পটলার বনভ্রমণ

সুখে থাকতে ভূতে কিল মারে বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। মানে সংসারে বেশ কিছু মানুষ আছে তারা সুখে-শান্তিতে থাকতে চায় না। যেভাবেই হোক কোনো একটা অশান্তিকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেই। কথাটা আমাদের বন্ধু পটলার বেলাতে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিজে তো অশান্তিতে জড়াবেই, আর সেই সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের আমাদের বাকি চারজনকেও জড়াবে।

বেশ ছবির মতো সুন্দরই সবকিছু ছিল। আমরা অর্থাৎ আমি, পটলা, হোঁৎকা, ফটিক মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। গোবরা এত করেও টেস্টে অ্যালাউ হল না। হবে কী করে! মামার বিরাট কুমড়োর ব্যবসা। এবার নাকি বিদেশেও কুমড়ো এক্সপোর্ট করছে। গোবরাও সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে কুমড়ো কালেকশন করে জোগান দিতে ব্যস্ত ছিল। কুমড়োর জন্যই অ্যালাউ হয়নি। লাউ-কুমড়োর মধ্যে নাকি মিল নেই। তাই অ্যালাউ হয়নি গোবরা। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিই, তুই পাকা হয়ে অ্যালাউ হবি, সামনের বছর।

পটলা এর মধ্যে প্রোগ্রামও করে ফেলেছে, এবার সে অরণ্যভ্রমণে যাবে। আর ইদানীং পটলা বন-জঙ্গল নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করেছে। অরণ্যই হল আজকের গ্রিন হাউস ব্যাঙ্ক, উষ্ণায়ন থেকে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাতে পারে এই বনজঙ্গল, গাছই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু একদল শয়তান নিজেদের হীন উদ্দেশ্যের জন্য এই অরণ্যকে ধ্বংস করছে-এই সব নিয়ে রীতিমতো ভাষণ দিতে শুরু করেছে পটলা। আমরা পটলার সেসব কথা মন দিয়ে না হোক কান দিয়ে অন্তত শোনার ভান করি। কারণ পটলাই আমাদের পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের ক্যাশিয়ার। ক্যাশও নেই, ক্যাশবাক্সও নেই। তবু সেই-ই ক্যাশিয়ার। এতদিনের চা-টোস্ট, সিঙ্গাড়া, আইসক্রিম, এসব খরচা ওই-ই জোগায়। বিরাট বনেদি বাড়ির একমাত্র বংশধর। ওর বাবা-কাকার দুটো কারখানা, ওর ঠাকমার নামে এই এলাকায় বিরাট বাজার। বাড়িতে নিত্যপূজা হয়। ওর ঠাকমা রোজ ডেকে পাঠিয়ে আমাদের গোপালের ভোগ খাওয়ান। লুচি, কিশমিশ দেওয়া ছোলার ডাল, ছানার কালিয়া, পায়েস। তাঁর দয়াতেই পটলার হাতে ক্যাশ আসে। তাই পটলাকেই আমরা ক্যাশিয়ার বানিয়েছি।

বেশ চলছিল আমাদের প্রসাদ সেবা, খেলাধুলো। ফটিক আমাদের ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। পড়াশোনার পাশাপাশি কোন ওস্তাদজির কাছে গানও শিখছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। আর ক্লাবে-বাড়িতে হারমোনিয়াম নিয়ে তা-না-নানা করে। ওর ওস্তাদ ওকে শিখিয়েছে-'কাঁহা গ্যায়ে ঘনশ্যাম'। সেই তিনটে কথাই নানা সুরে, নানা তালে সে রেওয়াজ করে। আমরা বলি-তারপর কী রে? ঘনশ্যাম গেল কোথায়? ফটিক বলে-পরের লাইন রেওয়াজ করাবে ছ'মাস পর। আগে এটাই রপ্ত করি। তারপর আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে শুঁড় তোলে-কাঁহা গ্যায়ে-

হোঁৎকা বলে-তর দেশ ভারতবর্ষে। ঘনশ্যামরে যেখানে মন চায় যেতে দে। তুই থাম! আর গাওনের দরকার নাই।

ফটিক বলে-পরের লাইনটা পাব এবার।

এমনি দিনে সব শান্তি নষ্ট করে পটলা বলে, পিসেমশাইকে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনিও লিখেছেন, চলে আয়। বন-পাহাড় ঘুরে যাবি। দেখবি কেমন বন, চোখ-জুড়োনো সবুজ। আর সাতশো পাহাড়ের দেশ সারান্দা। সেই বন-পাহাড় দেখে যা। এখনও অব্দি একটা পাহাড়ই দেখিনি, তায় একসঙ্গে সাতশো পাহাড় দেখব ভেবে রীতিমতো ভয়ই পাই। সেবার দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ে গিয়ে পালকি নিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, এবার সাতশো পাহাড় আর গহন বন! কী যে হবে জানি না!

হোঁৎকা যেন আগুনে ঘি ফোড়ন দেয়। বলে সে, ফরেস্ট তো যাইবি! তর পিসেমশায়ের ত শহরে খুব নামডাক! তায় বনবাংলোতেই যাইমু। বনকে যদি দেখতেই হয় ফরেস্ট বাংলোতেই থাকার লাগব।

একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। পটলা বলে, কথাটা মন্দ বলিসনি! সারান্দার গহন অরণ্যেও অনেক ভালো ফরেস্ট বাংলো আছে। আজই বাংলোর পারমিশানের জন্য বনকর্তাদের চিঠি দিচ্ছি।

পটলার মাথার সুপ্ত পোকাটা নড়ে ওঠে। বলে, পটলা, দারুণ হবে। হোঁৎকা আর আমি ওই বনবাংলোয় চলে যাব। পিসেমশাই ওই সারান্দার গহন বনের মধ্যে ফরেস্ট বাংলোয় থাকতে দেবেন না। তিনি বলবেন-সকালে বনে যাও-দিনভোর বনে ঘুরে সন্ধ্যার মুখে

শহরে ফিরে এসো। খুব সাবধানী লোক তিনি। তাই ভাবছি আমরা বন ঘুরে তবে শহরে আসব।

আমি বলি-তোরা তো ফরেস্ট বাংলোয় থেকে বন দেখবি ঠিক করেছিস, শুনেছি সারান্দায় বাঘ-হাতির পাল, বাইসনের দল, ভালুক, হরিণ, সম্বর সবই আছে?

পটলা বলে-আছে তো! দলে দলে আছে নানা প্রাণী। ওদের দেখতে গেলে রাতের অন্ধকারে জিপ নিয়ে স্পটলাইট নিয়ে বের হতে হয়। বনবাংলোয় না থাকলে রাতে বের হওয়া যায় না।

হোঁৎকা বলে বেশ বীরদর্পে-তোগোর মুরগির কলজে! বাঘ-হাতির পাল দেখলে প্যান্ট বাসন্তী কালার কইর্যা ফেলবি! তাই তগোর রাতে বনে লই যামু না। পটলা আর আমিই যামু। তারপর কি দ্যাখলাম, কি করলাম সব কমু পরে পিসেমশাই-এর বাড়ি আইস্যা-

এর মধ্যেও হোঁৎকা যে এমন ডেয়ার ডেভিল হয়ে উঠবে তা ভাবিনি।

পটলা বলে, ঘাবড়াস না। পরে তোদেরও বনে নিয়ে যাব। আমরা ব্যাপারটা দেখে-বুঝে আসি।

গোবরা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার বলে, কোনো প্রবলেম হবে না তো!

হোঁৎকা এখন পটলার সাপোর্টার! সে বলে, না-না, কুন প্রবলেম হইব না!

হোঁৎকার কথাটা ভালো লাগেনি। তাও বলি, গোবরা , আমরা তো ভিতুর ডিম! ওদের দুজনকে যেতে দে- ওরাই সামলাক্। আমাদের ভেবে লাভ কি?

পটলা বলে-না-না, তোরাও তো যাচ্ছিস বনে! ঠিক সাতদিন পর! সমী, ইংরাজিটা তো তুই ভালো জানিস। বনবিভাগের কর্তাদের লিখে দে, ওই ফরেস্ট বাংলো বুক করার জন্য। একটা ঘর চাই সাতদিনের জন্য। তারিখটাও লিখে দে।

অর্থাৎ পটলার ওসব হিসাবও হয়ে গেছে। গোবরা বিজনেস বোঝে। সে বলে, ক্লাবের ক্যাশ তো খালি। বেড়ানোর খরচ-?

পটলা বলে, ওর জন্য ভাবিস না। ঠাকমাকে বলে রেখেছি। ক্যাশ ম্যানেজ হয়ে যাবে। একটা লিস্ট করতে হবে ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না। তাই ইস্টিশানে নেমে লোকাল বাজার থেকে সবকিছু নিয়ে নেব। ফর্দ করে নিবি।

টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এর মধ্যে পটলা অরণ্যজগৎ, বন্যপ্রাণীজগৎ নিয়ে বেশ কিছু বইও জোগাড় করেছে। বলে-বনে যাবি, বন্যপ্রাণীদের সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করে নে। সারান্দার শালবন সারা এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

গোবরা বলে-কেন? তরাই-এর শালও খুব ভালো।

পটলা বলে-সারান্দাতেই রয়েছে সবচেয়ে প্রাচীন শালগাছ। এর এক-একটার পরিধি বারো ফিটেরও বেশি। আর মানেও সেরা। তাছাড়া সেগুন, নিমশাল, গামহার, আরও অনেক ভালো গাছ আছে। আর বন্যজন্তুর তো অভাব নেই। পাল পাল হরিণ, হাতি, সম্বর, ভালুক তো আছেই। এমনকী চিতা, বাইসনও আছে।

গোবরা বলে-এত দামি গাছ, এত প্রাণী ওখানে-তাহলে চোরাশিকারিও আছে ওখানে। বনের মধ্যে শুনেছি তাদেরও দাপট কম নয়।

পটলা বলে-তা হতেও পারে। আমাদের তাতে কী। আমাদের বন আর বন্যপ্রাণী দেখা নিয়ে কথা।

হোঁৎকা বলে-আর কয়দিন বনে গিয়ে ফ্রেশ অক্সিজেন লইয়া আসুম। মুনি-ঋষিরা একশো বছর কেন বাঁচে জানস্? ওই অক্সিজেন

আর পিওর ফ্রুটস্-

হোঁতকাও আমাদের বন সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে শুরু করেছে।

এর মধ্যে বনবিভাগ থেকে দুজনের জন্য ফরেস্ট বাংলোর ঘর বুকিং-এর চিঠিও এসে গেছে। পটলা আর হোঁৎকা কালই চলে যাবে। আমরা যাব সাতদিন পর। বড়বিল স্টেশনে নামব। পটলার পিসেমশাই-এর ওখানে কাঠের গোলা, করাতকল। আর ওখানের পাহাড়ে রয়েছে অফুরান খনিজ লোহা, অর্থাৎ আয়রন ওর। সেই আয়রন ওর তুলে চলে যায় নামী কারখানায়। তাঁর বন-পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে নাকি দু-তিনটে বাংলো। তারই একটাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পটলারা যাবে বনপাহাড়ের শেষ স্টেশন অবধি। বন থেকে কাঠ বোঝাই ট্রাক বাইরে আসে, সেইসব ফেরত ট্রাক ধরে ওরা বনের মধ্যে গিয়ে ফরেস্ট বাংলোয় থাকবে সাতদিন। তারপর আবার বন থেকে বেরিয়ে ট্রাক ধরে পিসেমশাই-এর বাংলোতে পৌঁছাবে। আর আমরাও সেদিন সকাল ন'টার গিয়ে নামব। একসঙ্গেই যাব পিসেমশাই-এর বাড়ি। পিসেমশাইও জানবে আমরা একসঙ্গে কলকাতা থেকে আসছি।

আমরা পটলা আর হোঁৎকাকে ট্রেনে তুলে দিই। উপর-নীচ দুটো বার্থ। দুজনে বেশ গুছিয়ে বসেছে। এবার নজর পড়ে সহযাত্রীদের দিকে। ওদিকে বার্থে বসে আছে মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। কপালে রক্তচন্দনের তিলক। বেশ ভক্তি ভক্তি ভাব। নিরীহ গোছের চেহারা। পাশে আরও কয়েকজন। ভদ্রলোক এর মধ্যে প্রকৃতির মহাশক্তির সম্বন্ধে অনেক গূঢ়তত্ত্ব নাকি প্রকাশ করা শুরু করেছে। হিন্দি দেহাতি টানের সঙ্গে বাংলা মেশানো। কথা শুনে মনে হয় ভদ্রলোক অবাঙালিই। তবে বাঙালিদের সঙ্গে ওঠা-বসা আছে। বাংলা ভাষাটাও ভাঙা ভাঙা বলার চেষ্টা করে। 'ভক্তিমার্গই একদম সচ্‌মার্গ-সত্যপথ। ভক্তিভরে ঈশ্বরকা ভজনা করো, জরুর দর্শন মিলেগা।'

পটলা বলে-মহারাজ, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

অবশ্য ভদ্রলোকের পরনে সাদা ধুতি, শার্ট। সঙ্গে একজন বছর বাইশের ছেলে। মহারাজের বেশও নয়। তবু পটলা তাকে মহারাজ বলে।

ভদ্রলোক বলে, কৌশিশ করছি বেটা! সব্‌ তাঁরই লীলা! জয় সীয়ারাম-

ট্রেন তখন ছুটে চলেছে। খড়্গপুর ছাড়িয়ে শালবনের সীমা শুরু হয়েছে। রাতের অন্ধকারে বন কালো রখার মতো দেখায়। ওদিকে বসে আছে আর এক ভদ্রলোক। জীর্ণ লম্বাটে চেহারা। টিকালো নাক, চোখ দুটোও বড় বড়। সব দেখছে সে। আর কান খাড়া করে মহারাজের মূল্যবান ভাষণ শুনছে। সঙ্গে তার স্ত্রী আর ছোট ছেলে। ওরা যে ঈশ্বরের কথায় তত বিশ্বাসী নয় তা বোঝা গেল।

এবার মহারাজ তার পোঁটলা থেকে একটা বড় সাইজের টিফিন বাক্স বের করে। তাতে দেখা যায় কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুভাজা, নতুন গুড়ের পায়েস আর বেশ বড় সাইজের কালাকাঁদ। হোঁৎকা একটু বেশি পেটুক। সে এবার এইসব খাবার দেখে মহারাজের শ্রীচরণে মণপ্রাণ ঢেলে দেয়। বলে, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, মহারাজ!

ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বলে-নেহি নেহি, আরে আমি তো সেবক আছি। এ তিওয়ারি, ইন লোগোকো প্রসাদ দো-

তিওয়ারিও এক টুকরো খবরের কাগজে দুটো কচুরি, আলুভাজা, এক হাতা পায়েস আর দুটো কালাকাঁদ দেয়। মহারাজ বলে, বাবাজিকা প্রসাদ, লেও বেটা-

বেশ তৃপ্তিভরে এবং ভক্তিভরে হোঁৎকা সেই খাবার খায়।

ট্রেন তখন বক্সার পার করে ঘড়িবাড়ির দিকে চলেছে। অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেন ছুটেছে। আশপাশের যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। পটলা স্বপ্ন দেখছে সারান্দার গভীর বনে সে আর হোঁৎকা চলেছে। ছায়াঘন অরণ্য-পাহাড় বেষ্টিত পথ। সাবধানে পা ফেলে চলেছে তারা বনের পথে। হঠাৎ গা-ছমছম করা স্তব্ধতা ভেদ করে ওঠে হাতির চিৎকার। একপাল হাতি এদিকেই আসছে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে। ওরা দুজনে সামনের দিকে জঙ্গল ভেঙে ছোটার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ছিটকে পড়ে। পায়ে কাঁটা ফুটেছে। এদিকে

সামনে হাতির পাল। পটলা চিৎকার করে উঠে বসে। তারপরই সদ্য ঘুমভাঙা চোখে দেখছে আশপাশ।

ট্রেনের বার্থে শুয়েছিল সে। রাতের অন্ধকারও আর নেই। ট্রেনটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। সেই শীর্ণকায় লম্বা লোকটা ওর পা ধরে নাড়া দিচ্ছে। পটলা চোখ চাইতে বলে, লাস্ট স্টেশন এসে গেল! বলছিলে এখানে নামবে! গাড়ি তো এখানেই থেমে যাবে। আবার একঘণ্টা পর ফিরে যাবে।

পটলার খেয়াল হয়। এত ঘুম ঘুমিয়েছিল টেরই পায়নি। হোঁৎকা এখনও ঘুমোচ্ছে। পটলা হোঁৎকাকে ডাকে, অ্যাই হোঁৎকা, আর কত ঘুমোবি? ওঠ-এবার নামতে হবে। ওঠ।

ঠেলাঠেলি করেও হোঁৎকাকে জাগানো যায় না। তারপর জোরে ধাক্কা দিতে হোঁৎকা এবার ধড়মড় করে উঠে বসে। গাড়ি তখন শেষ স্টেশনে ইন করছে। ওরা মালপত্র নামাতে গিয়ে দেখে যেখানে তাদের ব্যাগপত্র রেখেছিল সেই জায়গাটা খালি। চারটে ছোট-বড় ব্যাগের একটাও নেই। যে ব্যাগটা মাথায় দিয়েছিল, মাত্র সেটাই আছে।

পটলা চমকে ওঠে-আমাদের ব্যাগ?

সেই লোকটা নামতে নামতে বলে-তোমাদের ব্যাগ? ওসব তো ওই মহারাজের ব্যাগ? ওরা তো সব নিয়ে টাটানগরে নেমে চলে গেছে।

হোঁৎকা বলে-বুঝেছি! ক্যান এত ঘুমাইছি! মাদক মেশানো খাবার খাইয়াই ক্যামন ঘুম আইল! এহনও যাইত্যাছে না-

পটলা বলে-এখন কী হবে?

ওরা প্লাটফর্মে নেমেছে। এবার ভালো করে দেখে স্টেশনটাকে। উঁচু প্লাটফর্মও নেই। ওদিকেই একটা পাহাড়। পাহাড়টা যেন এখানেই শেষ হয়ে গেছে। তাতে শাল, মহুয়া নানান গাছে ভরা। নির্জন স্টেশনে ট্রেনটা দম নিচ্ছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে এই জায়গা থেকে সে পালাবে।

চারদিক পাহাড় আর সবুজের কলরব। বনভূমি। ওদিকে স্টেশনের বাইরে দু-একটা ঝুপড়ির দোকান। ওদিকে কাঠের স্তূপ। দু-একটা ট্রাকও দেখা যায়। হোঁৎকা বলে, সবই তো গেছে গিয়া, চল, আমরাও ফিইর‍্যা যাই। পকেটে যা আছে তাতে ফেরার ভাড়া হই যাবে।

কিন্তু ওই বনভূমি, রহস্যভরা পাহাড় যেন পটলাকে টানে। সে বলে, আমার কাছে কিছু টাকা আরও আছে। দু'খানা জামা-প্যান্টও। এসেছি যখন বনবাংলোতে চল। ফিরে গেলে ওরা সবাই হাসবে।

তা সত্যি! প্রসাদ খেয়ে এমনভাবে সব হারাতে হবে তা ভাবিনি হোঁৎকা।

হোঁৎকা বলে-মহারাজ নয়, ও ব্যাটা মহাচোর! কান মইল্যা সব লইয়া গেছে গিয়া।

পটলা বলে-তবু আমাদের থামাতে পারবে না! দেখি বনবাংলো যাবার কোনো কিছু পাই কিনা!

হোঁৎকা বলে-ওই ঝুপড়ির দোকানে চল। বনে কী পাবি কে জানে! কিছু খাই লইতে হইব যাবার আগে।

স্টেশনের বাইরে উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ। দূরে একটা আলোর মতো দেখা যায়।

পাহাড় এখানে চারদিকে। মধ্যে একটু উপত্যকার মতো। নিচু জায়গাতে সামান্য চাষবাস হয়। ছোট্ট নদীটা ওই পাহাড়ের দিক থেকে এসে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে পাহাড়শ্রেণির কোন গলিপথে হারিয়ে গেছে। এই নদীর ধারে গড়ে উঠেছে ঝুপড়িগুলো। ওদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে নানা সাইজের কাঠের গুঁড়ির টাল। বন থেকে নানা ধরনের কাঠ আসে। এখান থেকে

ট্রেনে, ট্রাকে উঠে শহরে, কল-কারখানায় চলে যায়। বন থেকে কাঠ এনে এখানে ড্রাইভাররা মাল খালাস করে আবার বনের গভীরে ফিরে যায় কাঠ আনার জন্য। নদীর জলে ড্রাইভাররা গাড়িগুলিকে ধুয়ে নেয়। নিজেরা জিরিয়ে নিয়ে রুটি-তড়কা খেয়ে আবার বনে ফেরে। তাই দু-চারটে ঝুপড়ির দোকানও গড়ে উঠেছে। হোঁৎকা-পটলার খিদেও পেয়েছে। তার আগে ফরেস্ট বাংলোয় যাবার জন্য কোনো ট্রাকের সন্ধান করতে একজন বলে, ওদিকে যাও। বন-বাংলোতে যাবার ট্রাকগুলো ওখানের গেটেই থামে। ওখানে গেলে সর্দারজিকে পাবে।

পটলা-হোঁৎকা খুঁজে খুঁজে সেই গেটেই পৌঁছয়। কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে খাটে বসে ড্রাইভাররা রুটি-তড়কা খাচ্ছে। পটলা-হোঁৎকা ওদেরই জিজ্ঞাসা করে, থলকোবাদ ফরেস্ট বাংলোয় যাব আমরা। কোনো ট্রাক মিলবে?

সর্দারজি তখন তড়কার মধ্যে থাকা একটা কাঁচালঙ্কা চিবিয়েছে। আর বুনো কাঁচালঙ্কা তেমনি ঝাল। ঝালের চোটে তখন তার অবস্থা কাহিল। কথা বলার মতো অবস্থায় নেই সে। হুস হাস করছে। লালা ঝরছে ঝালের চোটে। ওর হেল্পার খালাসিরা বেগতিক দেখে পটলাদের বলে, ওস্তাদকো তন্ মত্ করো? চলো হামিসে বাত করবে।

ওকে থলকোবাদে নিয়ে যাবার কথা বলতে খালাসিটা জানায়, দো আদমি তিস রুপেয়া লাগবে।

পটলা বলে-অনেক বেশি বলছ তুমি।

দুসরা কোই ট্রাকসে যাইয়ে! খালাসি নির্বিকার চিত্তে জবাব দেয়। কারণ সে জানে ওখানে যবার আর অন্য কোনো গাড়ি নেই। ওদেরও যেতে হবে। শেষে দরদস্তুর করে দুজনের পঁচিশ টাকায় রফা হয়। এবার ড্রাইভারও লঙ্কার ঝাল সামলে নিয়ে বলে, কাঁহা রুপেয়া? অর্থাৎ ভাড়াটা আগামই দিতে হবে। টাকা দিয়ে দেয় পটলা।

খালাসি বলে-আধাঘণ্টার মধ্যে তৈয়ার হো যাইয়ে, গাড়ি ছেড়ে দেবে।

বেলা তখন বারোটা প্রায়। বনে কী জুটবে জানা নেই। তাই ওই তড়কা-রুটি খেয়ে নিয়ে ট্রাকে ওঠে। আর ট্রাকও চলতে শুরু করে। ফাঁকা প্রান্তর ছাড়িয়ে ট্রাকটা এবার বন-পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। রাস্তা বলতে মোরাম ফেলা বনবিভাগের অস্থায়ী রাস্তার মতো কিছুটা। শীতের মরশুমে বনে পারমিট দিয়ে গাছ কাটানো হয়। সেইসব লগ বের করার জন্য অস্থায়ী পথও চাই। বর্ষার জলে তা মুছে যায়। সেই এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে ট্রাক চলেছে। আর পটলা-হোঁৎকা যেন ট্রাকের পিছনে ফুটন্ত কড়াই-এর জলে আলু পটল সিদ্ধ করার মতো লাফালাফি করছে। এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে। আর সেই কষ্টকে ভোলার জন্য পটলা গান শুরু করেছে, আমাদের যাত্রা শুরু হল এবার ওগো কর্ণধার!

হোঁৎকা একটা রড ধরে কোনোমতে স্থির হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছে। দু'দিকে গভীর বন। পুরুষ্টু শাল-গামহার-শিয়াশাল, আরও নানা গাছের ঘন সমাবেশ। বন ক্রমশ গভীরতন হয়েছে। রোদ এখানে একচিলতে কোনোমতে আসে। ঘন সন্নিবেশিত গাছগুলো। সবাই এখানে ভিড় ঠেলে মাথা আকাশের দিকে তুলে সূর্যের আলোর প্রত্যাশী। প্রতিযোগিতা চলছে সবার মধ্যে। হঠাৎ গাছের ঘন ডালে কিসের শব্দ শুনে হোঁৎকা গাছের উপরের দিকে চাইল। দেখে একটা বিরাট ময়ূর এদের ট্রাকের আওয়াজ শুনে ভারী দেহ নিয়ে উড়ে গেল আড়ালে। হোঁৎকা বলে ওঠে-দেখছিস্! এখানকার ময়ূর।

ট্রাকের সামনের রাস্তায় দুটো হনিণ নিমেষের মধ্যে লাফ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে বনের গভীরে হারিয়ে যায়। পিছনে শোনা যায় একটা চাপা গর্জন। কোনো লোভী হায়না শিকার হারাবার রাগে গর্‌গর্ করাছে। আতঙ্ক জাগে ওদের মনে। এই বন যেন কেমন রহস্যে ভরা।

ট্রাকটা পাহাড়ের নীচে একদিকে এসেছে। সামনেই একটা পাহাড়ি নদি। জল বেশী না। তার চেয়ে বেশি রয়েছে পাঁক-কাদা। দুটো পাহাড়শ্রেণির মাঝে একটা জলনিকাশি ঝোরা। গাড়িটা কাদায় নেমেই আটকে গেছে। গিয়ার দিয়ে গাড়ি তোলার চেষ্টা করছে। গাড়ি নড়ে না। ড্রাইভার চেষ্টা করে। গাড়ি যেন জগদ্দল পাথরের মত বসে গেছে। পটলা তখনও প্রকৃতির প্রেমে মশগুল হয়ে গাইছে-'আমি চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী।'

হঠাৎ খালাসির তীব্র কণ্ঠে গর্জন শুনে থামল সে। খালাসি চিৎকার করে,- আবে কিশোরকা বাচ্চা! গানা ছোড়কে হাত লাগাও।

ওদের হাঁক-ডাকে পটলা নামে ট্রাক থেকে। আর ড্রাইভারও গাড়ি তোলার চেষ্টা করছে। এরাও ঠেলে প্রাণপণে। সকলের ঠেলায় গাড়ি একটু এগোচ্ছে তারপর আবার পিছনে গড়িয়ে আসছে। আর কাদা-জল ছিটকে আসছে। এ জলের রং লালচে। আর সেই জল-কাদা সারা গায়ে-মুখে লাগে পটলা আর হোঁৎকার। ওদের আর চেনা যায় না। ঠেলেঠুলে গাড়ি স্টার্ট হল। ঝোরার জলে কাদা-মাটি ধুয়ে ভিজে শার্ট-প্যান্ট পরেই ট্রাকে উঠল।

পটলা বলে-আর কাদা মেখে গাড়ি ঠেলব না।

হোঁৎকা বলে-টাকা দিচ্ছি, গাড়ি ঠেলুম ক্যান্!

খালাসি বলে-তব উতর যাও। পায়দল যাও!

এই গভীর গহন বনে সেটা সম্ভব নয়। তাই কাদা মুছে আবার ট্রাকে ওঠে পরবর্তী কোনো ঝোরার বুক থেকে গাড়ি তোলার জন্য তৈরি হয়ে।

বেলাও বাড়ছে। ট্রাক চলেছে গুড় গুড় করে বনের পথে। এই পথের যেন শেষ নেই। হোঁৎকা শুধোয়, থলকোবাদ আর কদ্দুর?

হঠাৎ শান্ত বনের মধ্যে ওঠে ঝড়ের শব্দ। মড়মড় করে ডালপালা ভাঙছে। ওদিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসে। সামনের পথটায় দেখা যায় বনের একটা অংশ। চাতাল মতো। গাছপালা এখানে কম। দু'দিকেই বনভূমি। মাঝের জায়গাটায় দেখা যায় বনের ওদিক থেকে একপাল হাতি আসছে। হোঁৎকা অস্ফুট আর্তনাদ করে, পালা, হাতি-

খালাসি ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে। আর ড্রাইভারও ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। হাতির পাল প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। একটা বিরাট দাঁতাল হাতি ট্রাকটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানেই। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গর্জন করে তীব্রকণ্ঠে আর থামের মতো পা ঠুকতে থাকে। যেন শাসাচ্ছে এদের। তবে কেউ এসে আক্রমন করে না ওদিকে হাতির পাল একে একে পার হয়ে এদিকের বনে যেতে সেই দাঁতাল হাতিও এবার পিছু পিছু বনে যায়।

পটলা-হোঁৎকা এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল। হাতিগুলো চলে যেতে খালাসি বলে, ওদের কোনো লুকসান না করলে ওরাও কোনো লুকসান করে না।

হোঁৎকা বলে-ই কোথায় আইছিস রে, পটলা? বন দেইখ্যা কাম নাই। চল, ফিরে চল।

ফেরার পথও আর নেই। এখন বনবাংলোতেই যেতে হবে। তারপরে ওখানে গিয়ে ফেরার কথা ভাবা যাবে।

থলকোবাদ বনবাংলো বনের গভীরে গড়ে উঠেছে ব্রিটিশদের আমল থেকেই। বনের মধ্যে এত বড় বনবিভাগের নানা ধরনের কাজ চালাবার জন্য, নতুন বনাঞ্চল তৈরির জন্য, পথঘাট তৈরির জন্য এবং বনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ বড় একটা ফরেস্ট কলোনিও আছে। রেঞ্জার, অন্য স্টাফদের কোয়ার্টার, অফিস, পশু চিকিৎসালয় সবই আছে। আর এখানেই গড়ে উঠেছে আদিবাসীদের বড়সড় জনপদ। প্রাইমারি স্কুল, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবই আছে। আর সপ্তাহে দু'দিন এই বনের গহনেও হাট বসে। এই

সবকিছু থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপর গড়ে উঠেছে সুন্দর বাংলো। বেশ কয়েকটা ঘর রয়েছে। লাগোয়া বাথ-রুম। পাহাড়টা ঘিরে বয়ে গেছে একটা ছোট পাহাড়ি ঝোরা। হাঁটু ভোর জল থাকে। তার উপর একটা কাঠের ব্রিজমতো আছে। সেই ব্রিজ পার হয়ে পাহাড়ের গায়ে চড়াই ভেঙে রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। গাড়ি উঠে যায় উপরে। বাংলোর সামনে এদিকে-ওদিক সুন্দর সজানো বাগান। আর পাহাড়ের গায়ে কার্নিশ বের করে কাঠের তক্তা দিয়ে বসার ব্যবস্থাও আছে। দীর্ঘ শাল গাছ-গুলোর মাথা এসে পায়ে ঠেকে। আর কানে আসে প্রবাহমান ঝোরার কলকল শব্দ।

মাঝে মাঝেই তাই অরণ্যপ্রেমীদের অনেকেই পারমিট নিয়ে চলে আসে এখানে। বনের গভীরে রয়েছে লিগিবদা ওয়াচ টাওয়ার। গহন বনের মধ্যে ঝোরার জল বইছে। ঝোরার ধারে গাছের ডালে চটের থলেতে নুন টাঙানো। বনবিভাগ থেকে ওগুলো টাঙিয়ে রাখা হয়। বন্যপ্রাণীরা এসে নুন খায়। জল খায়। কাদায়-ঘাসে লুটোপুটি খায়। ওয়াচ টাওয়ার থেকে তাদের দেখা যায়। প্রথমে আসে রাতের অন্ধকারে তৃণভোজী প্রাণীরা। হাতি, বাইসন, হরিণ, সম্বর ইত্যাদি। আর বনের রাজা বাঘ যখন আসে তখন এরা সরে যায়। নীলাভ চোখের দৃষ্টি নিয়ে বনের ভিতর থেকে বের হয়। বাতাসে ওঠে উৎকট গন্ধ। শিকারের সন্ধানে ঘোরে।

বন্য জীবনের বহু বৈচিত্র্যও দেখা যায় এখানে।

ভূধর বিশ্বাস কলকাতায় থাকে। তার কাঠের ব্যবসা রয়েছে নিমতলার ওদিকে। ভূধরের কাঠের ব্যবসা ওর বাবা তাঁর বন্ধু অজয় সেনের সঙ্গে শুরু করেছিলেন। আজ অজয়বাবুর বয়স হয়েছে। স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। ওঁদের কোনো ছেলেপুলে নেই। বালিগঞ্জ এলাকায় বিশাল বাগানঘেরা বাড়ি। আরও কীসব ব্যবসা আছে। অজয়বাবু, তাঁর স্ত্রী মানসী দেবী ওঁদের বন্ধুর ছেলে ভূধরকে ছেলেবেলা থেকেই দেখছেন। তাকে স্নেহ করেন। তবে অজয় সেন ঠিক করেছেন কাঠের ব্যবসাটা ভূধরকে দিয়ে যাবেন, আর বালিগঞ্জের বাড়ি ও অন্যসব ব্যবসা কোনো ধর্মীয় সংস্থাকে দান করে দেবেন। তাঁর ইচ্ছা মিশনকে এসব সান করলে এই অর্থ সৎকাজেই লাগবে।

ভূধর এসব শোনে মাত্র। সে এখন কাঠের ব্যবসা চালাচ্ছে। বাইরে থেকে বন ইজারা নিয়ে শাল, সেগুন, আরও নানা কাঠ আমদানি করে। তবে ভূধরের নজর অজয়বাবুর সাম্রাজ্যের দিকে। যেভাবে হোক এসব সেই-ই দখল করবে। তবে ভূধর খুবই সাবধানী আর চতুর। তাই এসব মনের কথা ভুলেও অজয়বাবুর কাছে প্রকাশ করে না। বরং বলে, তাই ভালো কাকাবাবু, মিশনের হাতে এসব তুলে দিলে সৎকাজে লাগবে।

অজয়বাবুর বয়স হয়েছে। স্ত্রী মানসী দেবীও সংসার ছেড়ে দূরে গিয়ে ঠাকুরের নাম করতে চান। তাই ভূধর বলে, কাকাবাবু, আমি তো বনে যাই কাঠের ব্যবসার জন্য। চলুন, বনে সুন্দর ফরেস্ট বাংলো আছে। সেখানে থেকে নিরিবিলিতে ঈশ্বরকে ডাকবেন। মুনি-ঋষিরা তো বনে থেকেই ঈশ্বর সাধনা করেন।

কথাটা অজয়বাবুর মনে ধরে। মানসীও বলেন, তাই চলো, কিছুদিন বনবাসেই থেকে আসা যাক।

ভূধর মনস্থির করেছে বনে গিয়ে কোনোমতে এদের দিয়ে বিষয়-সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার একটা মরিয়া চেষ্টাই করবে।

ভূধর বনে-পাহাড়ে আসে। শহরের মানুষ। বন সম্বন্ধে, বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঘ-হাতি সম্বন্ধে তার ভয় আছে। তবে টাকার জন্য সে সবই করতে পারে। বনজগতেও সাধারণ সহজ-সরল আদিবাসীদের মধ্যে থেকে সে বেশকিছু অন্য প্রকৃতির মানুষকে খুঁজে বের করেছে। তাদের টাকা দিয়ে সে তার কাজগুলো করায়। গাছ কাটার জন্য বনবিভাগকে টাকা দিয়ে পারমিট নিতে হয়। বনবিভাগের কর্মীরা কোন গাছ কাটা হবে তার নির্দেশ দিয়ে সেইসব গাছে হলুদ রং-এর ছাপ দিয়ে দেয়। কী পরিমাণ গাছ কাটা হবে তারও নির্দেশ থাকে। ভূধরদের খেলা শুরু হয় এরপর। বনবিভাগের কর্মীকের ম্যানেজ করে আরও বেশি পরিমাণ গাছ কাটাই করে। একই পারমিট তিনবার-চারবার দেখিয়ে তিন-চার গুণ কাঠ কাটাই করেন বনকে ধ্বংস করে। আর কিছু আদিবাসী চোরাশিকারিদের টাকা দিয়ে রেখেছে। রারা বন্যপ্রানী মেরে হারিত দাঁত, বাঘের চামড়া, হরিণের শিং এসব সংগ্রহ করে। ভূধর তার কাঠের চালানের সঙ্গে এসব কলকাতায় পাচার করে, যা থেকে তার লাখ লাখ টাকা আমদানি। তবে বাইরে থেকে ভূধরকে দেখলে কিচ্ছুটি বোঝা যাবে না।

এসব ছাড়াও এবার ভূধর অজয়বাবুর সম্পদ দখল করার জন্যই তাঁকে সস্ত্রীক টানা গাড়িতে করে এই গভীর বনের মধ্যে বাংলোয় এনেছে। অজয়বাবু, মানসীদেবী শহরের ভিড় থেকে দূর নির্জনে এই বনবাংলোয় এসে খুশিই হন। তবে সবকিছু তো একসঙ্গে মেলে না। বাংলোয় ওঁরা বাইরে থেকে চাল, ডাল, তেল, ঘি, মালপত্র মাছ, সবই এনেছেন। এখানের বাংলায় কাজের লোকের বড় অভাব। হতদরিদ্র এই আদিবাসীরা ভাত খেতে পায় পাঁচ-সাতদিন অন্তর। এদের খাদ্য বলতে কন্দমূল সিদ্ধ, মকাই সিদ্ধ, বন্য লতাপাতা নুন দিয়ে ঘাঁটা। আনাজপত্র ভালো রাঁধতেও জানে না। বেগুন পোড়া, শাকসিদ্ধ ইত্যাদিই খায়। টাই রান্না করার লোক এখানে তেমন মেলে না। অজয়বাবু দেখেন ওদের খাবার দিয়ে গেল কোনোরকমে-গলা ভাত, আলুপোড়া, বেগুন পোড়া। ডাল যা করেছে তা ভাতের মতো জমাট। তাতে নুনও নেই। সেইসঙ্গে খানিকটা ধানিলঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছে। মেনু দেখে মানসী চমকে ওঠেন।

একি! এই আধপোড়া পিণ্ডি খেতে হবে? ও ভূধর!

ভূধর এখানে এসে তার নিজের একনম্বরী আর দু'নম্বরী ব্যবসার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। কোনো দু'নম্বরী একট্রাক মাল গেছে স্টেশন বাজারে মহাজনের কাছে। অনেক টাকার মাল। এখনও ওরা ফেরেনি। ট্রাকওয়ালার কাছে যেতে হবে টাকা আনতে। ভূধর বলে। তাই তো দেখছি! বাংলোয় কাজ করার, রান্না করার লোকও পাচ্ছি না।

অজয়বাবু বলেন-অনেক তো খুঁজলে? এবার আমি নিজে খুঁজে দেখি যদি বাংলোয় কাজের জন্য কোনো লোক পাই কিনা। বাংলোয় একজন কাজ জানা বেয়ারা চাই।

মানসী বলেন-এই বনমানুষদের মধ্যে এমন লোক পাবে না। নিজেদেরই এখানে দেখছি হাত পুরিয়ে রাঁধতে হবে। কাজকর্মও করতে হবে।

ভূধর দায়িত্ব এড়াতে চায়। সে বলে-তাই দেখুন? যদি কোনো কাজের লোক পান! রান্না-বান্না তো করতে হবে! নাহলে যে উপোস দিতে হবে।
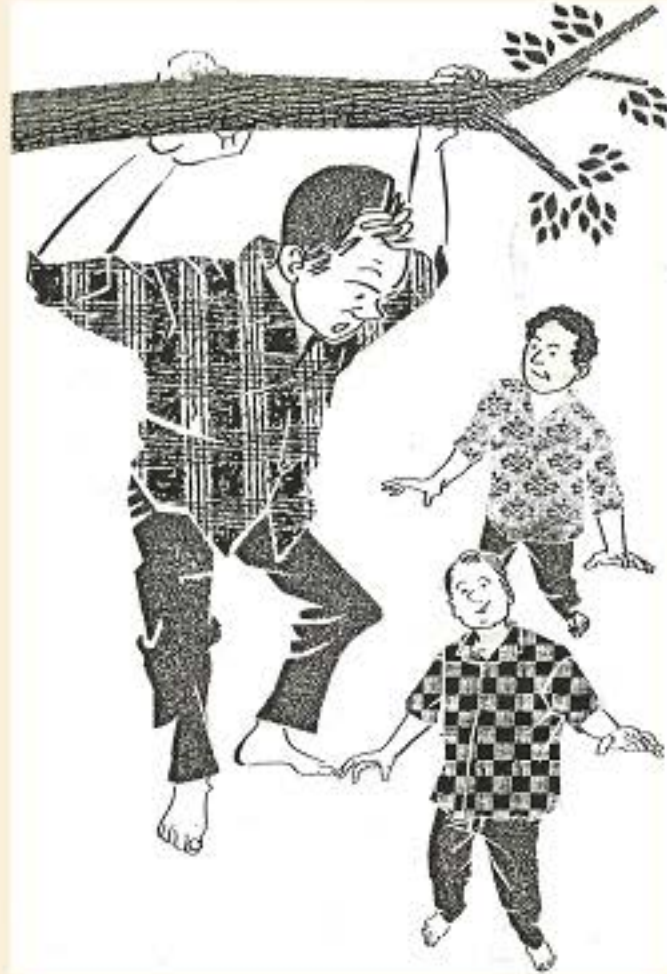
ওদিকে ট্রাক ফেরার সময় হচ্ছে। ভূধর বলে, আমার কাজ আছে। আমি চলি, কাকাবাবু। ভূধর জিপ নিয়ে চলে যায়।

বনের মাঝখানে চেক পোস্ট। একটা খুঁটি পোঁতা। তাতে একটা খুঁটি আড়াআড়িভাবে লাগানো। কোনো গাড়ি এলে বনবিভাগের লোকরা তা চেক করে দড়ি খুলে দেয়। বাঁশটা উঠে যায়। পথও পরিষ্কার হয়ে যায়। গাড়ি চলে যেতে বাঁশ আবার নেমে যায়। এত পাহারা দেবার কারণ বনবিভাগের অগোচরে যাতে কোনো বে-আইনি কাজ না হয়!

ভূধর না খেয়েই বের হয়ে যায়! মানসী অজয়বাবুকে বলেন, তুমি খাবে না?

অজয়বাবু বলেন-দেখি, কাজের লোক যদি পাই তখন খাব। ওই চাল সিদ্ধ আর বেগুন পোড়া আদিবাসীদেরই দিয়ে দাও। আমি বরং চিঁড়ে-মুড়ি খেয়েই থাকব। লোক আমি জোগাড় করবই। বের হয়ে যান অজয়বাবু ফরেস্ট কলোনির দিকে কাজের লোকের সন্ধানে।

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত পটলা-হোঁৎকা ট্রাকে বসে আছে। পথের জমা জল-কাদা সারা শরীরে ভর্তি হয়ে আছে। মুখে-চোখে ক্লান্তির ছাপ। আর জনহীন বনে হাতির পাল দেখেই ওরা খানিকটা ঘাবড়ে গেছে। ফরেস্টে যে কখন কী ঘটে তা ওরা বুঝেছে।

হঠাৎ বনের মধ্যে একটা জিপ আসতে দেখে ট্রাকটা থামে। জিপটাও এসে থামে ট্রাকের কাছে। ট্রাক থেকে দেখে পটলা-হোঁৎকা, ড্রাইভার তার সিটের নীচ থেকে একটা টাকার থলে নিয়ে এগিয়ে গেল জিপের আরোহীর দিকে। টাকার থলেটা সেই তরুণের হাতে দিয়ে বলে, মহাজন দিয়া। অউর বোলা, উড্ অউর দো ট্রাক চাহিয়ে, অউর দো শের কা চামড়া, হাতি কা দাঁত ভি।

পটলা-হোঁৎকা ট্রাকে বসে শুনছে ওদের কথা। জিপের সেই তরুণ বলে, কাঠ কাল দো ট্রাকই যায়েগা। তুম্ রাত কো জঙ্গলমে আও সর্দারজি!

এই বলে তার হাতের থলে থেকে একমুঠো টাকা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে জিপে উঠে বলে, চলি, রাতে ভেট হোগা। হুঁশিয়ার!

জিপটা চলে যায়! ট্রাকটাও এবার বনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। একটা জায়গায় এসে থামে। খালাসি বলে, যাও, থলকোবাদ আ গিয়া! ফরেস্ট বাংলো উধার! উ টিলাকা উপর।

জায়গাটা এক নজর দেখে ভালোই লাগে। চারদিকে গভীর বনে ঢাকা আদিম রহস্যময় পাহাড়। এই উপত্যকাতে কিছু ঘর-বাড়ি-জমিজিরাতও আছে। সামান্য চাষবাসও হয়। পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর ছোট্ট বাংলো। কে বলে-ওটা নিখিল সাহেবের বাংলো। আজীব সে আদমি। এই বনের তিনি ছিলেন বড়কর্তা। রিটায়ার করার পর একাই এই বনে থেকে গেছিলেন। আদিবাসীদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, আর ভালোবাসেন এই অরণ্যকে।

হোঁৎকা বলে-নিখিল সাহেব নয়, ওঁর নাম হওয়া উচিত বুনো সাহেব, নাহলে এই গভীর বনে কেউ পড়ে থাকে? চল গিয়া বনবাংলোর দিকে-

দূর থেকে দেখা যায় সেই টিলার উপর গাছ-গাছালি ঘেরা ছবির মতো বাংলোটাকে। পটলা বলে-দারুণ সিনসিনারি!

হোঁৎকা বলে-প্যাট ভরবো সিনসিনারি দেইখ্যা? ইখানে দোকান বলতে তো ওই মুদির দোকান একটা! খাওনের কী হইব?

পটলা বলে-চল দেখি, বাংলোর চৌকিদার কিছু দিতে পারে।

ওরা আসছে দুজনে। জামা-প্যান্টে কাদা-জলের শুকনো ছাপ। আর একদিনের জল-কাদাতেই কলকাতার ভদ্র ছাপটা মুছে গেছে।

অ্যাই শোনো, শুনছো? এই ছোকরারা?

এই পরিবেশে হঠাৎ ওই ডাক শুনে পটলা-হোঁৎকা দুজনেই চাইল। দেখে ওদিক থেকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

পটলা বলে-আমাদের বলছেন?

ভদ্রলোক কাছে এসে দুজনকে আপাদমস্তক যেন জরিপ করে দেখছেন। পটলা-হোঁৎকা দুজনের অবস্থাই শোচনীয়। বেশ বুঝেছে তারা হুট করে খাবার না নিয়ে এখানে এসে ঠিক করেনি। পকেটটার অবস্থাও বিশেষ ভালো না। এখানে থাকার খরচা দিয়ে খাবার

পয়সাও দু'দিনের জন্যও থাকবে না। আর ফিরবে কী করে সেটাও ভাবেনি তারা।

ভদ্রলোক শুধোন-কী করা হয় কাজকর্ম?

পটলার মুখে যেন কথাটা এসে যায়-জামশেদপুরে একটা হোটেলে কাজ করি দুজনে। এদিকে এসেছি।

ভদ্রলোক যেন হাতে চাঁদ পান। বলেন-অ্যাঁ, হোটেলে কাজ করো দুজনেই।

হোঁৎকা বলে-হঃ বয়-বেয়ারার কাজ! ওখানে ভালো লাগত্যাছে না। তাই চইল্যা আইলাম।

অজয়বাবুও বলেন-গুড্! ভেরি গুড! তা এখানে কয়েকদিন আমরা ওই বনবাংলোয় আছি। চলো না ওখানে। মাত্র তিনজন আমরা। এখানে ওই আদিবাসীদের রান্না ঠিকমতো পছন্দ হচ্ছে না। একটু কুকিং-এর কাজ আর তুমি বেয়ারার কাজই করে দেবে। ওখানেই থাকবে। খাবে-দাবেও আমাদের সঙ্গে। আর ডেলি দুজনে একশো টাকা করেও পাবে। কাজ খুব সামান্যই। ডেলি দুজনে দুশো টাকা। এছাড়া থাকা-খাওয়া!

পটলা কোনোদিন এসব কাজ করেনি। তাদের বাড়িতে, তাদের কারখানায় এমন কত লোকই কাজ করে। এই বনে এসেছে বেড়াতে। তাকে যে এরকম বেয়ারার কাজ করতে হবে তা ভাবেনি। হোঁৎকা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সে টুকটাক বাড়ির কাজও করে। এখানে এসে বিপদেই পড়েছে। তবু ক'দিন আহার-আশ্রয় পাবে। আর দিনে দুশো টাকা করে পাবে। ওদের খরচা করতেও হবে না। পটলা কিছু বলার আগেই হোঁৎকা বলে, আপনি বুড়া মানুষ, বনবাংলোয় এসে বিপদে পড়েছেন দেহি!

অজয়বাবু বলেন-সত্যি বিপদে পড়েছি হে! দিন পাঁচ-সাত থাকব।

হোঁৎকা বলে-ঠিক আছে, আপনি যহন কইছেন-কইর্যা দিমু। বয়-বেয়ারার কাজ সব জানি আমরা।

গুড! তাহলে চলো বাংলোয়! অজয়বাবু তাদের নিয়ে এবার পথের ধারে কাঠের ব্রিজ পার হয়ে টিলার উপর উঠতে থাকেন।

হোঁৎকা পটলাকে বলে-চল, সব ঠিকঠাকই হইব।

বাংলোতে মানসী একা। তিনিও ভাবনাতে পড়েছেন কাজের লোকের জন্য। এই বনবাংলোতে এসে হাঁপিয়েও উঠেছেন। কোথাও যাবার উপায় নেই। টিভি-রেডিও-সিনেমা নেই। সন্ধ্যা থেকে নামে আদিম অন্ধকার। তখন বাংলোর বাইরে থাকাও নিরাপদ নয়। গত রাত্রেই তো হাতির পাল এসে বাগানের সাজানো বাহারি ফুলের টবগুলোকে নিয়ে ফুটবল খেলে গেছে। সেদিন রাতে একটা সাবধানী চিতাকে আসতে দেখেছিলেন। মাঝে মাঝে হায়নার দলও আসে। দাঁতাল শুয়োরও ঘোরাফেরা করে।

এই তো অবস্থা! তার উপর যদি রান্নার লোক, কাজের লোক না পান চলবে কী করে। ভূধর তো এখানে এসে বনে বনে ঘোরে। তার কাঠের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে রাতেও জিপ নিয়ে বের হয়।

একাই রয়েছেন মানসী বাংলোতে। আশপাশে লোকজন আর কেউ নেই। পিছনেই গভীর জঙ্গল। যে কোনো মুহূর্তে ভালুক, হাতি চলে আসতে পারে। তাই দিন দুপুরেও তিনি দরজা বন্ধ করে আছেন। বিশ্রী লাগছে এখানে। হঠাৎ কাদের কথা শুনে সাহসে ভোর করে দরজা খুলে বের হয়ে দেখেন বিজয়ীর মতো ফিরছেন অজয়বাবু। সঙ্গে দুটি ছেলে। অজয়বাবু বলেন, গিন্নি নাও, তোমার জন্য এই যে হোটেলের ট্রেনড বেয়ারা এনেছি। এরমধ্যে অজয়বাবু এদের নামও জিজ্ঞাসা করেছেন।

হোঁৎকাই বলে, এর নাম চঞ্চল গাঙ্গুলি, ব্রাহ্মণ। আমার নাম মঙ্গল দাস। আমরা হোটেল নন্দনে কাজ করতাম। ওখানে আমাদের চঙ্গু আর মঙ্গু বলেই ডাকতেন সবাই।

অজয়বাবু বলেন-গিন্নি, এ চঙ্গু আর এ মঙ্গু। জামশেদপুরের নামী হোটেলের স্টাফ। ক'দিনের জন্য বনে বেড়াতে এসেছে। আমি ধরে আনলাম। সব দেখিয়ে দাও এদের। চঙ্গু, আগে চা হোক। দেখি, চা কেমন করো!

মানসী দেখছেন ওদের। ওরা যে ক্লান্ত বিধ্বস্ত তা বুঝেছেন। মানসীর নিজের সন্তান নেই। ছেলে দুটোকে তাঁর ভালো লেগেছে। দুঃখও হয়, কাজের জন্য অসহায় দুটো ছেলে এই বনেও এসেছে। মানসী বলেন-ওরা সবে এসেছে এতটা পথ, ওদের হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। আউট হাউসে গিয়ে জামা-প্যান্ট বদলাক, তারপর ওসব হবে। তারপর ওদের বলেন-ওদিকে তোমাদের থাকার ঘর। ওখানে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। জল-টল খেয়ে কাজ করবে।

পটলা-হোঁৎকারা এইসব প্যাঁচ-এর ব্যাপার দেখে বেশ চমকে উঠেছে। এবার আউট হাউসে এসে পটলা বলে,-এটা কী করলি? বেড়াতে এসে চাকরগিরি করতে হবে?

হোঁৎকা বলে-নিজেদের পকেট তো গড়ের মাঠ! থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে এখানে থাকা যাবে না। বাঘ-হাতিতেই শেষ কইর্যা দিবে। তাই কইত্যাসি, তুই ভাবিস না। আমিই ম্যানেজ কইর্যা দিমু। তোরে কিছু করতে হইব না।

পটলা গজগজ করে-চঙ্গু-মঙ্গু হয়ে থাকতে হবে!

হোঁৎকা বলে-পুরুষের দশ দশা। কখনও হাতি, কখনও মশা। এহন না হয় মশা হইয়াই থাকি। ফিরা গিয়া আবার হাতি হইব। চল, চা করছি। তুই কাপ-প্লেট গুলান ট্রেতে সাজাই ল। তার আগে পাঁউরুটি, মাখন, চিনি কলা, সন্দেশও আছে দেখি অনেক। খাইয়া ল-ক্ষুধা শান্ত হইলে মন-মেজাজও ঠাণ্ডা হইব।

পটলা-হোঁৎকা এবার বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে উদর সেবা করে। বেশ বুঝেছে এখানে খাওয়া-দাওয়া ভালোই হবে। হোঁৎকা চায়ের আয়োজন করতে থাকে।

বিকালের দিকে ফিরেছে ভূধর। তবে তার দলবলকে খবর দিতে হবে। আজ রাতেই চোরা কাটাই হবে দক্ষিণের বনে। বিশাল একটা সেগুন গাছকে রাতারাতি কেটে টুকরো টুকরো করে চালান করে দিতে হবে। আর ডমরুকে বলতে হবে হাতির দাঁতের জন্য, বাঘের চামড়ার জন্য। এগুলো বেশ ভালো দামেই চালান হয়। লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। ডমরু এই অঞ্চলের নামী চোরাশিকারি। তার দলে বাছা বাছা শিকারি আছে। ওরা বনের নানা প্রান্তে ঘোরে। সঙ্গে থাকে ছোরা, রাইফেল। তার গুলিতে হাতি-বাঘও লুটিয়ে পড়ে। ওরা কাজ শেষ করে হাতির দাঁত বাঘের চামড়া, হরিণের শিং নিয়েই সরে পড়ে। বনবিভাগের কর্তারা পরে মৃত জন্তুর দেহটা পায় আর ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

এইভাবে একটা চক্র টাকার লোভে বনভূমির সবুজ বনসম্পদকে-বনের প্রাণীদের শেষ করে অরণ্যকেই নিঃশেষ করতে চায়। ভূধর তাদেরই একজন। তাদের অত্যাচারের কথা এখন কর্তারাও জেনেছেন। অপরাধীদের ধরার চেষ্টাও চলছে। তবে নানা কারণে তা আর হয়ে উঠছে না।

মিঃ নিখিল রায় ছিলেন ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার। বনবিভাগের পদস্থ কর্তা। তিনি অরণ্যজগতেরই লোক হয়ে গেছেন। বন্যপ্রাণীদের ভালোবাসেন। বনে বনে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন আরণ্যক প্রাণীদের চরিত্রকে। বাঘ মাংসাশী প্রাণী। শিকার করে অন্য প্রাণীকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রাণীকে সে মারে না। আর মানুষের লোভ অত্যন্ত বেশি। সে নিজের জন্য নয়, তার পরিবারের জন্য, তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও সঞ্চয় করে রাখে। তাই সবকিছু সে লুট করে নিতে চায়। পশুরা তা করে না। আর তাকে বিরক্ত না করলে সে অন্য প্রাণীকে আক্রমণও করে না। মানুষের এই সহাবস্থান নীতি নেই যা পশুর জগতে আছে।

নিখিলবাবু রিটায়ার করার পরও এই বনভূমিতে রয়ে গেছেন। স্ত্রী গত হয়েছেন। ছেলেরাও পড়াশুনা শেষ করে ভালো চাকরি করছে। তারা শহরে থাকে। নিখিলবাবু আর ফিরে যাননি। তিনি যখন যুবক ছিলেন তখন বন্যপ্রাণী শিকার বে-আইনি ছিল না। তখন তিনিও বাঘ, হরিণ, হাতি শিকার করেছেন। এখন তিনিই তাদের রক্ষার কাজ করেন সাধ্যমতো।

বর্তমান রেঞ্জার মি. মিত্রও নিখিলবাবুর অধীনে কাজ করেছে। সেও ভদ্রলোককে তাই খুবই শ্রদ্ধা করে। কোনও পরামর্শের প্রয়োজন হলে ছুটে আসে নিখিলবাবুর কাছে। নিখিলবাবুর ঘরে দু'তিনটে বাঘের চামড়া ট্যান করে তার ভিতর খড়-তুলো ইত্যাদি পুরে পূর্ণসাইজের বাঘই বানিয়ে রাখা আছে। হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকলে তার মনে হবে আলোছায়ায় যেন জ্যান্ত বাঘই বসে আছে। দরজার উপর হরিণের মাথা। বাইসনের মাথাও আছে। নিখিলবাবু বলেন-অতীতের ভুলের চিহ্ন ওগুলো। আর রাইফেল চালানোও অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। তবে মনে হচ্ছে, ওগুলো আবার বের করতে হবে।

ইদানীং এই রেঞ্জে বেশ কিছু অন্ধকারের লোক গোপনে দামি গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আবার বাঘ, হাতি, হরিণও শিকার করছে চামড়া, দাঁত পাবার আশায়। নিখিলবাবু বলেন, বনকে বাঁচাও, মিত্র। দ্যাখো, হয়তো সরষের মধ্যেই ভূত আছে। তাদের ধরার চেষ্টা করো।

বাংলোর বাগানে বিকালের পড়ন্ত রোদ হলুদ আভা এনেছে। ওদিকে দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য অস্ত গেছে। পটলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য। পরনে ওর হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট। এখানে এসে ওদের নাম-পোশাক সবই বদলে গেছে। হোঁৎকার পরনেও একই রকম পোশাক। সে ট্রেতে টি-পট, কাপ সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে নামায়। অজয়বাবু বলেন ভূধরকে, এই হল মঙ্গু, আর ওই যে চঙ্গু। জামশেদপুরের একটা হোটেলের বেয়ারা।

মানসী বলেন-বেশ ভালো ছেলে দুজন। কাজের খোঁজে এই বনে এসেছে।

পটলা-হোঁৎকা এখানে ভূধরকে দেখবে তা ভাবেনি। ওকে দেখেই চিনতে পারে ওরা দুজনে। এই লোকটাই যে ওই ট্রাক ড্রাইভার সর্দারজির সঙ্গে দু'নম্বরী ব্যবসা চালায় তা বুঝেছে। আর তাকে এই বাংলোতেই থাকতে দেখে একটু অবাকই হয়। অবশ্য ভূধর ওদের ট্রাকে দেখতে পায়নি। সে ব্যস্ত ছিল চোরাচালানের কথা বলতে। তাই সে বাংলোতে পটলা-হোঁৎকাকে দেখে বলে, সত্যি, কাকাবাবুর এলেম আছে। এই বনে এসেও ঠিক কাজের লোক বের করেছেন।

অজয়বাবু চায়ের কাপ তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিয়ে বলেন, নাহে, মঙ্গু চাও বেশ ভালো তৈরি করেছে।

এ যাত্রাটা পার হয়েছে ওরা। রাতে এবার রান্না করতে হবে রুটি আর কষা মুরগি। পটলা বলে, এবার কী করবি হোঁৎকা? রুটি করতে গেলে তো গোল হবে না, ইন্ডিয়ার ম্যাপই হবে। আর কষা মুরগি, ও তো খেয়েইছি এতদিন। এবারে বাঁচবি কী করে।

হোঁৎকা বলে-গোবিন্দর দোকানে মুরগি-রুটি বানাতে দেখেছি। ঠিক বানাই দিমু। তুই আটায় জল দে-আটা মাখতে হইব।

একটা গামলায় আটা নিয়ে পটলা তাতে বেশ খানিকটা জল ঢেলে দেয়।

হোঁৎকা চিৎকার করে-অ্যাই থাম্-থাম্-

আর থাম্! ততক্ষণে গামলার আটা সিন্নিতে পরিণত হয়েছে। জল আর আটা মিশে তরল একটা কিছু হয়ে গেছে। আর সেই হাত মুখে ঠেকিয়েছে। ফলে তার মুখ-মাথা আটায় ভর্তি হয়ে গেছে।

একি করেছ! অ্যাঁ-

মানসী ঘরে ঢুকে দুই আটারঞ্জিত মূর্তিকে দেখে হেসে ফেলেন।

হোঁৎকা বলে-রুটি কইরত্যাছি মাসিমা!

মানসী হাসছেন-এ যে আটার লেই হয়েছে! খানিকটা ফেলে দিয়ে আরও আটা দাও ওতে। রুটি করতেও জানো না! আর মাংস?

মাংস তখন ওদিকে তেমনই রয়েছে। আলু কাটতে গিয়ে হোঁৎকা এর মধ্যে তার আঙুলও কেটেছে। মানসী দেখছেন ওদের।

বলেন-এসব কাজ কখনও করেছ বলে তো মনে হয় না! করেছ?

পটলা বলে-না মাসিমা, সাহেব কিছু বলার আগেই আমাদের ধরে আনলেন।

হোঁৎকা বলে-আমাগোর থাকার জায়গাও নাই, খাবার টাকাও নাই। এহানে থাকতে-খেতে পামু, তাই চইলা আইছি।

মানসী দেখছেন দুই বিচিত্র মূর্তিকে। শুনছেন ওদের কথা। কী ভেবে বলেন মানসী-ঠিক আছে। কাউকে বলবে না এসব কথা। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। চঙ্গু, এই আটার লেই খানিকটা ফেলে এতে আরও আটা দিয়ে শক্ত করে মাখো। আর মঙ্গু, মাংস রান্নাটা আমি যেভাবে বলছি সেইমতো করো। সিদ্ধ হলে ডাকবে। কতটা কী দিতে হবে দেখিয়ে দেব।

পটলা-হোঁৎকা হাতে-নাতে ধরা পড়তে পড়তে মাসিমার জন্যই কোনোমতে বেঁচে গেছে। মাসিমাকে তাদের আসল পরিচয়ও দিয়েছে। মানসী সব শুনে বলেন, খুব সাহস তো তোমাদের!

আর পটলারাও জানতে পারে এই ভূধরবাবু, অজয়বাবু বা মানসীদেবীর রক্তের সম্পর্কের কেউ না। অজয়বাবুর বন্ধুর ছেলে। তাঁদের দয়াতেই মানুষ হয়েছে ভূধর। তাঁদের টাকাতেই এই বনে কাঠের ব্যবসা করে।

পটলা-হোঁৎকা এখন এখানে চঙ্গু-মঙ্গু নামেই পরিচিত। রাতের খাবার আজ ভালোই হয়েছে। ভূধর খাবার টেবিলে বসে অজয়বাবুকে বাঘের গল্পও বলেছে। অজয়বাবুর কণ্ঠে ভয়ের সুর।-বাঘ আছে জেনেও বনে এইভাবে কেন ঘোরো?

ভূধর বলে-বাঘের ভয় আমার নেই! কত বাঘ দেখেছি বনে। বাঘ, হাতি, বাইসন-এসবকে ভয় পাই না। প্রায়ই তো বাঘ-হাতির সামনে পড়ি। নো ফিয়ার-

পটলা-হোঁৎকা শুনছে। ভূধরবাবুর উপর তাদেরও সন্দেহ কেমন বাড়ে। লোকটা সাহসী বটে।

রাতের খাওয়া শেষ হবার পর ভূধর বের হয়ে যায়। তার নাকি কী জরুরি কাজ আছে। আজয়বাবু ও মানসীদেবীও শুয়ে পড়েন। নিশুতি বাংলো। ওদিকের ঘরে পটলা-হোঁৎকা রয়েছে। ওরা দেখে বনের দিক থেকে মাঝে টর্চের আলোর ঝলক ওঠে। আবার নিভেও যায়। হোঁৎকা বলে। ওই ভূধরবাবু রাতে বনে বের হইল, কী করে ওরা? চল দেইখ্যা আসি-

পটলা বলে-এত রাতে বনে যাবি?

হোঁৎকা বলে-ভূধরবাবু যদি যাইতে পারে, আমরাও যামু-চল হুঁশিয়ার!

এর মধ্যে ওরা দুজনে দিনের আলোয় বনকলোনি আর আদিবাসী বস্তির খানিকটা দেখেছে। ওদিকেই বন। দুজনে চলেছে রাতে। ভূধর এর মধ্যে তার লোকদের গাছ কাটাই করে পাচার করার ব্যবস্থা করে খুশি মনে ফিরছে। বনের ভিতরে একটা ছোট্ট ঝরনার জল পড়ার শব্দ কানে আসে। দু'দিকে ঘন বন। একটা ছোট মন্দিরও রয়েছে। আর সেটাকে কেন্দ্র করে দুএকটা ঘরও তৈরি হয়েছে। ভূধর সেইমন্দিরে আসে। সেখানে কালীমূর্তি রয়েছে। রয়েছে একটা শিবলিঙ্গ। পূজারী ভজনলালও ভূধরকে চেনে। ভূধরকে দেখে ভজনলাল

বলে-ক্যা, ভূধরবাবু-ব্যবসা তো ভালোই চলছে!

ভূধর জানে কিসের ব্যবসার কথা বলছে ভজনলাল। ভূধর বলে, কই আর চলছে। হাতির দাঁত, বাঘের চামড়ার বহুৎ ডিমান্ড! মাল মিলছে না!

ভজনলাল এককালে ছিল বনের চোরাশিকারি। যেমন সাহস আর তেমনি তার অব্যর্থ লক্ষ্য। অতীতে বহু শিকার করেছে রাজা-জমিদারদের জন্য। পরে শিকার নিষিদ্ধ হতে সে চোরা কাঠের কাজ আর চোরাশিকার করছে তার লোকজন দিয়ে। মন্দিরের পূজারী সেজে থাকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় ধর্মের ভাষণের সঙ্গে লুকিয়ে সংগ্রহ করা হাতির দাঁত, বাঘের চামড়ার ব্যবসার কথা। সারা বনে তার চ্যালারা এ কাজ করে। আর ভজন মহারাজ মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে সব লেনদেন সেরে আসে। ভূধরও তার খরিদ্দার।

ভজনলাল বলে, এখন বনবিভাগ ভি বহুৎ হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। আর নিখিলবাবু, ওই রিটায়ার্ড ডি. এফ. ও ভি লোকজন নিয়ে বনে ঘুরছে। কামকাজ করা মুশকিল হয়ে গেছে।

ভূধর জানে ভজনের এসব কথা বলার কারণ, সেও চায় আরও টাকা।

ভূধর বলে, টাকা ভালোই পাবে ভজন।ওসব মাল আমার চাই।

টাকাও বেশ কিছু আগাম দিয়ে বের হয়ে আসে ভূধর।

পটলা-হোঁৎকা এসেছে মন্দিরের বাইরে। টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। ভূধর আর ভজন বাইরে এসেছে। ভূধর টর্চের আলো জ্বেলেছে। ওপাশে ঝোপের আড়ালে পটলা আর হোঁৎকা।একফালি আলোয় ওরা দেখছে ভজনলালকে। ওর মুখটা দেখেই হোঁৎকা চমকে ওঠে। সেই মুখখানাকে তারা ভোলেনি।

হোঁৎকা বলে-পটলা, লোকটারে দেখছিস? সেই ট্রেনের দেখা মহারাজ না? ওই তো আমাগোর পাঁচ হাজার টাকার ব্যাগও লইছে-

পটলাও দেখে লোকটাকে। এই বনের ধারে বিরাট মন্দির করে সাধু সেজে বসে আছে। আর দু'নম্বরী ধান্দাই করে এখানে। নাহলে এই ভূধরবাবুরা এখানে আসবে কেন?

ভজন ভিতরে চলে গেছে। জিপটা তখন একটু দূরে বনের ধারে। একটা নালার জন্য গাড়ি আনতে পারেনি মন্দিরের কাছে অবধি। ভূধর আসছে অন্ধকারে জিপের দিকে। চারদিকে গাছ-গাছালির ঘন সমাবেশ। এদিকে ঝর্নার জলধারা নীচে একটা জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। বনের জন্তু-জানোয়ার এখানে জল খেতে আসে। চারদিক থমথমে। শুধু গাছ-গাছালির শনশন শব্দ ওঠে। তারাগুলো জ্বলছে।

হঠাৎ গাছের ওদিকে শব্দটা শুনে ভূধর থমকে দাঁড়াল। টর্চের আলো দিয়ে চারদিকটা দেখছে। ঝোপটা নড়ে ওঠে। যেন ডোরাকাটা একটা কী দেখেছে সে। আর এক লহমাও দাঁড়িয়ে থাকেনি সে। ভূধর সামনের মহুয়া গাছটার একটা ডাল ধরে প্রাণপণে লাফ দিয়ে গাছে ওঠে। তারপরই অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার শুরু করে-বাঘ-বাঘ-বাঘ-

ভারী দেহটা ডালে দুলছে আর ঝুলন্ত মূর্তিটা চিৎকার করছে, বাঘ-বাঘ-

পটলা-হোঁৎকা ভূধরকে এড়াবার জন্যই ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে। তারাও ভাবেনি যে তাদের ডালপালা নড়ার শব্দ শুনে ভূধরবাবু এমনি একটা কাণ্ড করবে।

ঝোপের ভিতর থেকে দেখছে পটলা-হোঁৎকা। হাসিও পায় ভূধরের কাণ্ড দেখে। হঠাৎ আর একটা টর্চের আলো এসে পড়ে।ভূধরের টর্চ তো নীচে। পটলারা দেখে আর একজন বয়স্ক লোক হাতে টর্চ আর রাইফেল নিয়ে আসছেন। হাঁক পাড়েন তিনি, ভূধরবাবু-অ্যাই ভূধরবাবু! বাঘ নয়, আমি। মিঃ রায়। নীচে আসুন।

এবার ওঁর কণ্ঠস্বর শুনে আর টর্চের আলো দেখে ভূধরবাবু কোনোরকমে হাত, হাঁটু সব ছিঁড়ে গাছ থেকে নীচে নেমে আসে। ভূধর গাছ থেকে নেমে সামনে ভদ্রলোককে দেখে যেন আশ্বস্ত হয়ে যায়। থতমত খেয়ে বলে-রায় সাহেব, আপনি? একটু মায়ের মন্দিরে এসেছিলাম।

আর বাঘ মনে করে গাছে চড়ে গেছিলেন? তাও নিচু ডালে! বাঘ তো অনায়াসেই ধরতে পারত আপনাকে! এভাবে রাতের বেলা বনে ঘুরবেন না। চলুন-

ওরা বের হয়ে যায়। এবার ঝোপ থেকে পটলা-হোঁৎকাও বের হয়ে বাংলোয় ফিরে আসে। পটলা বলে-ভূধরবাবুও জোচ্চোর মহারাজের কাছে যায়। নিশ্চয়ই ওরা বনের মধ্যে দু'নম্বরী অনেক কাজই করে। তবে ওই মিঃ রায়কে তো চিনলাম না! ওর খোঁজ নিতে হবে।

পরদিন এখানের হাট। বনের মধ্যে আজ যেন সাড়া পড়ে যায়। সকাল থেকে বন অফিসের সামনে মাঠের মধ্যে ট্রাকে করে দোকানদাররা এসে তাদের বেসাতি সাজাচ্ছে। কয়েকটা মুদির দোকান। রয়েছে সস্তা ধুতি, গামছা, গেঞ্জি। কেউ এনেছে টুকটাক মনিহারি জিনিস। বনের মধ্যে দু'চারজন আদিবাসী বস্তি থেকে ছেলেমায়েরা সেজেগুজে মাদল নিয়ে গানের আসরও বসায়। আর সাধারণ লোক কেউ কুমড়ো, বেগুন নিয়ে বসেছে। এই হাটই তাদের মিলনক্ষেত্র। আজ বনবিভাগের ছুটি। পটলা-হোঁৎকাও বের হয়েছে বাংলো থেকে। হাটে আসার পথে একটা বাগানঘেরা বাড়িতে একটা পুকুরে পদ্মফুল দেখে থমকে দাঁড়ায়। বাগানে একটা বকুল গাছের নীচে বসে আছেন কাল রাতের দেখা সেই ভদ্রলোক। গত রাতে তাঁর পরনে ছিল প্যান্ট-শার্ট-হান্টার শু, হাতে রাইফেল। আজ লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। পটলা-হোঁৎকাকে দেখে তিনি চাইলেন। শুধোন, কী চাই? এসো ভিতরে এসো।

ওরা দুজনে ভিতরে যায়। পটলা বলে, আপনার বাগান দেখছিলাম। কী সুন্দর বাগান! সবুজ গাছ-গাছালি, কত ফুল! এই বনের মধ্যেই-

হাসেন মিঃ রায়-হ্যাঁ, আমি আর শহরে ফিরে যাইনি! রিটায়ার করার পর এখানেই রয়েছি। বনকে ভালোবাসি। এই বন, বনের প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তবে মানুষই নিজের লোভ আর হীন স্বার্থের জন্যই এসব শেষ করবে!

পটলা-হোঁৎকার পরনে এখন নিজেদের পোশাক। বয়-বেয়ারার পোশাক ছেড়েই বের হয়েছে। মিঃ রায় বলেন, চলো ভিতরে চলো। চা খাবে তো! বনে বেড়াতে এসেছ বুঝি!

পটলা বলে-তাই বলতে পারেন!

হোঁৎকা বলে-ও পটলা, আমি শিবাজী, ডাক নাম হোঁৎকা! কলকাতা থনে আইত্যাছি!

রায়সাহেব বলেন-তোমরা ও ঘরে গিয়ে বসো। আমি আসছি। এখানে কথা বলারও লোক নেই। তবু তোমাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে।

ওদিকের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে নিজে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে পটলা আর হোঁৎকা। ঘরের জানলাগুলো প্রায়ই বন্ধ। ফাঁকফোকর দিয়ে একটু আলোর আভাস আসছে মাত্র। পটলা-হোঁৎকা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়। ঘরের মেঝেতে বসে আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। মিঃ রায়ই ঘরে ঢুকে ব্যাপারটা দেখে বুঝতে পেরে বলেন, ওগুলো জ্যান্ত নয়, মরা-

পাশের জানালাটা খুলে দিতে এবার দিনের আলো ঘরে এসে ঢোকে। এবার দেখা যায় বিশাল ঘরটাকে। ওদিকে একটা দাঁতালো হাতির দাঁত সমেত মাথা। হরিণের শিং। মিঃ রায় বলেন, ওসব অতীতের দুষ্কর্মের চিহ্ন। এখন ওদের বাঁচাতে চাই-ড্রইংরুমের আলমারিতে রয়েছে বেশ কিছু বই। আর পাশের আলমারিতে রয়েছে তিন-চারটে রাইফেল। মিঃ রায় বলেন, তখন এসব কিনেছিলাম।

মিঃ রায় এর মধ্যে আলমারি থেকে সঞ্চয়িতা বের করে বৃক্ষবন্দনা কবিতাটা শোনান। বলেন, এই অরণ্যকে মানুষ শেষ করে দিতে চাইছে। এ হতে দিতে পারি না। তাই বনে বনে রাতেও ঘুরি। কিন্তু চেষ্টা করেও চোরাশিকার বন্ধ করতে পারছি না।

এসে পড়েন মিঃ মিত্র। তরুণ রেঞ্জ অফিসার। মিঃ রায় বলেন, মিত্র, এসো। এরা কলকাতার ছাত্র। বনে এসেছে। এদের বনের কথাই বলছিলাম।

মিত্র বলেন-খবর আসছে বনের গভীরে চোরা কাটাই চলছে। কালই দুটো বড় সেগুন গাছ পাচার হয়ে গেছে! আর শুনলাম ছোট ফুলিয়াতে দুটো দাঁতাল হাতিও মারা পড়েছে। এসব কি বন্ধ হবে না, সাহেব?

মিঃ রায় বলেন- বনে কড়া পাহারা বসাও। সব ট্রাকের দিকে নজরদারি বাড়াও। বনের কাঠের কারবারি যারা আছে তাদের দিকেও নজর রাখো। এসব কাজে ওদের হাত নিশ্চয়ই আছে। তাদের হাতে-নাতে ধরতেই হবে। তারা বনের শত্রু, মানুষের শত্রু।

পটলা-হোঁৎকা সব শোনে। বলে পটলা, আমরা আজ আসি, স্যার। হাটে যেতে হবে।

মিঃ রায় বলেন-ঠিক আছে। চলে এসো মাঝে মাঝে। তবু কথা বলা যাবে। একাই থাকি তো!

ওরা বেরিয়ে আসে। হোঁৎকা বলে, ওই কাঠচোর আর চোরাশিকারিদের লইয়া এরা বিপদে পড়ছে। হালারা এমন সুন্দর বন শ্যাষ কইর‍্যা দিবে। কিছু করনের লাগব!

বনের পথ দিয়ে হাঁটছে ওরা। হঠাৎ জিপের শব্দ শুনে এরা বনের ভিতর আড়াল হয়ে যায়। দেখা যায় হাট থেকে ফিরছে ভূধর তার জিপ নিয়ে। আর রয়েছে সেই ভজন মহারাজ। পিছনের সিটে দু-তিনজন ভীষণ-দর্শন লোক। জিপটা চলে গেল বনের দিকে।

হোঁৎকা বলে, দেখলি, ভূধর নির্ঘাৎ কিছু একটা করবেই! ওর মতলব সুবিধার নয়! চল গিয়া কই মিঃ মিত্রকে।

মিঃ মিত্র অফিসেই ছিলেন। বনবিভাগের অফিসে টাঙানো রয়েছে সারা বনের একটা বড় ম্যাপ। মিত্র হঠাৎ এদের দেখে চাইলেন। একটু আগেই তিনি ওদের মিঃ রায়ের ওখানে দেখেছেন। তাই এদের দেখে বলেন- এসো-এসো! হঠাৎ এদিকে?

পটলা বলে-দেখলাম ভূধর তার জিপে মন্দিরের পূজারীকে নিয়ে বনের ভিতর চলে গেল।

মিঃ মিত্র বলেন-সেকি! আজ তো বন কাটাই বন্ধ

হোঁৎকা বলে-এদের মতলব নিশ্চয়ই খারাপ!

মিঃ মিত্র বলেন-আমি দেখছি। আর তোমরা তো বনবাংলোতেই আছ! ওর উপর একটু নজর রাখো! সব খবর আমাদের জানাবে!

পটলা-হোঁৎকা ফিরেছে বাংলোয়! যথারীতি ভূধরের পাত্তা নেই। দুপুরে নাকি সে ফিরবে না! কীসব জরুরি কাজ আছে! পটলা-হোঁৎকাও নিশ্চিন্ত হয়। এর মধ্যে মানসীও রান্নার কাজ এগিয়ে রেখেছেন। এরা হাট থেকে আনাজপত্র, ডিম, মুরগি এনে রান্নার কাজে হাত লাগায়।

অজয়বাবু বলেন, ভূধর বন দেখাবে বলে নিয়ে এসে দিনরাত নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

মানসী বলেন-আর বন-বাদাড় দেখে কাজ নেই! ঘরে ফিরে চলো! ভূধর থাকে থাকুক তার কাজ নিয়ে। এর চেয়ে পুরীতে গেলে ভালো হত-তা না ওর পাল্লায় পড়ে এলে এই বনবাসে!

ভূধরের উপর এঁরা যে খুশি নন তা বুঝেছে পটলা-হোঁৎকা।

দুপুরে বাংলো নিঝঝুম। আজয়বাবু-মানসী খাওয়ার পর ঘুমাচ্ছেন ওঁদের ঘরে। পটলা-হোঁৎকা ভূধরের ঘরের জনালা খুলে দেখে

একটা রড সহজেই খোলা যায়। ওরা সেই রডটা খুলে সাবধানে ঘরে ঢোকে। এ ঘরেই ভূধর তার জিনিসপত্র রেখেছে। টেবিলে ডায়েরি, হিসবের খাতা ছড়ানো। বিছানা এলোমেলো। জামাকাপড় যত্রতত্র ছড়ানো। এ ঘরে ভূধর কাউকে ঢুকতে দেয় না। ওর বিছানা তুলতেই দেখে গদির নিচে একটা বন্দুক আর একটা কাগজের বাক্সে বেশ কিছু বুলেট ও রয়েছে। অথচ বনবিভাগের পারমিটে লেখা আছে কেউ বন্দুক নিয়ে বনে ঢুকতে পারবে না।

হোঁৎকা বলে, কার্তুজগুলান লই চল! বন্দুকেও যেন গুলি না থাকে!

পটলা ওই ডায়েরি-নোটবইগুলো হাতিয়ে নিয়ে কার্তুজগুলোও তুলে নেয়। তারপর এদিক-ওদিক দেখে, না কেউ কোথাও নেই-ওরা জানলা দিয়ে বের হয়ে এসে আবার রডটা যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়।

পটলার গোয়ান্দাগিরির কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বহু গোয়েন্দা গল্প সে পড়েছে। আর ওর এক কাকা গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ অফিসারও। পটলা এবার ভূধরের কাগজের মধ্যে একটা বনের ম্যাপ আর তার কিছুটা অংশ লাল মার্ক করা দেখে। আর হিসাবের খাতায় বেশ কিছু মোটা অঙ্কের টাকা আর ভজনলালকে দেওয়া বেশ কিছু টাকার হিসাব দেখে। তাছাড়াও বেশ কিছু নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দেখে। আর দেখা যায় একটা দানপত্রের খসড়া। সেটা পড়ে পটলা বলে, দ্যাখ, ভূধরবাবুর মতলব! হোঁৎকাও পড়ে কাগজপত্রগুলো। তাতে লেখা আছে যে, অজয় সেন নাকি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ি-ব্যবসা, সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি শ্রীভূধর বিশ্বাসকে দানপত্র করে দিয়েছেন।

হোঁৎকা বলে-এডা কী রে! মাসিমারে ফাঁসাইবার মতলব!

পটলা বলে-এর বিহিত করতেই হবে। এসব কাগজপত্র এখানে রাখা ঠিক হবে না। ঠিক জায়গায় জমা করে দিয়ে আসতে হবে। চল।

নিখিল রায় দুপুরে ঘুমোন না। বইপত্র নিয়েই থাকেন। হঠাৎ এসময় পটলা-হোঁৎকাকে দেখে খুশিই হন। পটলা এসে ওর থলে থেকে সব কাগজপত্র বের করে নিখিলবাবুকে দেখায়। কাগজপত্র দেখে মিঃ রায় চমকে ওঠেন।

আমার সন্দেহ তাহলে মিথ্যে হয়নি। ওই ছেলেটা এতদিন ধরে এখানে এসে এইসব করছে। খুব উপকার করেছ তোমরা! এতে অনেক কাজ হবে। আমি এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি ফরেস্ট পুলিশকে। তবে তোমরাও সাবধানে থেকো। যদি গোলমাল বোঝ আমাকে খবর দেবে।

বিকেল নামছে। ভূধরের সকাল থেকে কোনো খবর নেই। বিকেলের চা এনেছে হোঁৎকা। মানসী-অজয়বাবু চা খাচ্ছেন। মানসী ওদের জন্যও টেবিলে চা দিয়ে বলেন, তোমরাও খাও।

এটা অবশ্য ভূধরের চোখে পড়লে ভূধর চটেই যেত। এখন সে নেই। এবার পটলাই দানপত্রের দলিলটা মাসিমার হাতে দিয়ে বলে, কাগজটা আবর্জনার মধ্যে পড়েছিল। হাতে পড়তে নিয়ে এলাম। ছোট সাহেবের দরকারি কাগজ নয় তো!

মানসী কাগজটা দেখে চমকে ওঠেন! তাঁর স্বামী যে তাঁকে না জানিয়ে এতবড় সিদ্ধান্ত নেবেন তা ভাবতেও পারেননি। মানসী কাগজটা অজয়বাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, পড়ে দ্যাখো! তখনই বলেছিলাম ওর মতলব ভালো নয়! এই বনে এনে আমাদের চরম সর্বনাশই করতে চায়।

অজয়বাবু কাগজটা পড়ে চোখ বড় বড় করে বলেন, এটা পেলে কোথায়?

পটলা বলে-ওসব আবর্জনার মধ্যে পড়েছিল!

অজয়বাবু বলেন-না-না, এসব বাজে কথা! এসব কাজ কেন করতে যাবে ভূধর?

কাগজগুলো নিজেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উপরের বারান্দা থেকে উড়িয়ে দেন। হাওয়ায় সেগুলো উড়ে যায়।

ভূধর আজ লোকজন নিয়ে বনে এসেছে। আজ রবিবার। বনে কাটাই হয় না। নির্জন বন। ভজনের লোকরা অবশ্য দিনের বেলায় শিকার কম করে। রাতের অন্ধকারেই তাদের সুবিধা বেশি। এরমধ্যে ভূধর দুটো গাছ কেটে ফেলেছে। লরিও এসে গেছে। এবার টুকরো করে লরিতে তোলার পালা। গাছগুলো লোকে বোঝাই করে আজই পাচার করতে হবে। লাখ টাকার মাল। হঠাৎ বনের মধ্যে স্তব্ধতা ভেদ করে গাড়ির শব্দ শুনে চাইল ভূধর! ও জানে আজ বনবাবুরা হাটেই থাকবে। এদিকে কেউ আসবে না। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজে চমকে ওঠে। নিমেষের মধ্যে এরাও লরিতে মাল তুলে নিয়ে পালায়। সব মাল তোলাও হয়নি। বেগতিক দেখে ভূধরও জিপ নিয়ে কেটে পড়ে।

মিঃ মিত্র আজ খবরটা নিখিলবাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন। ওই ম্যাপ-ডায়েরিতেই লেখা ছিল জায়গার কথা। মিঃ রায়ের কাছে খবর পেয়েছিলন ভূধরবাবু বনে গেছেন। আর সেটা যাচাই করার জন্যই মিঃ মিত্র নিজে এসেছেন বনবাংলোতে। আর সেখানে ভূধরবাবুকে না দেখতে পেয়েই ফোর্স নিয়ে বনের ভিতর যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন কাটা গাছটার গুঁড়িও পড়ে আছে! আসামিরা ফেরার। মিত্র বলেন, -ইস্, হাত ফসকে বের হয়ে গেল ব্যাটারা। একটাকেও ধরা গেল না!

তবে ধরা না গেলেও যারা এসব করে এসেছে এতদিন বিনা বাধায়, তারাও এবার বুঝেছে যে তাদেরও এবার প্রবল বাধার সামনে পড়তে হবে।

ভূধর কোনোমতে সেদিন তার লোকজন নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। অনেক টাকাই তার লোকসান হয়েছে। বনবিভাগ সব গাছই সিজ করেছে। ভূধরও ভাবছে কী করে বনবিভাগের লোক এসব খবর পেল! তাকে এবার অন্য কাজটাও সারতে হবে!

আজ বেশ জ্বালাভরা মন নিয়েই ফিরেছে ভূধর বনবাংলোয়। এতদিন ধরে সে এই বনে তার দাপট চালিয়ে এসেছে, লুঠতরাজ করেছে। আজ সে প্রথম বাধা পেল। বেশ বুঝেছে এই বাধা আরও বাড়বে। তাই তার ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও তাকে করতে হবে।

ঘরে ঢুকে প্রথমে তেমন কিছু টের পায়নি ভূধর। সে তার কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাংলো নিস্তব্ধতায় ঢেকে যায়। পটলা-হোঁৎকা আউট হাউসে এসে শোবার ব্যবস্থা করছে।

হঠাৎ বাংলো থেকে মানসীদেবী-অজয়বাবুর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে শোনা যায় ভূধরের কণ্ঠস্বর। ভূধর বলে, আমার কথা শুনতেই হবে!

রাতে ভূধর সেই দানপত্রের আসল কপিটা এনে অজয়বাবুকে বলে, এটাতে সই করে দিন! অজয়বাবু চমকে ওঠেন। মানসীও দেখেছেন কাগজটা! বলেন, তা কী করে হবে?

তাই হবে! আমি যা বলছি তাই করুন। এতে সই না করলে এই বন থেকে বের হতেই পারবেন না! দুজনকে মেরে লাশ গভীর জঙ্গলে ফেলে দেব। কেউ জানতেও পারবে না!

ভূধর আজ তার আসল স্বরূপটা দেখায়। এঁরা বিপন্ন।

মানসীই বলেন, ঠিক আছে। তুমি ছাড়া আমাদের আর কেই-ই বা আছে! তোমাকেই সব লিখে দেব। আজ রাত হয়েছে, বুড়ো মানুষটাকে শান্তিতে ঘুমাতে দাও। কাল সকালেই সই করবেন।

অজয়বাবুও অসহায় কণ্ঠে বলেন-কাল সকালে সই করে দেব।

ভূধর বলে-ঠিক দেবেন তো?

দেব। নিশ্চয়ই দেব।

ভূধর কী ভেবে বলে-ঠিক আছে, তাই হবে। তবে যা করার কালকেই করতে হবে।

চলে যায় ভূধর নিজের ঘরে। বাইরে থেকে সব শুনেছে পটলারা।

হোঁৎকা বলে, কেস তো জনডিস রে!

পটলা বলে-একটা কিছু করতেই হবে? ওই শয়তানকে উচিত শিক্ষাই দিতে হবে।

অজয়বাবুও এবার ভাবনায় পড়েছেন। ভাবছেন কী করা যায়। হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কাকে আসতে দেখে চাইলেন মানসী। তারা-জ্বলা আলোয় পটলা-হোঁৎকাকে আসতে দেখে মানসী বলেন, তোমরা?

পটলা ইশারায় ওঁকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বলে, আমরা সব শুনেছি মাসিমা! আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। আর একটু রাত হোক। তারপর যা করার করব! এই রাতেই বাংলো থেকে পালাতে হবে। আপনারা তৈরি থাকুন।

ভূধরের আজ সারাদিন খুব ধকল গেছে, তাই বিছানায় পড়তেই তার দু'চোখে ঘুম নামে। নাক ডাকতেও শুরু করে! পটলারা এবার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে অজয়বাবুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাংলো থেকে।

সেই রাতেই পটলারা অজয়বাবু আর মানসীদেবীকে নিয়ে আসে নিখিল রায়ের বাংলোতে। নিখিলবাবুর সঙ্গে পটলাদের আগেই কথা হয়েছিল। সেইমতো তিনি দরজা খুলে ওদের ভিতরে ডেকে নেন। দেখছেন নিখিলবাবু, অজয়-মানসীদেবীকে।

মানসী বলেন-ওই ভূধরের দলবল ভালো নয়, ও যে এতবড় শয়তান তা ভাবিনি!

রাত বাড়ছে। পটলা বলে, আমাদের বাংলোয় ফিরতে হবে।

নিখিলবাবু বলেন-সাবধানে যাবে। আর ভূধরের উপর নজর রাখবে। এদিকে যা করার আমি করছি!

পটলা-হোঁৎকা রাতেই বাংলোর আউট হাউসে ফিরে আসে! সকালে মিঃ মিত্র রায়বাবুর বাংলোয় এসে সব শুনে অবাক হন! রায়বাবু সেই ডায়েরি-কাগজপত্র মিত্রকে দেন। মিঃ মিত্র সব দেখে অবাক হয়ে বলেন, অনেক প্রমাণই হাতে পেয়েছি। ওরা যে এমনি ডেরা গেড়েছে তা জানতাম না। আমি এখুনি ফোর্স ডাকছি।

ভোরবেলাতেই মিঃ মিত্র ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

ভূধরের আজ ঘুম ভাঙে একটু দেরিতেই। চোখ খুলে আশপাশের পরিবেশটা বুঝতে পেরেই সে চমকে ওঠে। দেখে সে তার ঘরে নয়, ঘুমোচ্ছিল লক-আপের মধ্যেই। পাশে ভজনলাল আর তার দলের কিছু লোক। লাফ দিয়ে ওঠে ভূধর-একি আমি এখানে কেন?

এবার দেখা যায় মিঃ মিত্রকে। মিঃ মিত্র বলেন, আমরাই আপনাকে এখানে এনেছি ভূধরবাবু। আপনার দলবল সমেত। সব প্রমাণই আমাদের হাতে এসে গেছে। দিনের পর দিন যে চোরা কাটাই-পোচিং-এর কাজ করেছেন তার শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে।

থানাতেই আনা হয়েছে মন্দির থেকে উদ্ধার করা হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া, হরিণের শিং। যার বাজারদর কয়েক লাখ টাকা।

অজয়বাবুও এসব দেখে অবাক। তিনি ভাবতেই পারেননি যে তাঁর ভালোমানুষিক সুযোগ নিয়ে ভূধর এসব কাজ করত। তাঁরও চরম সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। তিনিও এবার নিশ্চিন্ত হন। ওরা ফিরে আসে বনবাংলোতে। আজ তিনি পটলা-হোঁৎকার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি, গোবরা, ফটিক তখন বড়বিল স্টেশনে নেমেছি। পটলাদের এখানে থাকার কথা। কিন্তু তাদের পাত্তা নেই। আমরাও ভাবনায় পড়ি। এর মধ্যে পিসেমশাইও এসে গেছেন আমাদের নিতে। তিনি পটলা-হোঁৎকাকে না দেখতে পেয়ে বলেন, তোদের পঞ্চপাণ্ডবের বাকি দুজন কইরে?

এবার আমি ভয়ে সমস্ত ঘটনা পিসেমশাইকে জানাই। পিসেমশাই সব শুনে চমকে ওঠেন, সেকি! ওরা একসপ্তাহ আগেই থলকোবাদ বাংলোয়।

আমি বলি-আমরাও যাব।

আমরা পিসেমশাইকে নিয়ে বাংলোয় পৌঁছেছি। পটলা-হোঁৎকা তখন চঙ্গু-মঙ্গুর বেশে চা সার্ভ করছে। পিসেমশাই তখন ওদের দেখে চিৎকার করেন, কি রে, পটলা-হোঁৎকা, তোরা এখানে চা খাওয়াচ্ছিস! আর আমরা কত চিন্তা করছি!

অজয়বাবু অবাক হয়ে বলেন-ওরা চঙ্গু-মঙ্গু! আপনি ভুল করছেন!

এবার মানসীই সব কথা বলেন অজয়বাবুকে। অজয়বাবু এবং আমরাও অবাক হই সব শোনার পর। পটলা যে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারে আমাদের ধারণাই ছিল না।

অজয়বাবু বলেন-তোমার যে এত বড় বাড়ির ছেলে তা লুকিয়ে ঠিক করোনি। অযথা তোমাদের দিয়ে বইয়-বেয়ারার কাজ করলাম।

হোঁৎকা বলে-কইয়া দিলে এমন অ্যাডভেঞ্চার আর হইত না!

আমরাও গর্বিত হই পটলার এরকম দুঃসাহসিক কাজে। সত্যিই বনভ্রমন ওদের সার্থক হয়েছে।

সেই রাতটা আমরাও বাংলোতে থেকে পরদিন ফিরে এলাম পিসেমশাই-এর বাড়িতে।

কলা প্রতিযোগিতা ও পটলা

পটলার মাথায় আবার পোকা নড়েছে, অর্থাৎ নতুন কিছু করার আইডিয়া এসেছে। পটলার ওই এক রোগ, বেশ আছে, হঠাৎ কি এক আইডিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, আর সেটাকে কার্যে পরিণত করতেই হবে।

বড়লোকের নাতি-পয়সার অভাব নেই পটলচন্দ্রের। ঠাক্‌মার একমাত্র বংশধর। বাবার বিরাট কারখানা, মেজকাকার বিশাল ছাপাখানা, একমাত্র সরকারি নোট ছাড়া আর সবই ছাপা হয়। ছোটকাকাও কম যায় না, কাঠগোলা, করাতকল, তেলের মিল-কি নেই! এহেন বাড়ির 'অন্লি বংশপ্রদীপ' ঠাকুমার চোখের মণি পটলচন্দ্রের তাই হাতখরচা আসে নানাভাবে। এবং সেটা বেশ মোটা অঙ্কেরই। আর সেই কারণেই পটলচন্দ্রকে আমরা পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ বানিয়েছি।

অবশ্য পার্মানেন্ট সেক্রেটারি ওই হোঁৎকা। চেহারাটাও বেশ নধর, গোলগাল। আর ফি ক্লাসে দু'বার করে গড়িয়ে আরো মজবুত হয়ে এখন ক্লাস টেনে নোঙর করেছে।

এয়াছাড়া ফটিক কালচারাল সাইডের চার্জে। এখনও তিনখানা গান নিয়েই সাতবছর এলেম নিচ্ছে কোন এক ওস্তাদ খাঁ সাহেবের কাছে। ভোর থেকে তার সা রে গা মা-র চর্চা শুরু হয়। পাড়ার কুকুরগুলোও ওর সঙ্গে গলা মেলায়, সুরের এমনি যাদু।

গোবর্ধনের চেহারাটা হোঁৎকার চেয়েও সরেস। আর ওর থেকেও দুপোঁচ বেশি কালো। মামার কুমড়ো, আলুর আড়ত।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লাবের মাঠের জামতলায় পটলার অপেক্ষায়। তখনও তার দেখা নেই। ওদিকে ঝাল-মুড়িওয়ালা দু-তিনবার হেঁকে ফিরে গেছে।

হোঁৎকা বলে,-পটলার কাণ্ডখান দ্যাখ! কেলাবের জরুরি মিটিং, এহনও দেখা নাই বাবুর। ওদিকে এহনও নো টিফিন, নো ঝালমুড়ি, আলুকাবলি। আমি রেজিক্‌নেশন দিমু-

হোঁৎকার ওই দোষ। পেটে যেন ওর রাক্ষস পোরা আছে। গোবর্ধন অর্থাৎ গোবরা বলে,

-তুই কি রে? কেবল খাই খাই।

হোঁৎকা বলে,-তর মামার তো কুমড়োর গুদাম। তুই একখান কুমড়ো খেয়েই রইয়া যাবি। আমার এইসব হাবি যাবি সয় না।

এমন সময় রেসিং সাইকেলটা নিয়ে পটলা এসে হাজির। বেশ উত্তেজিত সে।

পটলা বলে,-স্-স্ স্-

উত্তেজিত হলে পটলার জিবটা আলটাকরায় সেট্ হয়ে যায়। বেশ চেষ্টা করে এবার পটলা বলে,-সাংঘাতিক খবর। কু-কুলেপাড়া এসপোটিং এবার ব-বসে আঁকো কম্পিটিশন শুরু করবে। বি-বিরাট ব্যাপার!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,-থো ফ্যালাই তর কুলেপাড়ার কথা। আমি রেজিক্‌নেশন দিত্যাছি। তগোর কেলাবে আর থাকুম না।

হোঁৎকার পকেটে একটা রেডিমেড রেজিক্‌নেশন লেটার মজুতই থাকে। এখন সেটা ভাঁজ পড়ে বিবর্ণ। তবু সেটাই বের করে।

পটলাও জানে। সুতরাং আশপাশে ওই আলুকাবলি-ঝালমুড়ি গোকুলের মালাই কুলপির, সমবেত কোরাস শুনে বলে, -আ-আগে কিছু খেয়ে নে, তারপর তোর রেজিক্‌নেশন লেটার দিবি।

হোঁৎকা ঈষৎ মিইয়ে যায়, ওই আলুকাবলি এন্ড কোং-দের দেখে। বলে-কইছিস?

খাবার সামনে পেয়ে হোঁৎকা এবার জলবৎ তরল হয়ে গিয়ে বলে, -কুলেপাড়া বইসা আঁকো কম্পিটিশন করছে?

পটল বলে-হ্যাঁ. স-সকলেই নাম করছে ওদের। পোস্টার প.প্ল্যাকার্ড ছাড়ছে।

ফটিক বলে ওঠে, -ঠিক আছে, আমরাও মিউজিক কম্পিটিশন করবো। একেবারে যাকে বলে-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ কলা-

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, -চুপ মাইরা যা। সেবার তর জন্য ফ্যাংশন করতি যাই ইট পাটকেল খাইছি। প্যান্ডেলে আগুন ধরতি গেছল।

হঠাৎ পটলার মাথায় আইডিয়াটা এসে যায়। বলে, -প.প.পেয়েছি। ইউরেকা-

আমরাও অবাক। পটলা কি এমন পেল যে খুশিতে টগবগিয়ে উঠেছে? শুধোই, -কি পেলি রে?

পটলা বলে,-প.পেয়ে গেছি। কুলেপাড়া ক্লাবকে.ট.টেক্কা দেবার পথ। ওই.প্র.প্র-

হোঁৎকা যোগান দেয়, -প্রতিযোগিতা?

পটলা বলে, -হ্যাঁ। একেবারে নতুন আইডিয়া। কলা প্রতিযোগিতা।

গোবর্ধন বলে, -তার সঙ্গে কুমড়োর এগজিবিশন দিলেও মন্দ হয় না। গুদামে একটা বাইশ কেজি কুমড়ো আছে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, -কুমড়ো ছাড়া আর কিছুই চিনতে পারস্ না?

পটলা বলে, -না না কুমড়ো নয়, কলা প্রতিযোগিতা। কলা ভক্ষণ প্রতিযোগিতা। সে.সেদিন কোন্ এক বিরাট নেতা রসগোল্লা ভক্ষণ প্রতিযোগিতা করে কাগজে ছবি ছাপালো। রসগোল্লা তো সবাই খায়। কলা কে কত খেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা হবে।

গোবর্ধন বলে, -কিন্তু এত কলা!

পটলাদের নিজেদের বিরাট কলাবাগান আছে চন্দননগরের ওদিকে। বেশিরভাগ সেখান থেকেই আসবে।

হোঁৎকা খাওয়ার ব্যাপার শুনে বলে, -তা মন্দ কস্‌নি। কদলি ভক্ষণ প্রতিযোগিতা! মন্দ হইব না। তর, বাজেট কত? আমাগোর পকেটের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। তর বাজেট খান ক! খবরের কাগজের লোকদের খাওয়ানো, আনা-এসব লাগবো। ব্যানার-তর পাবলিসিটি চাই। চিফ গেস্টে অ্যাকখান জব্বর আনতি হইব।

পটলা বলে, -ঘ্‌ঘটার জন্য ভাবিস না। ক্‌কম্‌পিটিশন জোর করতে হবে। যে বেশি কলা খাবে, তাকে সোনার মেডেল দেবে ক্লাব।

হোঁৎকা আঁতকে ওঠে, -সোনার মেডেল। ঠিক কইছিস?

পটলা বলে, -ঠাক্‌মাকে বলে ম্যানেজ করেছি। দাদুর স্মৃতি রক্ষার জন্য ম্‌মেডেল দেবে ঠাক্‌মা। ক্‌কাল থেকেই নেমে পড়। টাকায় কি না হয়? পটলার টাকায় আমরা এবার ফুল পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাব ওই বিচিত্র প্রতিযোগিতার প্রচারে নেমে পড়েছি। এর মধ্যে পোস্টার, ব্যানারও এসে গেছে। তামাম পাড়ার গাছ, লাইটপোস্ট ডালে ঝুলছে নধর সাইজের কলা। তার পাশে ভক্ষণ প্রতিযোগিতার ঘোষণা।
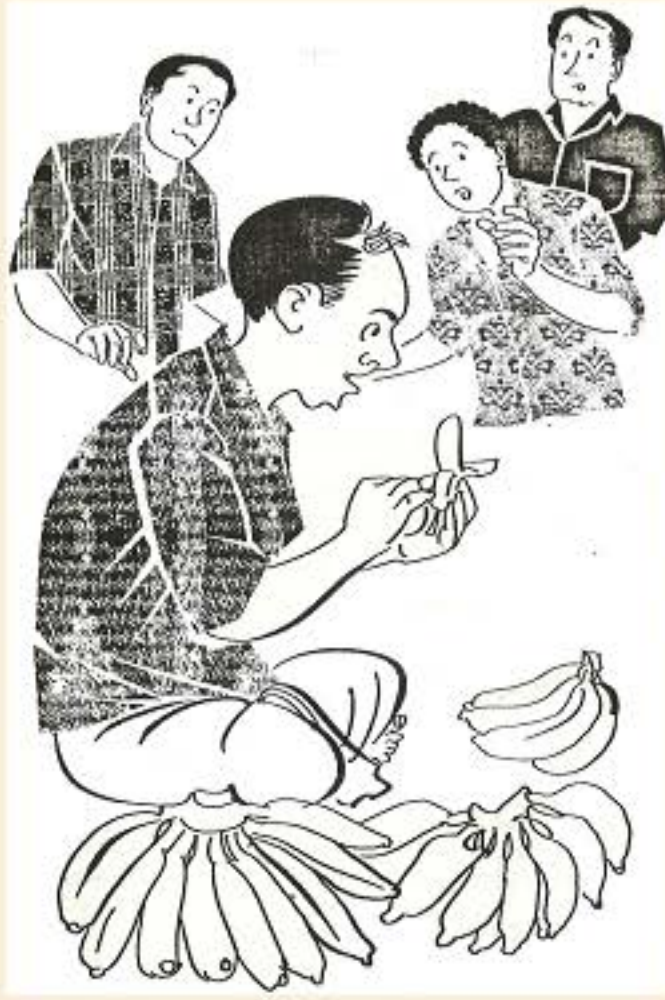
কুলেপাড়া ক্লাবের বসে আঁকা প্রতিযোগিতার দিনই আমাদের ক্লাব প্রাঙ্গণে হবে কদলিভক্ষণ প্রতিযোগিতা। আর রামনবমীর দিনই হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা।

ফটিক বলে, -রাম-এর সঙ্গে কলারও সম্পর্ক আছে।

ওর আবিষ্কারে অবাক হই,-মানে?

ফটিক বলে,-রাম-এর নাম করলেই আসে হনুমান। হনুমান আর কলা একেবারে মাখামাখি ব্যাপার। তাই তো উদ্বোধন সঙ্গীতে ওই কলা আর হনুমানকে নিয়েই গান গাওয়া হবে। আমারই রচনা। আর সুর যা দিয়েছি দেখবি।

হোঁৎকা বলে,-কিন্তু তুই গাবি না। লোকজন বেবাক তাড়াই দিবি! তবে গান চলবো না। এহেন অপমানে ফটকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

-ইনসাল্ট করবি না হোঁৎকা। তুই গানের কি বুঝিস? আমি রেজিকনেশন দিচ্ছি এখুনিই।

কোনোমতে থামাই, -এত বড় কাজ সামনে, আর তোরা এইসব করবি? ওসব পরে হবে।

ফটিক থামলো তবু গজগজ করে, যা তা বলবে? গানের কি বোঝে ও?

ওদিকে সময় নেই। প্যাণ্ডেল তৈরি হচ্ছে। প্রতিযোগীদের নামও আসছে। দশ টাকা এনট্রি ফি দিয়ে কলা খাবার লোকের অভাব যে নেই দেশে, তা বুঝেছি। তার উপর সোনার মেডেল ফার্স্ট প্রাইজ। সেকেন্ড থার্ড প্রাইজ-ও বেশ ভালোই। সারা এলাকায় শুধু কলা আর কলার ছবি।

আমরা কুলেপাড়ার বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে যে স্রেফ পথে বসিয়ে দিয়েছি, তা বেশ বোঝা যায়।

কুলেপাড়ার ক্লাবের কর্মকর্তারা ভাবতে পারেনি যে পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাব এমনি একটা নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের ক্লাবকে শুইয়ে দেবে। বসে আঁকতে আর কেউ আসছে না, সব ছুটেছে কলাভক্ষণ দেখতে।

কুলেপাড়ার ক্লাবের মাঠে মাত্র ক'জন ছেলেমেয়ে স্রেফ লজেন্স আর থিন এরারুট বিস্কুটের লোভে এসেছে। ওই দ্রব্য মিললেই তারাও পালাবে কলা খাওয়ার মাঠে। ওদিকে তখন মাইক বাজছে।

কুলেপাড়ার কেষ্ট বলে, -ওদের ওই কলাভক্ষণ পালার নিকুচি যদি না করি, আমার নাম কেষ্টা পালাই নয়। একেবারে ডুবিয়ে দিলে।

এদিকে পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের প্যান্ডেলে লোক ধরে না। পটলার রসদের জোরে কাগজের লোকরাও এসেছে। মঞ্চে বিচারকরা বসে আছে ঘড়ি ধরে। সামনে টানা বেঞ্চে প্রতিযোগীরা। হাইবেঞ্চে রাখা আছে এক একটা ঝুড়িতে নধর পাকা কলা।

ওদিকে ঝুলছে সারবন্দী কলার কাঁদি। ওর থেকে সুপক্ক কলা সাইজমত খুলে প্রতিযোগীদের দেওয়া হবে। যে পনেরো মিনিটে সব থেকে বেশি কলা খাবে, সেই হবে ফার্স্ট।

ক্লাবের সভ্যরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না। তাই হোঁৎকা প্রথমে আপত্তি তুলেছিল। আমি বলেছিলাম, -তুই তো ফার্স্ট হবিই। লোকে বলবে পার্শালিটি করেছে।

হোঁৎকা সোনার মেডেল হাতছাড়া করতে নারাজ। বলে, -তয় নসুমামার নামটাই লিখে নে, দশটাকা দিত্যাছি।

তাই পটলা হোঁৎকার নসুমামাও এসেছে প্রতিযোগী হয়ে। শুনলাম কাল থেকেই মামা 'ওনলি ওয়াটার' খেয়ে স্টম্যাক শূন্য করে রেখেছে। গোল্ড মেডেল তার চাই-ই।

নসুমামার চেহারাটাও দারুন। হাত পা-ও কলাগাছের মত। ইয়া কুমড়োর সাইজের মাথা। হাঁ করলে তা প্রায় চার ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি একটা 'হাঁ' মুখ দেখা যায়।

ওদিকে মঞ্চে প্রধান অতিথি ফিলমের হিরোইন ধরিত্রী দেবী, আর সভাপাতি করা হয়েছে পাড়ার চিটে গুড়ের, তুলোর, সিমেন্টের আড়তদার-বর্তমান এম. এল. এ. কেতনবাবুকে।

কেতনবাবুর ওজস্বিনী ভাষণ শুরু হয়। তাঁর ভাষণে কেতনবাবু প্রমাণ করেন কলা ভক্ষণ প্রতিযোগিতা জাতির প্রগতিরই পরিচয়। কলা চৌষট্টিটি কলা যে সেবন করতে পারে, সে জাতির গৌরব।

এরপরই ওই ধরিত্রীদেবী উঠলেন। রং চং করা মুখ। হাতের নখগুলোও রং করা। মিউজিকের তালে তালে তিনি একটি কলা ছাড়িয়ে আলতো করে মুক্তোর মত দাঁতে ঠেকালেন, আর অমনি 'ফুর' করে বাঁশি বেজে উঠলো।

এরপর প্রতিয়োগিতা শুরু হয়ে গেল। প্রতিযোগীরা দুহাতে কলার খোসা ছাড়াচ্ছে আর গব্ গব্ করে সাইজমত কলা মুখে

ফেলছে। চিবোতে হয় না। কোঁৎ করে গিলে আবার অন্য কলা ভক্ষণ করছে।

ওদিকে নসুমামা যেন মেসিন চালিয়েছে। ফস্ করে কলা নিচ্ছে, একটানে চোকলা যতটা খুলল ভালো, না হলে সবসমেত মুখে দিয়ে একবার ঢোক গিলেই অ্যানাদার কলা।

দর্শকরাও উত্তেজিত। তারা উৎসাহ দেয়, -জোর, আরও জোরে।

হঠাৎ এমন সময় প্যান্ডেলে একটা চাঞ্চল্য জাগে।

-হেট্... হ্যাত... ওরে বাবা!

কে আর্তনাদ করে ওঠে। পরক্ষনেই একটা চেয়ার সে শূন্য ছুঁড়ে দেয়। সেটা তীরবেগে ছিটকে পড়ে দর্শকদের ঘাড়ে। তারপরেই দেখা যায় আসরে ঢুকে পড়েছে বিরাট দু'তিনটে ষাঁড়।

ওগুলো রাসমনি বাজারের আশেপাশেই থাকে। বাতিল আনাজপত্র, বাঁধাকপির পাতা-এসব খায়। আর সকালে পাড়ার দোকানে দোকানে পাড়ার মস্তানের মত তোলা তোলে। নীরবে গিয়ে দাঁড়ায়, কিছু দিলেই চলে যায়। না দিলেই শিং-এর গুঁতোয় দোকান তছনছ করে দেয়।

লালু মহারাজ, শাহানশা, আর কালাপাহাড়-এসব নামেই সেই তিনমূর্তি পরিচিত। হঠাৎ সেই তিন মূর্তিকে প্যান্ডেলে ঢুকতে দেখে দর্শকরা ভয়ে এদিক ওদিকে ছুটোছুটি শুরু করে।

ষাঁড়বাহিনীর নজর পড়ে এই রাশিকৃত সুপক্ক কদলির কাঁদিগুলোর দিকে। বাতাসে পাকা কলার খোসবু ম ম করছে। ষাঁড়বাহিনী সামনে এমন স্বাদু খাবার পেয়ে এবার মরিয়া হয়ে ওঠে।

কে বাধা দিতে যাবে ? কালাপাহাড় একজনকে ঘাড় দিয়ে তুলে অ্যাইসা পটকান দিয়েছে, সে ছিটকে গিয়ে পড়েছে মঞ্চে সমাসীন ধরিত্রী দেবীর ঘাড়ে। কেতনবাবুর গলায় রাশিকৃত রজনীগন্ধা, গোলাপ, তায় গাঁদা ফুলের মালা। কেতনবাবু স্থানীয় নেতা-তাই ষাঁড় তাড়াতে নামেন। আর লালু মহারাজ তার গলায়, স্বাদু ফুলের মালা পেয়ে, তাই কামড়ে ধরেছে। কেতনবাবুর গলায় যেন মালার ফাঁস পড়েছে। মশ্ মশ্ করে একমুঠো মালা খেয়ে লালু নেতাকে পটকে কলার গাদায় ফেলেছে।

নসুমামা তখন কপিলদেবের মত রেকর্ড করতে চলেছে কদলি ভক্ষণে। ষাঁড়ের গুঁতো লাগে মামার বিশাল কলা ভর্তি উদরে। ছিটকে পড়েছে নসুমামা-আর গুঁতোর চোটে এবার কুলপি মালাই বেরুবার মত মসৃণ গতিতে মামার উদরে সঞ্চিত আস্ত কলাগুলো কোঁৎ কোঁৎ করে মুখ দিয়ে বের হতে থাকে।

এদিকে ষাঁড়বাহিনী মারধোর খেয়ে ক্ষেপে উঠে চেয়ার টেবিল মঞ্চ ভাঙ্গছে মড় মড় করে। কে কোন দিকে পালাবে তার জন্যই ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছে। আর কলার ওই খোসার স্তূপে পা পড়ে কে কোন দিকে ছিটকে পড়ে, চোট পায়, তার ঠিক নেই।

কেতনবাবুকে দেখা যায় এক লহমার জন্য লালু মহারাজের দুই শিং-এর মাথায় সমাসীন। আর পটলা ঝুলছে কালাপাহাড়ের ল্যাজ ধরে। হোঁৎকা মাচানের বাঁশ ধরে যেন হরাইজ্যানটাল বারের খেলা দেখাচ্ছে। ফটিক জানে পাবলিক ফাংশনে কখন পালাতে হয়, গাইয়ে লোক। তাই তাক্ বুঝে যন্ত্র নিয়ে কেটে পড়েছে।

কলরব, কোলাহল, আর্তনাদ।

শেষ অবধি পাড়ার কিছু পাবলিক এসে দর্শকদের, কলা ভক্ষণের বিচারকদের এখান ওখান থেকে টেনে উদ্ধার করে। কেতনবাবুর ঠ্যাং ভেঙেছে, ধরিত্রী দেবী অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। অনেককেই হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

নসুমামাও কদিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী রয়েছে।

খবরের কাগজে খবর হল ঘটনাটা। তবে কদলি ভক্ষণ প্রতিযোগিতার ফলাফল বের করা সম্ভব হয়নি। আর সম্ভব নয়ও।

পুলিশ কেস-নানা হাঙ্গামা থেকে বেঁচে গেছি, কোনোমতে। ক্লাবের মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছি ক'জন।

হোঁৎকা তখনও ল্যাংচাচ্ছে। ষাঁড়ের গুঁতুনিতে কমবেশি সবাই আহত। পটলা বলে,-ষাঁড়ে মারুক ক্ষতি নাই, এমন জমাটি কম্‌পিটিশন ত.তছনছ করে দিল রে! হোঁৎকা গর্জে ওঠে,-চুপ মাইরা থাক! হালায় ষাঁড় আইল ক্যামনে তা ভাবছিস? এমন সময় গোবরাই এসে খবর দেয়। তাদের কুমড়ো গুদামের কাছে ষাঁড়গুলো পচা কুমড়ো খাচ্ছিল। হঠাৎ ওই কুলেপাড়ার কেষ্ট পালই নাকি পাকা কলার লোভ দেখিয়ে ওদের প্যান্ডেলে এনে ঢুকিয়ে দেয়।

পটলা গর্জে ওঠে,-শোন, শোন কথা!

হোঁৎকা বলে,-হ্যাঁ রে, ওরা মিছে কথা কেন বলবে? তাছাড়া কুলোপাড়ার বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে ডাউন করেছিল কলা ভক্ষণ পালা, তাই ওরাই আমাদের 'স্যাবোটেজ' করেছে।

এবার হোঁৎকা বলে,-তাহলে শুইনা রাখ, আমি বিভাসচন্দ্র (হোঁৎকার ভালো নাম নাকি ওইটা) ওগোরে ছাড়ুম না। ওর প্রতিশোধ লমুই।

পটলা বলে,-আমার আইডিয়া-ওই কলা ভক্ষণ প্র.প্রতিযোগিতা আবার করতে হবে।

হোঁৎকার দেবসেবা

পটলাকে নিয়েই ফ্যাসাদে পড়ি আমরা। এমন দু'একজন আছে যারা সব সময়েই নিজেদের বুদ্ধির প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ে এক একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। আর বিচিত্র সে সব কাণ্ড।

পটলাও তেমনি গোছের। পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের বাকি চারটি,মামা আর ওই পটলাকে নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে মনে হয় ওসব ঝকমারিতে যাব না,রামচন্দ্র হেন অবতার বিশেষ ব্যক্তিও লক্ষ্মণের মত ভাইকে বর্জন করেছিলেন। সেদিন পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের জরুরি মিটিং-এ হোঁৎকাই বলেছিল।

-পটলার এগেনেস্টে এস্টেপ্ নিতি হবে। কিন্তু ওর এগেনেস্টে এস্টেপ নেওয়াও যা ডালে সে সেই ডাল কাটাও তাই। তাহলে পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের অস্তিত্বই থাকবে না। পটলা আমাদের কামধেনু। ক্লাবের ঝালমুড়ি-চা, নকুড়েরদোকানের
চপ,কাটলেট,রামখেলাওনের ফুচকা,কালুয়ার কুল্‌পিমালাই প্রভৃতির বিল মেটায় সে। মাঝে মাঝে গ্র্যান্ড ফিস্টও হয় তার দৌলতে;আউটিং অর্থাৎ দেশভ্রমণও হয়ে যায় তার সুবাদে। এ হেন পটলাকে হটানো যায় না চট্ করে।

ইদানীং অবশ্য ক্লাবের একটা জবরদখলি জায়গায় রীতিমত পাথর-নুড়ি সাজিয়ে তেলসিন্দুর মাখিয়ে একটা শিশু বটের-চারা লাগিয়ে জল দিয়ে একটা মিনি মন্দির করা হয়েছে। ফটিক-এর বাবা এ পাড়ার নামী পূজারি বামুন,তস্যপুত্র ফটিক সেখানে ফি শনিবার শনিপুজোর পত্তন করেছে।

জায়গার মালিক শাহজির বিরাট পুরোনো লোহা-লক্করের কারবার, সে এসে দেখে জায়গা আর নেই এখন দেবস্থান। ফলে চেষ্টা করে ও আর উৎখাত করতে পারেনি। ইদানীং ফি শনিবার বেশ আমদানিও হয়। প্রণামী পড়ে। অবশ্য প্রণামী পড়াটা খানিকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। ওটাকে একবার সংক্রামিত করে দিতে হয়। চালু হয়ে গেলে প্রণামী তখন আপনা হতেই পড়ে।

শনিবার বড় পিতলের থালায় ফটিক আগেকার সঞ্চিত কিছু দশ নয়া-পাঁচ নয়া-দু চারটে সিকি ফেলে রাখে, মাঝে মাঝে আমরাও কিছু ফেলি,দেখাদেখি পথচারীরাও ফেলতে থাকে রাত্রিতে। পুজোর যখন হিসাব হয় দেখা যায় শশা বাতাসা কলার ঘটা খরচ দিয়েও বেশ কিছু থাকছে।

হোঁৎকা বলে-শনি ঠাকুর খুব জাগ্রত দেবতা। তয় মন্দির একখান্ বানাতি লাগবে।

আমি অবাক হই সে তো অনেক কাণ্ড। ফটিক বেশ ঝকঝকে পাথর বাঁধানো মন্দিরের স্বপ্ন দেখছে, সে বলে বাবার কৃপায় হয়ে যাবে রে! আর ওদিকে গানের ক্লাস খুলে ভজন টজনও শেখানো হবে।

ফটিক গানও গায়, কি যে গায় বুঝি না-তবে গলা ফাটানো চিৎকার প্রায়ই শুনি। পটলাকেও দিনকতক তালিম দেবার চেষ্টা করেছিল। পটলারও মাঝে গাইয়ে হবার শখ চেপেছিল, কিন্তু ওর জিভটা মাঝে মাঝে টাকরায় আটকে গিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড বাধে, সেবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বসেছিল কুলেপাড়ার ফাংশনে। বেশ মানজা দিয়ে বসে সবে গান ধরেছে-তুমি কেমন ক্ করেগান ক্রোহে গু-ব্যস তারপরই ব্রেক ফেল করে 'গুণী' অবধি আড় পৌঁছতে পারে নি গু-গু-গু-

বারকতক পবিত্র আসরে ওই অপবিত্র নোংরা ব্যাপারটার কথা এক নাগাড়ে বলে যেতে পাবলিক ঘোর প্রতিবাদ করে তাকে উঠিয়ে দিল, কোনো বেরসিক পাবলিক পচা টমেটোও ছুঁড়ে দেয়, ফলে কাজকরা ওর পাঞ্জাবিটা রঞ্জিত হয়ে ওঠে। সে এক কাণ্ড!

সেই থেকে পটলা ফটিকের কাছে নাড়া বেঁধে রীতিমত কালোয়াতি গান শিখতে থাকে।

ওতে ভায়া টাযার বিশেষ ঝকমারি নেই।

পটলাও বলে-ত-তা মন্দ হয় না। গোবরা বলে-তাহলে ডোনেশন তুলতে হবে, না হয় একটা যাত্রা গান লাগিয়ে দে মন্দির নির্মাণকল্পে স্ট্যাম্প দিয়ে পোস্টার করে। গোবরা যাত্রার দলের খুব ভক্ত। ক্লাবের থিয়েটারে রাজপুত্র, নায়ক টায়কের পার্ট করে।

হোঁৎকা বলে-এপিমেট কইরা আনছি। কি করে পটলা-মন্দির হইবো? পটলা আমাদের শেষ আশ্রয়। মন্দির, বিদ্যালয়-সঙ্গীত কলালয়টয় করবে পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাব-। পাড়াতেও এর মধ্যে খবর ছড়িয়ে যায়।

কুলেপাড়ার ক্লাবের ছেলেদের হিংসে ছিলই আমরা দিব্যি কায়দা করে জায়গা-মিনিমন্দির শনিপূজা করে ক্লাবের আমদানি বাড়িয়ে এবার বিদ্যালয়-টিদ্যালয় গড়ার কথা ভাবছি, তারা ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে-ওসব ফোরটোয়েনটি ব্যাপার।

এই নিয়ে সেদিন গোলকবাবুর রকে হোঁৎকা-ওদের সঙ্গে দুচারটে কথা কাটাকাটি করে। পটলাও ছিল। তারও প্রেস্টিজে বাধে, অবশ্য কথা বেশি বলতে পারেনি সে। জিবটা ব্রেক ফেল করেছিল।

তবু বলে সে-সিওর হবে বি-বিদ্যালয় মন্দির! ওরা বলে-দ্যাখা আছে। ফোরটোয়েনটি করে জায়গা দখল করেছিস, লোক ঠকাচ্ছিস পুজোর নামে।

আমাদের ক্লাবের চত্বরে রীতিমত আলোচনা হয়। আমি বলি ছেড়ে দে ওদের কথা। আর ওসব করাও অনেক খরচার ব্যাপার।

হোঁৎকা বলে-ওল্ড কজ, এর জন্যে ডোর টু ডোর ভিক্ষা করুম? গোবরা বলে-কোটো নাচাতে পারব না? ওতে আমি নাই।

মন্দির তাহলে হবে না। পটলাই আবার সেই ঝামেলা বাধিয়েছে। সে ওদের সামনে ঘোষণা করেছে-ওসব সিওর হবে।

ক'দিন চুপচাপই থাকি-হঠাৎ সেদিন পটলা, যেন খুশিতে বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উড়ে এসে পড়ে বলে সে।

-লা-লাইন কি-কিলিয়ার? মন্দির হবে সিওর। হোঁৎকা চুপসে গেছল। ফটিক তো আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। কেবল কণিষ্ক জোর মন্তর আওড়ায়। গোবরা বিরসবদনে বসে থাকে। পটলার কথা শুনে হোঁৎকা বলে দেশজ ভাষায়।

-ইস্টপ! চুপ কর পটলা। আমাগোর গাছে তুইলা মই কাড়ছিস তুই? তর লগে নো কনেকশন্।

আমরা অবাক হই। পটলা বলে।

-ফটিক, ঝালমুড়ি নিয়ে আয়। আর ম-মন্দিরের ব্যাপার ও স্-স-

আমি বলি-স্টপ হয়ে গেল? পটলা এবার মরিয়া হয়ে বলে-নো! সেটেলড্। প-পাক্কা। ম-মন্দির হবে? ইউথ বি-বিদ্যালয়। পিসিমা রাজি-

ফটিক জয়ধ্বনি দেয়-জয় বাবা শনিমহারাজ। সবই তোমার কৃপা।

পরে শুনে খেয়াল হয় তার। বলে সে।

-সুখবর শুনে ঝালমুড়ি স্রেফ-কি রে হোঁৎকা?

হোঁৎকা বলে-যা রতনের দোকান থেকে গরম সিঙ্গাড়া আর টু পিস্ কইরা নলেনগুড়ের সন্দেশ আন্। সাথে চাও আনবি। প্যাট ঠান্ডা কইরা সব ভাবতি হইব।

পটলার এক পিসিমা থাকেন মেমারিতে। নেমে মাইল দশেক ভিতরে কোনো গ্রামে। বিরাট জমি জায়গার মালিক-আলু হয় পাহাড় প্রমাণ, নিজেদের কোল্ড স্টোরেজও আছে। বিরাট দিঘিও কয়েকটা। মাছ বিক্রি হয় বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার মত।

টাকার নাকি হিসেব নেই। পিসেমশাই মাটির মানুষ। পিসিমাই সব। আর খুব ভক্তিমতী তিনি। এর আগে গুরুদেবের মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন, বৃন্দাবনের মঠে যত চাল আলু লাগে তামাম সাপ্লাই করেন। তিনি নাকি আশা দিয়েছেন পটলাকে-এসব করে দেবেন।

হোঁৎকা বলে-তর যাবার লাগবো। প্ল্যান-হিসাবপত্র লইয়া চল গিয়া হেই পিসিমার কাছে।

ফটিক এহেন নৌকা ছাড়তে রাজি নয়।

সে বলে-শুভস্য শীঘ্রম। মঙ্গলে উষা বুধে পা, আজই চল তাহলে ফিরে এসে জোর করে মহারাজের পুজো দেব।

...ইদানীং শনিমহারাজের ভক্ত হয়ে উঠেছে ফটিক। বেলপাতায় সিন্দুর তেল এর পেস্ট-কপালেও কিছুটা লাগিয়েছে সে। আমরা পঞ্চপাণ্ডব চলেছি মেমারির দিকে।

ইস্টিশনে নেমে বাস মেলে, বরাত ভালো থাকলে ট্যাক্সিও মিলবে। তবু শুধাই,

-ইস্টিশান থেকে এত দূর, অচেনা জায়গা-রাত হয়ে যাবে, কাল সকালেই চল-

হোঁৎকা গর্জে ওঠে-কাওয়ার্ড! একটুকু পথ-হ্যোঁৎকার হঠাৎ মনে পড়ে ভাবার্থ সম্প্রসারণের একটা কবিতা। কবিতাটা বলে সে।

-ক্যান পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ তারপরেই যথারীতি ভুলে গেছে। বললে-পারেন কি র্‌্যা? পটলা সুর করে উদ্যম বি-বি-হনে ক্‌ক্‌-

বাস তখন কুলেপাড়া ছাড়িয়ে শিয়ালদা চত্বরে এসে গেছে। আমার প্রপোজাল ওরা ভেবেও দেখল না, পটলার কবিতা তখনও হয়নি।

হোঁৎকা আউড়ে দেয়-নাম! বলি হাওড়া থেকে মেমারি হোঁৎকা বলে-কথা কবি না! নো টক্‌! শিয়ালদহ ওই নৈহাটি দিয়া ব্যান্ডেল গিয়া ট্রেন ধরুম।

বৈকাল তখন হয় হয়! আষাঢ় মাসের দিন একটু বড়ই হয়। ব্যান্ডেল স্টেশনে নেমেছি তখনও বেলা একটু আছে। বর্ষায় মেঘগুলো ঘুরছে আকাশে, চারিদিকে মেঘভাঙা রোদ মাঝে মাঝে উঁকি মারে। আবার ঢেকে যায় মেঘের আড়ালে সূর্যের আলোটুকু।

মেমারি যাবার গাড়ির দেরি আছে। এদিকের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে আছি, হোঁৎকা বলে। -ফটিক! চা বিস্কুট আন গিয়া, আর এহানের কলাও ফাস্‌কেলাস! কিছু লইয়া আয় গিয়া।

মন দিয়ে কলা খাচ্ছি, পটলা বলে,-রাতে গিয়ে পি-পিসিমার পু-পুকুরের তাজা রুই মাছ এর ঝোল দিয়া গ-গোবিন্দ ভোগ চালের ভাত।

খিদেও লেগেছে। রুই মাছের মুড়িঘণ্ট-কালিয়া দিয়ে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চালের অন্ন-বাড়ির ঘৃত সহযোগে-কথাটা ভাবতে জিবে জল আসে। আর আশা আছে মন্দির বিদ্যালয় তৈরি হবে।

গাড়ি আসছে। বর্ধমান লোকাল-ট্রেনে উঠতে যাব হঠাৎ পটলার চিৎকার শুনে চাইলাম। বেঞ্চের উপর ব্যাগটা ছিল-তাতে আমাদের জামা-প্যান্ট, টাকা পয়সা মায়, ট্রেনের টিকিটও ছিল, সবশুদ্ধ ব্যাগটাই হাওয়া হয়ে গেছে।

ব্যান্ডেল জংশন-এর এত মহিমা জানা ছিল না। এখানের চোরদের শিক্ষা কলকাতার চোরদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ওরা তাক্‌ বুঝে ঠিক মাল হাপিস্‌ করেছে। ওদিকে ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে।

হোঁৎকা উঠে পড়েছে ট্রেনে-ওকে নিয়েই বোধহয় ট্রেন চলে যাবে। পটলা ওকে কি বলবে চেষ্টা করে। বোধহয় নেমে আসতেই বলছে, কিন্তু জিবটা ঠিক সময়েই বিট্রে করে টাকরায় সেঁটে গেছে।

পটলা তখন ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠেছে ওকে নামাবার জন্যই। আমরাও ফলো করেছি ট্রেনের কামরার মধ্যে। ইলেকট্রিক ট্রেনটা

সিটি বাজিয়ে ফুলস্পিডে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বের হয়ে গেছে।

নামার কোনো পথই নেই। পটলা বলে কোনোমতে স-সর্বনাশ হয়ে গেছে। ব-ব্যাগটা কে নিয়ে গেল।

আমরা ভাবছি। হোঁৎকা গর্জে ওঠে-তরে এ্যাক্ লাথি মাইরা ফ্যাইলা দিমু ট্রেন থেকে। ম্যাডাগাস্কার কোথাকার। এহন-

পটলা সান্ত্বনা দেয়-পিসিমার ওখানে পৌঁছিলে স-সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

পাঁচজনের পকেট এর অবস্থা নিদারুণভাবে শূন্য। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মোট সাড়ে চার টাকা একস্ট্রা ছিল, তাই বেরুলো।

পটলা বলে-বাস ভাড়া হয়ে যাবে। তারপর পিসিমার ওখানে স-সব পাবি।

আমি বলি-ট্রেনে যদি ধরে?

হোঁৎকা ক্রমশ ভেবেচিন্তে পথ করেছে। বলে সে।

-এ ট্রেনে চেক্ হইব না। চল গিয়া। ট্রেন তখনও দুদিকের সবুজ পাট ক্ষেত-সদ্য কার্তিক ধানক্ষেতের বুক-চিরে চলেছে। সন্ধ্যা নামছে-মেঘঢাকা আকাশ ছেয়ে এবার বৃষ্টি নেমেছে অঝোর বৃষ্টি।

-টিকিট? যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। টিকিট নেই আর এই সময় কি না হানা দিয়েছে টিকিট চেকার। হোঁৎকা বলে।

-ছিল স্যার? টিকিট চেকার পাঁচজনকে দেখছে। ফটিকের কপালে সিন্দুরের দাগ, পরনে গেরুয়া ধুতি-পাঞ্জাবি। ইদানীং শনি মহারাজের রেগুলার পুজো করে ও আধা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে-তাছাড়া পিসিমাকে মন্দির টন্দিরের কাজে নামাতে হবে তাই ফটিক এমনি জব্বর মেক্আপ নিয়ে বসেছে। টিকিট চেকার গুঁতোয়।-টিকিট ছিল তা গেল কোথায়?কি হে ছোকরা-তোমাদের মত টিকিটের কি ডানা পালক গজিয়েছিল? অ্যাঁ-

পটলা বলে-চ-চ-চ টিকিটচেকার গর্জে ওঠে-আবার ভেংচানো হচ্ছে? টিকিট বের করো-না হলে সিধে রেলওয়ে পুলিশের গারদেই পুরে দেব বর্ধমানে।

কোনো যাত্রী বলে।-দেখে তো ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। অন্যজন বলে-পকেটে সার্চ করুন দাদা, ট্রেন ডাকাতির মতলবে ঘুরছে কি না? ছুরি-ভোজালি-বোমা-পিস্তল না বেরুয়।

হোঁৎকা বলে-বিশ্বাস করুন চোর আমরা নই, চোরেই আমাগোর সব লইয়া গেছে ব্যান্ডেল ইষ্টিশানে।

টিকিট চেকার গর্জে ওঠে ব্যান্ডেল ইষ্টিশানের চোরদের এহেন অপবাদ শুনে। ধমকেওঠে সে।

-মিথ্যে কথা। নিজেরাই চোর কি না ঠিক নেই আবার ব্যান্ডেলের বদনাম দিচ্ছ। লজ্জা করে না। আমিও ব্যান্ডেলে থাকি।

সামনে স্টেশন আসছে। টিকিট চেকার বলেন।-নামো এখানেই। চলো-না হলে বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেব।

কে বলে-তাই করুন দাদা। না হলে ডব্লু-টির যাত্রীদের সিধে করা যাবে না।

স্টেশনে গাড়ি থামতে চেকার সাহেব আমাদের টেনে নামিয়ে এবার বলে-কি আছে বের করো?

হোঁৎকা বলে-ছোরা পিস্তল নেই স্যার। পটলা বলে-বি-বিলিভ মি স্যার চোর নই।

চেকার সাহেব বলে-ওসব না, টাকা কি আছে বের করো জলদি। নাহলে-

ফটিক আমাদের সমবেত ফান্ডের চারটাকা পঞ্চাশ পয়সা বের করতেই ব্যান্ডেলের চেকার সাহেব ঘপ্ করে সব কটা টাকা পয়সা হাতের মুঠোয় পুরে ধাবমান ট্রেনে উঠে পড়ে, চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা কর্তব্যপরায়ণ চেকারকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

হোঁৎকার এবার ব্যাপার বুঝে গর্জন করে!-হালা ব্যান্ডেলের চোরও য্যামন-চেকারও তেমনি। দুইডাই এক কেলাসের। লাস্টপাই অবধি নিয়া গ্যালো গিয়া। তবু ঠাকুরের কৃপা, যেখানে নামিয়েছে সেইটাই মেমারি ইস্টিশান।

পটলা বলে-তবু এখানেই এসেছি। হোঁৎকা গর্জায়-স্বর্গে আইছি! চা খাবার পয়সাও নাই-দশমাইল কইছিস, বাসভাড়াও নাই। যামু ক্যামনে?

ভাবার কথা। রাত্রি হয়ে আসছে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি মল্লিকপুরের স্টেট বাস তখন চলেছে, কাদা ভরা রাস্তা-বাস-এরসর্বাঙ্গেমানুষ। ছাদেবসেওকাকভেজাহয়েভিজছে লোকজন। কণ্ডাক্টার হাঁকছে।

লাস্ট বাস মল্লিকপুর কুসুমগাঁ! খালি গাড়ি বোঝাই বাসটা টলতে টলতে বের হয়ে গেল। আমরা পথে দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা এগারোটায় বাড়িতে ভাত খেয়ে ক্লাবে এসে দল বেঁধে বের হয়েছি। ব্যান্ডেলের কলা পাউরুটি কখন হজম হয়ে গেছে মানসিক, দৈহিক ধকলে। এবার বুঝতে পারি খিদের জ্বালাটা।

হোঁৎকার খিদে পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। অচেনা জায়গা সঙ্গে টাকাপয়সাও নেই। ওদিকে দোকানের শোকেসে কদ্‌বেলের সাইজ রাজভোগ, সন্দেশ, কালো ঘৃতপক্ক ল্যাংচা রসে হাবুডুবু খেয়ে যেন ডাকাডাকি করছে। বাদলার রাতে গরম আলুর চপের খদ্দেরের অভাব নেই। আমাদের পেটের নাড়িগুলো পাক দিচ্ছে খিদের জ্বালায়।

পটলাই বারবার এমনি সব দারুণ দারুণ বিপদে ফেলে। আর প্রত্যেকবারই বলি তোর সঙ্গে আর নেই। কিন্তু বরাত দোষে ও জুটবেই আর ফ্যাসাদে ফেলবে। তবু পটলা সান্ত্বনা দেয়।

-পিসিমাকে চিঠি দিইছি। গরম খিচুড়ি-মাছভাজা মাছের কালিয়া-হোঁৎকা গর্জে ওঠে-তরেই কলিয়া বানাইমু পটলা! এহন দশমাইল পথ যামু ক্যামনে! উঃ ক্ষুধায় চক্ষে অন্ধকার দেহিরে! শেষ মার মাইরা গেল ব্যান্ডেলের চেকার? খাসা জায়গাখান্-হালায় জামা প্যান্টুল সব লই গেল-যামু ক্যামনে তর মল্লিকপুর!

এমন সময় সিটকে মত ছেলেটা এগিয়ে আসে! মল্লিকপুর যাবেন ট্যাক্সিতে-

বাসের ভাড়া নাই আর ট্যাক্সিতে চাপবে? পটলা বলে মল্লিকপুর চৌধুরীদের বাড়ি যাবে।

ছোঁড়াটা বলে বেশ তো চলেন। পাঁচ জনে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। দুমাইল রাস্তা কিনা-বর্ষার রাত!

আমি শোনাই-পটলা! টাকারকিহবে?

পটলাঅভয়দেয়-পিসিমার বাড়ি যাচ্ছি-পৌঁছলে নো ফিয়ার ওখান থেকেই পিসিমা সব ম-ম্যানেজ করে দেবে।

তবু দরাদরি করে রফা হ'ল তিরিশ টাকায়।

শুধোয় গাড়ি কোথায় তোমার?

ছেলেটা দেখায়-ওই তো!

দূরে দেখি একটা যেন মানুষের স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ক্যাম্বিসের ছাদটা পিছনে ফেলা। সাবেকি আমলের হুড ওয়ালা গাড়ি হুডটা নাই, মুক্ত আকাশের নীচে দুটো সিটে জনা চৌদ্দ মানুষ অলরেডি জড়াজড়ি করে আছে, পাদানিতে দুকিকে দুটো বাঁশ ফিট করা, তাতে দুপাশে ব্যালেন্স করে জনাআস্টে ঝুলছে পাদানিতে ঠ্যাং রেখে।

ছোড়াটা সামনে কুন্ডলীভূত ড্রাইভারকে শোনায়। মল্লিকপুরের পাঁচ খান মাল পেইছি, ড্রাইভার বলে-পেছনে সেঁটে দে!

আর কোন উপায় নেই। পেছনে হুড-এর উপর জালে রাখা মাছ-এর মত বসেছি। ছেলেটা বলে।-পথে সব খালি হয়ে যাবে তখন সিট্ পাবেন। এখন চলেন-

বিচিত্র বাহন এবার নেচে কুঁদে হেলেদুলে চলেছে, আমরা হুডের ক্যানভাসের ফাঁকে উল্‌টি পাল্‌টি খেতে খেতে চলেছি তপ্ত খোলাই ভাজা খই-এর মত অবস্থা আমাদের। হোঁৎকা গজগজ করে, কি বিপদেই না পড়েছি-হালায় শনি ঠাকুরের মন্দিরের কাম নাই, থাউক বিদ্যালয়ের কতা-নাইমা পড়।

নামবার উপায়ও নাই। পয়সা কিছুও দিতে হবে তাহলে, তাও নেই। পটলা বলে-ম-মল্লিকপুর অবধি যে যেতেই হবে।

হোঁৎকা কাতরস্বরে জানায় ডেডবডি খান্ ই লইয়া যাবি মনে লয়। হুড-এর ভাঁজ করা লোহার রডের মধ্যে পড়ে আমি চাপা খেয়ে কাতর স্বরে আর্তনাদ করছি। ড্রাইভার গর্জন করে চুপ করে থাকুন।

গাড়ি লম্ফ দিয়ে যেতে যেতে এবার থেমেছে কোনো গ্রামের ধারে। হঠাৎ পথের ধারে চায়ের দোকানে হ্যাজাক নিয়ে কারা অপেক্ষা করছিল।

সমবেতভাবে চিৎকার করে-এসে গেছে। ঢোল কাঁসিও বেজে ওঠে। গাড়ির ওই মানুষের পিণ্ডগুলো বরযাত্রীর দল, বরও ছিল তাতে গুনে গুনে দেখি তেইশজন উইথ বর নামল গাড়িখানা থেকে।

ফটিক বলে-উঃ! বিয়েবাড়ির খাওয়াও জোর হবে। এদের সঙ্গেই নামবি নাকি?

বুদ্ধিটা ভালোই, কিন্তু টাকা কই! আমরা যেন পোস্টাপিসের ভিপিতে চলেছি। ঠিকানায় পৌঁছে টাকা দিলে তবে ছাড়া পাব। না হলে ছাড়া পাবার উপায়ও নেই। পটলার পাল্লায় পড়ে আবার কি ঘটে কে জানে।

-সিট এ বসেন। গাড়ি খালি হয়ে গেছে। এবার আরাম করে সিটে বসেছি। বর বরযাত্রীরাও চলে গেছে। আঁধার নেমেছে, পিটি পিটি বৃষ্টি বন্ধছিল আবার পড়তে শুরু করে।

আমি বলি-গাড়ির হুডটা টেনে দেবেন? হেলপার ছেলেটা বলে-হাওয়ায় ইস্‌পিড কমে যাবে লাগালে। কি গো গনুদা লাগাব?

-না!

শুধোই-মল্লিকপুর আর কতদূর?

ড্রাইভার ছোটকথা কানে তোলে না, হেলপার ছেলেটা-সিগ্রেট আছে? দাও না একটা।

জানাই ওসব খাই না। ছেলেটা গুম হয়ে যায়, মল্লিকপুরের হদিশও জানায় না রেগেমেগে। নির্জন মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলেছে

লম্ফ ঝম্প করে।

এবার পিচরাস্তা শেষ হয়ে খোয়াফেলা আধকাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। বৃষ্টির মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদও উঠেছে। মনে হয় মল্লিকপুরের কাছে এসে গেছি। রাতে ভরপেট মাছের ঝোল ভাত পাবো। বিছানা পাবো। ঘুম যা হবে ভাবতেই চোখ বুজে আসে আরামে।

হঠাৎ গাড়িটা ঝড়াৎ করে থেমে গেল। ড্রাইভার গাড়িতে বসেই বলে-গাড়ি আর যাবে না। ওই গ্রামটার ওপারে মল্লিকপুর। হেঁটে চলে যান। রাস্তা খারাপ-বিলে এদের পঁয়ত্রিশ ট্যাকা না-

ঘুম ছুটে গেছে। এবার হোঁৎকা নিজমূর্তি ধরেছে। বলে সে-মল্লিকপুর লই যাবা কইছো-তয় গাড়িতে উঠছি। এহন মাঝপথে কও যাবে না রসিকতা পাইছ?

ড্রাইভারও গর্জে ওঠে-বললাম তো রাস্তা খারাপ।

আমি বলি-সঙ্গে টাকা নাই। মল্লিকপুর চৌধুরীবাড়ি গেলে তবে ভাড়া পাবে।

ড্রাইভার এবার হুঙ্কার ছাড়ে-ভাড়া দেবে না? বিলে ছোঁড়াটা ফস্ করে গাড়ির হ্যান্ডেল বের করেছে। ড্রাইভার গজরায়।-ভাড়া না দিলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। দেও টাকা।

-টাকা সত্যিই নাই?

ড্রাইভার হুঙ্কার ছাড়ে-মামার বাড়ি পেয়েছ?

পটলা আন্তরিকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে-পি-পিসার ব-ব-

-চোপ! ড্রাইভার ওকে এক ধাক্কা দিতে পটলা ছিটকে পড়ে রাস্তায়। ওরা দুজন আমরা পাঁচজন। হোঁৎকাও গর্জে ওঠে-শ্যাষ কইরা দিমু। কইছি ট্যাকা সাথে নাই।

সেই-ই এবার রডটা হাতিয়েছে। হেলপার ছোঁড়াটা কুঁইকাই করছে। ড্রাইভার বলে-এতখানি তেল পুড়িয়েছি, কিছু দ্যান। না হয় ঘড়িটাই দিতে হবে।

পটলা এক পটকান্ খেয়েই টের পেয়েছে ব্যাপারটা। এবার দুই পক্ষই যুদ্ধমান। হেলপার বিলে সিটের নীচে থেকে এবার হাঁসুয়া বের করেছে। আমিও ঘাবড়ে যাই। কে জানে হাঁসুয়া চালাবে কি না।

পটলার জন্মদিনের উপহার এইচ-এম টি ঘড়িটা খুলেই ওকে বলে।-এইটাও নাও? থ্-থামদিকি তোরা।

ড্রাইভার এত সহজে দাবির চেয়ে বেশি আদায় হতে দেখে গাড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করছে, সরু রাস্তা। দুদিকে নিচু খাদ-

হঠাৎ একটা কলরব শুনে চাইলাম। ওদিকের গ্রামের দিক থেকে কয়েকটা টর্চের আলো পড়ে। কলরব উঠছে কারা অন্ধকারে ছায়া-মূর্তি মত দৌড়চ্ছে-দু'একটা বোমের শব্দ ওঠে।-ডাকাত! ডাকাত!...

গ্রামে বোধহয় ডাকাত পড়েছিল। তাড়া করেছে ওদের গ্রামের লোকজন। হঠাৎ পথের উপর জনা দশেক ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে, গাড়িটার দিকে। অবাক হই ড্রাইভার দু'একবার সাইড লাইটটা জ্বেলে কিসের সংকেত করছে। আমাদের বলে সে।-চলে যাও, ওদিকে। ওই আলপথ ধরে। যাও বলছি।

ছায়ামূর্তি দল একজন আহত রক্তাক্ত লোককে ধরাধরি করে এনে গাড়িতে তোলে। আমাদের দেখে গর্জে ওঠে একজন। ভোজালি

তুলে তেড়ে আসে-ফিনিশ্ করে দেব। চল গজা-ওরা আমাদের ফেলেই গাড়ি হাঁকিয়ে পালাতে চায়। মনে হয় গাড়িটা গজা এখানেই আনত এদের নিয়ে যাবার জন্য। পথে কিছুটা দমকা রোজগার মাত্র।

এবার বেশ মোটা মাল রোজগার করেই ফিরছে। একটা সুটকেশ-বস্তায় জড়ানো কি সব, হাতে অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। বাধ্য হয়েই সরে গেছি আমরা ওদিকে।

গাড়িটা স্টার্ট করেই চীৎকার করে ওঠে ড্রাইভার। গাড়ি নড়ে না। স্টিম ইঞ্জিন গজরাচ্ছে কিন্তু গাড়ি চলে না। ওরা নেমে পড়েছে দু'একজন, চমকে ওঠে ড্রাইভার।

হোঁৎকাও তৈরি। সে বলে-শালারা ডাকাত, ওই গাড়ির তিনটে চাকার হাওয়া আমিই খুইলা দিছি-হালায় শয়তানিটা দেখ এবার।

লোকগুলো বিপদে পড়েছে। আমরাও চিৎকার করছি-ডাকাত! ডাকত! হুশিয়ার-।

গ্রামের লোকজন ভাবেনি যে ডাকাতরা এখানে আছে। আমাদের চিৎকার শুনে তারাও দৌড়ে আসে। ডাকতরাও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে-তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তাদের। দু'একজন গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে পালাতে যাবে সেই কেড়ে নেওয়া হ্যান্ডেল হাতে হোঁৎকা দুই ঘায়ে দুটোকে কাদায় ফেলেছে, ওদিকে এসে পড়েছে গ্রামের লোকজনও। পলায়মান ড্রাইভার এর লম্বা চুলের মুঠো ধরেছে গোবরা কয়েক মিনিটের মধ্যে লড়াই শেষ। সারা গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে, ডাকাতরা হানা দিয়েছিল পটলার পিসিমার বাড়িতেই। সোনা দানা-টাকাকড়ি মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর নিয়ে পালাচ্ছিল, আর পড়বি তো পড় আমাদের সামনেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রামের শ খানেক জনতা এসে ডাকাত-ড্রাইভারদের ধরে ফেলে, দু তিনজন বেশ আহতই। থানার দারোগাও এসে পড়েন পুলিশ বাহিনী নিয়ে।

পিসেমশাই অবাক হন পটলাকে দেখে, সেও কমবেশি ঝাড় খেয়েছে মরিয়া ডাকাতদের হাতে। কপালটা ফুলে গেছে জামাটা ফর্দাফাঁই। হোঁৎকা রেগেছিল ব্যান্ডেল থেকেই চোর নামক প্রাণীদের উপর, শেষ ঘা মেরে গেছে ব্যান্ডেলের চেকার, আর সর্বশেষ ঘা মেরেছে ড্রাইভার। পটলার ঘড়ি কেড়ে নিয়েছে। সব রাগ ঝেড়েছে ওই ডাকাতদের উপর তাদেরই গাড়ির হ্যান্ডেল দিয়ে

পিসেমশাই বলেন-পটলা। তোর এসে পড়েছিলি তাই এসব রক্ষা হল রে। চল বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি চল মল্লিকপুরের বাকি পথটুকু আর কষ্ট করে যেতে হয়নি। ওরাই শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেল।

চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। এতদিন ধরে আশপাশের গ্রামে, এই এলাকায় এরাই ডাকাতি করছিল, এবার জালে পড়েছে।

ফটিক বলে-সবই শনি মহারাজের ইচ্ছে বুঝলি। পিসিমাও ভক্তি গদগদ চিত্তে বলেন-সত্যিই রে। দেখছি এবার কি করা যায় তোদের ইস্কুলের জন্য, মন্দিরও তৈরি করিয়ে দেব বাবার?

হোঁৎকার সময় নেই। সে বলে।-এ্যাহন খ্যাতি দ্যান পিসিমা। বাবার কাম বাবায় বোঝাব। ক্ষুধায় এহন জ্বলতিছি।

হোঁৎকার ওই এক চিন্তা। গঠনমূলক কাজ-যে ব্যাটারা করবে তার দিকে নজর নাই, খাওয়াটাই বড়।

পটলার অদৃশ্য বন্ধু

পটলা খবরের কাগজটা কিছুক্ষণ পড়ার পরই সেটাকে আশমানে ছুড়ে দিয়ে গর্জে ওঠে-ধ্যাৎ তে তে রি কা। সব ফোন টোয়েনটি! ই-ইন্ডিয়ার কী হল বল তো!

পটলা ইদানীং ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তিত। মাঝে মাঝে পটলার মাথায় এক-একটা চিন্তা এসে সেঁদিয়ে যায়। আর তখন কিছুদিন পটলা সেইটার পিছনেই পড়ে। একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ে না।

ইদানীং পটলার মাথায় ঢুকেছে অন্যায়ের প্রতিকার করতেই হবে। তাই নিয়ে সে মায় রবীন্দ্রনাথের করিতাও আওড়ায়।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

এই নিয়ে স্কুলের পরীক্ষাতেও এবার দারুণ 'এসে' লিখেছে। বাংলার টিচার মদনবাবুও বলেন, দারুণ লিখেছ বিদ্যুৎ (পটলার ওইটা নাকি ইস্কুলের নাম) এবার তোমাদের ক্লাব থেকেও সমাজের কোণে কোণে জমে ওঠা অন্যায়গুলোকেই দূর করার চেষ্টা কর।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের আমরা ক'জন সভ্যই ক্লাবের মাথা। হোঁৎকা, গোবর্ধন অবশ্য আমাদের বাহু। অর্থাৎ শক্তি, বুদ্ধি দেয় ওরাই। ফটিক গাইয়ে-টাইপের ছেলে, স্কুলের পরীক্ষাটা কোনোমতে টপকায় মাত্র। তার ধ্যান জ্ঞান ওই সঙ্গীত। তাও আজকের কিছুই না জেনে হেলেদুলে গিটার বাজিয়ে জীবনমুখী টাইপের গান নয়। ওকে বলে-ফক্কিবাজি রে। গান হচ্ছে কালোয়াতি গান। ভারতের রাগসঙ্গীতই আসল।

তাই ভোর থেকেই ক্লাবের ঘরে এসে গলা সাধতে থাকে, বিকট স্বরে এমন সাপট তান মারেই যে, কাক চিলও এমুখো হয় না।

হোঁৎকা অবশ্য খেতে পেলেই খুশি, 'সব করে দেবে' পটলার বাবা-কাকার বিরাট কারখানা; ঠাক্‌মার তো অনেক সম্পত্তি, একটা বাজারই ওদের। টাকার অভাব নেই। আর পটলা ওই বনেদি বাড়ির একমাত্র কুলপ্রদীপ।

সুতরাং সেই আমাদের ক্লাবের কামধেনু কাম ট্রেজারার। আর হোঁৎকা এবার সেক্রেটারি; গোবর্ধনের মামার বিরাট কুমড়োর ব্যাবসা। কুমড়ো, চালকুমড়ো এসবের ওরা হোলসেলার। তারকেশ্বর, বর্ধমান, বনগাঁ অঞ্চলের সব কুমড়ো ট্রাকবন্দী হয়ে আসে ওদের গুদামে। এক-একটা খোলের সাইজ, কোনোটা ফুটবলের মতও। ওই কুমড়োর সংস্পর্শে থেকে গোবর্ধনও কুমড়োর মত ফুলে উঠছে। ওদের পাশে পটলা, আমি আর ফটকে তো স্রেফ এইটুকু।

কিন্তু পটলার কর্তৃত্বই বেশি। তাই পটলার ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এখন আমরাও যোদ দিয়েছি। আর করার মত একটা কাজও হাতের কাছে পাকা ফলের মত টপ করে খসে পড়েছে।

এদিকে বেশ কিছু তেলকল গজিয়ে উঠেছে। ছোট বড় মাঝারি সাইজের তেলকল এখন এদিকে-ওদিকে চলছে।

হরষিতবাবু এই অঞ্চলের লিডার। লোকটা কয়েক বছর আগে রাসমণি বাজারে একটা মনোহারি দোকান দিত। দোকান ওই নামেই। বাজারের ফড়ে, ব্যাপারীদের নিয়ে মাঝে মাঝে মিটিং মিছিল করত।

আর এদিকের নেতা বসন্তবাবুর বয়স হয়েছে, ওই বসন্তবাবুর সঙ্গেই ঘুতর। সৎ মানুষ বসন্তবাবু। তিনি এখানের পথঘাট, জল নিকাশি ব্যবস্থা এসবের অনেক উন্নতি করেছেন।জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করে তাদের সুখদুঃখের খবর নিতেন; হরষিত তখন বসন্তবাবুর ছায়া।

তারপরেই বারেই কোনো জাদুমন্ত্রবলে হরষিতবাবুই ভোটে জিতে বসন্তবাবুকে হটিয়ে নিজেই এখানের এম-এল-এ হয়ে গেল। আর বাজারের ফড়েদের,স্থানীয় কিছু মস্তানকেও দেখা গেল তার মিছিলে। তেলিয়া মস্তান হরষিতের পাশে এসে ফিট হয়ে গেল।

হরষিতবাবু নেতা হয়ে বসল। পরের বার ভোটের সময় দেখা গেল তার বুথে ওই তেলিয়ার দলই সর্বেসর্বা। বীরদর্পে মোটরবাইক হাঁকিয়ে ঘুরছে তেলিয়া। তার দলবল সাধারণ ভোটারদের ভোটের বাক্সের ধারে কাছে এগোতে দিল না, জিতলেন হরষিতবাবুই।

এখন হরষিতবাবুর বিশাল বাড়ি, দু-তিনটে গাড়ি। সর্বদাই ব্যস্ত, দেখা মেলে না তাঁর।গাড়িতে চড়ে ঘোরেন। এলাকার পথঘাট-এর কাজও হয় না। বর্ষার চার মাস এলাকার বেশিটা জলে ডুবে থাকে।

সারা বাজারের বাইরে রাস্তারেও বাজার এসে বসেছে। পুলিশ দেখে মাত্র। তেলিয়ার দলের দৈনিক রোজগার এখন কয়েক হাজার টাক, এর অর্ধেক নাকি হরষিতবাবুর। বাকি ভাগ করে নেয় তেলিয়ার দল।পুলিশদেরও প্রণামী ঠিক দেয়। সাধারণ মানুষ ওদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

বাজারের দোকানদার সাহুজির ছিল একটা রেশনের দোকান। কোনো রন্ধ্রপথে সেই সাহুজি এখন হরষিতবাবুর খুব কাছের লোক হয়ে গেছে। তার ছেলে এখন হরষিতের সেক্রেট্যারি। ব্রিজভূষণ সাহুর কনট্রাকটারি ব্যবসা। পথঘাট মেরামতের কনট্রাক্ট সেই-ই পায়। লাখ লাখ টাকার কাজ। পথেঘাটে দু-চার ঝুড়ি খোয়া পড়ে মাত্র। ড্রেনের নর্দমার পাঁক দু-একদিন তোলা হয়। মানুষজন আশান্বিত হয়। এবার পথঘাট মেরামত হবে। জলনিকাশি ড্রেনও তৈরি হবে। কিন্তু কোথায় কী? আর কিছুই হয় না।

সেদিন বৃদ্ধ প্রমথবাবু রিকশা উলটে পড়ে হাত ভাঙলেন। আমরাই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম; হরষিতবাবুর কাছে আমরাই ক্লাবের পক্ষ থেকে রাস্তার ব্যাপারে বলতে গেলাম। তিনি বলেন, সে কী! রাস্তা তো নতুন হয়ে গেছে। বারো লাখ টাকা পেমেন্ট ও হয়ে গেছে। আমি তদন্ত করছি।

ওই পর্যন্তই। পটলা বলে দ্-দ্যাখ দুর্নীতি ক্-কাকে বলে! উত্তেজিত হলে পটলার জিভের ব্রেক ফেল করে আলটাকরায় সেট হয়ে যায়। উত্তেজিত হওয়ারই কথা।

হোঁৎকা তার দেশজ ভাষায় বলে-হালা চোরের দুনিয়া হইগেছে গিয়া। পটলা বলে, এখনও কিছু করবি না! সায়লেন্ট থাকবি? প্রতিবাদ করতেই হবে।

আমরাও ভাবছি কথাটা। তাই সেদিন বেশ কিছু ছেলেদের নিয়ে খেলার মাঠের দাবিতে মিছিল করতে জনসাধারণও এগিয়ে আসে।

প্রমথবাবু, বাংলার টিচার মদনবাবু, কুলেপাড়ার কিছু ছেলেও আমাদের পাশে আসে। একটা মাঠ বেওয়ারিশ পড়ে ছিল, সেখানেই সকলে খেলত। হঠাৎ ওই ব্রিজমোহনের লোক এসে ইট-এর লরি খালাস করতে গেলে সকলে বাধা দিই।

সেই রাতেই আমাদের ক্লাবঘরটাই জ্বালিয়ে দেয় কারা। দরমার ঘর পুড়ে ছাই। ফুটবল, ক্যারামবোর্ড সব সাফ। আর তেলিয়াই এসে বলে, ওসব আন্দোলন করলে ফিনিশ করে দেব।

অর্থাৎ ওই হরষিতের দল চায় না আমরা কিছু করি। ওদের সব করবা? মগের মুলুক? তেলিয়া জিনস-এর প্যান্টের পকেট থেকে চেম্বার বের করে বলে, এটা দেখছিস! বাঁচতে যদি চাস , মুখ বুজে থাকবি। না হলে কড়াক্ পিং-ব্যাস, খেল খতম।

আমরা চমকে উঠি। ওই শয়তানের দল যে সমাজের এত গভীরে গেড়ে বসেছে তা জানা ছিল না। তবু মনের অতলে একটা যন্ত্রণাই ফুটে ওঠে।

এরপর দেখা যায় ওই তেলকলের ব্যবসা। শোনা যায় ও সবই নাকি হরষিতবাবু আর ব্রিজভুষণেরই। ট্রাক, ঠেলাগাড়িতে সরষের তেলের ড্রাম চালান যায়।

আর ওই সাহুজির দোকান থেকেও মিলের এক নম্বর পবিত্র সরষের তেলও বিক্রি হয়।

সেবার, হঠাৎ সাত নম্বর বস্তি, ওদিকের পাড়ার বেশ কিছু লোক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বমি দাস্ত জ্বর, নানা উপসর্গ। একেবারে

মড়ক লাগার মত অবস্থাই। ক্লাব থেকে আমরাই তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, পাড়ার মানুষরাও এগিয়ে এলেন। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হল।

কারণও ধরা পড়ল, বিষাক্ত সরষের তেল থেকেই এসব হয়েছে। আর ওরা সেই তেল কিনছে ওই সাহুজির দোকান থেকেই।

সারা এলাকার মানুষকে নিয়ে দোকানে গেলাম আমরা। পটলা বলে, প্রতিকার চাই। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। দোকান বন্ধ করে সাহুজি নাকি বর্ধমান চলে গেছে। পুলিশ এসে লাঠি চালায় শান্তিরক্ষার জন্য। আমাদেরও হাতে মাথায় লেগেছে। হরষিতবাবুও এসে বলে, পুলিশ তদন্ত করছে। দোষীর শাস্তি হবেই।

পটলা বলে-কিছুই হবে না।

হোঁৎকা শোনায়-রাস্তার লাখ লাখটাকা চুরি হইল, কী তদন্ত করছেন?

-চোপ! গর্জে ওঠে হরষিতবাবু।

তেলিয়া বলে-দেবো ফিনিশ করে!

সরে আসি। আজ মনে হয় সমাজের সর্বত্র এই অন্যায়, চুরি-অবিচারই চালাবে ওরা গায়ের জোরে, আর তাই মুখ বুজে দেখতে হবে আমাদের।

রাত নেমেছে। এদিকে এখনও গাছগাছালি কিছু আছে। ক্লাবঘরটা নেই, ধ্বংসস্তূপ। আমাদেরও আজ পুলিশ দিয়ে পিটিয়েছে হরষিত। সাহুজির ছেলে ব্রিজমোহনের দল, তেলিয়া তো শেষ করতেই চায় আমাদের। পটলা বলে, তবু থামব না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে।

হঠাৎ একটা পিক্ পিক্ শব্দ শুনে চাইলাম সকলে। ঝোপের বুকে জোনাকি জ্বলছে, হঠাৎ ওই ম্লান আলোগুলো যেন একটি দেহের রূপ নেয়। চোখের সামনে দেখি একটা মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আমরা হতবাক! মূর্তিটা বলে, ভয় পেয়েছ না?

পরনে বিচিত্র আকারের পোশাক। মাথায় একটা টুপির মত, তাতে একটা টিকির মত কী উঠে আছে।

সে-ই বলে, তোমাদের ক'দিন ধরেই দেখছি সকলের ভালো করতে চাও, অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাও। তবে এত সহজে ভেঙে পড়লে তো চলবে না!

আমাদের দিকে নীলাভ চোখ মেলে বন্ধুর মতই চেয়ে থাকে সে। শুধোই, তোমার নাম কী? আমাদের দেখেছ বলছ, এখানে কোথায় থাক? তোমাকে তো দেখিনি কখনও? হাসে সে। বলে, আমি নিজে দেখা না দিলে আমাকে কেউ দেখতে পায় না। তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। সত্যিই ভালো ছেলে তোমরা, তাই নিজে থেকে দেখা দিয়ে পরিচয় করতে এলাম।

বললাম-তুমি কোথায় থাক?

আমার কথায় বলে সে, সর্বত্র। সব জায়গাতেই আমার গতি অবাধ। আমি তোমাদের পাশের গ্রহেরই মানুষ, তোমাদের ভালো লাগল, এসে গেলাম।

হোঁৎকা বলে, আর কী হইব। আমাগোর করনের আর কিছুই নাই। পটলা বলে, ক্লাবঘর তো জ্বালিয়ে দিয়েছে ওই তেলিয়ার দল। ওদের বিরুদ্ধে কথা বলি তাই।

পিক্ পিক্ করে বলে অচেনা বন্ধু-আরও বলবে, ওদের সকলের মুখোশই খুলে দেবে।

আমি জানাই-ওরা শেষ করে দেবে অচিন মানুষ।

সে বলে, ধ্যুস। আমিও এখন থেকে তোমাদের ক্লাবের সভ্য হয়ে গেলাম। কাল সকালে এসো-ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করে যা করার করব। রাজি?

হঠাৎ এমনি একজনকে পেয়ে যাব, ভাবিনি। এটা তেলিয়াদের কোনো প্ল্যান কি না বুঝতেও পারি না। বন্ধুটিকে আর দেখাও যায় না। চারদিক শুনশান, সে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। হোঁৎকা বলে, কেসখানি কী রে?

পটলা আশাবাদী। তাই সে বলে-নিশ্চয়ই কোনো মহান আত্মা। দেখবি এবার, একটা কিছু হবেই।

গোবর্ধন-এর দেহটাই বড়, বুদ্ধি সেই অনুপাতে বেশ কমই। বলে সে, ম্যাজিক ট্যাজিক নয় তো রে!

পরদিন ভোরেই এসেছি সবাই ক্লাবের মাঠে। ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। গাছগাছালি ঘেরা মাঠে পাখিদের কলরব ওঠে। দেখে চমকে উঠি-পোড়া দরমার ঘরখানার চিহ্নমাত্র নেই, রাতারাতি সেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর ক্লাবঘর। আগের থেকেও সুন্দর। ফুটবল, ক্যারাম সবই এসেছে। মায় ফটিকের হারমোনিয়ামটাও এসে গেছে একেবারে নতুন হয়ে।

হোঁৎকা বলে, এ কী রে?

পটলার তোত্‌লামি বেড়ে গেছে। বলে সে, ম-ম্যাজিক নাকি রে?

ফটিক নতুন হারমোনিয়াম পেয়ে খুশিতে ফেটে পড়ে। হারমোনিয়ামে বাজাতে থাকে খুশির সুর।

পিক্ পিক্! সেই বিচিত্র শব্দে চাইল ওরা। হলঘরের কোণে হটাৎ তার ছবিটা ফুটে ওঠে। দেখা যায় সেই মূর্তিটাকে।

কী গো, খুশি?

চমকে উঠি-তুমি!

হাসে সে, তোমাদের দুঃখ দেখে করে দিলাম এসব।

তুমি অনেক কিছুই করতে পারো? আমার কথায় সেই অচিন মানুষ বলে-তা ঠিক পারি না, তবে তোমাদের ইচ্ছা যদি সত্যিই থাকে কিছু করার, সেটা আমি করতে পারি। আসলে মানুষের ইচ্ছা হলেই আর তাতে অনেকের ভালো হলে তবেই সে কাজ করা যায়।

হোঁৎকা কী ভাবছে। পটলা বলে, তাহলে সমাজের বুকে লোভী মানুষদের অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়?

নিশ্চয়ই যায়। তবে আন্তরিকতা চাই-ই। পিক্ পিক্ করে জানায় কথাটা সেই বন্ধু।

হটাৎ কাদের গর্জনে চাইলাম আমরা। তেলিয়া মস্তানের দল ভেবেছিল জায়গাটার দখল তারা পেয়ে যাবে। ব্রিজমোহন সাহু আর হরষিতবাবু এখানে বিল্ডিং কমপ্লেক্স করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করবে আর তেলিয়ার দলও পাবে লাখকয়েক টাকা। কিন্তু মাঠে ঘর উঠতে দেখে তারাও এবার শাবল, গাঁইতি, লোক লশকর নিয়ে এসে হাজির।

তেলিয়া গর্জে ওঠে-ঘর কে বানিয়েছে এখানে? অ্যাই পটলা-

দেখছি ওদের! গর্জে ওঠে তেলিয়া-ভেঙে দে, জ্বালিয়ে দে এসব।

পটলা বলে, না, একদম এগোবে না।

তেলিয়া সপাটে একটা চড় মারে পটলার গালে। ছিটকে পড়ে সে। হোঁৎকাও এবার একটা ঘুষি মারে তেলিয়াকে। শীর্ণ তেলিয়ার জোর নেই, তবু সেই মস্তানের সর্দার। হোঁৎকার ঘুষিতে সে ঘুরে পড়ে, আর তেলিয়ার অন্য একটা চ্যালাকে তখন ধরেছে গোবর্ধন। ছেলেটা কোমর থেকে ছুরি বের করে গোবরার হাতেই মেরেছে। রক্ত ঝরছে-এবার তেলিয়ার দল ঘিরে ফেলে আমাদের। তেলিয়া পকেট থেকে চেম্বার বের করে বলে-এতে পাঁচটা গুলি আছে, তোদের পাঁচটাকে খতম করে আগুন জ্বালিয়ে ক্লাবঘরের সঙ্গে তোদের পুড়িয়ে ছাই করে দেব। ব্রিজমোহনবাবু, হরষিতদার দলের সঙ্গে টক্কর দিবি পিঁপড়ের দল?

আমরা সামনে ওই মৃত্যুদূতকে দেখছি। এবার গুলিই চালাবে হয়তো ওই শয়তানরা। হঠাৎ দেখি তেলিয়ার পিছনে সেই অদৃশ্য বন্ধুকে। সে এসে একটা লাথি কষে তেলিয়ার পিছনে। আর ছোট ওই অদৃশ্য মানুষের লাথির যে এত জোর, তা জানা ছিল না। তেলিয়া কর্নার কিক্ করা বলের মত কাত মেরে শূন্যে উঠে গিয়ে ওপাশের দেওয়ালে প্রচণ্ড বেগে মাথা ঠুকে চিৎপাত হয়ে কাটা কলাগাছের মত ছিটকে পড়ে, হাত থেকে ছিটকে পড়ে রিভলবারটি। হোঁৎকা সেটি তুলে নিয়েছে। তেলিয়ার দলের মধ্যে মন্টার চেহারাটা বুনো মোষের মত, তেমনি শক্তিশালী সে। তার নেতার ওই অবস্থা দেখে পটলার টুঁটিই ধরতে আসে, শেষ করবে পটলাকেই। কিন্তু নিমেষের মধ্যে আমাদের অদৃশ্য বন্ধু এবার মন্টার গালে লাফ দিয়ে উঠে একটা চড় কষাতে ওই মোষের মত দেহটা ক্লাবঘরের মাঝে বোঁ বোঁ করে দুটো পাক দিয়ে বসে পড়ে, আর ফুঁ দিতে একটা দাঁতই ছিটকে পড়ে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে মন্টা।

আমরা অবাক! তেলিয়া ততক্ষণে ঝেড়েঝুড়ে উঠেছে, তার ইজ্জতের সওয়াল-এবার তেড়ে আসছে, হঠাৎ অদৃশ্য বন্ধু রিভলভারটা তুলে নেয়, আর তেলিয়া শূন্যপথে ওই ভাসমান রিভলভারটাই দেখে তার দিকে তাক করা। মানুষজন নেই। রিভলভারটা সজীব হয়ে উঠেছে।

আঁতকে ওঠে সে। আর তারপরেই সিধে দৌড় দেয়। মন্টার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে গেছে। দলের বাকিরাও তাদের দলপতিকে ওইভাবে ল্যাজ তুলে দৌড়তে দেখে তারাও দৌড়লো। পিছু পিছু অন্যরা।

আমরা তো হাসছি।

এবার অদৃশ্য বন্ধু বলে ওঠে-কী, নমুনা দেখলে তো? অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস হবে এবার?

আমরাও বুঝেছি আমাদের অদৃশ্য বন্ধুর শক্তির পরিমাণ। আজ তেলিয়াদের ওই দুর্দশা দেখে আমরা বলি-এইবার হবে বন্ধু!

-তাহলে কাজে নেমে পড়ো। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।

ওদিকে ব্রিজমোহন তখন তেলিয়াদের ওই দুর্দশা দেখে গর্জাচ্ছে-এই তোদের মুরোদ। ক'টা ছেলেকে সাপ্‌টে নিতে পরলি না?

তেলিয়া বলে-সাংঘাতিক কাণ্ড।

মণ্টার দাঁত ভেঙে মুখটা ছোট হাঁড়ির মত ফুলে উঠেছে। ব্রিজমোহনের ঘরে বসে আছে হরষিতবাবু আর থানার দারোগা ভুজঙ্গবাবু। ইয়া বিড়ালের ল্যাজের মত একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ।

ব্রিজমোহন বলে-হরষিতদা, কুছু করেন। ওদিকে পিতাজি তো বাড়ি থেকে নিকালতে পারছে না। বলছে বৃন্দাবন গেছে। পাবলিক লোক মিলের দু'নম্বরী পোড়া মোবিল মেশানো তেল খেয়েছে-

ভুজঙ্গ দারোগা বলে-ওসব রিপোর্ট হামি সামলে লিবে। হাসপাতালের ডাক্তারদের সাথে বন্দোবস্ত করিয়ে লিন। উরা রিপোর্ট বদলে দেবে।

ব্রিজমোহন এবার সিন্দুক খুলে কয়েক তাড়া নোট বের করে দেয় হরষিতবাবুকে। এক বাণ্ডিল নোট দেয় দারোগাবাবুকেও। বলে, যা করার করেন আপনারা। পিতাজিকে অ্যারেস্ট করবেন না।

দারোগা বলে-আরও কিছু চাই। তাহলেই সব ব্যবস্থা পাক্কা হয়ে যাবে। কোনো ভয় নেই।

হরষিতবাবুও টাকাটা ব্যাগে পুরে বলে, তাই করো ব্রিজমোহন। সব কাজ ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

সারা এলাকার মানুষ মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। সরষের তেলের দাম এক লাফে পঞ্চাশ টাকা থেকে আশি টাকায় উঠল কেন? ভেজাল তেল বিক্রি করে এত মানুষকে মেরেছে, পঙ্গু করেছে সাহুজি। তার বিচার চাই। আমরা এই মিছিল করছি, প্রতিবাদ মিছিল। দেখি নেতা হরষিতবাবুও এসেছে দলবল নিয়ে। তিনিও বলেন, দারুণ কাজ করেছ। এত বড় নিষ্ঠুর কাজের বিচার চাই। দোষীকে শাস্তি দিতেই হবে।

হরষিতবাবুও দারুণ ওজস্বিনী ভাষায় লেকচার দেয়, নিদারুণ অমানবিক কাজ এই তেলে ভেজাল দেওয়া, খাদ্যে ভেজাল-এর তদন্ত করতেই হবে। তোমরা এসো আমার ওখানে, এ নিয়ে কথা হবে।

ওদিকে হরষিতবাবুই এবার হাসপাতালের কোনো কর্তাকে তুষ্ট করে আগেকার রিপোর্টও বদলে ফেলেছে। ওই লোকগুলো

ভেজাল তেল খেয়ে অসুস্থ হয়নি। অপুষ্টির জন্যই এটা হয়েছে।

আর করপোরেশনের টেস্ট যেখানে হয়, এত মধ্যে সেখানে সাহুজির দোকানের তেলের আসল নমুনার শিশি বদলে ভালো তেলের নমুনাই দেওয়া হয়েছে। সেই ভেজাল তেলের সিল করা শিশি হরষিতবাবু এনে নিজের ঘরেই লুকিয়ে রেখেছে।

হরষিতবাবুর দু'দিকে দুই মূর্তি। আমাদের সামনে জনদরদি সমাজসেবী, আর সাহুজির ছেলে ব্রিজমোহনের কাছে অন্য মানুষ। ভেজাল তেল-এর ব্যাপারে সেদিন আমরা গেছি হরষিতবাবুর কাছে।

ব্রিজমোহনও রয়েছে। পটলা বলে,-সাহুজিকে অ্যারেস্ট করার কী হল? এত বড় অন্যায় করে লোকটা পার পেয়ে যাবে?

হরষিত জানে আমরাই এই ব্যাপার নিয়ে জোর আন্দোলন শুরু করেছি। খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক নরেনবাবু থাকেন আমাদের পাড়াতেই, তাঁকে বলে সব কাগজে খবরটা ছাপানো হয়েছে। দু-একজন রিপোর্টারও এর মধ্যে খবর সংগ্রহ করেছে যে, সাহুজি-বৃন্দাবন যায়নি। তার খালধারের নতুন বিশাল বাড়িতেই রয়েছে।

পুলিশের দারোগাও নাকি সেটা জানে। তাই আমরা তাকে অ্যারেস্ট করবার জন্যই বলি হরষিতবাবুকে। হরষিতবাবু বলে, সে তো এখানে নেই।

পটলা বলে, ওই নতুন বাড়িতেই আছে। পুলিশের দারোগাও জানে, তবু ধরছে না।

হরষিতবাবু বলেন, শোনো পটল, তোমাদের ক্লাব ওখানেই থাকবে, তোমরা এ নিয়ে আর গোলমাল করো না।

পটলা বলে, কী বলছেন স্যার! এত বড় ক্রিমিনাল-সমাজবিরোধী সে।

ব্রিজমোহন গর্জে ওঠে-চোপ! হরষিতদা যা বলছেন তাই করো। না হলে-

না হলে? আমিই শুধোই।

এবার তেলিয়া মস্তানদের দেখা যায়। ওরা সেদিনের অপমানকে ভোলেনি। ব্রিজমোহন বলে ওদের-

ওদের সবকটাকে আটকে রাখ। রাতের অন্ধকারে মুখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নে গিয়ে, খতম করে মাঝ গাং-এ ফেলে দিবি। খুব বেড়েছে।

ওরাও তৈরি ছিল।

আমারাও প্রমাদ গনি। অবশ্য ফটিক এর মধ্যে বাথরুমে গিয়েছিল। সেখানে র্যাকের ওপর রাখা সেই করপোরেশনের ধরা ভেজাল শিশিটা দেখে সে জামার তলে নিয়ে এসেছে।

ফটিক ভয় পায়! ওটা ধরতে পারলে ব্রিজমোহন তাদের শেষ করে দেবে।

আমরাও অবাক হই। হরষিতবাবু যে কতবড় শয়তান, সেটাও বুঝেছি এবার। কিন্তু এবার ওর জলেই পা দিয়েছি আমরা।

ওরা ধরবে এইবার। আমি বলি-

হরষিতবাবু, এবারের মত ছেড়ে দেন।

হরষিত বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তাই তোমাদের ছেড়ে দেওয়ার উপায় আর নেই। নিয়ে যা ওদের।

আমাদের করার কিছুই নেই, আমরা পাঁচ জন। ওদিকে ব্রিজমোহনের টেবিলে ডাক্তারের নতুন রিপোর্ট যেটা আদালতে হাজির করতে পারলে সাহুজি এতগুলো মানুষকে মারার পরও বিনা দোষে বেঁচে যাবে।

কিন্তু ওসব প্রমাণ হাতে পাওয়ার উপায় নেই। এবার ওদের সব জেনে ফেলেছি বলেই ওরা আমাদেরও শেষ করে দেবে। দাঁতভাঙা মন্টা এবার ধরে ফেলেছে আমাদের দলের সর্দার হোঁৎকাকে। গোবর্ধনকে ধরেছে দু'জন, সে তবু ছাড়াবার চেষ্টা করছে। হরষিতবাবুই রিভলভারের বাঁট দিয়ে গোবর্ধনের কপালে মারতে রক্ত পড়তে থাকে।

আমি ফটকে পটলাও এবার প্রমাদ গনি, বাঁচাবার কেউ নেই। হঠাৎ দেখি মন্টার মোষের মত দেহটাকে আমাদের সেই অদৃশ্য বন্ধু এসে একটা লাথিতে ভলিবলের মত শূন্যে তুলে টেবিলের ওদিকে আস্ফালনরত হরষিতবাবুর ঘাড়েই ছিটকে ফেলেছে, আর ওই বিশাল দেহের ওজনে ছিটকে পড়ে হরষিতবাবু মন্টার দেহের নীচে। আর্তনাদ করে, পরক্ষণেই তেলিয়ার দুটি হাত ধরে শুন্যে তুলে ওকে নিক্ষেপ করেছে ব্রিজমোহনের ঘাড়ে। দু'জনে মেঝেতে ছিটকে পড়ে। তেলিয়ার আর একটা চ্যালা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরেই পটলার দিকে ছেড়ে আসে হাতের ন্যাপলাটা বের করে। অদৃশ্য বন্ধু সেটাকে তুলে সোজা দরজা পার করে বাগানের জলের চৌবাচ্চায় ছুঁড়ে ফেলে।

হরষিত, মন্টা কিন্তু এর মধ্যে ঠেলে উঠে হোঁৎকার দিকে রিভলভার তাক করেছে, কিন্তু একটা অদৃশ্য লাথিতে হরষিতবাবু ছিটকে পড়ে, রিভলভার গেল কোনদিকে, হরষিতের বাঁ হাতটাই নড়বড় করছে।

এবার ব্রিজমোহন ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। দেখে তারা, টেবিলে রাখা সেই মূল্যবান মিথ্যা রিপোর্টখানা যেন হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ওরা এখন ওটার জন্যই ছুটছে ওই উড়ন্ত কাগজের পিছনে। হাওয়া নেই-তবু এদিক-ওদিকে উপরে-নীচে উঠছে-নামছে রিপোর্টটা। ব্রিজমোহন চিৎকার করে দৌড়য় তার দলবল নিয়ে, 'পাকড়ো পাকড়ো।' কিন্তু সেটা ঘর থেকে বারান্দা, সেখান থেকে বাগানে যায়। ওরাও ছুটছে ওর পিছনে। তারপর দূরে বিলীন হয়ে যায়।

ওরা হতাশ হয়ে বসে পড়ে। হরষিতবাবু নড়বড়ে হাত নিয়েই দৌড়য়-'ধর'।

এই অবস্থায় আমরাও কেটে পড়ি। ওদের নজর তখন ওই নৃত্যরত কাগজের দিকে।

পটলাদের বাড়িতে এবার এসে হাজির হয়েছি আমরা। পটলাও এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক নরেশবাবুকেও খবর দিয়েছে। পটলার কাকার বন্ধু নরেনবাবু, তিনিও এসেছেন। তিনি এলাকার মানুষ, জানেন ওই ভেজাল তেলের ব্যাপারটা, তাই কাগজের বিশদভাবেই রিপোর্ট করেছেন, আর তাই উপর মহলে এ নিয়ে জল ঘোলা হয়েছে। আজ নরেনবাবু আনা সেই ভেজাল তেলের সরানো নমুনা আর অদৃশ্য বন্ধুর আনা সেই মিথ্যা রিপোর্টটা দেখে চমকে ওঠেন।

এত বড় জাল জোচ্চুরি ঘটতে চলেছে? সর্বনাশ!

এসব আলমারিতে রেখে দাও, আর সাহুজি এখানেই আছেন?

হ্যাঁ।

নরেনবাবু বলেন-আজই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করছি। ওই দারোগাও ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ বিভাগের কলঙ্ক ওরা, ওদের মুখোশ খুলে দিতেই হবে। সাবধানে থাকবে।

এবার চাকা গড়িয়েছে ওই অদৃশ্য বন্ধুর জন্যই। সেও এসে জুটেছে। পটলা বলে, অন্যায়ের প্রতিকার হবেই।

কিন্তু এমনি হবে, তা ভাবিনি।

হরষিতবাবু, ব্রিজমোহনের দলের হাত অনেক লম্বা। পুলিশ ওদের হাতে। তাই এবার ওদের রিপোর্টটা উড়ে গায়েব হয়ে যেতে ওরা ভেবেছে এসব আমাদেরই কাজ। তাই নিজেরা বাঁচার জন্য এবার থানায় আমাদের নামেই কড়া করে ডায়েরি করিয়েছে। আমরা

ওদের বাড়ি গিয়ে ওদের উপর চড়াও হয়ে মারপিট করে ওদের মালপত্র লুট করে এনেছি। ভুজঙ্গ দারোগাবাবু এবার সেই ডায়েরি পেয়ে দলবল নিয়ে এসেছে।

নরেনবাবু অবাক হন-সে কী! এই ছেলেরা যাবে ব্রিজমোহনবাবুর বাড়িতে ডাকাতি করতে?'

পটলার বাবা-কাকারা এখন নেই। তাঁরা ব্যবসার কাজে বাইরে।

দারোগা বলে-ডাকাতিই নয়, জখমও করেছে। চলো থানায়। এখন থেকেই এতবড় সাহস তোমাদের? চলো।

নরেনবাবুর কোনো কথাই শোনে না ভুজঙ্গ। আমাদের ক'জনকে হাতে পেয়ে নিয়ে গিয়ে থানায় আটকে রেখেছে।

হোঁৎকা বলে-দ্যাখ পটলা, পরোপকার করার ঠ্যালা এখন বোঝ!

ফটিক বলে-শেষে জেলে যেতে না হয়!

গোবরার কুমড়ো মামা, পটলার কাকা সকলেই এসেছে। দারোগা বলে, ছাড়ব না।

হঠাৎ দেখা যায় আমাদের সেই অদৃশ্য বন্ধুকে। হাসছে সে পিক্ পিক্ করে। পটলা বলে-হাসছ তুমি?

বন্ধু বলে-ভয় নেই। একটু সবুর করো।

ওদিকে খেতেও দেয়নি কিছু। হোঁৎকার খিদে পেলে মাথাখারাপ হয়ে যায় বন্ধু বলে, তোমারা ওইদিকে বসো। ওদিকে কেউ নেই, দেখি খাবার কী পাই?

তারপরেই আর দেখা যায় না তাকে। ওদিকে ব্রিজমোহন, হরষিতবাবু এসে এবার শাসায়-

ছাড়বেন না ওদের। মার্ডার করত আমাদের।

ওদের তড়পানি চলছে। দেখি অদৃশ্য বন্ধু এর মধ্যে আমাদের জন্য খাবারও এনেছে। গরম পুরি-তরকারি-সন্দেশ। বলে, চট্ করে খেয়ে নাও।

হঠাৎ ওর সেই মাথার খাড়া করা ছোট এরিয়ালে আলো জ্বলে ওঠে। বলে, আসছি।

তার কিছুক্ষণ পরই দেখি বিরাট কাণ্ড ঘটে যায় থানায়। নরেনবাবুর সঙ্গে খোদ পুলিশ কমিশনার সাহেবই এসে হাজির। সঙ্গে হাতকড়া বাঁধা সাহুজি। যাকে পুলিশ এতদিন ধরে খুঁজেই পায়নি।

সাহুজি এতদিন ওই বড় বাড়িটাতে নিরাপদেই ছিল। ভুজঙ্গের পুলিশ তাকে বিরক্ত করেনি। তারা রিপোর্ট দিয়েছে, সাহুজি এখানে নেই।

কিন্তু আমাদের হামলার পর ব্রিজমোহন, হরষিত দু'জনেই সাবধান হতে চেয়েছিল। ওরাও টের পেয়েছে আমরা সাহুজির খবর জানি। আর সেটা কাগজে তো বের হয়ে যাবে। তখন সাহুজিকে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হবে। তাই ওরাই এবার সাহুজিকে গাড়িতে করে পাচার করেছিল। দিল্লির ফ্লাইটের টিকিট ও কাটা ওর নামে। একবার বের করে নিয়ে যেতে পারলেই ব্যস!

নিয়ে যেতেও পারত,কিন্তু তার আগেই নরেনবাবু গিয়ে খোদ পুলিশ কমিশনারকেই সব কথা বলেন, আর নির্দোষ ছেলেরা যারা সমাজের এই ক্রিমিন্যালদের কাজে বাধা দিতে চায়, পুলিশ ওই দোষীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদেরই গুণ্ডা মস্তান বদনাম দিয়ে জেলে পাঠাতে চায়।

তাই সাহুজিকে অ্যারেস্ট করতেই হবে। তেলিয়াই গাড়িতে তুলে মালিককে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ দেখে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই। অবশ্য অদৃশ্য বন্ধুটিই সেখানে হাজির হয়ে চাকার হাওয়া খুলে দেয়।

তেলিয়া ড্রাইভারকেই মারতে যায়। কী করিস! জলদি চাকা লাগা। প্লেনের দেরি হয়ে যাবে।

ড্রাইভার চাকা লাগাচ্ছে। গাড়িতে কাচ তুলে বসে আছে সাহুজি। দেরি হলে বিপদ হতে পারে। চাকা লাগিয়েছে-এদিকে অদৃশ্য বন্ধু ব্যাটারির কানেকশানই খুলে রেখে দেয়। আবার ঝামেলা-তেলিয়া গর্জাচ্ছে। সেটা ঠিক করে গাড়ি স্টার্ট দেবে আবার একটা চাকার হাওয়া সশব্দে বের করছে। তেলিয়াও ভীত সন্ত্রস্ত।

এমন সময়েই এসে হাজির হয় পুলিশ ভ্যান। তেলিয়া জানে তাদের হাতের পুলিশ। কিন্তু চমক ভাঙে, এরা ভুজঙ্গের পুলিশ নয়। ওদের ঘিরে ফেলে, আর পালাবার পথ নেই।

সাহুজিকে ধরে ফেলে ওরা। তেলিয়াকেও। তেলিয়াও বুঝেছে, এবার কড়া পাল্লায় পড়েছে তারা।

পুলিশ কমিশনারও বুঝেছেন; ভুজঙ্গবাবু এতদিন এতবড় একটা অপরাধীকে জেনেশুনেই ছেড়ে রেখেছিল আর মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিল হেডকোয়ার্টারে। ওই ছেলেগুলোই জেনেছিল ওদের অন্যায়ের খবরগুলো। একটা দুষ্টু চক্রের অংশীদার।

তাই নিজেই এসেছেন থানায়। ভুজঙ্গ, ব্রিজমোহন হরষিতবাবু এবার সাহুজিকে দেখে চমকে ওঠে। কমিশনার সাহেব শুধোন, সেই ছেলেরা কোথায়?

-লক-আপে।

গর্জে ওঠেন কমিশনার-আসলে দোষীকে লক আপে না পুরে, ছেলেরা যারা আপনাদের শয়তানির প্রতিবাদ করতে চায়, তাদেরই ধরেছেন? ছেড়ে দিন ওদের।

এর মধ্যে ছাড়া পেয়ে ফটিকই বলে, ওদের নমুনা পালটানো আর মিথ্যা রিপোর্টের কথাও। সেগুলোও এনে দেয় পটলা। আর সাহুজির গুদামেও পাওয়া যায় প্রচুর ভেজাল তেল।

ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই ভুজঙ্গবাবুকে ধরে ব্রিজমোহনকে তার বাবার সঙ্গে হাজতে পোরা হল। আসামি করা হল হরষিতবাবুকেও।

সারা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। এতদিনের জমা রাগটা আজ মিছিলে ফেটে পড়ে। মিছিলের পুরোভাগে রয়েছি আমরা। গলায় মালা-যেন বীরের ভূমিকাতে নেমেছি। সঙ্গে চলেছে আর একজনও, আমাদের সেই অদৃশ্য বন্ধুও। পিক্ পিক্ করে বলে-

-কি গো কেমন লাগছে?

-ভালোই। পটলাও আজ খুশি।

বন্ধু বলে, অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিকার করো। দেখবে সত্যিই ভালো লাগবে।

শ্রী কামড় বাবা

আমাদের হোঁৎকা ওরফে মিহির কুমার সরখেল এবারও পরীক্ষায় লাট খেয়েছে। অবশ্য আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের শ্রীমান হোঁৎকা দু একটা সাবজেক্টে বিশেষ করে অঙ্কে একটু কাঁচা আর ইংরেজিতে একটু নড়বড়ে। তবে অন্য বার নাম্বার কিছু কম থাকলেও টেনেটুনে উৎরে যায়। কারণ স্কুলে টিমের সে-ই ক্যাপ্টেন। খেলাধুলায় সুনামের মূলেও হোঁৎকা। তাই স্যাররাও ওকে একটু নেক নজরেই দেখেন।

কিন্তু এবার হোঁৎকা একেবারে ভোঁ কাট্টা ঘুড়ির মতো জব্বর ভাবে ফেল করেছে তিনটে সাবজেক্টে। অঙ্ক, ইংরেজি আবার বিজ্ঞান। হেড স্যার বলেছেন-"এবার নো চান্স মিহির কুমার।"

হোঁৎকা মাঠের ক্লাবে একাই বসে আছে। তার রাগটা এবার ফেল করার জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশি ওই নবীন পাল লেনের হাঁকডাকওয়ালা শ্রী কামড় বাবার উপর। ব্যাপারটা আমারাও জানতাম না। তবে কামড় বাবার নাম আমরা কেন এই চত্বরের সবাই জানে। প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবার নাকি তাঁর উপর বাবা মহাদেব ভর করেন। বেশ ক'বছর হল ওখানে কামড় বাবার আবির্ভাব হয়েছে।

ওদিকে এখনও শহরের ছোঁয়া তেমন লাগেনি। এখনও ওই অঞ্চলে বাঁশবন, কিছু গাছপালা আর পুরানো বাসিন্দাদের টালির ঘরও রয়েছে। একটা বটগাছের নীচে বেশ খানিকটা জায়গাতে কামড় বাবার আশ্রম, মন্দির। এখন সেই মন্দিরের বেশ রমরমা। শ্রী কামড় বাবা বলেন-বাবা মহাদেব শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। তিনি পাকা মন্দির চান না।

তাই তাঁর মন্দির এখনও মাটির চালাই রয়েছে। ওদিকে গড়ে উঠেছে কামড় বাবার পাকা দালান ঘর। ভক্তদের অনেকেই টাকা পয়সা দিয়ে বাবার জন্য ঘর, আসবাবপত্র, কার্পেট, চেয়ার সব এনে দিয়েছে। শনি, মঙ্গলবার বাবার নাকি ভোর হয় আর কৈলাস থেকে বাবা মহাদেব এসে কামড় বাবার ঘাড়ে চাপেন। আর সিল্কের গেরুয়া পাঞ্জাবী পরা কামড় বাবা তখন মহাদেব হয়ে সবার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেন। বহু দুরারোগ্য যা যা বলেন তা নাকি বর্ণে বর্ণে ফলে যায়। ওঁর বাতলানো ওষুধ খেয়ে নাকি মৃত্যুপ্রায় রোগী, ডাক্তার যাদের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তারা নাকি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অবশ্য ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য আগে থেকে ভক্তদের গিয়ে ভালো টাকা দিয়ে নাম লেখাতে হয়। বাবা ভরের সময় নামের তালিকা ধরে তাকে দক্ষিণার পরিমাণ দেখে নির্দেশ দেন জনে জনে। আর যদি বাবা পাতাল ভৈরবের মুখের কথা শুনতে হয় তাহলে আরও বেশি প্রণামী দিলে বাবার নির্দেশ আসে তাঁর ঘর থেকে। কামড় বাবা ঘটে ফুল চাপিয়ে বাবার পূজা করেন প্রার্থীর নামে। ভক্তরাও একদৃষ্টে ঘটের দিকে তাকিয়ে থাকে। কামড় বাবাও হুঙ্কার দেন-জয় বাবা পাতাল ভৈরব, দয়া করো বাবা। জয় বাবা-

পাতাল ভৈরবের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। আর কামর বাবার হুঙ্কারে যেন স্বয়ং মহাদেব ঘট থেকে আশ্চর্যজনকবাভে ফুল ফেলে দেয়। ভক্তের প্রার্থনা নাকি নির্ঘাৎ পুরণ হবে, হয়ও। বাবা পাতাল ভৈরবের জয়ধ্বনি ওঠে।জয়ধ্বনি ওঠে-জয় শ্রী কামড় বাবা-

আর বাবা যদি একবার কাউকে কামড়ান তাহলে তার সব বিপদই নাকি কেটে যায়। তার থেকেই ওর নাম হয়েছে শ্রী কামড় বাবা। তবে সেটা নাকি খুব কঠিন সাধনার কাজ। ব্যয়সাধ্যও-। তাই কামড়টা কমই হয়। তবে নামটা বহাল রয়ে গেছে।

হোঁৎকা এমনিতে বিশেষ দেবদেবী মানে না। তবে দেখেছে এত লোক আসে। শতশত ভক্ত। বাবার দয়ায় তাদের অনেক কাজই হয়েছে। সব বিপদই কেটেছে। তাই হোঁৎকার হঠাৎ মনে হয় পরীক্ষার ব্যাপারে যদি বাবার শরণ নিতে পারে, হয়তো কামড় বাবার দয়ায় আর পাতাল ফোঁড় শিবের দয়ায় নির্ঘাৎ পাশ হয়ে যাবে। অবশ্য হোঁৎকা আমাদের এসব কথা জানায়নি।

আমাদের পাড়ার নেত্যদা কামড় বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত। বাবার দয়াতেই নাকি তার চিটে গুড়ের ব্যাবাসা রমরম করে চলছে। হোঁৎকা সেই নেত্যদার সাথে বাবার কাছে আছে। বাবার চ্যালা হোঁৎকাকে বলে,

-বাবার প্রনামী একশো এক টাকা। তবে বাবার দয়া হলে তোমার সব বিপদ কেটে যাবে। বাবা তো দেবদেবীর সাথে কথা বলেন, মা সরস্বতীর সাথে কথা বলে তুমি যাতে পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করো সে ব্যসস্থা করে দেবনে। চাই কি ফার্স্টও করে দিতে পারেন

কামড় বাবা। হোঁৎকা বিপদে পড়ে। বলে,

-একশো এক টাকা! কিছু কম হইব না?

ভক্ত তার খেরো খাতা দেখিয়ে বলে-দ্যাখো বাবার রেট, পাঁচশো এক টাকা। তোমাকে কোনসেশন করছি নিত্যদার জন্য। ভেবো না, বাবার দয়ায় লোকে ভরা নদী পার হয়ে যায়, আর পরীক্ষা তো তুচ্ছ! হোঁৎকা এতদিন ধরে কিছু সঞ্চয় করেছিল টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে। বাজার থেকে ম্যানেজ করে। সব নিঃশেষ করে বাবার চরনে দিয়ে এল। ভক্ত বলে,

-বাবা তোমার হয়ে বাবা পাতাল ভৈরবকে ফুল চড়াবেন। যদি ফুল পড়ে জানবে কেল্লা ফতে। ফার্স্ট-সেকেন্ডই হয়ে যাবে।

হোঁৎকা স্বপ্ন দেখে যে পটলা তাকে টপকে ফার্স্ট হয়েছে। তাই পরদিনই কিছু না খেয়ে শীতের সকালে স্নান সেরে বের হয়। মা জিজ্ঞাসা করে,

-ব্যাপার কি রে? এত ভোরে চান্ করস্ ক্যান্?

হোঁৎকা বলে-কাম আছে গিয়া। পরে কমু।

হোঁৎকার সকাল বেলাতেই খাওয়া অভ্যেস। আজ উপোস দিয়েই বাবার আশ্রমে এসেছে। রয়েছে ভক্তের ভিড়। তার মাঝে তার নাম করেও ডাক আসে। বাবার ডাক। কামড় বাবা তখন ভরে শিরনগ্র হয়ে পাতাল ফোঁড় শিবের ঘটের সামনে উপবিষ্ট। বাবা পাতাল ভৈরব নাকি স্বয়ং মাটির টোল থেকে এখানে উঠেছেন নিজেই। কামড় বাবার আহ্বানে তিনি ধরাধামে এসেছেন। ঘটের উপর ফুল চাপানো। হোঁৎকার ভাগ্য তাতে নির্ধারিত হতে চলেছে। ফুল যদি পড়ে যায়, দয়া হয়েছে জানতে হবে। না পড়লেই সর্বনাশ। হোঁৎকাও কামড় বাবার মত হাঁক পাড়ে,

"জয় বাবা পাতাল ভৈরব,জয় শ্রী কামড় বাবা।

ভক্তদের ডাকে দেখা যায় ঘটে আম্রপল্লব নড়ে ওঠে আর ফুল পড়ে যায় বাবার শ্রীচরণে। হোঁৎকাও নিশ্চিন্ত হয়। কামড় বাবা বলেন,-যা তোর প্রার্থনা বাবা শুনেছেন রে! আর ভয় নেই। বাবার চরণামৃত নিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি যা। আর সেই ফুল মাদুলি করে লাল সুতোয় বেঁধে ডান হাতে ধারণ করবি। জয় বাবা পাতাল ভৈরব।

তারপর বাড়ি ফিরে রোজ মাদুলি ধোয়া জল খেয়েছে। পরীক্ষার দিন একশো আটবার কামড় বাবার নাম করেছে। তারপরও

তিনটে সাবজেক্টে ফেল। পাসের নামগন্ধ নেই। টাকা জলে গেল। আর ভক্তিও যেন তার উবে গেছে।

সেই খবরটা আমরাও জেনে গেছি। হোঁৎকা গর্জে ওঠে-সব ফক্কিবাজী! ব্যাটা নাম্বার ওয়ান ভণ্ড। লোককে ঠকাইত্যাছে-আমারেও ঠকাইছে-

পটলা বলে-জ্ঞান হয়েছে তাহলে? পড়বি না-আর কামড় বাবা কেন স্বয়ং মহাদেবও তোকে পাস করাতে পারবে না।

গোবরা বলে-তুই গেলি ওই ঠকবাজদের কাছে! গেল তো টাকাটা? হোঁৎকা বলে,

-ওই কামড় বাবার সব জারিজুরি খতমই করুম। ওর ধর্মের নামে লোক ঠকানো বন্ধই করুম। আমার মত আর কেউ যেন না ঠকে।

কথাটা অবশ্য এখানের অনেকেই বলে। তবে বাবার চ্যালাদের দাপট ও কম নয়। আমাদেরও জেদ চাপে। বেশ কিছু মানুষও চান বাবার এসব খেলা বন্ধ হোক। কিন্তু তারা তাদের ভয়ে জোর গলায় কথা বলতে পারে না। থানা পুলিশও কোনো অভিযোগ পায়নি। তাই সব দেখেও তারা না দেখার ভান করে।

সেদিন আশ্রমে কিসের উৎসব। বহু লোকসমাগম হয়েছে। কামড় বাবা বেশ সেজেগুজে পূজায় বসেছেন। শিবলিঙ্গ বলতে পাথরের একটা চাঁই। কালো সিঁদুর মাখা। তার সামনে একটা ঘটি। উপরে আম্রপল্লব,তার উপর ফুলের স্তূপ। সেই ঘট থেকে ফুল ফেলার জন্য বাবা তারস্বরে চিৎকার করছে।

-জয় বাবা পাতাল ভৈরব।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে সেই মটির কলসিতে এসে লাগে গুলতি দিয়ে ছোড়া কাচের গুলি। আর তার আঘাতে মাটির ঘটি দু' আধখানা হয়ে যায় আর জল সব বেরিয়ে যায়। দেখা যায় তার ভিতর থেকে বের হচ্ছে দু'তিনতে কাঁকড়া। ওই কাঁকড়াগুলোই ঘটির মধ্যে নড়াচড়া করলে আম্রপল্লবের ডগায় নড়া লাগে আর ফুল পড়ে যায়।

ঘটনাটা দেখে সকলেই হতবাক। এইভাবে পুরো ব্যাপারটা যে সাজানো, কামড় বাবার ভণ্ডামি তা ধরা পড়ে গেছে। বাবা গর্জে ওঠে-এসব কি?

হোঁৎকাই আজ গুলতি মেরে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে। কামড় বাবাও এবার মরিয়া হয়ে ওঠে। ত্রিশূল নিয়ে সে লাফ দিয়ে ওঠে। হোঁৎকাকে সে নিধন করবেই। অবশ্য পুলিশে বলা ছিল আগে থেকেই। পুলিশ তাই ছদ্মবেশে ছিল ওই উৎসবে। তারাও কামড় বাবাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। বন্দি কামড় বাবা শুধু গর্জনই করে। বাবার সব জারিজুরি আজ হোঁৎকাই ধরে ফেলেছে।

কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

শত্রু যে কত রকমের হয় তার সম্বন্ধে কোনো বই-এ বিশদ ভাবে লেখা না থাকলেও তারা যে নানা প্রকারের, নানা রূপের হয় এটা এবার আমরা,অর্থাৎ পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

আর ওই শত্রুদের কাজকর্মের নমুনা যত টের পাচ্ছি, মনে মনে ততই শিউরে উঠছি। এক এক সময়ে ক্লাবের ময়দানে সন্ধ্যার পর ঘাসের উপর বসে ঘোষণা করি,-পটলা,ক্লাব তুলে দে। এত শত্রু! উঃ!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,-ওগোর সব প্ল্যান,শত্রুতা বানচাল কইরা দিমু। চুপ মাইরা দ্যাখ।

ফটিক বলে,-আর কত দেখবো র‍্যা? ওই কুলেপাড়ার ইলেভেন বুলেটস্ আমাদের গুলি করে ফুটিয়ে দেবে! সেদিন দেখলি আমাদের ক্লাবের জমাটি বসন্তোৎসবটাকে ক্যামন করে ফাঁসিয়ে দিল! বাজারের দু'তিনটে ধর্মের ষাঁড়কে খাবারের লোভ দেখিয়ে এনে কিভাবে ক্লাবের মাঠে ঢুকিয়ে দিল!

সে এক কাণ্ড। ফটিক তখন সবে তার কালোয়াতি গানের মুখটা ধরেছে,চোখ বুঁজে শূন্যে হাত তুলে। ঠিক তখনই, একটা ষাঁড় উত্তেজিত হয়ে প্যান্ডেলে ঢুকে শিং দিয়ে,খান তিনেক চেয়ার এদিক ওদিক ছুঁড়তেই,দর্শকরা উঠে পড়ে প্রাণভয়ে কে যে কোন্‌দিকে যাবে ঠিক করতে পারে না। ফটিকের তবলচিও কাট মেরেছে। তানপুরাওয়ালাও গদা ঘাড়ে করে সটকেছে। ফটিক চোখ খুলতেই দেখে সামনে ওই বিশাল বপু ষণ্ড মহারাজকে। অজান্তেই তখন গান ছেড়ে একেবারে তারস্বরে চেল্লাতে শুরু করে,-বাঁচাও-ও-!

আমরা অবশ্য তখন লাঠি বাঁশ হাতে ষণ্ড মহারাজদের যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করছি। পটলা দৌড়েছে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে।

কোনমতে ফটিককে তুলে আনি দুই ষণ্ডের মাঝখান থেকে।

পরে জানা গিয়েছিল,এ ওই ইলেভেন বুলেটস্-এর নেতা গুপিনাথ বাঘ-এর কীর্তি। ওরা আমাদের ক্লাবের পিছনে আদানুন খেয়ে লেগেছে।

অবশ্য তার কারণ আছে। আমরা,পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাব এলাকার মানুষের কাছ থেকে কোনো চাঁদা আদায় করি না। পটলার বাবা-কাকারাই ক্লাবের জমি দিয়েছেন। আর পটলাই তার হাতখরচা থেকে মাসে শ'তিনেক টাকা দেয় ক্লাবকে।আর আছেন পটলার ঠাকুমা।

আমরা পটলার দিনরাতের সঙ্গী। ওর পাশে থাকি। বহুবার ওই ওন্‌লি বংশধরকে বাঁচাবার জন্য ঠাক্‌মা আমাদের ক্লাবের উপর খুবই খুশি। তাই দায়ে-অদায়ে ঠাক্‌মা ক্লাবকে দু'পাঁচ হাজার টাকা দেন।

ফলে আমরা ক্লাবের,ফুটবল টিম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এগুলো অনায়াসেই করে থাকি এলাকার কাউকে চাপ না দিয়ে। সকলেই আসে আমাদের অনুষ্ঠানে।

নিজস্ব খেলার মাঠ-অনুষ্ঠানের জায়গাও আছে আমাদের। অন্য ক্লাবের তা নেই। আর ওদের কোনো অনুষ্ঠান করতে হলে টাকা চাই। তাই পাড়ার লোকের কাছে হাত পাততে হয়। তাছাড়া মোটা টাকা চাঁদা আদায় করে দোকানদারদের কাছ থেকে,বাজারের ফড়েদেরও নিস্তার নেই। সোজা কথায় না দিলে চমকায়। কারো দোকানের সাইনবোর্ডই খুলে ফেলে।

ফলে লোকে চাঁদা দেয় ওদের, কিন্তু বলে,-ক্লাব তো ওই পঞ্চ পাণ্ডব। ভদ্দরলোকের ছেলেদের ক্লাব। ওদের খানদানই আলাদা। তোদের মত ছ্যাঁচড়ামি করে না।

এতে ওই ইলেভেন বুলেটস্-এর সভ্যরা হাড়ে হাড়ে চটে ওঠে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

তাই ওরা আমাদের ক্লাবের পিছনে লেগেছে। নানা ভাবে আমাদের ক্লাবের সুনাম তারা মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায়।

ফুটবল খেলায় ওরাই গোলমাল করে,খেলা পণ্ড করে দেয়। ওরাই রেফারি-এখানকার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার গজেনবাবুকে শাসায়,-পাড়ায় প্র্যাকটিস করতে দেব না।

ওদের ক্লাবের নণ্টে বলে,-ওই লবেনচুষ মার্কা ওষুধ সব গিলে খেয়ে ডাক্তারি লাটে তুলে দেব। ইলেভেন বুলেটস্‌কে জিতিয়ে দিতে হবে।

গজেন ডাক্তার নিরীহ ছাপোষা গৃহস্থ মানুষ। খেলাধুলো ভালোবাসে। তাই কেউ ডাকলে গলায় বাঁশি নিয়ে হাফপ্যান্ট কেইডস্‌ পরে মাঠে নেমে রেফারিগিরি করে। কিন্তু এমন বিপদে পড়তে হবে সে ভাবেনি। গজেন ডাক্তার ইলেভেন বুলেটস্‌-এর বুলেটদের চেনে। নণ্টের কথায় বলে,-তা কি করে হয়? ওদের টিম তো খেলা ভণ্ডুল করেনি। করেছ তোমরা।

নণ্টে বলে,-ওসব বুঝি না,ভালো কথায়,যা বললাম তাই করুন ডাক্তারবাবু,না হলে কাল থেকে বাজারে আপনার ডাক্তারখানার ঝাঁপ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

গজেন ভয়ে ভয়েই তাই পঞ্চপাণ্ডবকে হারিয়ে দিল। ব্যবসাপত্র বজায় রাখতে হবে তো?

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব এবার শিল্ড পেল না। শিল্ড জিতলো ওই ইলেভেন বুলেটস্‌। ওরা বিজয়ী হয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে শিল্ড নিয়ে গেল আমাদের ক্লাবের সামনে দিয়ে।

প্রতিবার এই বিজয় উৎসব করি আমরাই, এবার হতাশ হয়ে দেখলাম ওদের নৃত্য।-পটলা বলে বিমর্ষ কণ্ঠে।

-এর পরেও বাঁ... বাঁ... বাঁ-চ্‌তে বলিস?

পটলার ওই এক দোষ। উত্তেজিত হলে তার জিবটা আলটাকরায় সেঁটে যায়। যাবারই কথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গেছে। এতদিন জেতা শিল্ড থেকে জোর করে ছিট্‌কে আউট করে দিল আমাদের। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের আর কত সর্বনাশ করবে ওরা জানি না!

এবার সত্যিই আমরাই বিপদে পড়েছি।

খবরটা আনে আমাদের ক্লাবের গোবরা নিজে। ওর মামার বিরাট হোলসেল কুমড়ো, চালকুমড়োর ব্যবসা। খালের ধারে বিরাট গুদামে টাল করে রকমারি সাইজের কুমড়ো সাজানো। দেড় দু'কেজি থেকে উৎকৃষ্ট তারকেশ্বরের আট-দশ কেজি সাইজের কুমড়োও মেলে। আর ওদিকে গাদা করা চালকুমড়ো।

কচি,বুড়ো, ছোকরা সব কিসিমের চালকুমড়োই আছে। ট্রাকে মাল আসে, গুদাম ভরে যায়। আবার কলকাতার বিভিন্ন বাজারে ওসব মাল বিলি হয়ে যায়। এসটক্‌ ক্লিয়ার। আবার মাল আসে দূর দূরান্তের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাক বোঝাই হয়ে।

গোবরা ওইসব কাজ দেখাশোনা করে। ইলেভেন বুলেটস্‌ ক্লাবের ওই গুপিনাথের বাজারে কুমড়োর দোকান। চালকুমড়োর মোরব্বার কারখানা। মামার এখান থেকে ছাতা পচা দুনম্বরী চালকুমড়োগুলো কিনে দোকানে লোক দিয়ে পিস্‌ পিস্‌ করে কাটায়। সেই চালকুমড়োর পিস্‌গুলোকে কাঠি দিয়ে ফুটো ফুটো করিয়ে কড়াই-এ রাত ভোর সেদ্ধ করে। তারপর সেই সেদ্ধ চালকুমড়োর পিসগুলোকে শুকিয়ে তারপর চিনির রসে সেদ্ধ করে চালকুমড়োর মিঠাই বা মোরব্বা বানানো হয়।

গুপিনাথ তাই বিরুদ্ধ ক্লাবের হলেও গোবরাকে কিছুটা বিশ্বাস করে। অবশ্য ওই মাল কেনাবেচায় গোবর্ধনেরও কিঞ্চিৎ অবদান থাকে, তাই গুপিনাথ গোবরাকে আড়ালে কিঞ্চিৎ কমিশনও দেয়।

এহেন গোবর্ধনকে ওই ইলেভেন বুলেটস্-এর গুপিনাথ গোপনে কথাটা জানায়। এবার তারা নাকি পটলার পিতৃদেবকেই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক করবে। আর পটলার বাবার সামনে ইলেভেন বুলেটস্ প্রমাণ করবে যে তারাই আসল কাজের লোক,ওই পঞ্চপাণ্ডবদের তুলনায়। ফলে খেলার মাঠটা তাদের ক্লাবকে দিলে তারাই এই অঞ্চলে খেলাধুলোর বিকাশ ঘটিয়ে এই উষর প্লেয়ারহীন মাটিতে প্লেয়ারের ফুল ফুটিয়ে দেবে।

পটলার বাবাও নাকি নিমরাজি হয়েছেন।

এবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে আমাদের।

পটলা বলে,আর কিছু বাকি থাকল ই-ই-ন্ সাল্টের? মাঠ চলে গেলে ক্লাবও গন্ ফট!

হোঁৎকা বলে,-ঠাক্‌মারে ক',একটা ব্যবস্থা করণের লাগবো

গোবর্ধন বলে,-না হলে ওরা এই সিজিনেই মাঠের দখল নেবে বলল।

ফটিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাহাকার ভরা কণ্ঠে বলে,-একে একে নিভিছে দেউটি।

জবাব কি দেব জানি না। তাই চুপ করেই থাকি। হোঁৎকা বলে,-ওগোর ব্যবস্থা করনের লাগবোই।

এর মধ্যে বর্ষা নেমেছে। বর্ষা নামলে এদিকের চেহারা একেবারে বদলে যায়। এককালে এই এলাকা ছিল কলকাতার পূর্ব সীমান্ত। তারপরই খাল-ওপারে ছিল ভেড়ি,নলখাগড়ার বন,মাঝে মাঝে দু-চার ঘর বসতি তারপরই ভেড়ি।

এখন সেসব অঞ্চলই সল্টলেক,বাইপাস রোডে পরিণত হয়েছে। তখন এসবের চিহ্ন ছিল না। কুলেপাড়া বলতে নিচু জলা জমি,বাঁশ,আশশ্যাওড়া আর ঘেঁটুবন।

গ্রীষ্মে ছায়াময়,আর বর্ষার জলে ডুবে যেত ওই অঞ্চল। ঘরবাড়ি যাদের ওদিকে ছিল,তারা এসে ঠাঁই নিত স্কুলবাড়িতে। আর ওই অঞ্চল তখন জলে থৈ থৈ করছে।

ওই জলবন্দী মানুষদের উদ্ধারের কাজে আমরাও নামতাম। বেশ কিছু লোককে এনে তুললাম পাড়ার মাতঙ্গিনী বিদ্যামন্দিরে। আমরাই চাল ডাল সংগ্রহ করে ওদের খিচুড়ি বিতরণ করতাম।

এবার ইলেভেন বুলেটস্ যেন জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করেছে একাগ্রভাবে। বৃষ্টি নামার পরদিন থেকেই ওসব অঞ্চলে জল জমতে শুরু হবার মুখেই তারা কুলেপাড়া,শীলপাড়া, খালধার বস্তি থেকে লোকজনদের আগাম তুলে এনে ওদের পাড়ার চারুশীলা বালিকা বিদ্যালয়-এর বিল্ডিং ভরে তুলেছে।

পরের দিন সকালে আমরা জলবন্দী মানুষদের উদ্ধারের কাজে বের হবার মুখে গোবরাই খবর দেয়,--আর যেতে হবে না।

ক্যান? একরাতেই সব ডুইবা গেছে গিয়া?--হোঁৎকা বলে।

গোবর্ধন বলে,--না, না ওই ইলেভেন বুলেটস্ কাল থেকেই ওসব অঞ্চলের লোকদের তুলে এনে চারুশীলা বিদ্যালয়ে গ্যারেজ করেছে। কাল রাতেই মামার গুদাম থেকে দুশো মণ কুমড়ো, কয়েক বস্তা পিঁয়াজ, আলুও এনেছে, জোর লঙ্গরখানা চালু করেছে দেখলাম, বড় বড় ডেকে খিচুড়ি চেপেছে।

অবাক হই,--সেকি! তাহলে আমাদের রিলিফ ওয়ার্কের কি হবে?

হোঁৎকা বলে,--তাই দেখছি। সৎকাজও করতি দিবে না ওই গুপিনাথের দল।

পটলা বলে,--ক্-ক্লাব এবার তুলেই দিতে হবে।

ফটিক বলে,-এবার মাঠই না কেড়ে নেয়। এই ঘরও! তাহলে কি করে এলাকায় মুখ দেখাবি হোঁৎকা?

পটলা বলে,-ওই গুপিনাথকে দেখি বাবার কাছেও যায় টায়।

হোঁৎকা বলে,-এই জমি ওর বাবার নয়, এ জমির মালিক সুভাষিণী দেব্যা-তর ঠাক্মা। ঠাক্মারেই গিয়া কই চল। যেন জমি না দেয়।

আমি বলি, ইলেভেন বুলেটস্‌কে ঘা না দিলে সর্বনাশ হবে। এখন কি করে মোক্ষম ঘা-টা ওদের দেওয়া যায় তাই ভাব।

ইলেভেন বুলেটস্-এর কর্ণধার গুপিনাথ খুব ঘোড়েল ব্যাক্তি। বাজারে একটা মুদিখানার দোকান চালায়-আর কর্তাদের ধরে করে সেই সঙ্গে রেশন শপ্-ও চালু করেছে। এখন সেই দোকান রমরমিয়ে চলছে। খালধারে একটা গুদামও ভাড়া নিয়ে সবরকম মালপত্র রাখছে। ক'মাসের মধ্যেই গুপিনাথ বেশ ফেঁপে উঠেছে। একটা মোটর বাইক হাঁকিয়ে তার আদি নিবাস বনগাঁ থেকে সীমান্তের দিকে কোনো আজ পাড়াগাঁয়েও যাতায়াত করে।

আর ক্লাব করে এখানকার এম.এল.এ সুধীরবাবুরও খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছে। ফলে থানার বড়বাবু, মেজবাবু, মায়বিটের কনস্টেবলরাও ওকে ভালো করে চেনে। দেখা হলে সেলাম জানিয়ে কুশল সংবাদ নেয়।

সুধীরবাবুও জানে সামনে ইলেকশন আসছে। ভোটে জিততে হলে ওই ক্লাবকে হাতে রাখতেই হবে। ওরাই এদিকের সব বস্তির ভোট নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সুধীরবাবুও গুপিনাথকে তার গাড়িতে নিয়ে ঘোরে যখন তখন। সারা এলাকার মানুষও জানে এম.এল.এ-কে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে গুপিনাথবাবুকেই ধরতে হবে। তাই পারমিট্, লোনের জন্য আসে তারা গুপিনাথের কাছেই।
গুপিনাথও ক্রমশ বুঝেছে এই লাইনের ব্যাপারটা।

কিছু পেতে গেলে কিঞ্চিৎ দিতে হবে। গুপিনাথ সেই থেকে আমদানিও শুরু করে। আর সেই টাকা ব্যবসাতে ঢালে। ক্রমশ গুপিনাথ পটলার কাকার সঙ্গেও পরিচিত হয়ে ওঠে। পটলার কাকার কারখানায় রকমারি সাবান, সুগন্ধি কেশতৈল, আয়ুর্বেদিক মলম-এসব তৈরি হয়। আর গুপিনাথ ওসবের এজেন্সি নিয়ে বেআইনি পথে সেইসব মাল বাংলাদেশে পাচার করে বিরাট মুনাফা গড়ে তুলেছে।

ফটে পটলার কাকা এখন ব্যবসা করছে ভালোই, আর সেই সুবাদে গুপিনাথও উপরে উঠেছে। এবার পটলার বাবা অর্থাৎ ও বাড়ির বড়বাবুর বিশ্বাসভাজন হতে পারলে ওই বিঘে তিনেক খেলার মাঠটাও নিশ্চিত দখলে এসে যাবে।

ওই মাঠ হাতে এলে বছর কয়েক খেলার নামে কিছু খরচ করে তারপর রাতারাতি ওখানে ফ্ল্যাট বাড়ি তুললে কোটি টাকা আমদানি হবে। বাকিটা সামলে দেবে নেতা-ওই সুধীরবাবুই।

সেই মতলবটা অবশ্য এখন প্রকাশ করে না গুপিনাথ। এ বাড়িতে আসে যায়।

ঠাক্মা গুপিনাথকে চেনে। আগে গুপিনাথ লজ্ঝড়ে সাইকেল চেপে ঘুরত। এখন জিপ নিয়ে ঘোরে।

ঠাক্মা বলে পটলার বাবা গোবিন্দবাবুকে,-ওই লগার মত লোকটা তোর কাছে আসে কেন? মদনও দেখি ওর সঙ্গে ঘোরে।

ঠাক্মা বলে পটলার বাবা গোবিন্দবাবুকে,-ওই লগার মত লোকটা তোর কাছে আসে কেন? মদনও দেখি ওর সঙ্গে ঘোরে।

মদন পটলার কাকা। গোবিন্দবাবু বলে,-ও এলাকার সেবামূলক কাজ করে। দেশপ্রেমিক গুপিনাথ।

ঠাক্মা বলে,-ওই কাকতাড়ুয়ে হল দেশপ্রেমিক! রেশনের মাল দেয় না, সব ব্ল্যাক করে। ওর সঙ্গে মিশবি না, ও বাজে লোক।

মায়ের উপর কথা বলার সাহস নেই গোবিন্দবাবুর। চুপ করে থেকে বলে,-এখানে খেলার জন্যে সরকারি টাকা এনে স্টেডিয়াম করবে, তাই বলছিল ওই মাঠটা যদি ওদের দেওয়া যায়-!

ঠাক্মা অবশ্য আগেই শুনেছে কথাটা। হোঁৎকার দল সবই বলেছে তাকে। ঠাক্মা বলে,-সরকার ইস্টেডিয়াম করবে-নিজেরা মাঠ দেখে নিক। আমার জমি আমি দেব না। পটলারা খেলছে-খেলবে ওখানে।

গোবিন্দবাবু আপাতত চুপ করে যান। কিন্তু খবরটা হোঁৎকাদের কাছে ঠিক পৌঁছে যায়। এবার আমরাও জরুরি মিটিং ডাকি। বেশ বুঝেছি যে ওই গুপিনাথ এবার আমাদের হঠিয়ে এই মাঠের দখল নিতে চায়।

এদিকে আমরাও গোপনে ক'জন মিলে ওই গুপিনাথের হাল হকিকত-এর খবর নিতে শুরু করেছি। ফটিকের মামার বাড়ি বনগাঁয়ের ওদিকে। গুপিনাথের গ্রামটা ফটিক চেনে। সেও তার মামার বাড়িতে চারপাঁচ দিন থেকে গুপিনাথের সম্বন্ধে যা সব খবর এনেছে তা একেবারে চমকপ্রদ।

আমরা অবাক হই। শুধোই ফটিককে,-ঠিক খবর তো রে ফটিক?

এবারে ফটিক যেন গুপিনাথকে বধ করার মত ব্রহ্মাস্ত্র হাতে পেয়েছে। বলে সে-ঠিক মানে? একেবারে ঠিক। ওরা রাতের অন্ধকারে মোটা টাকা দিয়ে, লাইন করে ওদিক থেকে লাখলাখ টাকার বিদেশি মালপত্র আনে, আর এদিক থেকে ট্রাকে চাল, ডাল, চিনি, টিনটিন সরষের তেল, আলু-এদেশের লোকের মুখের গ্রাস টাকার জন্যে ওদেশে পাচার করে। আর মালপত্র কখন আসে, কোথায় আসে-তাও খবর এনেছি।

পটলা বলে,-চুপ করে থাক। কালই তোকে নন্দ মেসোর কাছে নিয়ে যাব।

নন্দদুলালবাবু পটলার আপন মেসোমশাই। লালবাজারের বিরাট পুলিশ অফিসার। ফটিক ঢোক গিলে বলে, -কোনো গোলমাল হবে না তো রে?

হোঁৎকা বলে, -না-না। কাল যা ওরে লই' সব রিপোর্ট কইরা আয়। এদিকে আমরাও দেখছি, ওই দ্যাশসেবক গুপিনাথের এবার শিক্ষাই দিমু একখান।

হোঁৎকা তার পরিকল্পনাটা আমাদের বলেছে।

ফটিক বলে,-এদিককার সঠিক খবর আমি এনে দেবো, সেইমত অ্যাকশন করতে হবে।

ব্যাপারটা খুবই গোপনে ঘটিয়ে চলেছি আমরা। পটলার সেই পুলিশের কর্তা মসোমশাইও পটলাকে দিয়ে ফটিককে ডাকিয়ে এনে নিজে থেকে কি সব জেরা করে সীমান্তের ধারে ওই গ্রামটার সম্বন্ধেও সব খবর নিয়ে বলেন,-এবার নজর রাখো ফটিক। খবর যা শুনবে বা পাবে আমাকে জানাবে।

এদিকে গুপিনাথও থেমে নেই। সারা এলাকায় একজন দরদি সমাজসেবক বলে পরিচিত হয়ে উঠেছে সে। এবার বর্ষায় ওই বানডুবি অঞ্চলের মানুষদের জন্য একেবারে পার্মানেন্ট ক্যাম্পই বানিয়েছে ওই চারুশীলা বালিকা বিদ্যালয়ের দুখানা তিনতলা বিল্ডিং-এ।

আর এম.এল.এ মন্ত্রীরাও যখন ওর হাতের লোক, সুতরাং ফুড ডিপার্টমেন্ট থেকে ওই ক্যাম্পের চাল, ডাল এসবের পার্মানেন্ট কোটাও বের করেছে। প্রায় হাজার বস্তা চাল, দুশো বস্তা ডাল এসবও আসছে রিলিফের জন্য।

আমরাও এবার ওদের দলে ভিড়েছি। অর্থাৎ ইঁদুর যেমন ডুবন্ত নৌকা ছেড়ে নদীতে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, আমরাও তেমনি কৌশল করে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব ছেড়ে ওই ভাসমান তরী ইলেভেন বুলেটস্-এ সভ্যপদ পাবার জন্য দরখাস্ত করেছি।

গুপিদাই বলে,-কিছুদিন ট্রায়ালে থাকতে হবে তোদের, তারপর কমিটি মিটিং-এ তোদের মেম্বার করে নেবো। তবে তোদের ক্লাবঘর তুলে দিতে হবেই হবে।

অর্থাৎ তাহলেই ওরা পটলার বাবাকে এনে দখল নেবে মাঠের। হোঁৎকা বলে,-আমরা তো ছাইড়াই দিছি ক্লাব। অন্য মেম্বারদের কন তো প্যাঁদাইয়া দিমু। বাপ্ বাপ্ কইতি কইতি মাঠ ক্যান হেই কুলেপাড়া ছাইড়া পলাইব।

গুপিনাথ বলে,-দেখি ভালো কথায় যদি কাজ না হয় তাহলে আঙুল বাঁকাতে হবে। মোট কথা, আমার মাঠের দখল চাই।

আমরা এখন পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বিপক্ষ ইলেভেন বুলেট্‌সে। গুপিদাই আমাদের আপনজন। তাই বলি,-অর্ডার করবেন অ্যাকশন ঠিক হয়ে যাবে। মাঠও আসবে আমাদের কব্জায়। ওরা আর কজন? কি করে ক্লাবকে বাঁচাবে?

হোঁৎকা বলে,-আমরা রেজিক্‌নেশন দিছি পঞ্চপাণ্ডব খনে।

তাই গুপিদা আমাদের উপর এখন ভরসা করে এগোচ্ছে। আমরাও এখানকার রিলিফ ক্যাম্পের বিশ্বস্ত কর্মী। হিসাবপত্র রাখি। ওই গুদামে অবশ্য আমাদের যেতে দেয় না গুপিনাথ।সেখানে তার একান্ত বিশ্বস্ত কিছু ছেলে কাজ করে।

গুপিনাথ মাঝে মাঝে রাতে উধাও হয়ে যায়। সারারাত কোথায় থাকে, কি করে কেউ জানে না। ফেরে পরদিন, আর কর্মব্যস্ততাও বেড়ে যায় তখন। গুদামে মাল আসা যাওয়া করে রাতের অন্ধকারে।

এদিকে নেতা মন্ত্রীরাও আসছে। এখানে খেলার স্টেডিয়াম হবে। সুধীরবাবুদের নিয়ে গুপিনাথ এবার পটলার বাবাকেই ধরে,-ওই মাঠটা দেন। পটলাদের ক্লাব উঠেই যাবে। ওখানে পাকা স্টেডিয়াম হবে।

অবশ্য এর আগে নশুবাবু নেতা থাকাকালীন একটা মাঠে কোনো মন্ত্রীকে দিয়ে একটা পাথরের ফলক লাগিয়ে ছিলেন। সেটা এখন ঝোপজঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে।

পটলার ঠাকুমাকে খবরটা আমরাই দিয়েছি। ঠাকুমা সব শুনে বলে,-গোবিন্দ, তোর ওই ন্যাতাদের বল মাসির মাঠে যে শীল পুঁতেছিল মন্ত্রী, ওই মাঠেই কাজ হোক। এখানে কেন?

গুপিনাথ বলে,-ওখানে জলা। এই মাঠটা হলে দারুণ হত-আপনার স্বামীর নামে পাকা মাঠ হবে।

এর মধ্যেই হঠাৎ খবর আসে, ক্যাম্পে নাকি আন্ত্রিক না হয় ফুড পয়জন হয়েছে, কয়েকজনের। কাতরাচ্ছে তারা। আমরা অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে ক্যাম্পের সাতজনকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠিয়েছি।

আরও অনেকে অসুস্থ। গোবরার মামার কুমড়ো বওয়া গাড়িকেই অ্যাম্বুলেন্স বানিয়ে রোগীদের পাচার করছি।

সারা এলাকার মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। খারাপ খাবার খাইয়ে ক্যাম্পের লোকদের মারতে চায় এই ইলেভেন বুলেটস্। ভাগ্যিস পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব ছিল তাই ওদের হাসপাতালে পাঠিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে।

পুলিশেও খবর যায়।

গুপিনাথ সেদিন তার বিশেষ কাজে ব্যস্ত। সে তখন সীমান্তের গ্রামে। সে জানে না তার দুর্গে এবার আক্রমণ শুরু হয়েছে। পচা ভেজাল চাল ডাল, ভোজ্য তেল-এর অভিযোগ উঠতে পুলিশ ও জনতা ওই গুদামেই হানা দেয়। এর মধ্যে ফটিকও গিয়ে হাজির হয়েছে পটলের সঙ্গে তার পুলিশ মেসোমশায়ের কাছে। সব জেনে তিনিও ফোর্স নিয়ে এসে গুদামে হানা দেন। আর দেখেন রাশি রাশি ভালো চাল, ডাল, তেল, ট্রাকে উঠে চলেছে সীমান্তের দিকে। আর এদিকে ক্যাম্পের লোকেদের খাওয়ানো হচ্ছে ধানকল থেকে সংগৃহীত বাতিল খুদ, পচা চাল ডাল।

গুদাম থেকে বের হয় হরেকরকমের দামি বিদেশি মালপত্র। কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস।

এদিকে তখন গুপিনাথ নতুন চালানের মাল নিয়ে বিজয়ীর মত ঢুকছে। এক একটা চালানের মাল ঠিকমত আনতে পারলে দিয়ে-থুয়েও লাখখানেক টাকা থাকে। প্রতি মাসে এরকম দুতিনটে চালান তার হাতে আসে।

-হল্ট।

চমকে হঠে গুপিনাথ।

পথের মাঝে অন্ধকারে চারিদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে তাকে। তিন চার লরি মালসমেত। বের হবার পথ নেই। পুলিশের ইমার্জেন্সি আলো-ওদিকে দুচারটে সার্চলাইট রাতকে দিন করে তুলেছে।

হাতে-নাতে ধরে ফেলে পুলিশ, গুপিনাথ আর ওই এলাকার নেতাকে। এতদিন ওরা দেশসেবক, সমাজ সেবকের মুখোশ পরে

ছিল, আজ সেই মুখোশ তাদের খুলে পড়েছে।

সকালে সারা কুলিপাড়ার মানুষ ভেঙে পড়ে। তারা দেখছে গুদামে পুলিশ ভর্তি। কয়েকশো বস্তা ভালো চাল ডাল ও ক্যাম্পের মাল পাচার করছিল গুপিনাথের দলবল।

এবার ইলেভেন বুলিটস্-এর বেলুন চুপসে গেছে। নেতা ও তাদের দলবলকে পুলিশ এবার জুলুম করে টাকা তোলা, লোকের ক্ষতি করা ইত্যাদি নানা চার্জে ধরেছে।

আর গুপিনাথও দেখেছে পুলিশ সাহেব পটলা, ফটিকদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করছে।হোঁৎকাই ওই ক্যাম্পের আন্ত্রিকের ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল তার চেনাজানা কজনকে দিয়ে। তারপরই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়।

এবার আমাদের মাঠ আবার জমে ওঠে। ইলেভেন বুলেটস্ দু'দিন মাথা তুলেই একেবারে ঠান্ডা! আবার নব উদ্যমে লেগে পড়েছি আমরা। ক্লাবকে বিপদে ফেলার মত আর কেউ নেই।

হোঁৎকাদার সেবাব্রত

হোঁৎকাদা বলে-তালে ওই কথাই রইল। ঝুলনের মেলায় এবার সেবা-টেবার কাজে ফোর স্কোয়ার ক্লাবকে রেকর্ড করতেই হবে।

গুপিনাথ তখনও হুস-হাস শব্দে বৈঠকি দিয়ে চলেছে। এবার দম ফেলে হাঁকে-আড়াই শো!

অর্থাৎ নিদেন আড়াই শো বৈঠকি না দিয়ে ওর ব্যায়াম শেষ হয় না। ওদিকে পটলা ক্লাব-ঘরে তখনও হারমোনিয়ামে পোঁ-পোঁ শব্দ তুলে ক্লাবের উৎসবের জন্যে গান তুলছে।

-কি গাব আজি কি শুনাব-

হোঁৎকাদা ধমকে ওঠে-ওই সব থামা দিকে! এখন কাজের কথায় আয়। অ্যাই শ্রীমতি তোর এক্‌টো থামা দিকি!

মতিলাল আমাদের ক্লাবের নাট্য-পরিচালক কাম হিরো। সামনের মাসে ক্লাবের নাটক, তারই মক্‌শো করছিল। হোঁৎকাদার কথায় ওরাও এসে জুটেছে। হোঁৎকাদা বলে-সামনে এত বড় কাজ, এখন ক্লাবের প-প্রেস্‌টিজ বলে কথা! পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাব তো উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা বসে থাকব?

মতিলাল বলে-কি করতে হবে? ফাইটিং?

হোঁৎকাদা জানায়-সেবা! জনসেবা! মানে ভিড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ল, হারিয়ে গেল, খুঁজে আনতে হবে। কেউ পথ হারিয়েছে, অফিসে আনতে হবে। কেউ অসুস্থ তাকে ফার্স্ট- এড দিতে হবে। কোনো দুষ্টু লোক, মানে চোর পকেটমারকে বাধা দিয়ে হবে।

গুপি বলে-শেষের কাজটা আমিই করব।

হোঁৎকাদা বলে-সব অর্গানাইজ করতে হবে বুঝলে, জনসেবাই আসল কাজ। বি-বিবেকানন্দ বলেছেন-জ-জীবে-

মতিলাল পাদপূরণ করে দেয় বাকিটা।

আমাদের গ্রামটা বিরাটাই বলা যায়। এখনও অনেক ধসে পড়া জমিদার বাড়ি, খালবিল, গজিয়ে ওঠা আদকদের কাচের ঠাকুবাড়ি, মোহান্ত মহারাজের বিরাট মন্দির, আরও অনেক ছোট বড় মন্দির, ঠাকুরবাড়ি আছে। ইদানীং বিজলিবাতির দৌলতে মন্দিরের বোল-বোলাও সাজ-গোজও বেড়েছে। ঝুলনের সময় তাই প্রতি ঠাকুরবাড়িতেই ঠাকুর সাজানো হয়। ধুমধাম করে মেলা বসে। আদকদের চত্বরে কলকাতার যাত্রাগানও হয়। নামী কীর্তনীয়ারাও আসেন। ক'দিনের জন্য গ্রামটা জমে ওঠে। আর আশপাশের গ্রাম থেকে আসে হাজার হাজার মানুষ। পথঘাট, বাজার, মেলার জায়গায় লোক ধরে না।

তাই হোঁৎকাদা এই সুযোগে জনসেবা করে কিছু পুণ্যি অর্জন, আর ক্লাবের নাম ফাটাবার সুযোগটা ছাড়তে চায় না। হোঁৎকাদা এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কালীতলার মাঠে একটা তেরপলের ছাউনি বানিয়ে নিজের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা থেকে হাতল-ভাঙা চেয়ার, নড়বড়ে বেঞ্চ, আর কোত্থেকে একটা ফোল্ডিং টেবিল পেতেছে। লাল শালু দিয়ে ফোর স্কোয়ার ক্লাবের সেবা-বিভাগের প্রচার করা হয়েছে। হোঁৎকাদা গ্রামের অনেক কিছুতেই থাকে। ফুটবল মাঠের রেফারি, প্রসেশনের লিডার, ব্যান্ড-পার্টির ম্যানেজার ইত্যাদি নানারকমে সে জনসেবা করে চলেছে। আজ খাকি হাফ-প্যান্ট, শার্ট আর মাথায় টুপি, বেল্টে হুইশেল ঝুলিয়ে প্যামসু পায়ে হোঁৎকাদা গোল দেহটাকে আরও গোলাকার বানিয়ে চেয়ার জাঁকিয়ে কম্যান্ডার সেজে বসেছে।

আর সেবকদেরও অভাব নেই। আমি, গুপি, মতি, পটলা ছাড়া পাড়ার ক্ষুদিরাম, দুকড়ি, দেড় ঠেঙে হরিপদ, কানা শশী, নুলো তারণ ইত্যাদি অনেকেই হোঁৎকাদার সেবাব্রতে সাড়া দিয়ে জমায়েত হয়েছি তার পতাকা তলে।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের টেন্ট ওদিকেই। তাদেরও বাহার কম নয়। পশুপতিদা মাথায় ব্যান্ড-পার্টির পালক গোঁজা টুপি পরে বিউগিল নিয়ে সেজেছে। ওদের দলের পোশাকও জমকালো। ওদের ক্লাবের গদাই বলে-ভালো মানিয়েছে রে তোদের পিপেটিকে, গড়িয়ে

দিলেই-

গুপি গর্জে ওঠে হোঁৎকাদার প্রতি এই মন্তব্যে। তাই গর্জে ওঠে-কথা বলবি না গদাই, তোকেই সেবা করে দেবে এক রদ্দায়। অবশ্য গুপির হাতের রদ্দা খেলে গদাইকে লাশ হয়ে যেতে হবে। তাই আমি থামাই ওদের-এই, সেবাদলের নিজেদের মধ্যে সেবা শুরু করবি নাকি?

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের তাঁবুতে ব্যান্ড বাজছে। ভিড় জমেছে ওখানেই। হোঁৎকাদাও হুইশেল বাজিয়ে দেড় ঠেঙে হরিপদ, কানা শশী, নুলো তারণ, লিকলিকে কার্তিকদের নিয়ে রীতিমত প্যারেড শুরু করিয়ে তালিম দিয়ে সেবাব্রতী করে ছাড়বে।

সন্ধ্যার পর থেকে ভিড় শুরু হয়। কাতারে কাতারে ছেলে মেয়ে, বুড়ো-বুড়ির দল চাল চিঁড়ে বেঁধে এসেছে। মন্দিরগুলোর দরজায় ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চলেছে। বাঁশ পুঁতে দড়ি-দড়া বেঁধে ভিড় সামলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু জনস্রোতের চাপে, সব বানের মুখে খড়কুটো হয়ে ভেসে যাচ্ছে।

হোঁৎকাদার গলা শোনা যায়-রেডি, স্টেডি বয়েজ। মহিলারা এদিকে-ওয়ান বাই ওয়ান। পুরুষদের গেট বন্ধ করে রাখো। হুঁশিয়ার-

আদকমশাইও রয়েছেন। ভিড় সামলাতে গিয়ে নুলো, তারণ ছিটকে পড়েছে, লিকলিকে কার্তিক চাপের চোটে কোনো দর্শনার্থীর ঘাড়ে উঠে ভিড় থেকে আত্মরক্ষা করছে।

আমরাও স্ট্রেচার নিয়ে তৈরি। দু-একটা বোধ হয় জখম হবেই। তবু সেবা করার সুযোগ পাব। কিন্তু মানুষগুলো যেন ইস্পাতের তৈরি! এত ভিড়েও কারো কিছু হয় না!

কলরব ওঠে-পুঁটু, কোথায় গেলি র্যা! অ-কুসুম-

-ছেলে হারিয়ে গেছে মা? হোঁৎকা এগিয়ে যায় ব্যগ্রভাবে।

বুড়ি দাঁত পড়া লালচে মাড়ি বের করে খিঁচিয়ে ওঠে-পুঁটু আমার হারাবে কেন র্যা মুখপোড়া? তুই হারা গে না!

পঁটু, বুঁচু কেউই হারায় না। কেউ আহতও হয় না। মেলার পর্বও ঠিক চলেছে। আদকমশাই বলেন-দারোয়ানদের বলে রেখেছি।

হোঁৎকাদা বলে-আমার সেবাদলও রেডি আছে আদকবাবু, মানে এবার ফোর স্কোয়ার ক্লাবের পেট্রন হতেই হবে। আপনার এখানেই তাই সেবাদলকে রেখেছি।

আদকমশাই জবাব দেয়-সেবাদল! ওরা কি করবে হে? যাক গে, এবার ডেকরেশনটা কেমন হয়েছে বল হোঁৎকা? ফোকাস্, স্পষ্ট লাইট ওই ঠাকুরের ভ্যানিস-ট্যানিস সবই কলকাতার মিস্ত্রি এনে করিয়েছি।

আবার ভিড় আসছে জনস্রোতের মত। আমারও ক্ষুণ্ণ হয়েছি। আদকমশাই কেন মোহান্ত মহারাজের ঠাকুরবাড়িও ম্যানেজ করছি, কিন্তু ওরা যেন আমাদের চেনে না!

-রেডি বয়েজ। পুরুষদের গেট খুলে দাও। ওরা বের হয়ে গেলে মেয়েরা ঢুকবে। আস্তে-

কোনরকমে সেবা করার সুযোগ খুঁজছি। রাত হয়েছে। হোঁৎকাদা বলে-চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি রাখবি। শুনেছি, দু-একটা ছেনতাইও হয়ে গেছে।

ক্যাম্পের নড়বড়ে বেঞ্চে বসে আছে কয়েকটা বুড়োবুড়ি-দুটো ছেলে। হোঁৎকাদা বলে-আপনাদের নাম বলুন।

বুড়ো গর্জে ওঠে-আমরা কি চুরির আসামি যে নাম-ধাম গাঁ-গোত্তর বলতে হবে?

-আপনারা তো হারিয়ে গেছেন?

হোঁৎকাদার কথায় বুড়ি গর্জে ওঠে-সদাব্রত খুলেছ, খেতে থাকতে দেবে শোনলাম, আর যাত্রীদের চোর ঠাওরেছো!

মতিলাল বলে-সেবাব্রত নিইছি আমরা-সদাব্রত নয়।

-ঝ্যাঁটা মারি তোদের মুয়ে, আঁটকুড়োর ব্যাটারা! মশকরা করতে এসেছ! ওঠ রে মদনা, অ্যাই কালী, চত্বরে পড়ে ঘুমোবি চল।

ঘুমন্ত কিল্লিবিল্লিদের নিয়ে ওরা চলে গেল।

রাত হয়ে গেছে। খিদেতে পেট জ্বলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা-গতর টাটিয়ে গেছে, তবু সেবাদলের নামও কেউ করে না। আদকমশাইকে ধরে কিছু মোটা টাকার ডোনেশন তোলার স্বপ্ন দেখেছিলাম। তাও হল না। ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের তাঁবুর সামনে বেঞ্চ পেতে ভলেনটিয়ারদের লুচি, আলুর দম আর মিহিদানা ভোগ চলছে।

নুলো তারণ ওর ছেঁড়া জামা থেকে ব্যাচটা খুলে হোঁৎকাদার টেবিলে রেখে বলে-লুচি-ফুচি নাই, এতে আমিও নাই। কাল থেকে ওদের দলেই সেবা করব।

দেড় ঠেঙে হরিপদের ছোট এক ঠ্যাং-এর হাঁটুটা ছড়ে গেছে। ও বলে-আমোও নাই কাল থেকে।

হোঁৎকাদা বলে-সেবা মানেই নিঃস্বার্থ সেবা। দই লুচি আলুর দম মিহিদানা তো তুচ্ছ।

যে কারণেই হোক পরদিন ফোর স্কোয়ার ক্লাবের অবস্থা সত্যই করুণ। মাত্র ক'জন টিম-টিম করছে। ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সামনে ভলেনটিয়ার আর ধরে না। নুলো তারণ, কানা শশী, লিকলিকে কার্তিকও চলে গেছে ওই ক্যাম্পে। বুক ওদের ব্যাজ এঁটে সেবাধর্ম নিয়েছে। আর দেড় ঠেঙে হরিপদও যেত, কিন্তু এক ঠ্যাং জখম হওয়ায় আসতে পারেনি।

এদিকে আমরা মাত্র ক'জন। হোঁৎকাদা বলে-নীরবে নিঃস্বার্থে সেবা করবি। জ-জানিস না-

য-যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চল রে।।

লোকজনের ভিড় আজ অনেক বেশি। শহর থেকে রির্জাভ বাসে লোকজন মেয়েরা আসছে। আজ আদকমশাই বলে-গেটে আমার দারোয়ানরাই থাকুক। তোমরা আশেপাশে থাক, অর্থাৎ তার দেউড়িতে তার ইউনিফর্ম পরা লোকজনই থাকবে, ওদিকে মোহান্ত মহারাজের মন্দিরের ভার আজ পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের, আর আদকমশাইয়ের মন্দিরের ভিতরেও পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নেতা পশুপতিবাবু দলবল নিয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ এবার আদক-কোম্পানির দরাজ টাকা ওরাই পাবে।

আমি বলি-এসব তুলে দাও হোঁৎকাদা। কি হবে?

-মানে! হোঁৎকাদা গর্জে ওঠে-যদি ভালো না লাগে চলে যা তোরাও। আমি একাই সেবাব্রত নিয়ে থাকব।

মতিলাল মাথায়-চুপ কর দিকি। কিন্তু কাজটা কি করব বল?

গোপীনাথ বলে-করার তো কিছু নেই। আদকমশাই, মোহান্ত মহারাজও জবাব দিলেন।

হোঁৎকাদা বলে-পথেঘাটে ঘুরবি, কত বিপন্ন মানুষ রয়েছে তাদের সেবা কর।

মনের রাগ চেপে ভিড়ের মধ্যে পথে এদিক ওদিক ঘুরছি। হোঁৎকাদাও বের হচ্ছে মাঝে মাঝে। ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের

ডিউটেতে রয়েছে ভলেনটিয়ার দল। গদাইও ব্যাচ পরে ভিড় ম্যানেজ করছে গেটে। আমাদের যেন চিনতেই পারে না।

ওদের লিডার পশুপতিবাবু ভিতরে যাবার মুখে শোনায়-বাজে ভিড় হটিয়ে দে গদাই, গেটের কাছ থেকে।

গুপিনাথ গজরাতে থাকে, পশুর বাবার জায়গা এটা! ঠিক আছে।

গুপিকে টেনে নিয়ে আসি, কারণ রাগের মাথায় ওর জ্ঞানগম্যি থাকে না।

হঠাৎ খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সারা মেলায় ওই ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়।আর খবরের মূল ওই হোঁৎকাদা।

রাত হয়ে গেছে। দত্তদের রকে একটা লোক মরে পড়ে আছে। হইচই পড়ে যায়। হোঁৎকাদা বলে-কুইক। এখনও মরেনি, পালস্ আছে। স্ট্রেচারে নিয়ে চল।

ভিড় জমে গেছে পথের দু'ধারে। তার মধ্যে দিয়ে আমি, মতিলাল, পটলা স্ট্রেচারে তুলে আনছি দশাসই দেহটাকে। জ্ঞান নেই। হোঁৎকাদা হাঁক পাড়ে-ভিড় করো না কেউ, পথ দাও সেবাদলকে। ধীরে-নো জার্ক বয়েজ।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ছেলেরাও ঘাবড়ে যায়। তারা কেবল লোকই ঠেলেছে, ফাঁক থেকে আমাদের ক্লাব একটা মারাত্মক কেসকে তুলে এনেছে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে। এর মধ্যে ওই অজ্ঞান লোকটার আত্মীয়দের কাছেও খবর গেছে। ওর বৌ হবে বোধ হয়-ইয়া লম্বা চওড়া একটি কালো মহিলা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আসছে, পিছনে আসছে বেঁটেখাটো একটি তরুন-ওর ছেলে বোধহয়।

হোঁৎকাদা বলে-ওকে ডিস্টার্ব করবেন না। এখুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বোধ হয় হার্ট অ্যাটাক্-সাংঘাতিক ব্যাপার।

-বাঁচবে তো গো? ও বাবু! মেয়েটি চিৎকার করে চলেছে।

কোনরকমে ওই দশাসই দেহখানাকে নড়বড়ে টেবিলে শুইয়ে দম নিচ্ছি। এতখানি পথ ওই পর্বতকে বয়ে আনা কম কথা নয়! আমাদের ক্যাম্পের আশপাশে লোকের ভিড় আর ধরে না। নিমেষের মধ্যে ফোর স্কোয়ার দলের সেবাব্রতের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। হোঁৎকাদা লোকটার পালস দেখছে।

হঠাৎ কাণ্ডটা ঘটে যায়। বিরাট মুষকো লোকটা সটান টেবিলের উপর আড়িমুড়ি ছেড়ে সিধে হয়ে উঠে বসে চোখ কচলে নিজেকে তেরপলের ছাউনির মধ্যে এই অবস্থায় দেখে হকচকিয়ে যায়। ওপাশে বৌটা তখন চিৎকার করছে দেখে লোকটা গর্জে ওঠে-অ্যাই থামবি। তা এখানে কি করে এলাম রে? যাত্রা শুরু হবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম দত্তদের রকে-

বৌটা গর্জে ওঠে-তুমি নাকি মরে গেছলে গো।

লোকটা অবাক হয়-মরে গেছলাম! কোন্ ব্যাটা বলে?

মেয়েটা হোঁৎকাকে দেখিয়ে বলে, ওই ছোঁড়াটা! ওমা কি মুখ গো ওটার? অ্যা! জলজ্যান্ত লোকটাকে মেরে ফেলছিল গো। ওরে আঁটকুড়ির ব্যাটা, ওই ছোঁড়াগুলো আবার খাটিয়ায় করে বয়ে আনছে।

-অ্যা! মরে গেছলাম! দেখাচ্ছি মজা! ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? মোটা লোকটা গর্জে ওঠে বুনো মোষের মত।

পায়ের দিকে ছিলাম আমি। লোকটা সজোরে আমার দিকেই লাথি ছুঁড়েছে। লাথি নয়, যেন একটা শালের গুঁড়িই এগিয়ে আসে। লাগলে থেঁৎলে যাবে, তাই মাথা নিচু করে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরুবার পথ খুঁজছি। সেবা করার পর যে এমনি কাণ্ড ঘটবে ভাবিনি। লোকটা হাত বাড়িয়ে ঠ্যাঙ ধরে ফেলেছে হোঁৎকাদারই। এবার বোধহয় হাসপাতালেই যেতে হবে হোঁৎকাদাকে। এখন সময় দাপাদাপিতে নড়বড়ে টেবলটা মচমচ করে ওঠে। একটা পায়া মড়মড় করে ভাঙছে। মোটা লোকটা পড়বার আগেই সামলে নেবার জন্য লম্বা হাত বাড়িয়ে তেরপলের নীচেকার ছাউনির বাঁশটাকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু ওই বিরাট দেহের চাপে টেবিলটা আছড়ে পড়ে, আর তেরপল সমেত বাঁশ ভেঙে ওই লোকটা, হোঁৎকাদা, সেই মেয়ে লোকজনই চাপা পড়ে গেছে। ওই ফাঁকে আমি তেরপলের তলা গলে কোনোরকমে হড়কে বের হয়ে মতিলালের হাত ধরে ভিড়ে মিশে যাই। বুকের ব্যাজটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে ওদের দলে মিশে কেটে পড়ার পথ দেখছি। ততক্ষণে বিরাট কাণ্ড বেধে গেছে। লোকজন, যাত্রীরা চিৎকার করছে। কোরাস শোনা যায়-মার! মার! সেবাব্রতের ব্যাটাদের হাড় গুঁড়িয়ে দে মেরে!

দম বন্ধ করে দৌড়চ্ছি বড় রাস্তা ছেড়ে। বড় বড় বাড়িগুলোর পেছনে একটা পুকুরের ধারে গাছ-গাছালির অন্ধকারে জায়গাটা থমথম করছে। ওইখানে এসে দাঁড়ালাম। লোকজন কেউ বিশেষ নেই এদিকে। আদকমশায়দের বিরাট বাড়িটার পেছনে বাগানে এসে পড়েছি। মতিলাল তখনও হাঁপাচ্ছে। গুপিনাথ রেডি আছে। আড়াইশো বৈঠকি দেওয়া ওর অভ্যাস। গুপিনাথ গুম হয়ে বলে-ঢের হয়েছে। এবার মানে মানে ঘরে ফিরে চল।

মতিলাল বলে-একটু দম নিতে দে। আর ওপথে নেই বাবা, ধরলে লাশ বানিয়ে দেবে।

আকাশ বাতাসে ওঠে আনন্দের সুর। ওদিক থেকে মাইকে গানের সুর শোনা যায়। পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের মাইকে ভলেনটিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-ভিড় সরিয়ে দাও। গেটে সারবন্দী যাত্রীদের যেতে সাহায্য করো।

ওরাই এবার টেক্কা দিয়ে গেল। আর হোঁৎকাদার বোকামিতে ফোর স্কোয়ার ক্লাব এবার পথে বসে গেল।

মতিলাল বলে-সামনের মাসে ফাংশন-নাটক এসব হবে না?

গুপি ধমকে ওঠে-যে নাটক করলি তাই সামলা এবার!

-হোঁৎকাদাকে রেসকিউ করবি না?

আমি ভয়ে ভয়ে বলি-মোটা লোকটা নির্ঘাৎ জোর ধোলাই দিয়েছে ক্যাপটেনকে।

গুপিনাথ বলে-আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এখন বাড়ি চল। এখন আমার হাতে ক্লাবের ফেস্টুনটা। রডে বাঁধা ওই লাল শালুর ফেস্টুনটা হাতিয়ে দৌড়েছিলাম।

অন্ধকারে হঠাৎ কিসের শব্দে চমকে উঠি। কে জানে কেউ বোধ হয় টের পেয়ে গেছে, তাই ধরতেই এসেছে আমাদের। কিন্তু ব্যাপার দেখে অবাক হই। আদক-বাড়ির দোতলার মহল থেকে দড়ি ধরে একটা লোক এসে ঝুপ করে পড়েছে ওই জঙ্গলে। আর একজনও নামছে। তার হাতে একটা ছোট বাক্স। বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটার পরনে কালো হাফ-প্যান্ট আর কালো গেঞ্জি। চমকে উঠে ঝোপের আড়ালে বসে আছি। ওদের কথাগুলো শোনা যায়। একজন বলছে-জোর হাতিয়েছি মাইরি! দু'দুটো গয়নার বাক্স। কর্তা গিন্নিরা ঝুলনের যাত্রা শুনছে। শুনুক যাত্রা! চল, হাজার তিরিশ টাকা তো হবেই। হীরের গহনা জড়োয়া সেট, চুনি পান্না, সোনা দানা। তা বড়লোক বটে।

গায়ে ঘাম দিচ্ছে। সামনেই বিরাট একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। আর দুটো লোকের হাতে হাজার হাজার টাকার চোরাই গহনা।

গুপির মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে, অন্ধকারে দু'চোখ জ্বলছে। আমিও ওর হাতের চাপে সজাগ হয়ে উঠেছি। আমার হাতে ফেস্টুনের একটা রড, অন্যটা গুপি টেনে নিয়ে তৈরি হয়েছে।

ঝোপের মধ্যে বসে আছি আমরা, মশায়, কামড়াচ্ছে খেয়াল নেই। লোক দুটো ওই ঝোপের পাশে সরু পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই আমি সজোরে আগের লোকটার মাথাতেই রডের এক ঘা বসাতেই লোকটা সামনের দিকে ছিটকে পড়ল, আর গুপি পিছনের লোকটার পায়ে মারতে সে ছিটকে পড়েছে, তার উপর দুমদাম শব্দে আঘাত করছে গুপি।

মতিলাল ওর ভরাটি নাটুকে গলায় চিৎকার করে-চোর-চোর!-চোওর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টর্চ, হ্যাজাক, লোকজন এসে পড়ে। ততক্ষণে ওই ফোর স্কোয়ারের ফেস্টুন-ফালা দিয়েই লোকদুটোকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছি। বাক্স দুটোও খুঁজে পাওয়া যায় হেজাকের আলোতে।

আদকমশাইও নিজে এসেছেন গোলমাল শুনে। দোতলার বারান্দা থেকে দড়িটা তখনও ঝুলছে। গহনার বাক্স দুটো দেখে চমকে ওঠেন তিনি। সর্বনাশ! এ যে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল ব্যাটারা।

আহত লোকদুটোকে আমরাই টেনে এনেছি। পুলিশ আফিসার এসে এবাক হল-আরে, একটা তো দাগি ডাকাত! আর রহমৎ তো খুনের ফেরারি আসামি! তোমাদের এই কাজ?

লোকদুটো মারের চোটে ধুঁকছে। গুপি বলে-আরও দুঘা দিই স্যার।

বাধা দেন দারোগাবাবু-ঢের হয়েছে! আর থাক গুপিনাথ। উঃ!বিরাট একটা কেস ধরেছ তোমরা।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ক্যাপটেন পশুপতিবাবুকে ধড়াচুড়ো পরে আসতে দেখে আদকমশাই বলেন-আপনার ছেলেরা কি করে পশুপতিবাবু? ধড়াচূড়া পরে লুচি আলুর দমই খায় কেবল। দুটো লোক এদিক থেকে গিয়ে ভিতরের মহলে ঢুকে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছিল, দেখেনি?

ভিড় ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠি। চেনা যায় না হোঁৎকাদাকে। সেই লোকটা বোধহয় আচ্ছাসে মেরামত করে গেছে সেবাব্রতী হোঁৎকাদাকে। গালে প্লাস্টার, কপালে আব গজিয়ে চোখ ঢেকে গেছে, বাঁ হাতটা গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ব্যান্ডেজ করা। খাকি শার্টটা ফেটে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জিও ঝুলছে। হোঁৎকাদা বলে ওঠে আদকমশাইয়ের কথায়-আমার সেবাদলের ছেলেরা স্যার অন্য ধাতুতে গড়া। নিঃস্বার্থ সেবাই তাদের ব্রত। আপনারা চাননি, তবু ওরা নীরবে সেবা করে গেছে আপনাদের।

আদকমশাইও কথাটা স্বীকার করেন এবার।

তাই এবার ফোর স্কোয়ার ক্লাবের বার্ষিক উৎসব বেশ জাঁকিয়ে করছি। লৌহ-ভীম গুপিনাথের ফিজিক্যাল ফিটস্, পটলার কণ্ঠসংগীত, আর শ্রীমতীলালের পরিচালনায় নাটকও হচ্ছে। হোঁৎকাদা আপাতত ওই নিয়েই ব্যস্ত।

তোমাদেরও নেমন্তন্ন রইল।

বরযাত্রী হোঁৎকা

বরযাত্রী যাবার আনন্দে হোঁৎকা অধীর হয়ে তার দেশজ ভাষায় বলে-হঃ! বিহার মধ্যে বরযাত্রী যাওনই আনন্দের। গাড়িতে যামু-খামু-হৈচৈ করুম।

গোবর্ধনের ছোট মামার বিয়ে, হরিপালের ওদিকে কোনো এক গ্রামে। তাই গোবর্ধনের বন্ধু হিসাবে লিস্টের মধ্যে আমরাও আছি। তবে বরযাত্রী দলে তরুণদের সংখ্যা কমই, মাত্র আমরা ক'জন। পটলা, ফটিক, আমি আর হোঁৎকা। গোবর্ধন তো নিতবর হতে হতে রয়ে গেছে।

এখান থেকে বাসে বরযাত্রীকুল যাবে, বর অবশ্য আলাদা গাড়িতে যাবে। বর বলে কথা। ফেরার সময় নতুন কনেও আসবে ওই গাড়িতে। বেশ ফুল, সবুজ শেওলা-টেওলা দিয়ে প্রজাপতি বানানো হয়েছে গাড়ির সামনে।

বিকেল নাগাদ বের হতে হবে।

গোবর্ধনের মামার কুমড়োর আড়াতে আমরা জমায়েত হয়েছি। ওপাশে ওদের বাড়ি, আড়তে কুমড়োর টাল, এক কেজি থেকে মৃদঙ্গের সাইজের আট-দশ কেজিটাকও আছে, ওদিকে চালকুমড়োর স্টক। পাউডার মাখানো পাশবালিশ, তাকিয়ার সাইজও আছে।

আজ কুমড়ো সেল বন্ধ। গোবরার মামা নদুবাবু তারকেশ্বরের কুমড়োর সাইজের ভুঁড়ি ঢেকে গরদের পাঞ্জাবি পরেছে। বর্ণটি কালো-তাতে চালকুমড়োর গায়ের মত পাউডারের প্রলেপ পড়েছে, গলায় মফচেন হার। ওদিকে এসে পড়েছে পাড়ার অনুকূল কবরেজ। শীর্ণ, পাকা বেলের মত চকচকে মাথা, কণ্ঠস্বর খাগড়াই ফাটা কাঁসরকেও হার মানায়। রয়েছে গুরুগম্ভীর মানুষ আমাদের স্কুলের সংস্কৃত স্যার, গলার উত্তরীয়, পরনে চটি। বাজারের ম্যানেজার হাবুলবাবু। বাজারের মাছ, ডিম, আনাজপত্র বিনা পয়সায় খেয়ে খেয়ে দেহটিকে যেন একটি জিপিও থামে পরিণত করেছে। কথায় কথায় লোককে শাসায়। গোবর্ধনের মামার বন্ধু কেশব ডাক্তারও এসেছে। বাজারে কেশববাবুর হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা।

অনুকূল কবরেজ ওকে দেখে বলে-ওই সাদা গুলিটাও বরযাত্রী যাচ্ছে?

কেশব ডাক্তারের পাশেই অনুকূলের কবরেজখানা। দুজনের প্রায়ই ঝগড়া বাধে। ও বলে-আমার রুগি ভাঙাবি?

কেশব বলে-শেকড়বাকড় দে রোগ সারে? সারে না। হ্যানিম্যান বলেন-

-রাখ তর হ্যানিমুন। চরক-শুশ্রুতের নাম শোনসনি? গণ্ডমূর্খ-

-খবরদার!

দুজনেই দোকান ছেড়ে পথে অবতীর্ণ হয়। এদিকে চকচকে টাক, অন্যদিকে বাবরি চুল কেশব। শেষে রোগীরাই তাদের ডাক্তার-কবরেজকে সামলায়। আজ কেশব এখানে এসে ওই মন্তব্য শুনে বলে-বরযাত্রী যাচ্ছ চলো কবরেজমশাই, বাজে কথা বলো না। নো টক।

আমাদের সংস্কৃত স্যার আশুবাবু বলেন-শান্তি-শান্তি-

ওদিকে বাকি বরযাত্রী দলও এসে পড়েছে। বরের গাড়ি রেডি। যেতে হবে অনেকটা পথ। আর কলকাতা থেকে বিকেলের দিকে যানজট ভেদ করে বের হওয়া অভিমন্যুর চক্রব্যূহ ভেদ করে বের হবার মতই কঠিন ব্যাপার।

অবশ্য লগ্ন রাত্রি নটার পরই। তবু দূরের পথ। গোবর্ধনের মামাই বরকর্তা। মামা ওই গাড়িতে বরের সঙ্গে নাপিত, পুরুতকে নিয়ে নিজে উঠে ম্যানেজারকে বলে-গাড়ি এলে এদের নে এসো। হরিপাল রোডের থেকে ডানদিকে কানা নদীর ধারে মাথাভাঙা কাদাপোঁতা গ্রাম।

কুমড়োর আড়তদার রাজুবাবু। ম্যানেজার ওখানে কুমড়ো আমদানি করতে কয়েকবার গেছে। বলে-ঠিক আছে।

এদিকে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বরকে বিদেয় করা হল। বরযাত্রীদের বাহনের দেখাই নাই। কে জানে বরযাত্রীবিহীন বিয়েই হবে। ওদিকে ফোন করে ম্যানেজার। বাসওয়ালা জানায় গাড়ি শ্রাদ্ধবাড়িতে গেছে, পার্টিকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে।

পণ্ডিতমশাই বলে-শ্রাদ্ধ তৎপর বিবাহ! কেমন অশুভ ব্যাপার হে-

অনুকূল কবরেজের আবার ভূতের ভয়। অবশ্য এ খবরটা অনেকেই জানে না। আমরা দেখেছি কুলেপাড়ার বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে সন্ধ্যার পর যাবার সময় কবরেজমশাই সজোরে রামনাম করে। সেদিন আমাদের দূর থেকে দেখে রামনাম ছেড়ে বু বু বু. করতে শুরু করে। ছিটকে পড়ে আর কি! আমাদের চিনতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়-তো-তো তোরা! সাড়া দিবি তো! আমরা হাসছি ওর অবস্থা দেখে। কবরেজ বলে-কাউকে বলিসনি বাবা। ওই কেশব যেন না শোনে।

আমরা অবশ্য কাউকে বলিনি, কবরেজমশাই ঘুষ বাবদ চ্যবনপ্রাশের গুলি কিছু দেয় আমাদের।

এহেন কবরেজ বলে-সত্যিই শ্রাদ্ধের ছোঁয়া-টোয়া নিয়ে বিয়েতে যাবে!

ম্যানেজার বলে-লোহাতে দোষ নেই।

বিকেল গড়িয়ে আসছে। শীতের দিন। আলো মুছে আসছে খালের বুকে। গাছগাছালিতে কাকের দল দিনের পরিক্রমা সেরে ফিরছে। বাসটা এলো এইবার।

বরযাত্রী দল রেডিই ছিল। বাহান্ন সিটের বাস ভর্তি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আমরা কজন অবশ্য উঠেই সিটকটা দখল করেছি। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় কবরেজ বসেছে কেশবের পাশেই, দুজনের মুখ দুদিকে, যেন ছোঁয়াও লাগাতে রাজি নয় কেউ কারো।

ম্যানেজার লাদাই পর্ব শেষ করে। কুমড়ো লোড করা মাথা, তাই বাকি কয়েকজনকেও তুলে এদিকে-ওদিকে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাসও যাত্রা করল।

দিল্লি রোড ছাড়িয়ে এবার বাস বাবার পথ দিয়ে চলেছে। সংস্কৃতের স্যার দু'হাত তুলে বাবা তারকনাথের উদ্দেশে স্তোত্র আওড়ায়-

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং

....

প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্।।

কে জয়ধ্বনি দেয়-জয় বাবা ভূতনাথ! এ ভূতপ্রেতের রাজ্য হে।

অনুকুল কবরেজের টাক ঘামছে। কেশব বলে-ভূতের দেশই বটে।

ধমকে ওঠে কবরেজ-ওনাদের নাম না নিলেই নয়?

ওদিকে বাজারের মাছের কারবারি নকুল এর মধ্যে বাবার প্রসাদও পেয়ে গেছে। সিগ্রেটের ভিতরে গঞ্জিকা পুরে জোরসে টান দিয়ে হিসাব করে দামি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ বুজে সে বলে-মলে সব ব্যাটাকেই তো ওই-ই হতে হবে গো। ভূতনাথই পরম গতি। জয় বাবা ভূতনাথ।

পথ অন্ধকার। বাস চলেছে নাচতে নাচতে। বরযাত্রী দলের পেটে দুপুর থেকে কিছুই পড়েনি। খালি পেটে বাসের নাচনে

খোল-কত্তাল বাজতে শুরু করে।

কালীবাবু বাজার ম্যানেজার হাবুলবাবুকে বলে-কি হে ম্যানেজার, তুমি বরযাত্রী নে যাচ্ছ না কুমড়ো চালান দিচ্ছ হে? লোকগুলোর কি খিদে-তেষ্টাও নাই? একটু চা-টা খাওয়াও হে।

ম্যানেজার ভেবেছিল এই বাবদ খরচটা পুরো বাঁচিয়ে নিজেই ম্যানেজ করে নেবে। কিন্তু গোবর্ধন বলে-সামনেই একটা ধাবা আছে, ম্যানেজারবাবু ওখানেই চা-টা মিলবে।

ম্যানেজার গাঁইগুঁই করে-এই তো এসে গেছি। কিন্তু বরযাত্রীদের চটানো নিরাপদ নয়। কাজেই থামাতে হল বাসটাকে।

ম্যানেজারের বেশ কিছু লোকসানই হল। বরযাত্রীর দল শুধু চাতেই থামেনি, টাও খেয়েছে-বিস্কুট, টোস্ট কেউ আবার ওমলেট।

ম্যানেজার বলে-তাড়াতাড়ি করুন ডাক্তারবাবু, বিয়েবাড়িতে গিয়ে জলটল খেতে হবে আবার। কিন্তু সে কথাতে কেউ কান দেয় না।

বিয়েবাড়ি অবশ্য সেখান থেকেও ঘন্টাখানেকের রাস্তা। তবে এটা পাকা রাস্তা নয়, মেঠো রাস্তা। মোরাম ইঁট ভাঙা ঢালা। কুমড়ো, আলুর লরিই যাতায়াত করে। বাসওয়ালা বেঁকে বসে-নেই যায়েগা।

একেবারে মাঝ মাঠ। রাতের অন্ধকার নেমেছে। পথের ধারে একটা পুরোনো বটগাছ, এদিক-ওদিকে ঝুরি নেমেছে।

দত্তমশায় নেমে বলে-এ কোথায় এলেম হে?

কবরেজ মশাই নেমেই আঁতকে ওঠে। ওর চকচকে টাকে সাদা চুনগোলা কিছুটা বস্তু পড়েছে গাছের উপর থেকে। তারপরই ডাল কাঁপিয়ে শন শন শব্দ। কোথায় একটা বাচ্চা ছেলে ককিয়ে ওঠে।

-রাম রাম রাম! কবরেজ মশাইয়ের টাক থেকে সেই তরল বিষ্টা গড়িয়ে কপালে এসেছে। রুমাল দিয়ে মুছে নেয়। তবু কপালে খানিকটা লেগে থাকে তিলকের মতো।

হাবুলবাবু বলে-শকুনির পাল রয়েছে গাছে। কাছেই শ্মশান।

-অ্যাঁ! কবরেজমশাই কেন, অনেকেই আঁতকে ওঠে। ভুতের রাজ্যে এসে পড়েছে। কেশব ডাক্তার ভয় পেলেও চুপ করে থাকে। সংস্কৃতের পণ্ডিত তখন কালীস্তোত্র শুরু করেছে-ওঁ কালী কালী মহাকালী-শুভদে বরদে দেবী-

ম্যানেজার বলে-ড্রাইভারজি, থোড়া চলো জি। সামনেই বিয়েবাড়ি।

ড্রাইভার বলে-শ্বশুরবাড়ি হলেও ভি নেহি যাবে। গাড়ি ব্যাক করবে কাঁহা? বহুত খারাব রাস্তা।

সংস্কৃত স্যার বলে-এ যে বহুত অপবিত্র স্থান হ্যায়। অপদেবতা রহতা ইধার।

ড্রাইভার বলে-অপদেবতা! সো কোন চীজ!

হাবুলবাবু বলে-ভূত পিরেত জানতা?

-হ্যাঁ ভূত! রহনে দেও। আপলোক পায়দল চলা যাইয়ে। নজদিক তো হ্যায়। হম নেহি যায়েগা।

বলে সে ব্যাটা সিটের উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। নড়ার লক্ষণও নেই। কবরেজ বলে-ও মানুষ না ভূত-পেরেত হে? অ্যাঁ! ভূতের কথা শুনে শুয়ে পড়ল। ছেরাদ্ধ বাড়ি থেকে গাড়ি নে আসাই ভুল হয়েছে। কে জানে ভূত-টুত কিছু রয়ে গেছে কিনা!

সংস্কৃত স্যার বলে-ভাববার কথা!

ওদিকে খিদের জ্বালা শুরু হয়েছে। গাড়ি যাবার লক্ষণ নেই। গ্রামের বিয়েবাড়ি কতদূরে জানি না। গোবরা বলে-মুশকিল হল।

হোঁৎকার খিদে সহ্য করার অভ্যাস নেই। দুপুরের পর পেটে কিছুই তেমন পড়েনি। উল্টে ঝাঁকানির চোটে যা ছিল তাও হজম হয়ে গেছে।

পটলা বলে-ভূ-ভূতের দেশে এনে ফেলেছে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে-তহন কইলাম যামু না। হালায় কুমোড় মহাজনের বিহা, তার বরযাত্রী! ল্যাঙোটের কয় বুকপকেট! এহন কি খামু?

শেষ অবধি পেটের জ্বালায় আর ভূতের ভয়েই এরা রাজি হয় হেঁটে যেতে। ম্যানেজার অভয় দেয়-পথ বেশি নয়।

অন্ধকার রাত্রি, তবু আকাশে ঝকঝকে তারার মেলা। ওরই আভায় দেখা যায় পথের রেখাটা। ওই পথ ধরে সঙ্গের দু'একটা টর্চের আলোয় কোনোমতে এগিয়ে চলি।

সামনে চলেছে বদন খাঁড়া, সে নাকি এসব অঞ্চলে, সুন্দরবনে, মধ্যপ্রদেশের বনে-পাহাড়ে বাঘ, হাতি শিকার করেছে। সেই লিড করে চলেছে। হঠাৎ এদিকের ঝোপ থেকে নীল জ্বলন্ত চোখ নিয়ে দুটো প্রাণী এসে রাস্তার উপর আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে চাপা গর্জন করতে থাকে।

দলটা থেমে যায়। বদন খোঁড়া বাপ্‌রে বলেই তুড়ি লাফ দিয়ে এপাশের বনবাদাড় ভেদ করে দৌড় লাগায়। পিছনেই ছিল সংস্কৃত স্যার। তিনি তো কাঁটাগাছে কাপড়টা আটকে যেতে কাপড় রেখেই আন্ডারওয়ার পরে যঃ পলায়তি সঃ জীবতি-এই নীতি গ্রহণ করে হাওয়া। বাকিরা অস্ফুট আর্তনাদ শুরু করেছে।

হোঁৎকা পথের থেকে গোটা দুই আধলা ইঁট নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়তে ওরাও পালায়। টর্চের আলোয় দেখা যায় এক জোড়া শিয়াল। তারাও এসময়ে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

শিয়াল তো গেল-এদিকে বদন খাঁড়া আর পণ্ডিতমশাই উধাও। হাঁকডাক করতে দূর থেকে সাড়া মেলে সংস্কৃত স্যারের-এই যে এইস্থানে। আমার বস্ত্রটা দাও।

বস্ত্রদান করে স্যারকে ফিরে পেলাম, বদন তখনও লা পাত্তা। শেষে দূর থেকে বদন সাড়া দেয়-আসছি।

বদনচন্দ্রকে আর চেনা যায় না। বেগে ধাবমান হয়ে বোধহয় অন্ধকারে কোনো জলার মধ্যে পড়েছে। কাদা-পাঁকে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি বিবর্ণ। বদন বলে-ব্যাটাদের ধরব বলেই ওৎ পেতেছিলাম, তা ব্যাটারা পালালো বদনের চোখে ধুলো দিয়ে।

বরযাত্রী দল চলেছে সামনে। ক্রমে দূরে আলো দেখা যায়, শোনা যায় লোকের কোলাহল। পটলার অভ্যাস পথেঘাটে বের হলে জলের বোতল সঙ্গে রাখা। অবশ্য দেখলাম অনেকেই জলের বোতল নিয়ে এসেছে। পথেঘাটে জল ঠিক মেলে না। এতক্ষণ ওই জলের উপরই চলেছি। এবার সামনে বিয়েবাড়ি দেখে আমাদের চলার স্পিডও বেড়ে ওঠে।

গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ি। রাস্তা থেকে বাগান, বাঁশবন শুরু, তারপর বড় এলাকা জুড়ে বাড়ি। সামনে বিরাট প্যাণ্ডেল করে জেনারেটারে আলো জ্বালা হয়েছে। বাইরে দু'তিনটে গাড়ি, তার মধ্যে বরের গাড়িও রয়েছে।

ম্যানেজার এগিয়ে যায়। বিয়েবাড়িতে আমাদের দেখে অভ্যর্থনার ধুম পড়ে। হাঁক-ডাক শুরু হয়, বসার জায়গা এগিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার এসে যায় প্লেটে। সিঙ্গাড়া, কচুরি-চার-পাঁচ রকম মিষ্টি। খিদের মুখে তখন পাল্লা দিয়ে জলখাবারই চলেছে। হোঁৎকা তো একসঙ্গে তিনটে এডিশন শেষ করে দিল। কবরেজ মশাই, সংস্কৃত স্যার মায় হাবুল, দত্তবাবুও দু'প্লেট করে শেষ করে গরম চা নিয়ে বসে।

ওদিকে বাদ্যবাণ্ড চলেছে। অন্দরে উলু-শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। রাত তখন প্রায় বারোটা।

গোবরা বলে-কই মামাদের কাউকে দেখছি না?

হোঁৎকা বলে-এহানে এহন হক্কলেই তর মামা। পাইবি। মামা যাইব কনে! চুপ মাইরা বোস।

এর মধ্যে হাবুলবাবু খোঁজ এনেছে, এদের খাওয়ার আয়োজনও দারুণ। মাছ-মাংস ভরপেট, মিষ্টান্ন পাঁচ পদের।

সংস্কৃত স্যার বলে-ভূষিমাল বেশি খেয়ে নিলাম হে।

অনুকূল কবরেজ ব্যাগ থেকে একটা মাঝারি বয়াম বের করে বলে-কোনো ভয় নাই। লৌহজারকচূর্ণ এনেছি, খেলে লোহা অবধি হজম হয়। এক মাত্রা করে খেয়ে নাও-

নিজেও এক মাত্রা খায়। সংস্কৃত স্যার, হাবুল, গোবরা হোঁৎকা আরও অনেকে খায়। কেশব ডাক্তার বলে-ওসবে কি হয়? পালসেটিলা থার্টি খেয়ে নে, ডবল খিদে হবে।

কবরেজের তেতো-কষা বিস্বাদগুলির চেয়ে ওই মিষ্টি লবেনচুসের মত গুলিই খাই আমরা। অনুকূল কবরেজ বলে-ঠকলে। হাতে হাতে ফল পাবে এর। ওই হনিমুনের গুলিতে কি হবে? কিসসু না।

-খবরদার!

-অ্যাও! গর্জে ওঠে কবরেজ।

বিয়ের আসরেই দুজনের বাধে আর কি লড়াই। হঠাৎ কন্যাকর্তাদের কে বলে-রাত হয়েছে। ভোজনপর্ব সেরে নিলে হত না?

-উত্তম প্রস্তাব। সংস্কৃত স্যারই এসব ব্যাপারে একটু তৎপর। ফলে কবরেজ আর কেশবের লড়াইটা মুলতুবি রইল। খাবার জায়গায় গিয়ে বসা গেল।

নাহ্‌। উত্তম ব্যবস্থা। গরম রাধাবল্লভী, কাশ্মিরী আলুর দম, বিরিয়ানি-তার সঙ্গে গরম মাংসের কারি পাতে পড়েছে। বেশ জমে উঠেছে ভোজনপর্ব। মাংস রিপিট হচ্ছে। হঠাৎ এমন সময় দেখা যায় আর একদল বরযাত্রী উইথ বর এসে গেছে।

এবার সেই কন্যাকর্তাদের রূপও বদলে যায়। একটু আগেই কত খাতির আপ্যায়ন, এবার গর্জে ওঠে মুশকো সেই কন্যাকর্তা আরও কজন-এটা কি! দল বেঁধে লোক ঠকানো! অ্যাই ন্যাপা-ভূতো-গজু, ঘিরে ফেল সবকটাকে, এক ব্যাটাও যেন পালাতে না পারে। ফাঁকি দিয়ে বরযাত্রী সেজে ঠকিয়ে যাবে হাড়ভাঙা নিকেশপুরে এসে! সব কটার হাড় ভেঙে দফা নিকেশ করে দেব। ওঠো-

বদন খাঁড়া ওদিকের লাইনে প্রথম কাদা মাখা জামাকাপড় পরে বসেছিল। তার নুড়ো ধরে তুলে সপাটে একটা রদ্দা ঝেড়ে গর্জায় সেই মুগুরের মত চেহারার লোকটা। -তখনই বোঝা উচিত ছিল, ধানখেতের কাদা থেকে উঠে এল কোন ব্যাটা! বরযাত্রী! আবার এক রদ্দায় বদনের বদনই বিগড়ে যায়।

সংস্কৃত স্যার তিড়িং করে লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বলে-আমাদের খোঁজখবর নিতে দিলেন? সোজা জলখাবারের প্লেট ধরিয়ে দিলেন, আমরাও প্রাপ্তিমাত্রেন ভক্ষয়িষ্যৎ-খাইলাম।

-চোপ! বিটলে বামুন, ঘাটের মড়া, এখনও নোলা গেল না?

ম্যানেজার বলে-বিশ্বাস করুন, ভুল হয়ে গেছে। আমরা বরযাত্রীই।

-তবে এখানে এসে জুটলে কেন?

অনুকূল কবরেজের কপালে তখনও শকুনের বিষ্ঠা তিলকের মত বিদ্যমান। কবরেজ বলে-ভ্রমপূর্বক। বিশ্বাস করুন।

সংস্কৃত স্যার বলে-আমরা প্রবঞ্চক নই।

ম্যানেজার শোনায়-মাথাভাঙায় আমার মালিক কুমড়োমার্চেন্ট গদাইবাবুর ভাইয়ের বিয়ে। সেখানে যেতে এখানে এসে পড়তে এই কাণ্ড। কিছু বলার অবকাশই দিলেন না।

এর মধ্যে অবশ্য বরযাত্রীদের দু'চার জন গজু-ন্যাপার দলের হাতে বেশ দুচার ঘা খেয়েছে। হোঁৎকা কি বলতে গিয়ে তার দেশজ ভাষায় তালগোল পাকাতে তাকেও নাক বরাবর কে একটা ঘুঁষি ঝেড়েছে। গোবরার কপাল আমড়ার মত ফুলেছে, তার সিল্কের পাঞ্জাবি বুকখোলা চাইনিজ শার্টে রূপান্তরিত হয়েছে।

শেষ অবধি রেহাই পাই অনেক কাকুতি-মিনতির পর। তারাই জানায়-মাথাভাঙা ওই বড়তলা থেকে উত্তরে দেড় মাইল মাঠ পার হয়ে আমরা দক্ষিণে চলে এসেছি পথ ভুলে। ফিরতে হবে আবার সেই বটতলায়।

কোনোমতে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে বের হলাম। মাঠ ভেঙে আবার সেই বনঢাকা বটতলায় এসে উত্তরের পথ ধরে যেতে হবে। তবে সেই বিয়েবাড়ি। রাত তখন দুটো বেজে গেছে। মধ্যরাত্রি। যুদ্ধে পরাজিত, বিপর্যস্ত, ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনীর মত কোনোমতে ফিরছি। দূরে অন্ধকারে ঘন বটগাছ, জঙ্গলটা দেখা যায়। গাড়ির ভিতর একটা মোমবাতির মত আলো জ্বলছে।

এবার শুরু হয় আসল বিপর্যয়। পথের ধারে জঙ্গলে কে দৌড়ে সোঁদলো, তারপরেই সংস্কৃত স্যার বলে ওঠে-উদরে তীব্র বেদনা, উঃ! তিনিও দৌড়লেন এদিকের বনে। অন্ধকার চারিদিক। দেখি এতগুলো বরযাত্রীদের অনেকেই এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছে।

হোঁৎকা বলে-জলের বোতল। পরক্ষণেই গর্জে ওঠে-বোতলটা দেহি। ছোঁ মেরে জলের বোতল নিয়ে দৌড়লো সেও, পিছু পিছু গোবরাও।

বটতলার জঙ্গলে আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে আছি। বাকি যে যেদিকে পেরেছে দৌড়েছে। অনুকূল কবরেজও দৌড়েছে। অন্ধকারে বসে পড়ে।

ঘন জঙ্গল। গাছের উপরে ছোট ছেলের আর্তনাদ, শন শন হাওয়া বয়। ঠান্ডাটাও বোধ হচ্ছে। কোথায় যেন হাসছে কারা।

কবরেজ প্রকৃতির ডাকে চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়েছে। হঠাৎ নাকিস্বরে কে বলে-কঁবরেজ, জঁলের বোঁতলটা রেঁখে যাঁও। কঁবরেজ-

কার ঠান্ডা হাতের ছোঁয়া। কবরেজ ভাবে, বুঝি বটগাছের ভূত-প্রেতরাই ধরেছে তাকে। আর্তনাদ করে ওঠে কবরেজ-ভূ-ভূ-ভূত! মেরে ফেললো রে-

ছুটে যাই আমরা। কবরেজ তো ধরাশায়ী আর বদন বলে-ওঁ কঁবরেজ মঁশাই-আঁমি।

মারের চোটে বদনের নাক বিগড়ে এখন নাকি স্বর বের হচ্ছে। সেও প্রকৃতির তাগিদে ঝোপে বসে পড়েছিল। এবার জলের দরকার হতে কবরেজের বোতলটা চাইতেই এই বিভ্রাট। চোখেমুখে জল দিতে কবরেজকে সুস্থ করে তুলতে, উঠেই সে আবার দৌড়াদৌড়ি করছে। এবার কবরেজ চিঁ চিঁ করে বলে-লৌহজারকচূর্ণ মনে করে উৎকৃষ্ট জোলাপের শিশিটাই এনেছিলাম বোধহয়। ওরে বাবা-

আবার দৌড়লো কবরেজ ঝোপের দিকে। একা কবরেজ নয়, লৌহজারক চূর্ণ যারাই খেয়েছিল তাদের অবস্থা তখন কাহিল।

এমন সময় হৈ হৈ করে ওদিকের গ্রাম থেকে আলো, লাঠিসোটা নিয়ে এসে পড়ে মাথাভাঙার কুমড়োমামার বেহাইয়ের লোকজন। বরযাত্রীদের গাড়ি পৌঁছায়নি দেখে তারা এইবার খোঁজ নিতে এসে দেখে বরযাত্রীদের ওই অবস্থা। ঘন ঘন ঝোপের দিকে দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই। আর নতুন করে বরযাত্রী যাবার তাগদ তাদের নেই।

কেশব ডাক্তার কিছু জরুরি ওষুধ সঙ্গে নিয়ে গেছল, তাই দিচ্ছে সকলকে। হোঁৎকাও খায়। অনুকূল কবরেজও বলে-তাই দে কেশব। জয়পালের মাত্রাটা জোলাপে বেশি হয়ে গেছে-উঃ। আবার দৌড়ায় সে।

সংস্কৃত স্যার কিছুটা সামলে বলে-আর বরযাত্রী যাইতে পারিব না। মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। সংস্কৃত স্যার একটা সিটে এলিয়ে পড়েছে। প্রায় সকলের ওই অবস্থা। বদনের তো পেটে-নাকে দুদিকেই যন্ত্রণা।

ভোর হয়ে আসছে। পাখিদের ঘুম ভাঙে। সারা মাঠ আলোয় ভরে ওঠে। কন্যাপক্ষ নিয়ে যাবেই। বরযাত্রী বলে কথা! ড্রাইভার বলে-হম্‌কো অন্নপ্রাশনের ট্রিপ লে যানে হোগা বারো বাজে। অব যায়েগা হম্ কলকাত্তা। যানা হ্যায় তো চলো-নেহি তো হম গাড্ডি লেকে ভাগেগা।

বিয়ের আসরে আর যাওয়াই হল না। ভূতুরে বটতলা থেকেই ফিরে এলাম। কারো আর সাড়াশব্দ নেই।

সংস্কৃত স্যার বলে-বরযাত্রী কদাপি যাওয়া উচিত নয়। যাহারা বাপের কুপুত্র তাহারাই যায় বরযাত্রী। সুপুত্রেরা ওই কর্ম কদাপিও করে না।

তবু অনুকূল কবরেজ বলে-কি কেশব, ওষুধ আমি খাঁটিই তৈরি করি দেখলি তো? নেহাত অদল-বদল হয়ে গেছল, তাই। এ তোর ঘুমন্ত হনিমুন হোমিওপ্যাথি নয়, জীবন্ত ওষুধ। বুঝলি। তাই এই হাল!

অবশ্য গোবরার কুমড়োমামা বৌভাতে এই খামতিটা পুষিয়ে দিয়েছিল। দারুন খাইয়েছিল।

পটলার কারসাজি

পটলা আবার এক প্রবলেম নিয়ে পড়েছে। প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যাগুলো যেন পটলার আশেপাশেই থাকে গা-ঢাকা দিয়ে, যখন তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এবারও তাই হয়েছে।

পটলা এবার বড় মামার বাড়ির গ্রামে গিয়েছিল পুজোর সময়। পটলার মামারা অনেকেই এখন ওই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকেন না। শহরে তাঁদের বাড়ি, ব্যবসাপত্র।

শহর থেকে ওই গ্রাম প্রায়, তিরিশ মাইল দূরে। এককালে ওসব অঞ্চল ঘন শাল, মহুয়ার বনে ঢাকা ছিল। পটলার দাদু ছিলেন এই অঞ্চলের জমিদার। পুরোনো সাবেকি আমলের চকমিলানো বাড়ি। চারপাশে যত্ন করে আম, কাঁঠাল, লিচু গাছ লাগিয়েছিলেন।

এখন জমিদারি আর নেই, দাদুও মারা গেছেন। তবে নামডাক রয়ে গেছে। গ্রামের বাড়িতে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় শশীবাবু থাকেন। তিনিই জমিজায়গা দেখাশোনা করেন। মামারা পুজোতে গ্রামের বাড়িতে যান, কারণ পৈত্রিক দুর্গাপুজোটা এখনও রয়ে গেছে। বেশ ধুমধাম করেই হয়।

পটলা সেবার মামাদের সঙ্গে দেশের বাড়িতে গিয়ে ওই রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের দেখে এসেছে।

আর কলকাতায় ফিরে সেদিন ক্লাবে এসে ঘোষণা করে,-আমি পল্লীগ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের পাশে দাঁড়াব, শিক্ষার আলো বিতরণ করব। রবীন্দ্রনাথ ব-ব বলেছেন-

বেশি আবেগ চাপলে পটলার জিবটা আলটাকরায় মাঝে মাঝে সেট্ হয়ে যায়।

হোঁৎকা, ক্লাবের মাঠে শুধু মুখেই বসেছিল। ক'দিন পটলা অর্থাৎ আমাদের ক্যাশিয়ারই ছিল না, ক্লাবের পকেটের স্বাস্থ্যও তাই খারাপই চলছে। হোঁৎকা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে-ঝালমুড়ি, ফুচকা কিছু আছে? তয় তর কথা শুনুম-নয় তো যাই সেভেন বুলেট্স্ ক্লাবেই। ওগোর ওখানে টোস্ট-ওমলেট দিব কইছে।

হোঁৎকা উঠছে, গোবর্ধনই বাধা দেয়। বলে,-বসো। টোস্টই হবে। পটলা-কেমন বেড়িয়ে এলি শোনা। ফটিক-জগাদাকে বলে আয় পটলার হিসেবে যেন টোস্ট-ওমলেট পাঠায় এখানে।

হোঁৎকা তাড়া দেয়,-তুই লইয়া আয় সঙ্গে কইরা। যেন গরম থাকে। ক' পটলা, কি যেন কইছিলি?

পটলার কাছে এই কটা টাকা তেমন কিছুই নয়। বিরাট পরিবারের একমাত্র বংশধর সে। ওর বাবা-কাকাদের বিশাল ব্যবসা, আর ঠাক্‌মার নয়নমণি। দুটো বাজারের মালিক ওর ঠাক্‌মা। সুতরাং পটলাই আমাদের ক্লাবের কামধেনু। পটলার নানা প্রবলেম আমাদেরই সল্‌ভ করতে হয়।

এবার, পটলা ঘোষণা করে,-দেশের মানুষের জন্য কিছু করা দরকার। তাই ভাবছি ওই দূর পাড়াগাঁ কুসুমডিতেই যাব।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মূল সভ্য বলতে আমি, ফটিক, গোবর্ধন, হোঁৎকা। ফটিক আবার গানের চর্চা করে। একটা লাইনই প্রায় বছর খানেক ধরে রবারের মত টেনে লম্বা করে, আর গিটকারি দিয়ে তান তোলে। গোবর্ধনকে দেখতে গিরিগোবর্ধনের মতই। তার মামার সঙ্গে সে কুমড়ো, চালকুমড়ো ইদানীং চিটে গুড়ের কারবার করে। আর সেক্রেটারি ওই হোঁৎকা। বেশ প্রমাণ সাইজের গতরখানা। মাথায় ওর বদবুদ্ধি যেন ঠাসা আছে। সাহসও ওর অনেক। ঠান্ডা মাথায় সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবে দোষ একটাই একটু বেশি মাত্রায় পেটুক। খিদের সময় কিছু না খেলে ওর মাথা গরম হয়ে যায়।

-পটলার কথায় এবার হোঁৎকা বলে আবার একখান ঝামেলা পাকাইবি পটলা?

পটলা বলে-ঝামেলা কে-কেন? ম-মহৎ কাজ। তোরা না যাস এ-একাই যাব।

পটলার ঠাকুমা নাতির এহেন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে চমকে ওঠে,-অ, বৌমা, পটলা কি বলে দ্যাখো! সে তো বনবাদাড়-একেবারে বুনো জায়গা, বুনো হাতির পাল ঘোরে-

পটলা বলে,-তাদেরই দেখার কেউ নেই ঠাক্মা। শিক্ষার আলো পায়নি তারা। আমাকেই যে যেতে হবে।

পটলার যে কথা সেই কাজ। ও যাবেই। এর মধ্যে বেশ কিছু অ আ ক খ-ইত্যাদির বই, স্লেট-পেন্সিল এসব কেনা হয়েছে। বেশ কয়েক ব্যাগ লজেন্সও কিনেছে। কচিকাঁচা পড়ুয়াদের আকর্ষণ করার জন্য।

আর এই কারণেই ঠাক্মার ডাক পড়েছে। ও বাড়ির পুরোনো চাকর শম্ভু পটলার এই ডেরা চেনে। সে সন্ধ্যার মুখেই এসে আমাদের খবর দেয়,-ঠাক্মা ডাকছে। জোর তলব।

হোঁৎকা বলে,-পটলার ক্লাবে আর নাই, রেজিকনেশন দিমু।

গোবর্ধন বলে,-মাথা গরম করিস না। স্কুলের তো এখন ছুটি, চল ঠাক্মা কি বলে শুনে আসি।

পটলার ঠাক্মা আমাদের দেখে বলে,-এসেছিস? দ্যাখ গে পটলার কাণ্ড! কোথায় বুনোদেশে যাচ্ছে-কি যে করি! থামাতেও পারছি না। তোরাও যা সঙ্গে।

গোবরা বলে,-ঠাক্মা, কুমড়ার সিজন। মাল কিনতে হচ্ছে।

-ওদেশে কুমড়ো পাবি জলের দরে।

ঠাক্মার কথায় গোবরা খুশি হয়। জলের দরে কিনে এনে এখানে পাইকারি চার টাকা কেজি বেচলে প্রচুর লাভ হবে।

ফটিক তো গান বেঁধে বসে আছে।

পটলার মা বলে,-হোঁৎকা, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, বাগানের আম কাঁঠালও আছে। আর মুরগিও সস্তা।

হোঁৎকার পেটুক মন এবার নেচে ওঠে। বলে,-ঠাক্মা আপনি যহন কইছেন-যামু।

তারপরই হোঁৎকা প্যাঁচটা কষে,-মুশকিল হইছে ফুটবল টিম লইয়া। মানে এহানে না থাকলি চাঁদাও উঠব না, টাকা না হলি টিমও হইব না।

গোবর্ধনও ধুয়ো ধরে,-তাই তো যাবার সমস্যা হচ্ছে।

ঠাক্মা বলে,-কত টাকা চাঁদা তুলিশ তোরা?

হোঁৎকা বলে ওঠে,-ধরেন হাজার সাতেক তো লাগবোই। দোরে দোরে ঘুরতি হয়।

ঠাক্মা বলে-দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে না। সরকার মশাই-

সরকার মশাই হাজির থাকে গিন্নিমার আশপাশেই। সে-ও এসে হাজির হয়,-ডাকছেন মা?

ঠাক্মা বলে,-এদের ক্লাবের নামে দশ হাজার টাকা দান বাবদ লিখে টাকাটা আজই দিন।

যে আজ্ঞে।-সরকার মশাইও সায় দেন।

এবার ঠাক্‌মা বলে-ওই ফুটবলের সমস্যাটা মিটে গেল। তোরা তৈরি হয়ে নে ভাই, পটলাকে একা ছাড়তে মন চায় না।

পটলার সঙ্গে যাবার আর কোনো বাধাই নেই।

রাতের ট্রেন, সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ট্রেনে উঠেছি। সরকারমশাই আগে থেকেই রিজার্ভেশন করে রেখেছিল, তাই বার্থ পেতে অসুবিধা হয়নি। আমরা পাঁচজনই বেশ আরাম করে শুয়েছি। গাড়িও চলছে। সেকেন্ড ক্লাস ক্যুপে থাক-থাক তিনটে করে ছ'টা বাঙ্ক। আমরা পাঁচজনে পাঁচটা দখল করেছি, আর নিচে এক বয়স্ক টাক-মাথাঅলা ভদ্রলোক রয়েছেন।

নীল মৃদু আলো জ্বলছে, কামরার সবাই ঘুমে মগ্ন, হঠাৎ ওদিক থেকে কাদের কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,-কেউ নড়বে না। যে যেখানে আছ, সব জানলা বন্ধ করে বসে থাক। খবরদার! কাজে বাধা দিলে গুলি চলবে।

দেখি কামরার দরজাগুলো লক করে জানলার স্টিলের সাটার, কাচের শার্সি অবধি বন্ধ করে দিচ্ছে কয়েকজন লোক। আর ওদের হাতে উদ্যত রিভলবার, ভোজালি, রড। কারো হাতে ছুরি, কামরার আলোয় চকচক করছে। ওরা সব জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে, যাতে কোনো শব্দ বাইরে না যায়।

পটলা বলে,-ডা-ডাকাত!

আজকাল ট্রেনে ডাকাতি প্রায় রোজকার ঘটনা। কিন্তু আমাদের ট্রেনে আজই ডাকাত পড়বে ভাবিনি।

ওদিকে এক একটা ক্যুপে দুজন করে ঢুকে লুটপাট শুরু করে দিয়েছে।

বেশ মিষ্টি সুরেই আমাদের বাঙ্কের নীচেকার ভদ্রলোককে এক ডাকাত বলল,-ক্যা হ্যায়, দেও বাবা!

ভদ্রলোক জামার পকেট থেকে শতখানেক টাকা বের করতে একজন বলে,-বাবা! এহি?

লোকটি বলে,-এই আছে।

ওদের মনঃপূত হয় না কথাটা। রড এটাচিতে কয়েকটা ঘা মারতে এটাচিটা ফেটে যায়। ভিতর থেকে জামা কাপড় টেনে বের করে কাগজের মধ্যে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ছাড়া ভাঙানো যাবে না দেখে গর্জে ওঠে,-পঞ্চাশ হাজার রুপেয়ার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট! নগদ ক্যাশ কিঁউ নেহি লায়া?

অর্থাৎ নগদ টাকা না এনে ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট এনে ভদ্রলোক যেন ওদের পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি করেছেন। এবার ওদের একজন সেই ড্রাফ্‌টটা ছিঁড়ে ফেলে গর্জে ওঠে,-অব ক্যা হোগা? কৌন্‌ বাঁচায়েগা?

এরপর ওরা ভদ্রলোককে নির্দয়ভাবে মারতে থাকে।

হোঁৎকা বাঙ্কের উপর থেকে নামতেই একজন ওর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে শাসায়,-একদম চুপ থাকবি।

লোকটা ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোটা পঞ্চাশ টাকা বের করে নিয়ে প্যান্ট-জামা সার্চ করছে। গোবরাও নিঃস্ব। তারও সব গেছে।

আমি বলি,-ভদ্রলোককে মারছ কেন?

একজন আমার গালে সপাটে চড় মেরে গর্জায়,-চুপ!

ওদিকে মেয়েদের কার কানের দুল খুলতে সময় লাগছে দেখে ভোজালি দিয়ে কানের লতিই কেটে নেয়, দুল সমেত। কান্না, আর্তনাদ ওঠে।

ওই নিষ্ঠুর পশুর দল সবার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে, নির্দয়ভাবে মেরে আহত করে, মাঝমাঠে চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে বীরের মত নেমে চলে গেল।

তারপর চিৎকার কান্নাকাটি শুনে পাশের কামরার লোকজন এল, গার্ডসাহেবও এল। পেছনে পেছনে ভুঁড়ি দুলিয়ে রাইফেল কাঁধে দুজন মোটকা পুলিশ এসে শুধোয়,-ক্যা হুয়া! আপ্‌লোক ক্যা করতা থা?

যাত্রীরা চটে আগুন। কেউ বলে,-কোথায়, ঘুমচ্ছিলে পুলিশ সাহেব? কি হয়েছে এখনও ঘুমচোখে দেখতে পাচ্ছ না? এইভাবে মেরে সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে!

-ক্যায়সে হুয়া?

হোঁৎকা বলে ওঠে,-হুক্কা হুয়া!

পুলিশপুঙ্গব জবরদস্ত মোচ পাকিয়ে গর্জে ওঠে,-কৌন?

ডাকাতদের ধরতে না পারলেও নিরীহ সর্বস্বান্ত যাত্রীদের যে ধরে বেঁধে হাজতে পুরতে পারে সেইটাই ঘোষণা করে।

কে একজন বলে,-থানায় গিয়ে কেস লেখাতে হবে!

ওরা তাতেও রাজি নয়। ট্রেন এতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। শেষ অবধি যাত্রীরা বলে,-ট্রেন যেতেই দেব না।

যাই হোক, একটা কাগজে কেস লেখানোর পর ট্রেন ছাড়ল।

এর কয়েকটা স্টেশন পরই নামব আমরা। বলি,-সবই তো গেছে! হোঁৎকা বলে,-না, আছে কিছু! ব্যাটারা সন্ধান পায় নাই।

এই বলে হোঁৎকা তার পায়ের মোজা খুলে তার ভিতর থেকে ক্লাবের ফুটবল টিম তৈরি করার পর হাজার তিনেক টাকা বেঁচে ছিল। সেইটা বের করে।

পটলা বলে,-এই মাত্র স-সম্বল! এখন এই দিয়ে নিরক্ষরতা দূর ক-করতে হবে?

হোঁৎকা বলে,-লোকগোর শিক্ষা দিবি দে, তর এই ডাকাতগোর কিছু শিক্ষা দিতেই লাগব। ব্যাটারা এক্কেবারে জানোয়ার। ওই কপালকাটা, ওদিকের বাবরি চুলওলা, আর মুখে বসন্তের দাগওলা সর্দার মত লোকটা। ছেলেগুলোর যদি পাইতাম-এমন শিক্ষা দিতাম ওরা ভুলতি পারত না।

গোবর্ধন বলে,-ঠিক বলেছিস, ওই শয়তানদের যদি ধরতে পারতাম দু একটাকে-

ফটিক ভয়ে তখনও বিবর্ণ হয়ে আছে। পটলাও ভাবছে কথাটা। ওই শয়তানদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ট্রেন ততক্ষণে আমাদের নামার স্টেশনে এসে গেছে। জেলার সদর শহর। আমরা মারধর খেয়ে সব হারিয়ে ঝুলঝাড়া অবস্থায় নামলাম।

পটলার মামাদের শহরেও বিরাট বাড়ি। বাজারে ব্যবসাপত্র আছে। আমাদের নিতে গাড়ি নিয়ে এসেছে পটলের মামাতো ভাই বিশ্বনাথ। বিশু আমাদের বয়সী, এবার স্কুল ফাইনাল দিয়েছে।

আমাদের দেখে বিশু বলে,-এ কি হাল হয়েছে তোমাদের পটলদা!

পটলা ডাকাতদের ব্যবহারের মৃদু প্রতিবাদ করতে একজন ডাকাত ওর মাথাটা কামরার বাঙ্কেই ধরে ঠুসে দেয়। বরাতজোর বলে,

ফাটেনি। তবে একটা আমড়ার আঁটির মত আব হয়ে গেছে। হোঁৎকার ডান বুকে ভোজালির বাঁটের ঘা মেরেছে-এখন টনটন করছে। ফটিকের বাবরি চুল একগোছা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে।

বিশুর কথায় বলি, তোমাদের দেশ কি ডাকাতের রাজ্য হে, কি হাল করেছে দ্যাখো আমাদের!

বিশু বলে,-তাই নাকি! ডাকাতি এখানেও প্রায়ই হয় আজকাল।

-কেউ কিছু করে না?

বিশু বলে,-কি করবে?

অর্থাৎ এরা এটাকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। বিশু বলে,-চলো, গাড়িতে ওঠো। পটলদার আবটা তো বেশ বড়ই হয়েছে দেখছি!

হোঁৎকা বলে,-মাথা ফাটেনি এই ঢের! ওগোরে ছাড়ুম না।

গোবর্ধনও গজরাচ্ছে। তাকে ওদের কে বেশ কয়েকটা জব্বর লাথি মেরেছে।

স্টেশন থেকেই শহরের শুরু। বেশ বড় বড় গুদাম, দু-একটা কারখানা। বাড়িও রয়েছে অনেক। আমাদের গাড়িটা মূল শহরকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলেছে। লালমাটির বুকে শাল মহুয়ার গাছ-ও দেখা যায়।

বিশু বলে,-এখানে ডাকাতি হয় প্রায়ই।

আমি বলি,-এখানেও! এই বনেও?

শহরের ওদিকে একটা ছোট টিলা। তার নীচে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। জল বিশেষ নেই-বালির বিস্তারই বেশি। মাঝে একফালি জলধারা বয়ে চলেছে।

তার ওদিকে ওর মামাদের পাঁচিলঘেরা বিরাট এলাকা। আশপাশেও দু'চারটে আধুনিক ধরনের বাড়ি দেখা যায়। তবে এদের বাড়িটার এলাকা অনেকখানি জুড়ে। গেটে দারোয়ান রয়েছে। গেট খুলে দিতে গাড়িটা ভিতরে ঢুকে গেল। দুপাশে মহুয়া গাছ ছাড়া আম, লিচু, কাঁঠাল গাছও রয়েছে। গ্যারেজে কয়েকটা গাড়িও।

পটলার মামা-মামিরা এসে পড়েন। তারাও আমাদের মুখে ট্রেনে ডাকাতির খবর শুনে, আর আমাদের হাল দেখে বলেন,-চারিদিকে এখন এই সবই ঘটছে।

থাকা খাবার ব্যবস্থা খুবই ভালো। বাড়ির ওদিকে বাগানের লাগোয়া একটা বড় হলঘরে পাঁচটা খাট পাতা,-তাতে ডানলোপিলোর গদি, মশারি সবই রয়েছে। পাশের ঘরটাতে থাকে বিশু। নীচে আর কেউ থাকে না। ওদিকে ড্রইংরুম, লাইব্রেরি, মামার দুটো অফিসঘরও আছে। তবে সেগুলো হলের ওদিকে। এপাশটা আমাদের দখলে। জানলা বা ঘরের দরজা খুললেই ফুলের বাগান।

হোঁৎকা বিশুকে বলে,-আপাতত এখানেই ক'দিন থাকতি হচ্ছে। চলো তোমাদের দেশটা দেহি একটু।

বিশু ও একপায়ে খাড়া। সে-ও এর মধ্যে এ বাড়ির তরুণ ড্রাইভার নন্টুকে হাত করে নিজেই ফাঁকা ডাঙায় গাড়ি চালানো শিখেছে। তবে তার লাইসেন্স নেই, তাই গাড়ি চালাতে দেন না বাবা-কাকারা।

মামিমাও বলেন,-তোরা নন্টুকে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে মা ভবানীর মন্দির, সেবক পাহাড়, এদিক ওদিক ঘুরে আয়, ভালো

লাগবে।

তবে সাবধান করেন,-খবরদার বিশু, বনপাহাড়ের পথে তুই জিপ চালাবি না।

বিশু বাধ্য ছেলের মতই বলে,-না-না।

আমরা বের হয়েছি অঞ্চলটাকে দেখতে। শহরেও একপাক দিয়ে আসি। বেশ বড় শহর। বড় বড় গুদাম, কিছু কলকারখানাও রয়েছে ওদিকে। বিহারের লাগোয়া অঞ্চল, তাই লোহার ছোতখাটো অনেক কারখানাই আছে। তারা টাটা, দুর্গাপুর, কলকাতাতেও নানা ধরনের মালপত্র সাপ্লাই দেয়। ট্রাকবোঝাই লোহা, সিমেন্ট-এসবও যাচ্ছে।

আমরা চলেছি এবার বনের দিকে।

বিশু বলে,-এসব শেঠ নাগরমলের এলাকা। নাগরনগর বলে জায়গাটাকে।

নণ্টু বলে,-ওই শেঠজি নাকি আগে খুবই গরিব ছিল। দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। শহরেও বিরাট দোকান, ব্যবসা, গাড়ি। আর এখানে বিরাট বাগানবাড়ি করেছে। ওই যে-

দেখি বনের ধারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাগান আর তার মধ্যে আধুনিক ধরনের বাড়ি। নাগরমলের কারখানা-গুদামও রয়েছে এখানে। কয়েকটা ট্রাকে মালপত্র তোলা হচ্ছে। বড় ছোট নানা ধরনের পেটি, বস্তা প্যাকেট উঠছে।

পথের ধারে একটা বেঁটে বটগাছের নীচে চায়ের দোকান। চা তেলেভাজা মুড়ি-এসব বিক্রি হয়।

সামনের রাস্তাটা বনের দিকে চলে গেছে। ওইখানে বনের মধ্যে কোনো সামন্ত রাজার পরিত্যক্ত গড়। অইটাই দেখতে চলেছি আমরা।

চায়ের দোকান দেখে নণ্টু গাড়িটা ওখানে থামায়।

বিশু একা আসেনি, ওর সঙ্গে পোষা কুকুর লাইকাকেও এনেছে। মাঝারি সাইজের তাগড়া অ্যালসেসিয়ান। প্রথমে আমাদের দেখে লাইকা বেশ কড়া নজরেই চেয়েছিল। গলা থেকে চাপা গরগর শব্দও বের হয়।

কিন্তু বিশু তাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর সে আমাদের বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে।

নণ্টু গাড়িটা একটু দূরে একটা শালগাছের ছায়ায় রেখে চা খেতে গেছে, আমরাও নেমে দেখছি জায়গাটা। এককালে এসব ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল, এখনও বেশ ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি। ইশারায় হোঁৎকাকে দেখাই লোক দুটোকে। ওরা একটা মোটরবাইক থেকে নেমে ওই গুদামের দিকে চলেছে। এপাশে গাছের আড়াল থেকে ওদের মুখগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

গতরাতের ট্রেন ডাকাতির কথা কোনোদিনই ভুলব না। সেই নিষ্ঠুর হিংস্র লোকগুলোর মুখ আমাদের চোখের সামনে বারবার ফুটে ওঠে। সেই গালকাটা। সেই লম্বা চুল নাক-ভাঙা লোকদুটোকে তাই এখানে দেখে চমকে উঠি।

হোঁৎকা বলে,-হালারা এহানে? নাগরমলের গুদামে ক্যান?

ওকে থামাই। বলি,-খবর নিতে হবে। তারপর দেখা যাবে।

হোঁৎকা পরলে সেই মারের বদলা নিতে এখুনিই লড়ে যাবে মনে হয়। কিন্তু এসময় ওদের কিছু করলে বাকিগুলো সাবধান হয়ে যাবে। ওদের দলসমেত ধরা যাবে না। তাই থামাই ওকে।

লোকদুটো গুদামের দিকে এগোচ্ছে। গুদামের ম্যানেজারও চেনে ওদের। দেখলাম বেশ খাতিরই করে,-আও কালুয়া, আও সোনা-চলো অন্দর!

গালকাটা লোকটার নামই কালুয়া। সে-ই শুধোয়,-নাগরমলজি হ্যায়?

-চলো অন্দর।

ওরা চলে যায়। মনে হয় ওরা নাগরমলজির খুবই চেনা।

নণ্টু ততক্ষণে চা খেয়ে এসেছে। পটলারা গাড়ির মধ্যেই গরম হাওয়ার জন্য কাচ তুলে রেখেছিল। ওরা এই ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করেনি। নণ্টু আবার গাড়ি চালাতে শুরু করে।

কাঁসাই নদী বনের বুক চিরে এসেছে। দুদিকে পাথরের স্তর, তাই নদীর বিস্তার এখানে কম। দুদিকে গভীর বন। হাতিও এদিকে আসে মাঝে মাঝে। উঁচু বিশাল টিলাটাকে কেন্দ্র করে অতীতের কোনো সামন্ত রাজা এখানে কেল্লা তৈরি করেছিল।

কেল্লার মধ্যে বিশাল প্রাঙ্গণ, তার ওদিকে প্রাসাদ। সব প্রায় ভেঙে পড়েছে, তবু কিছু কিছু এখনও কালের আঘাত বুকে নিয়ে টিঁকে আছে। তবে সাপ-খোপ চামচিকের রাজত্ব চলছে বর্তমানে। বনের বাঘও এসে থাকে।

নণ্টু বলে,-বাঘ খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। নিজের থাবা, গা সর্বদা চেটে সাফ রাখে। এমনকী যে জায়গায় থাকে, সেটাকেও থাবা দিয়ে, ল্যাজ দিয়ে ঝেঁটিয়ে সাফ-সুতরো করে রাখে। দেখুন না-এই ঘরগুলো! ওরা না হলে কে এসব সাফ করে রাখবে?

দেখে মনে হয় যেন মানুষজন আসে এখানে, তাই এত সাফ। কিন্তু এই গভীর বনের দুর্গম এই ভাঙা কেল্লায় কে আসবে?

ভিতরের দিকে চলেছি, হঠাৎ দেখি খালি সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। নীচে সোজা নেমে গেছে পাথরের স্তর, তার নীচে নদী।

হঠাৎ কিসের গন্ধ পেয়ে লাইকা গর্জন করে ছুটে যায়, ওই ভাঙা মহলের দিকে। বিশু ডাকছে,-লাইকা! লাইকা!

আমি বলি,-হঠাৎ কি দেখে ছুটে গেল ওটা?

বিশুও ছুটেছে ওর পিছনে। আমরাও।

ভাঙা খিলান-প্রায়ান্ধকার একটা ঘর। সঙ্গে টর্চ ছিল! আলোয় দেখি লাইকা মেঝেকে শুঁকছে, পা দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

কোথাও কিছু নেই, লাইকাকে ওইভাবে আঁচড়াতে দেখে অবাক হই। বিশু ওকে টেনে নিয়ে আসে।

তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে। চারিদিকে পাখিদের কলরব। কেমন থমথমে পরিবেশ।

নণ্টু বলে,-সন্ধ্যার পর এখানে কেউ থাকে না। চলেন।

ফিরে এসেছি গাড়ির কাছে। লাইকা কেমন ছটফট করছে। দৌড়ে এসে গাড়ির চারিদিক শুঁকতে থাকে, আর গরগর করে। গাড়িতে উঠলাম সকলে। স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখা যায় গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। নতুন গাড়ি। ইঞ্জিন, ডায়নামো সবই ঠিক আছে। পরে দেখা যায় পেট্রল ট্যাঙ্কের চাবি খোলা, আর ফুল ট্যাঙ্কি পেট্রল একেবারে হাওয়া।

চমকে ওঠে নণ্টু,-পেট্রল কে নিল? এত পেট্রল?

আমরাও চমকে উঠি-সে কি! এই গভীর বনের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে?

নণ্টু গাড়ি থেকে নেমে পিছনের হুটের দরজা বন্ধ দেখে নিশ্চিন্ত হয়। বলে,-হুটের ভিতর জেরিক্যানে আলাদা পাঁচ লিটার পেট্রল রাখা আছে। ব্যাটারা সেটার সন্ধান পায়নি।

হুট খুলে সেটা বের করে ট্যাঙ্কে ঢেলে এবার গাড়ি স্টার্ট করে।

হোঁৎকা বলে,-কিন্তু হালায় পেট্রল কে লইছে বনের মধ্যে? কারোরে তো দেখিনি।

আমি জানাই,-আমরা তাদের না দেখলেও তারা ঠিকই দেখেছে আমাদের।

-হালায় কারা?

হোঁৎকার কথায় গোবরা বলে,-সেইটাই তো প্রশ্ন। জবাব এখন না হোক, পরে পাবি।

গাড়িটা আসছে সরু মোরাম ঢালা বনের পথে। দুদিকে গভীর বনে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নামছে। নির্জন পথ। হঠাৎ সামনে একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখে নণ্টু গাড়ি থামায়।

বিশু বলে,-এটা এল কোথা থেকে?

নণ্টু নেমেছে, আমরাও। গুঁড়িটাকে ঠেলে সরিয়ে রাস্তা সাফ করতে হবে। হাত লাগিয়েছি আমরা, এমন সময় বনের মধ্যে থেকে দুমদাম পাথর বৃষ্টি শুরু হয়। গাড়ির উপরও পড়ে দু'-চারটে। আমরা হতবাক।

লাইকা তীরবেগে ছুটে যায়, বনের মধ্যে।

বিশু চিৎকার করছে। কিন্তু বনের মধ্যে থেকে শোনা যায় লাইকার গর্জন। কারা বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তারা ভাবেনি এভাবে আক্রান্ত হতে হবে।

পাথর বৃষ্টি থেমেছে, আমরাও ছুটে যাই।

কিন্তু গভীর বনে কাউকে দেখা যায় না। বিশুর ডাকাডাকিতে লাইকা ফিরে আসে।

পটলা বলে,-ওরাই পে-পেট্রল চুরি করে আমাদের উপর হা-হামলা করেছে।

নণ্টু বলে,-ডাকাতের দলই। চলুন, বন থেকে বের হয়ে যাই।

হোঁৎকা বলে,-চারিদিকেই দেহি চোর ডাকাতের রাজত্ব। হালায়, ওই গালকাটা ট্রেন-ডাকাতের দলও দেহি শহরে নাগরমলের ওখানে ঘুরছে, আর বনের মধ্যেও ডাকাত!

বিশু বলে,-এখানে নানা রকম ডাকাতি, খুন-খারাপি প্রায়ই হয়। নাগরমলবাবু এখানকার নেতা, উনিও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। ওদের উৎপাত বেড়েই চলেছে।

হোঁৎকা বলে,-তর নাগরমল লোকখান ক্যামন রে?

বিশু বলে,-খুব ভালো লোক। দেখা করতে চাস তো কালকে নিয়ে যাব।

হোঁৎকা বলে,-যামু। তয় শোন সবাই, আজ কেল্লার বনে যা হইছে বাড়িতে কারোরে কইবি না।

বারান্দায় মামাবাবু-মামিমারা যেন আমাদেরই জন্য পথ চেয়েছিলেন। আমাদের দেখে নিশ্চিন্ত হন।

মামিমা শুধোন,-এত দেরি? আমরা তো ভাবছি!

আমি বলি,-এদিক ওদিকে ঘুরছিলাম।

মামিমা বলেন,-যাও, হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলো।

নাগরমল শেঠজির সম্বন্ধে ছোট মামাবাবু অনেক কথাই বলেন। শহরের মধ্যে এখন অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান লোক সে। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় উদ্যমে এখন এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা কারখানা বানিয়ে অনেকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন।

এছাড়া বিশাল ধানকলও রয়েছে এলাকার এখান-ওখানে। চাষের সময় গরিব প্রান্তিক চাষীদের তিনি চাষ করার জন্য বীজধান, সার, পাম্পসেট-এসব দেন। অবশ্য টাকাটা ফসল উঠলে তুলে নেন। ফলে এলাকার সব ধানই যায় তাঁর ধানকলে। চাষীও কিছু পায়।

শহরের কলেজের জন্য জমিও দিয়েছেন। বেশ সজ্জন সমাজসেবী। তাই এলাকার মানুষ তাঁকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে। শহরের বড় বড় আমলা, খোদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের কর্তাদের সঙ্গেও তাঁর খুব খাতির।

মামাবাবু বলেন,-আমাদের অনবরত বলছেন, এদিকে বনের ধারে না থেকে শহরে ওঁর অনেক জায়গা আছে, সেখানে বাড়ি

করতে। খরচাও উনিই দিতে চান।

মামিমা বলেন,-শ্বশুরের তৈরি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি না, ও যতই বলুক। তোমার ওই নাগরমলজি যত চেষ্টাই করুক না কেন, আমি নড়বো না। ও ভাবে, যা ইচ্ছা করবে তাই পেয়ে যাবে এখন তো এই অঞ্চলের নেতা, জেলার মাথা। ধরাকে সরা দেখছেন।

রাত হয়ে আসে। চারদিকে স্তব্ধতা নামে। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়েছি। নীচের পাশাপাশি দুটো ঘরে আমরা, আর ওদিকে বিশু। কাল রাতে ঘুম হয়নি, আজ সারাদিনও ঘোরাঘুরিতে গেছে, তাই শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি।

রাত কত জানি না, হঠাৎ লাইকার ভরাটি গলার চিৎকার আর ওপাশের মালি দারোয়ানদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়।

বাড়ির সকলেই উঠে পড়েছে। বাইরের বারান্দা ও বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আলোয় দেখা যায় চকিতের মধ্যে কে যেন ছুটে ঘন আমবাগানের মধ্যে ঢুকে গেল।

লাইকা ছুটে যায়, মালি, লোকজনও। আমরাও যে যা হাতে পেয়েছি তাই নিয়েই দৌড়চ্ছি।

বিশুর হাতে একটা স্টিক। হোঁৎকা খাটের তলা থেকে একটা রড পেয়েছে, তাই নিয়েই দৌড়চ্ছে।

মামিমা চিৎকার করেন,-তোমরা যাবে না। অ্যাই বিশু-যাসনে! ওরা দেখছে।

কে কারা কথা শোনে?

কিন্তু দৌড়নোই সার হয়। সারা বাগান, এদিক ওদিক খুঁজেও কাউকে পাওয়া যায় না। দারোয়ানরা বলে,-দেখা দো আদমি উধার গিয়া। বাবালোগকা ঘর কা উধার।

-কিন্তু গেল কোথায়?

ছোটমামা বলেন,-কি দারোয়ানজি? রাতে ভাং-টাং খাও নাকি?

আমরাও ঘরে ফিরে যাই।

হোঁৎকা বলে,-আমারও মনে হয় দুজনেরে দেখছি। হালায় কাল রাতে সব টাকা পয়সা সখের হাতঘড়িটা গেছে গিয়া। আজও বনে পাথরের ঘা খাইয়া ফিরছি, হালায় ঘুমাইতেই দিব না!

পটলা বলে,-ত-তাই বলছি, গ্রামের বাড়িতেই চল। শ্-শান্তিতে থাকবি, দেশের, দ-দশের কাজও করতে পারবি।

হোৎকা বলে,-মার খাইয়া পালাইতে হইব? হেই দুইজনেরে ট্রেনে মারের জবাব না দিয়া যামু না। দেশোদ্ধার করনের কাজ পরে করলেও চলবো, এহন ওগোরে সযুত কইরা শিক্ষা না দিয়া যামু না।

গোবর্ধন বলে,-কিছু করার আগে ওই নাগরমলের দর্শন করা দরকার।

নণ্টুই নিয়ে চলেছে আমাদের নাগরমলের বাড়িতে। সকাল নটা থেকে ঘণ্টাখানেক নাগরমল তার বসার ঘরে আমজনতাকে দর্শন দেন। এখানে মানুষদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। তারপর নিজের বিভিন্ন কারখানা, শহরের ব্যবসাপত্র দেখতে বের হয়ে যান।

গেটটা খোলা, দারোয়ানও রয়েছে। ভিতরে লাল কাঁকর বিছানো পথের দুপাশে সযত্নবর্ধিত সবুজ ঘাসের লন। ওদিকে বিস্তীর্ণ গোলাপ বাগান।

গাড়ি ভিতরে ঢুকে বেশ কিছুটা গিয়ে তবে বাড়ির পোর্টিকো। এই জঙ্গল মহলেও অতি আধুনিক স্টাইলের বাড়ি বানিয়েছে নাগরমলজি।

ড্রইংরুমটাও বেশ সুন্দর করে সাজানো। একটা সিংহাসনের মত সোফায় বসে আছে বিশাল চেহারার লোকটা। দেখতে বিশাল, তবে দেখে মনে হয় ঠিক মেদের ভারে থলথলে নয়, সলিড চেহারা। মুখটাও বিরাট। একটা লোক ওকে দলাইমলাই করছে, আর নাগরমলজিকে ঘিরে বেশ কিছু গ্রাম্য লোকজন কি সব বলছে! নাগরমলজি বলে,-মুন্সীজী, ইন্দের বাতচিৎ সব শুনে লোট কর লিজিয়ে, পিছু হামাকে দিবে।

তাদের উদ্দেশে বলে,-তুম লোগ্ চিন্তা মৎ করো, হম দেখতা হ্যায়, কুছ না কুছ জরুর করব।

লোকটা রাজস্থানী হয়েও ঠেট বিহারী টানে কথা বলে। মনে হয় ছেলেবেলাটা বিহারের কোনো গ্রামাঞ্চলে কেটেছে, তাই কথার মধ্যে বিহারী টানও এসে পড়ে।

আমাদের দেখে চাইল নাগরমল।

বিশুকে দেখে বলে,-আরে বোনারজি সাব আসো আসো। কি খোবর? এনাদের তো পহচানতে পারল না।

বিশুই পরিচয় করিয়ে দেয় পটলাকে দেখিয়ে,-এই পটলদা আমার পিসতুতো দাদা, কলকাতায় থাকে। এরা ওর বন্ধু। এখানে বেড়াতে এসেছে।

-হ্যাঁ। কলকাতা ছোড়কেই বনজঙ্গলমে বেড়াতে আসলো? বাঃ! কিমন লাগছে ইটা?

নাগরমলজি শেষ প্রশ্নটা করেছে আমাদের উদ্দেশেই। জানাই,-খুব সুন্দর জায়গা। বন-নদী। বনের মধ্যে প্রাচীন একটা গড়ও দেখলাম।

নাগরমলজি একটু অবাক হয়,-উধার উ ঘন জঙ্গলমে ভি গেল? লেকিন হাথি, বহুৎ সাপ, বিচ বিচ মে চিতা ভি আসে উধার। বহুৎ খতরনক জায়গা।

হোঁৎকা বলে,-এসব জায়গাই শুনি গিয়া ডাকাতের রাজ্যি। ট্রেনেও ডাকাতি হয়, পথে-ঘাটেও হইতাছে।

হাসে নাগরমল,-শহর কলকাতায় ভি তো ডাকাতের রাজ আছে বাবুজি! বড়া বড়া ডাকাইত, ইধার তো ছোট মোটা কুছ হোয়।

তারপরই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই যেন হাঁক পাড়ে,-আরে এ লখনিয়া। কলকাত্তাসে বাবুলোক এল খাতিরদারি কুছ তো কোর। লস্যি লাও।

লস্যিটা ভালোই, আর খেতেও হল আমাদের। নাগরমলজি বলে,-দু-চারদিন থাকবে তো?

পটল বলে,-না, আমাদের গ্রামের দিকে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে নিরক্ষর লোকদের লেখাপড়া শেখাব।

নাগরমলজি যেন নিশ্চিন্ত হয়। বলে,-সে বহুৎ আচ্ছা কাম আছে বাবুজি। ইয়ং লেড়কারা ভি দেশের জন্য শোচছে-ই দেখে আমার খুশ দিল হোয়ে গেলো। যাইয়ে-ই কাম করিয়ে।

আমরা উঠে পড়ি। বাইরে বের হয়ে এসে হোঁৎকা বলে,-লোকটারে কেমন দেখস?

গোবর্ধন ওরফে গোবরা বলে,-ঘোড়েল লোক বলেই মনে হল। দেশের মানুষের দুঃখে যেন গলে পড়ছে!

আমরা বের হয়ে এসে ওদিকে দাঁড়িয়েছি। দু'তিনটে কারখানা এখন বন্ধ। তবু দেখি গেট খুলে ক'টা লরি বের হচ্ছে। তাতে

তেরপল ঢাকা কি সব মাল রয়েছে।

হোঁৎকা বলে,-কারখানা বন্ধ আছে গিয়া, তয় মাল কি যাইত্যাছে রে?

আমরাও ঠিক বুঝতে পারি না।

ট্রাকগুলোর দিকে নজর রাখছি, হঠাৎ হর্নের শব্দে সচকিত হয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ালাম, দেখি নাগরমলের বাড়ির দিক থেকে একটা জিপ তেড়ে ফুঁড়ে আসছে এইদিকে। আমরা সরে না গেলে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে বের হয়ে যেত।

ট্রাকগুলোও ফুল স্পিডে চলছে। জিপটা ওইদিকেই গেল। চমকে উঠে দেখি জিপে বসে আছে সেই গালকাটা, আর চালাচ্ছে সেই ট্রেনে দেখা লম্বা চুলওয়ালা শয়তানটা।

দেখা যায় জিপটা গিয়ে ওই ট্রাকগুলোর পিছন নিল। যেন ওই মালপত্র পাহারা দিয়েই নিয়ে চলেছে কোথাও কোনো বিশেষ মতলবে।

ট্রাকগুলো জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

হোঁৎকা বলে,-লোকটা চায় না আমরা এহানে থাকি!

আমারও মনে হয় কথাটা। ও আমাদের এখান থেকে যেন প্রকারান্তরে চলে যেতেই বলেছে, ওই দেশসেবার নাম করে।

গোবর্ধন বলে,-ব্যাটার ট্রাক বোঝাই মাল বনের মধ্যে কোথায় গেল বল তো?

বিশু বলে,-বনের ওদিকে শুরু হয়েছে গ্রাম-অঞ্চল, চলে গেছে দলমা পাহাড় অবধি। ওখানে ওসব যন্ত্রপাতি কি কাজে লাগবে?

অর্থাৎ কেমন একটা রহস্য ঘনিয়ে ওঠে। আর ওই ডাকাতগুলো যে নাগরমলেরই লোক এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

ফিরে আসি বাড়িতে। হোঁৎকার জায়গাটা ভালো লেগেছে। বিশেষ করে মামিমাকে। কারণ খাবার-দাবারের আয়োজন প্রচুর। পটলা বলে,-মামাবাবুকে বলি ওদের দেশের বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে। আসল ক-কাজই তো বাকি!

হোঁৎকা বলে,-নিজে আগে স্কুল ফাইনাল পাস কর দেহি, তারপর অন্যারে পড়া লিখা শিখাইবি।

এমন সময় ছোটমামাকে ঘরে ঢুকতে দেখি। কলেজ থেকে বের হয়ে ছোটমামা পারিবারিক কনট্রাক্টারি ব্যবসা দেখাশোনা করে। মোটরবাইক হাঁকিয়ে ঘোরে। বেশ হাসিখুশি মানুষটি বিজনমামা।

বিজনমামা বলে,-শুনলাম কাল বনের মধ্যে গড় দেখতে গিয়েছিলে?

পটল বলে,-হ্যাঁ!

মামাবাবু বলে,-ঠিক করোনি। ওখানে গেলেই লোকে বিপদ পড়ে।

শুধাই,-কেন?

মামা বলে,-সেইটাই তো রহস্য।

আমি শুধাই,-আচ্ছা, ওই নাগরমল লোকটা কেমন?

এবার মামা বলে,-ওকে দেখেছ?

ঘাড় নাড়ি।

মামা বলে,-লোকটা গভীর জলের মাছ। ওর সবকিছুই অন্যের লুট করা মাল। জনসাধারণ, সরকার, ব্যাঙ্ক-যখন যাকে পারে ঠকায়। আর বাইরের খোলসটা সম্পূর্ণ অন্য। খুব সজ্জন, কথাও মিষ্টি।

-ওর এক কারখানা?

-এও এক কৌশল! বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে লাখ টাকা, সরকার থেকে কাঁচামালের কোটা-এসব ঘোলাপথে আদায় করে। আর অন্ধকারে ওর অনুচররা দুর্গাপুর-খরগপুর-জামশেদপুর ও অন্য জায়গায় কারখানার লাখ-লাখ টাকার চোরাই মাল এনে গোপনে দ্বিগুণ তিনগুণ দামে বিক্রি করে।

সেই সঙ্গে দেশের নেতা সেজে বসে আছে। সারা এলাকার মানুষ ওর ভয়ে কিছু বলতে পারে না। ওর দলবল যথেচ্ছভাবে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপি করে।

বলি,-পুলিশ কিছু করে না?

মামাবাবু বলে,-সরষের মধ্যে ভুত থাকলে আর ওঝা কি করবে! ওসব ওর কেনা! তবে শুনেছি, নতুন পুলিশ সুপার নাকি এখন ওর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছে। চুরি-ডাকাতি তদন্ত করতে নেমে পুলিশ নাকি ওর লোকদের সন্দেহ করছে। কিন্তু হাতে নাতে ধরতে না পারলে, কোনো প্রমাণ না পেলে-কি করবে?

নণ্টু বলে ওঠে,-ওদের অনেক কাহিনি আমি জানি। ওই ব্যাটা কালুয়া, ন্যাপাদের কীর্তিকলাপও জানি।

মামাবাবু ওর দিকে চাইল। বলে,-ওদের ঘাঁটাস না নণ্টু, ওরা ডেনজারাস লোক। আর তোমাদেরও বলি,ওদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে।

আমরাও ভেবেছি কথাটা।

আমি বলি,-কিন্তু এর আগে আমরা এমন কিছু লোককে সযুত করেছি মামাবাবু।

মামা বলে,-হ্যাঁ, পটলার কাছ থেকে শুনেছি।

পটলা সঙ্গে সঙ্গে শোনায়,-যদি মদত দাও, ঠ-ঠান্ডা করে দেব ওদের। ওদের পি-পিছনে যে আছে তাকেও।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইলাম। পায়ের শব্দে ঠিক নয়, ট্রেতে করে চা আনছিল এবাড়ির চাকরটা। ওকে সবাই মুণ্ডা বলে ডাকে। কালো নাক চ্যাপ্টা একটা লোক। চোখ দুটো ছোট ছোট কেমন পিটপিট করে চায়।

মুণ্ডা বিড়ালের মত নিঃশব্দে যাতায়াত করে। ওকে প্রথমে দেখেই কেমন বিচিত্র এক জীব মনে হয়েছিল।

মামা বলে,-কি করছিলি দাঁড়িয়ে?

ঘাড় বেঁকিয়ে বলে,-কিছুই করিনি। চা-

-দিয়ে চলে যা।

লোকটা ট্রে-টা নামিয়ে চলে গেল।

এ ঘরেই কথাবার্তা হচ্ছিল। আমাদের ঘরটা ওদিকে। বড়মামা মামিও বের হয়েছে শহরে, বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই।

মামাবাবু চা খেয়ে নণ্টু কে নিয়ে বের হয়ে যায় কি কাজে। আমরা বের হব বিকেলে।

এদিকের ঘরে এসে দেখি আমাদের ব্যাগ সুট কেশ সব খোলা। কে যেন জিনিসপত্র সব তন্ন তন্ন করে দেখেছে।

আমাদের ব্যাগে বেশ কিছু নাইলনের দড়ি, ছুরি, ইঁট-এসব থাকে। আমি এর মধ্যে ওই পুরোনো কেল্লা ঘুরে এসে তার একটা স্কেচ ও করেছিলাম। কে সেসব নিয়ে গেছে। মায় পটলার লেখা ডাইরিটাও। পটলা তার ডাইরিতে ট্রেন ডাকাতির বিবরণ একেবারে বিশদভাবে লিখেছিল। অপরাধীদের চেহারার বর্ণনাও ছিল তাতে। আর তাদের যে ওই নাগরমলের ট্রাকে দেখেছে, তাও লিখেছিল।

এগুলো ওদের হাতে পড়লে আমাদের বিপদই হবে।

তাই হোঁৎকা বলে,-কে করছে এই কাজ? ঘরের মধ্যে হইতে মাল সাফ!

মামিমা বলেন,-বাড়ি থেকে এসব কে নেবে?

দেখা যায় মুণ্ডা তখন বাড়িতে নেই। কোথায় গেল সে?

একটু পরে দেখা যায়, মুণ্ডা ফিরছে সাইকেল নিয়ে। হ্যান্ডেলে আনাজপত্রের থলে। মামা শুধায়,-কোথায় গেছলি?

মুণ্ডা বলে,-আপনারা ছিলেন না, বাবুদের চা দিয়ে বাজারে গেলাম, আনাজপত্র আনলাম বটে।

দুপুরে খাওয়ার পর নিজেদের ঘরে শুয়ে আলোচনা করছি, হোঁৎকা বলে,-একবার ওই জঙ্গলের কেল্লায় যেতে হবে।

জানাই,-সেবার পাথর খেয়ে এসেছি, এবার যদি গুলি করে কেউ?

পটলা বলে -ভ-ভয় পাই না।

পটলা মাঝে মাঝে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

ওদিকে ছোট মামাবাবু ফিরে এসেছে। তার মন মেজাজ ভালো নেই। শহরে ট্যুরিস্ট লজ তৈরি করার জন্য সে টেন্ডার দিয়েছিল। ভেবেছিল সে-ই কাজটা পাবে। কিন্তু আজ টেন্ডারের ফল বের হয়েছে, দেখা যায় টেন্ডার পেয়েছে ওই শেঠজিরই এক বেনামদার। অর্থাৎ শেঠজিই গোপনে কলকাঠি নেড়ে ছোটমামাকে আউট করে নিজেই কাজটা হাতিয়েছে।

আমরা এ ঘরে কথাবার্তা বলছি। দুপুর হয়ে আসছে। হোঁৎকা বাজার থেকে ফেরে। বেশ খুশিই। বলে,-ভালো বাগদা চিংড়ি পাইছি, এক্কেবারে ফ্রেশ। নাহ, জায়গাটা ভালোই।

এতক্ষণ এদিকেই ছিলাম। এবার আমাদের ঘরে গিয়ে দেখি পটলা নেই।

গোবরা বলে,-সেটা গেল কোথায়?

আমি বলি,-আছে আশপাশে কোথাও।

ওদিকে বেলা বাড়ছে। মামিমা স্নান করার জন্য তাড়া দেন। মামাবাবুরাও সব ফিরেছে। পটলা এখনও ফেরেনি।

এবার ভাবনায় পড়ি আমরা। ওর মাথায় পোকা আছে, মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে সেটা। আর তখন কি করবে তা সে নিজেই জানে না।

মামিমা বলেন,-কোথায় গেল পটল? তোমরা স্নান খাওয়া করো, সে এর মধ্যেই এসে পড়বে।

হোঁৎকা বলে,-শান্তিতে খামু, তারও উপায় নাই ওই ইডিয়টটার জন্যে।

পটল এর মধ্যে তার হিসাবমত ভেবে নিয়েছে। মনে হয় ওই বনের মধ্যে কেল্লাতে বিশেষ কোনো রহস্য আছে। ওই নাগরমলজির প্রভূত সম্পদ হঠাৎ এল কোথা থেকে? মামাদেরও উৎখাত করতে চায় লোকটা। পটল সেই শক্তির উৎসের সন্ধান করতেই বের হয়েছে।

ছায়াঘন পথ ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে যায়। বাতাসে শাল ফুলের মঞ্জরীর গন্ধ। পটলা জানে একা যাওয়াই নিরাপদ এসব কাজে। প্রতিপক্ষ যদি কেউ থাকে, সে টেরও পাবে না। ওকে দেখতে হবে কেল্লার ভিতরটা ঘুরে।

ওখানে ট্রেন-ডাকাতদের সন্ধানও পেয়ে যেতে পারে। তাই চুপি চুপি চলেছে পটল। কিছু খবর পেলে বন্ধুদের সামনে তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

পটলা চলেছে, ও জানতেও পারেনি যে প্রতিপক্ষ আমরা আসার পর থেকেই সজাগ হয়ে গেছে। ওই নাগরমলজি এমনিতে বাইরে মৃদুভাষী হলেও, ওর ভিতরের রূপটা একেবারে আলাদা। খুবই ধূর্ত। কখন কি রূপ ধরতে হয়, কখন কাকে প্রণাম করতে হয়, আবার কখন তারই গলা টিপে ধরতে হয় এসব সে-ভালোভাবেই জানে।

নাগরমলজির হাতে লোকজনের অভাব নেই। বিশেষ কিছু লোকও পুষে রেখেছে সে।

নাগরমলজি তাঁর সাম্রাজ্য চালাতে গিয়ে বেশ বুঝেছে, গুপ্তচর বাহিনী না থাকলে এই ধরনের ব্যবসা করা যাবে না। সব খবর আগে জানার দরকার, সেই মত ব্যবস্থা নিতে দেরি করা চলবে না।

তাই খবর দেবার লোকও আছে সর্বত্র। তারাই পটলাদের খবরাখবর দেয়, আর ওই বাড়ি থেকে ডাইরি পাচার হয়ে চলে যায় নাগরমলজির কাছে।

নাগরমলজি ওসব দেখে চমকে ওঠে।

ডাইরিটা তার বিশ্বস্ত মুন্সীজিই তাকে পড়ে শোনায়।

-ট্রেন-ডাকাতদের খবরও এরা পেয়েছে। কালুয়ার কথা ভি লিখেছে, চুলওয়ালা নন্দুয়ার বাত ভি!

ক্যা! -চমকে ওঠে নাগরমল। বলে, ওই বাচ্চা লোক বহুৎ খতরনক হ্যায়, উ লোককো সিধা কর দো!

হঠাৎ গর্জে ওঠে নাগরমল। কি ভেবে বলে, কালুয়াকো বোলাও।

কালুয়া শেঠজির ডাকে গিয়ে হাজির হয়। জানে শেঠজি ডাকলে তার জন্য বিশেষ কাজের ফরমাশই করবে।

কালুয়া বুঝেছে তাদেরও তৈরি হতে হবে। ওই ছেলেগুলোকে সে-ও দেখেছে এদিকে ঘুরতে। তারও ভালো ঠেকেনি। তাই কালুয়া বলে,-বন্দোবস্ত করছি শেঠজি।

কালুয়াও নজর রেখেছিল সামনের চায়ের দোকান থেকে পটলের মামাদের ওই বড় বাড়িটার উপর। হঠাৎ পটলকে একা বের হতে দেখে সে একটু অবাক হয়। দেখে ছেলেটা এদিক ওদিক চেয়ে বনের দিকে এগিয়ে চলেছে একাই। এবার কালুয়াও ওদিকে রাখা জিপে তার দুজন চ্যালাকে নিয়ে ওঠে। মতলবটা সে ভেবেই রেখেছে। ওই একটা চ্যাংড়াকেই নয়, দলকে দলই ধরবে তারা। আপাতত ওদের একটাকে পেয়েই মতলব ফেঁদে ফেলে।

পটলা চলেছে একা বনের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ জিপটাকে পিছন থেকে আসতে দেখে চাইল। কিছু করার আগেই জিপটা ওর পাশে এসে সশব্দে ব্রেক কষে থামল। দু-তিনজন লোক লাফ দিয়ে নেমে পটলাকে ধরে ফেলে।

পটলা পালাবার চেষ্টাও করতে পারে না। ওরা তাকে ধরে নাকে তীব্র গন্ধমাখা একটা রুমাল ঠেসে ধরার কিছুক্ষণের মধ্যেই পটলার চোখ বুজে আসে। তারপর আর পটলার কিছু মনে নেই। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরও পটলার কোনো পাত্তাই মেলে না।

হোঁৎকা বলে,-কই গেল ব্যাটায়? এক কলসি দুধে এক ফোঁটা চোনা ফ্যালাইল ওই পটলা।

পটলার মামাবাবু এর মধ্যে শহরে ওদের আত্মীয়দের বাড়িতে ফোন করে-যদি পটলা গিয়ে থাকে সেখানে। কিন্তু কোথাও পটলার কোনো হদিশই নেই।

ছোটমামা এর মধ্যে চারিদিক ঘুরে খবর আনেন কাল রাতেই জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা অনেক মালপত্র লুট করে একজন যাত্রীকে গুলি করে মেরেছে। পুলিশ সাহেবও এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কারণ খবরের কাগজে এখানকার নৈরাজ্য নিয়ে নানা কথা লেখা হয়েছে।

আমরাও বিকালে বের হয়েছি। মনে হয় পটলার কোনো বিপদই হয়েছে। কিন্তু হোঁৎকা বলে,-এসব কথা কইবি না। চল নাগরমলের ওখানেই যামু।

গোবরা বলে,-গিয়ে কোনো লাভ হবে? কিছু করে থাকলেও ও ব্যাটা কিছুই বলবে না। উল্টে আমাদেরও বিপদে না ফেলে।

আমি বলি,-তা পারবে না। হাওয়াটা বরং বোঝা যাবে। ওকে বলবো, আপনার কথামত গ্রামের মানুষের সেবা করতেই আমরা চলে যাচ্ছি।

হোঁৎকা বলে,-তা মন্দ হইব না। চল দেহি।

নাগরমলজির বাড়ির ওদিকে একটা বন্ধ মিলের গেটে কিছু জনতার ভিড়। ওটাকেও বোধহয় বন্ধ করেছে নাগরমল।

চায়ের দোকানেও জটলা। আমরা চলেছি নাগরমলের বাড়ির পানে। গেট খোলাই। বারান্দায় লোকজন রয়েছে, নাগরমল বসে আছে। হঠাৎ ওদিকে মুন্সীজির সঙ্গে একজনকে কথা বলতে দেখে অবাক হই। লোকটা গাছের আড়ালে থাকার জন্য আমাদের দেখতে পায়নি।

আমি বলি,-হোঁৎকা, দেখেছিস ওই লোকটাকে? ব্যাটা মুণ্ডা এখানে কেন?

হোঁৎকাও দেখেছে। সে বলে,-তাই তো দেহি। ব্যাটা টাকাও লয় দেহি ওই মুন্সীর কাছ থিকা। এবার বুঝছি ডাইরি এসব কোথায় গেছে গিয়া।

গোবর্ধন বলে,-পটলার ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই নাগরমল সব জানে।

হোঁৎকা বলে,-চুপ মাইরা থাক। ব্যাটা মুণ্ডা যাইতাছে, ও যেন আমাগোর না দেইখা ফ্যালে। পরে দেখুম ওরে।

নাগরমলজি আমাদের দেখে হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে, সেটা আমাদেরও নজর এড়ায় না। কিন্তু নিপুণ অভিনেতার মত চকিতের মধ্যে সেই ভাবটা বদলে আমাদের আপ্যায়ন করে।

-আইয়ে বাবালোগ! আরে মুনিয়া, বাবালোগকো বাস্তে মালাই লস্যি লিয়ে আয়। বৈঠিয়ে, ক্যায়সে আয়া?

আমি বলি,-আমরা গ্রামেই চলে যাচ্ছি, আপনার কথাটা যে সত্যি তা বুঝেছি, গ্রামেই আসল কাজ করতে হবে।

নাগরমলজি বলে,-হ্যাঁ, অব ঠিক সমঝেছে। গাঁওমে কাম করনা হোগা। ওর জন্যেই হামি ভি শহরে থাকলো না।

মানুষের সেবার জন্যে গাঁও গাঁও ঘুরি। হ্যাঁ-সেই গোরা বাবাকো দেখছে না?

অর্থাৎ পটলার কথাই বলছে সে। শুধোয়,-সে কুথায়?

তার আসল খবরটা বোধহয় ও না জানার ভানই করছে। হোঁৎকা বলে,-সে আসেনি। দেশ-গ্রামে যাব তাই মালপত্র গোছগাছ করতিছে।

নাগরমল বলে,-বহুৎ আচ্ছা কাম করতে এসেছে তুমলোক।

দরকার হোলে হামাকে ভি জানাবে, হম ভি থোড়া বহুৎ সেবা করতে পারলে খুশ্ হবো।

হোঁৎকা বলে,-জানাবো। দরকার পড়লি আপনার কাছেও আইমু।

আমরা উঠে পড়ি। পটলার অন্তর্ধানের প্রসঙ্গে কোনো কথাই উঠল না।

এদিকে সন্ধ্যা নামছে। নাগরমলের বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। বাগানে শ্বেত পাথরের ফোয়ারা থেকে জলকণা উঠছে আর আলো পড়ে সেখানে রং-এর ফুলঝুরি ফুটছে।

এত সুন্দরের অতলে রয়েছে যেন জমাট একটা অন্ধকারের রাজ্য। সেই অন্ধকারের জীবরাই পটলাকে কোথায় লুকিয়েছে-এ কথাটাই বার বার মনে হয়।

বের হয়ে আসছি, হোঁৎকা বলে,-পিছন দিকটাই দেখার লাগবো।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে অন্ধকারে চলেছি আমরা। ওপাশে বাড়ির পিছন দিককার দরজা। অবশ্য সেটাও বেশ সুরক্ষিত। মোটা পাতের সাটার নামানো। গাছ গাছালির জন্য জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

হঠাৎ কাকে দেখে চাইলাম। শীর্ণ লম্বামত একটা ছেলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা তৈরি। হোঁৎকা ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট, গোবরাও বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ন। দরকার হলে ছেলেটাকে বেকায়দায় ফেলতে দেরি হবে না।

ছেলেটার উপর টর্চ ফেলতে সে ইশারায় আমাদের চুপ করতে বলে এগিয়ে আসে।

ছেলেটা বলে,-আমার নাম সজল। এদের বাড়িতে আমার বাবা কাজ করত। বাবা আর বেঁচে নেই। আমিই এখানে থাকি।

আমরা দেখছি ওকে।

ছেলেটা বলে,-নাগরমলজি সাংঘাতিক লোক। ওর অনেক গোপন খবর বাবা জেনে ফেলেছিল, তাই নাগরমল বাবাকে খুন করে লাশ কোথায় গুম করে দেয়।

-সে কি!

সজল বলে,-আমি পরে সব জেনেছি। কিন্তু কিছু করার শক্তি আমার নেই, আমি একা। তাই চুপ করে মুখ বুজে ওর বাড়িতেই আছি। ক'দিন ধরে তোমাদের দেখছি। নাগরমল তোমাদের ডাইরি, কাগজপত্র সব হাতে পেয়ে গেছে। তাই তোমাদের ও শেষ করে দেবে। ওর লোকদের ও বলেছে; ওই কালুয়ার দল তোমাদের ছাড়বে না।

হোঁৎকা বলে,-আমরা ওই বিজনবাবুদের বাড়িতে আছি।

সজল বিশুকে দেখিয়ে বলে।

-ওকে চিনি, বিশুবাবুকে।

হোঁৎকা বলে,-ওই নাগরমলকে আমরাই সযুত করে যাব।

ছেলেটা যেন আশান্বিত হয়। বলে,-পারবে? ওর দু-নম্বরী কারবারের অনেক কাগজপত্রের খবর আমি জানি। তোমাদের দিতে পারি, যাতে সবাই ওর আসল রূপটাকে চিনতে পারে।

গোবর্ধন বলে,-তুমি ওর দলের লোক কি না কি করে জানব?

সজল বলে,-তাহলে সেদিন থেকেই তোমাদের খবর নিতাম না। জানো, তোমাদের ওখানে যে চাকরটা আছে-

মুণ্ডা! -আমিই নামটা বলি।

-হ্যাঁ, ওই তোমাদের ঘর থেকে ডাইরি, কাগজপত্র সব এনে দিয়েছে শেঠজিকে। শেঠজিই ওকে তোমাদের ওখানে কাজে পাঠিয়েছে, যাতে ও-বাড়ির সব খবর এখানে সে দিতে পারে।

বিশু বলে,-তুমি মাঝে মাঝে ওই নবীনের চায়ের দোকানে এসে নবুদাকে কোনো খবর থাকলে বলে যাবে, আমাদের কিছু বলার

থাকলে আমরাও ওকেই বলে আসব।

সজল বলে,-তাই ভালো। বাইরে দেখা হলে আমরা যেন কেউ কাউকেই চিনি না।

হঠাৎ দূরের রাস্তা থেকে গাড়ির হেডলাইটের এক ঝলক আলো এসে পড়ে এদিকে। সজল চকিতের মধ্যে সরে যায় ঝোপের আড়ালে। বলে,-কাল ভোরে নবুর দোকানে কথা হবে। এখন ভিতরে যাচ্ছি। তোমরাও চলে যাও।

সে ওই দেওয়ালের ওদিকে নীচু ডালটা ধরে গাছে উঠে গেল। ডাল বেয়ে বোধহয় বাগানে নামার কোনো ব্যবস্থা করা আছে।

আমরা দেরি করে ফিরে দেখি মামাদের মধ্যে ভাবনার ছায়া নেমেছে। মামিমা আমাদের শুধান,-পেলে পটলকে?

কিন্তু পটলকে আমাদের সঙ্গে না দেখেই বুঝেছেন যে আমরা তাকে পাইনি।

মুণ্ডা যথারীতি চায়ের ট্রে নিয়ে চুপি চুপি ঢুকছে। বলে,-চা এনেছি।

বিশু বলে,-রাখো, আসছি।

বিশু চেনে মুণ্ডার ঘরটা। বাগানের ওদিকে দু-তিনটে ঘর আছে। হোঁৎকা বিশুকে নিয়ে এই ফাঁকে ওখানে এসে হানা দেয়।

মুণ্ডা ট্রে রেখে বাবুদের সামনে থেকে চায়ের শূন্য কাপগুলো তুলছে, হোঁৎকা বিশু তখনও ফেরেনি।

মামিমা বলেন,-ওরা কোথায় গেল আবার? চা ঠান্ডা হয়ে গেল।

মুণ্ডা বিনীতভাবে বলে,-আবার করে আনছি মা!

এমন সময় হোঁৎকা ঢুকল গম্ভীরভাবে। পিছনে বিশু। হোঁৎকা বলে,-থাক তার দরকার হইব না। তুমিও বসো! মুণ্ডা বলে,-কি যে বলেন!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে-যা কইছি তাই করো।

সকলেই চমকে ওঠে। হোঁৎকা বলে,-ছোটমামা, আপনারা দুধকলা দিয়া ঘরে কালসাপ পোষছেন।

মানে?-ছোটমামা অবাক হয়।

হোঁৎকা বলে,-দ্যাখেন ছোটমামা, আপনার কনট্রাকটারির টেন্ডারের কাগজপত্র, পটলার ডাইরি-সব ওর ঘরে পাইছি। ওই ব্যাটাই সব নাগরমলের কাছে পাচার করেছে। তাই দেখে নাগরমল শেঠ তার ভাতিজার নামে টেন্ডারের দর কমিয়ে দিয়ে আপনার কাজ হাতাইছে।

ছোটমামা ওসব কাগজ দেখে চমকে ওঠে,-তাই তো! এসব কাজ তুই করিস?

মামিমা বলেন,-মাথা গরম করো না। এখানে হৈ চৈ না করাই ভালো, ওরা সাবধান হয়ে যাবে।

ছোটমামা বলে,-মুণ্ডাকে আটকে রাখো, ও যেন বাইরে যেতে না পারে।

হোঁৎকা মুণ্ডাকে বলে,-কাগজপত্র চুরি কইরা কারে দেখাইছস?

মুণ্ডা চুপ করে থাকে। ছোটমামা রেগেই ছিল, সে এবার ওর ঘাড় ধরে দু-চারটে রদ্দা বসাতে মামিমা বাধা দেন,-করছ কি বিজন?

বিজন, অর্থাৎ ছোটমামা বলে,-যে রোগের যে ওষুধ তাই দিচ্ছি। কি ভেবেছে ও?

মারের ভয়ে মুণ্ডা এবার বলে,-ওই শেঠজিকে দিয়েছি।

হোঁৎকা বলে,-এবার বুঝছেন, পটলারে কারা আটকাইছে? ওই শেঠজিই।

বড় মামাবাবু বলেন,-আমি যাচ্ছি তার কাছে।

ছোটমামা বলে ওঠে,-শেঠজি এসব কথা স্বীকার তো করবেই না, উলটে পটলেরই বিপদ ঘটাবার চেষ্টা করবে। যা শয়তান ও!

তাহলে?-বড়মামা ভাবনায় পড়েন।

ছোটমামা বলে,-কলকাতায় পটলের কাকাকে খবর দিচ্ছি ফোনে, ওখানকার পুলিশের আই. জি. ওর পরিচিত, ওখান থেকে এখানের পুলিশ মহলে চাপ দিক। আমরা এদিকে খোঁজখবর করছি।

হোঁৎকা বলে,-পটলার বাড়িতে খবর পাইলে ওর ঠাক্‌মা, মা ভাইঙ্গা পড়বে। এহন খবর দিতে হইব না। আমরাই দেখছি। পরে যা হয় করবেন।

ভেবেছিলাম মুণ্ডাকে চাপ দিলেই কিছু খবর বের হবে। তাই মুণ্ডাকে ওর ঘরে আটকে রেখে আমরা জেরা শুরু করি।

-কোথায় রেখেছে পটলাকে তোর শেঠজি?

মুণ্ডা বলে,-জানি না সাব।

হোঁৎকা সপাটে একটা ঘুঁসি মারে।

গোবরা বলে-না বললে মেরে তোর হাত পা ভেঙে লাশ বানিয়ে দেব।

মুণ্ডা বলে,-আমি সত্যিই জানি না। শেঠজি আমাদের ওর কারখানার অফিসঘর অবধি যেতে দেয়, তার ওদিকে কোনোদিন যাইনি।

-তুই কালুয়াকে চিনিস?

আমার কথায় একটু চমকে ওঠে সে। হোঁৎকা বলে-মুখ বুজি থাকলি চলবেনি বাপধন, মুখ খোলাতি জানি। দিমু অ্যাক্ ঘা?

মুণ্ডা হোঁৎকার ঘা-এর জোর মালুম পেয়েছে। বলে,-ওকে দেখেছি শেঠজির মোকামে।

কি করে ও? বল-

মুণ্ডা বলে,-শুনি অনেক আকামই করে, বোমা গুলি টুলিও চালায়।

-কোথায় থাকে সে?

-ওই কারখানার পিছনে লালবস্তিতে।

গোবরা বলে-এই পর্যন্ত আজ থাক। ওটাকে আটকে রাখ।

ওই কালুয়ার খবর নিই, পটলার সন্ধান না পাওয়া অবধি ওটাকে আটকে রাখতে হবে এখানে।

হোঁৎকা বলে,-লালবস্তিটা কোথায় আবার?-

বিশু বলে,-লালবস্তি আমি চিনি।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সন্ধ্যার পর এদিকে দু-একটা আলো টিমটিম করে জ্বলে। বন্ধকারখানাগুলো ভূতের বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

আমরা চলেছি ক'জন। বিশু পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। খোলা জায়গায় একটা গাছের নীচে কারা চারপাই পেতে হুঁকো টানছে। ওদেরই একজনকে শুধাই,-কালুয়া এখানে থাকে?

কালুয়ার নাম শুনে ওরা আমাদের দিকে চেয়ে আপাদমস্তক দেখে। একজন বলে,-হ্যাঁ, ওইদিকে সোজা যাও, বাঁ হাতে লাল পেলাসটিকের চাল, ওটাই।

আমরা এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কাকে উদয় হতে দেখে চাইলাম। কর্কশ কণ্ঠস্বর, চোখ দুটো যেন কোটরে বসা-কাকে চাই?

বিশুই বলে-কালুয়া আছে?

লোকটা বলে,-না ভোরে বেরিয়ে গেছে।

-কখন ফিরবে?

-জানি না।

হঠাৎ দু'দিক থেকে বেশ কয়েকজন আমাদের ঘিরে ধরে। একজন বিশুর হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিতে চায়। গোবরা লোকটাকে সপাটে লাথি মারতে, সে ছিটকে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে। আর ততক্ষণে হোঁৎকা একজনের গলার সামনে ছুরিটা ধরে বলে,-কেউ এক পা এগোলে একেই শেষ করব।

লোকগুলো ভাবেনি যে ওদের আক্রমণ এমনিভাবে প্রতিরোধ করব আমরা।

হোঁৎকা ছুরিটা ওর গলায় ঠেকিয়ে বলে,-চল, বাইরে চল, বাইরে এসে এবার দেখি বস্তির লোকরাও থেমে গেছে। বেশ খানিকটা লোকটাকে এনে এবার তাকে ছেড়ে দিতেই সে দৌড়ে পালালো।

গোবরা বলে,-ব্যাটা যে এখানেই থাকে, সেটা নিশ্চিত।

মামাবাবুরাও শোনেন আমাদের অভিজ্ঞতার কথা। নন্টু ড্রাইভার আমাদের সঙ্গে যায়নি। সব শুনে সে বলে,-আমাকে নে যাননি কেন? ব্যাটাদের দু-একটাকে ঘা কতক দিয়ে আসতাম।

হঠাৎ অন্ধকারে লাইকার চিৎকার কানে এল।

দারোয়ান বলে,-একটা ছেলেকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

-নিয়ে এসো আমাদের ঘরে।

সজলকে দেখেই চিনতে পারি।

-সজল! বোসো!

সজল এদিক ওদিকে চাইছে। তাকে বলি,-এখানে বাইরের লোক কেউ নেই। বলো কি ব্যাপার।

সজল বলে,-একটু আগে কালুয়া এসেছিল শেঠজির কাছে। কারা নাকি তাদের বস্তিতে গেছল ওর সন্ধানে। ও আর ওই মাল রাখতে চায় না তার ঘরে।

-কি মাল?

সজল বলে,-ওদের হাতে অনেক মালই থাকে। তবে এটা নাকি সোনা-দানা চোরাই মাল কিছু নয়। বোধহয় একটা ছেলেকেই আটকে রেখেছে ওখানে! সে নাকি পালাবার চেষ্টা করতে তার মুখ-টুখ হাত-পা বেঁধে রেখেছে।

আমরা চমকে উঠি। তাহলে আমরা ওদের বাধা অগ্রাহ্য করে এগোলে নিশ্চয়ই পটলাকে উদ্ধার করতে পারতাম। ভাবতেও পারিনি যে ওই নোংরার মধ্যে ওরা পটলাকে আটকে রাখবে।

হোঁৎকা শুধায়-এখন কোথায় সে?

সজল বলে-শেঠজি ওকে তার জঙ্গলের ডেরায় নিয়ে যেতে বলেছে।

-সে কি!

সজল বলে,-এতক্ষণে বোধহয় তাকে নিয়েও চলে গেছে।

-সেটা কোনখানে?

সজল বলে,-শুনেছি জঙ্গলের মধ্যে একটা সুরক্ষিত আস্তানা ওরা তৈরি করেছে। সেখানে অনেক চোরাই মালও থাকে। আমি যাই, দেরি হলে ওরা খোঁজাখুঁজি করবে।

সজল চলে যেতে বলি-আমার মন বলছে পটলাকে ওই কেল্লার মধ্যেই কোথাও আটকে রেখেছে।

গোবরা বলে,-তাহলে এই রাতেই আমাদের ওখানে যাওয়া দরকার। ওরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারবে না যে এই রাতেই এত তাড়াতাড়ি আমরা ওদের ডেরায় হানা দেব।

বিশু বলে,-সেই ভালো।

নণ্টু ও তৈরি। সে বলে বাড়ি থেকে গাড়ি নিলে জানতে পারবে, আমার বন্ধুর জিপ আছে-সেটা নিয়ে পাঁচিলের ওদিকে থাকব।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়তে আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। দড়ি, টর্চ, ছুরি সব গোছানোই ছিল। আমরা এর মধ্যে খিড়কির দরজা দিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি জোগাড় করে নীরবে বের হয়ে গেছি। লাইকা কুকুরটাকেও সঙ্গে নিয়েছি।

বাড়ির পিছনে জিপও রেখেছে নণ্টু। আমরা হেডলাইট নিভিয়ে তারার আলোয় কোনোমতে এগিয়ে চলি।

নাগরমলজি খুব হিসেবি লোক।

পটলাকে আটকে রেখে ক্রমশ জানতে পারে, একে মোচড় দিলে লাখখানেক টাকা মুক্তিপণ আদায় করা যাবে।

তাই নাগরমলজি কালুয়াদের নামেই কলকাতায় পটলের বাড়িতে ফোন করে ঘোষণা করেন,-আপনার ছেলেকে আমরা আটকে রেখেছি। যদি তাকে পেতে চান দশ লাখ টাকা নিয়ে ভীমপুর স্টেশনের নীচে নদীর ব্রিজে আসবেন। পুলিশে খবর দিলে ফল ভালো হবে না।

খবরটা পেয়ে কলকাতায় পটলের বাড়িতে নেমেছে আতঙ্কের কালো ছায়া। ঠাক্‌মা খবরটা শুনে চমকে ওঠে-যে ভয় করছিলাম তাই হল! ডাকাতি করেছে ওই পটলকেই!

পটলের মায়ের চোখে জল। সে বলল,-কি হবে মা?

বুড়ি বলে,-চলো, টাকাই দেব ওই ম্যাপড়াদের। পটলের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আজই চলো।

ছোটকাকা বলেন-আগে খবর নিই, ওর মামাদের ফোন করি, তারপর যা হয় করা যাবে।

পটলের বাবা বলেন,-ডাকাতদের টাকা আমি দেব না। পুলিশের আই.জি. সাহেবকে ফোন করছি, এ কি মগের মুলুক!

ঠাক্‌মা বলে,-টাকা নিয়ে ধুয়ে জল খাবি? যদি আমার পটলের কিছু হয়ে যায়?

তবু পটলের বাবা পুলিশের বড়কর্তাকে ফোন করে ওই অঞ্চলের উপদ্রব, ডাকাতির কথা জানান। তাঁর ছেলের ওইভাবে অপহরণ, আর মুক্তিপণ দাবী করার খবরও জানান।

এবার পুলিশের টনক নড়ে। খোদ বড়সাহেব চেনেন পটলের বাবাকে। শহরের নামকরা পরিবার। পরিচিতি অনেক দূর অবধি। অর্থাৎ জল অনেক দূর অবধি গড়াতে পারে।

গভীর রাতে ফোনটা বাজছে। পটলার মামা-মামিরা জেগে।

ফোন আসছে কলকাতায় পটলদের বাড়ি থেকে। ওর বাবা ফোন করছে। মা কান্নাভেজা স্বরে বলে,-একি সর্বনাশ হল দাদা! ডাকাতরা পটলকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে, আমাদের কাছে ফোন করেছে একদিনের মধ্যে দশলাখ টাকা না দিলে তাকে শেষ করে দেবে।

চমকে ওঠেন মামাবাবু,-সে কি! পটলকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরাও খুঁজছি সবাই আর ডাকাতরা তোমাদের সিধে ফোন করেছে টাকার জন্য? নাম্বার পেল কোথায়?

ওদিকে থেকে বলেন পটলের মা,-বোধহয় পটলের কাছেই পেয়েছে। ওর বন্ধুরা কোথায়? তাদের ডেকে দাও! কথা বলব।

এবার নীচের ঘরে ছেলেদের ডাকতে গিয়েই ছোট মামাবাবু চমকে ওঠে। দুটো ঘরেই ছেলেদের কেউ নেই। বিশু ও নেই, মায় কুকুরটা অবধি নেই। ঘর ফাঁকা।

চমকে ওঠেন মামা-গেল কোথায় সব?

ওদিকে ফোনে কথা বলার জন্য লাইন ধরে আছে পটলের মা।

তাড়া দেয়,-কি হল?

ছোটমামা এসে খবর দেয়,-ছেলেগুলোকে দেখছি না। ঘর ফাঁকা।

মা এদিক থেকে চমকে ওঠে-সে কি। তাহলে তাদেরও ধরে নিয়ে গেছে। এখন কি হবে?

বড়মামা বলেন,-দেখছি!

ঠাক্মা ফুঁসে ওঠে,-আর দেখে কাজ নাই বাছা! যা দেখার এবার আমরাই দেখছি। যাচ্ছি ওখানে।

ফোনটা কেটে যায়।

এবার বড়মামা, ছোটমামাও বিপদে পড়েন। মামিমার চোখে জল,-মুখ দেখাবার উপায় রইল না। ছেলেগুলোকে ভালো রাখো ঠাকুর। বড়মামা বলেন থানাতেই চলো।

ছোটমামা বলেন,-ওখানে গিয়ে লাভ হবে না। থানার দারোগা নাগরমলের ধামাধরা। যেতে হয় পলিশ সুপারের কাছেই চলো দাদা। শুনেছি নতুন এসেছেন, খুব কাজের লোক।

ওদিকে রাতের অন্ধকারে আমাদের জিপটা চলেছে বনের রাস্তা ধরে। নণ্টু এখানকার ছেলে। এই বনের অন্ধিসন্ধি তার জানা। সে বলে,-গড়ে যাবার ভালো রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া যাবে না। ওই পথে নিশ্চয়ই নাগরমলের চর রয়েছে, ওরা আগেই খবর পেয়ে যাবে।

-তাহলে?

আমার কথায় নণ্টু বলে-বনের ভিতরে যাবার অন্য রাস্তা আছে, ওটা দিয়ে গড়ের পিছনদিকে পৌঁছান যায়। সেদিকে জঙ্গলও গভীর, সহজে কেউ যায় না। ওই পথে যাওয়াই নিরাপদ।

তাই আমরা হেডলাইট নিভিয়ে ম্লান চাঁদের আলোয় ঢাকা পথে চলেছি।

জিপটাকে বনের মধ্যে রেখে আমরা নামলাম। এখান থেকে নদীটাকে দেখা যায়। নদীর বুক থেকে উঠেছে গড়ের প্রাচীর। ওই স্তব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন কেল্লার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকি।

প্রাচীনকালের কেল্লা, তখন হয়তো এই নদীর ধারে জনবসতি ছিল। এখন জনহীন অরণ্য। অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে ওই কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে ধ্বসে পড়েছে, পাঁচিলের ফাটলে বট অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে।

তাতে অবশ্য আমাদেরই সুবিধে। টর্চের আলোয় ওই সব পথের সন্ধান করে এবার অভিযানের জন্য তৈরি হই।

নাইলনের দড়িগুলোর প্রান্তে মজবুত আংটা লাগানো। ওই আংটাসমেত দড়িগুলো উপরের দিকে ছুঁড়ে দিতে দু-একটা আংটা ওই গাছের ডালে আটকে যায়। তারপর ওই দড়ি ধরে আমরা অনায়াসেই কেল্লার ছাদে উঠে পড়ি।

সেখানেও ঝোপ-ঝাপ রয়েছে। ওরই আড়ালে বসে এবার দেখি দলের সবাই উঠে এসেছে, মায় লাইকাও।

কেল্লার এলাকাটা এবার দেখতে পাই। অনেকখানি এলাকা জুড়ে কেল্লাটা। এককালে বেশ সুরক্ষিতই ছিল। নদী থেকে কেল্লার চারদিকে খাল কেটে অতীতে জলভরা থাকত। এখন খালগুলো সংস্কারের অভাবে মজে গেছে। বনবাদাড় গজিয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কোথায় খুঁজব পটলাকে? আমরা ছাদের আলসের পাশ দিয়ে অন্ধকারে চলতে থাকি সিঁড়ির সন্ধানে।

বেশ খানিকটা এসে দেখি নীচের আঙিনায় একটা লোক। ওর হাতে বল্লম। লোকটা ওই সিঁড়ির পথেই পাহারায় রয়েছে।

হোঁৎকার ইশারায় আমরা থামলাম। বিশু লাইকাকে ধরে রেখেছে। ও নীচে নামার জন্য ছটফট করছে।

আমরা চুপিসাড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি। লোকটা বোধহয় দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমচ্ছিল। তাই আমাদের পায়ের শব্দ পায়নি।

গোবরা অতর্কিতে লোকটার ঘাড়ের কাছে ক্যারাটের এক জোর ঝটকা মারতে লোকটা নীরবে কাটা কলাগাছের মত সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে।

আমরাও তৈরি ছিলাম।

ওর মাথার পাগড়িটা খুলে ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ জোরসে ওর হাত পা বেঁধে তুলে এনে পাঁচিলের কোণে জমা করে দিলাম। লোকটার ফতুয়ার পকেটে কয়েকটা বড় বড় সেকেলে ধরনের চাবি পাওয়া যেতে হোঁৎকা সেগুলো হাতিয়ে নেয়। আর নণ্টু ওর বল্লমটার দখল নিয়েছে।

এবার এদিক ওদিক দেখছি। দূর থেকে কথার শব্দ ভেসে আসছে। অর্থাৎ আরও লোকজন এখানে আছে। তবে কাউকে দেখতে পাই না।

আমরা সামনের খিলান পথ ধরে এগোতে থাকি। ওদিক থেকে যেন মৃদু আলোর আভা আসছে।

আমরা একটা মজবুত দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম পথটা এখানেই থেমে গেছে। দরজায় একটা তালা ঝুলছে। হোঁৎকা সেই চাবির গোছা থেকে একটা একটা করে চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করে। হঠাৎ একটা চাবিতে তালাটা খুলে যায়।

সাবধানে বন্ধদরজা খুলতেই চমকে উঠি। মেঝেতে হাত পা বাঁধা কে পড়ে আছে? পটলা নাকি? এত সহজে পটলার সন্ধান পাব ভাবিনি।

এগিয়ে যাই।

টর্চের আলোয় এবার বন্দীও আমাদের দিকে চাইল। তাকে দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

-সজল! তুমি!

সজলের কপালে রক্তের দাগ, মুখে আঘাতের চিহ্ন। হাত-পা বেঁধে কারা এখানে ফেলে রেখেছে।

ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিই। বেশ খানিকটা জল খেয়ে সজল বলে-ওই শেঠজির লোক আমার উপর নজর রেখেছিল। তোমাদের বাড়ি হতে বের হবার পরই আমাকে ধরে জোর করে এখানে এনেছে। ওরা জানতে পেরেছে যে আমি তোমাদের কাছে গেছি।

হোঁৎকা বলে,-এখানে এসেছি আমাদের বন্ধুর সন্ধানে। কিন্তু কোথায় যে তাকে রেখেছে জানতে পারছি না।

সজল গলা নামিয়ে বলে,-এখানে ওদের অনেক গুপ্তঘর আছে। সবগুলোর খবর আমিও জানি না। চলো, দেখা যাক যদি সন্ধান মেলে।

এবার সাবধানে এগোতে থাকি। এদিকের বড় একটা ঘরে দেখা যায় বিরাট বড় বড় কাপড়ের গাঁট। ওদিকে নতুন টায়ারের স্তূপ, দেওয়াল অবধি সাজানো নানা ধরনের যন্ত্রপাতির প্যাকেট।

সজল বলে,-এসব শেঠজির ওয়াগন থেকে লুঠ করা মালের গুদাম। সব মাল এখানে এসে জমা হয়। তারপর এখান থেকে পাচার করা হয়।

হঠাৎ যেন দেওয়াল ফুঁড়ে দুটো ছায়ামুর্তির আবির্ভাব ঘটে,-ব্যাটা এখানে এসেছিস?

অন্যজন গর্জে ওঠে,-বাঘের গর্তে সেঁদিয়েছিস নেংটি ইঁদুরের দল তোদেরও ব্যবস্থা করছি।

তেড়ে আসে ওরা, হাতে ভোজালি।

হঠাৎ হোঁৎকা একটা পাথর তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়তেই সেটা একজনের কপালে গিয়ে লাগে। আর লোকটা চকিতের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেখানেই আছড়ে পড়ে। আর পরমুহূর্তেই লাইকা গিয়ে লাফ দিয়ে অন্যজনের টুঁটি টিপে ধরতে তার হাত থেকে ভোজালিটা পড়ে যায়। আমরা তাকে এবার ধরে ফেলি।

লাইকার হাত থেকে বাঁচলেও সে আমাদের হাত থেকে বাঁচে না। তার সামনে তারই ভোজালি তুলে ধরে বলি,-পটল নামের সেই ছেলেটাকে কোথায় রেখেছে বল!

লোকটা বলে,-জানি না।

গোবরার সপাটে লাথি খেয়ে এবার অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সে।

হোঁৎকা গজরায়,-কঠিক কইরা, নালি তরে কাইটা ফেলুম! বল-

উদ্যত ভোজালি দেখে লোকটা বলে,-বলছি।

গোবরা বলে,-বলতে হবে না, নিয়ে চল আমাদের। চল।

লোকটা বলে,-শেঠজি জানতে পারলে মেরে ফেলবে।

গোবরা বলে,-না বললে আমরাই মারব তোকে।

লোকটা বুঝেছে সমূহ বিপদ। তাই বলে সে,-ঠিক আছে। চলো এদিকে।

লোকটা আগে আগে চলেছে, পিছনে চলেছি আমরা। লাইকাও চলেছে। সে হঠাৎ কিছুটা গিয়েই থেমে যায়। বাতাসে কিসের ঘ্রাণ নিয়ে পিছু হঠে এসে চিৎকার করে।

আমি বলি,-বিশু ওকে থামা, ওর চিৎকারে অন্যরা এসে পড়লে বিপদ হবে।

বিশু ওকে থামাবার চেষ্টা করে। লোকটা বলে,-ওই ঘরের ওদিকে একটা ঘরে রেখেছে তোমাদের বন্ধুকে।

সামনে চাতাল মত, তারপর আবার একটা দরজা। ওই ঘরের ওপাশেই কোনো অন্ধকার পাথরের কারাগারে পটলাকে আটকে রেখেছে। তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

আমি হোঁৎকা দুজনে এগিয়ে যাই দরজাটা খোলার জন্য। এদিকে গোবরা লোকটাকে আটকে রেখেছে। হঠাৎ লোকটা নিমেষের মধ্যে এক ঝটকায় গোবরার হাত ছাড়িয়ে, নিজেকে মুক্ত করে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতেই লাইকা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকটা ততক্ষণে দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গেছে আর আমরাও আবিস্কার করি মেঝেটা নিমেষের মধ্যে আমাদের পায়ের নীচে থেকে সরে গেল।

একটা অন্ধকার গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি আমি আর হোঁৎকা। বাকিরা মেঝের সীমানার বাইরে ছিল বলে ওরা পড়েনি। আর আশ্চর্যের কথা উপরের সেই মেঝেটাও আবার জোড়া লেগে গেছে।

হাতে পায়ে সামান্য চোট লাগলেও সেটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। নীচের ওই অন্ধকার পুরীতে দেখি একটা পথও রয়েছে। অর্থাৎ এটা কেল্লার মাটির নীচের মহলই বলা যেতে পারে।

হোঁৎকা বিপদের মধ্যেও বেশ মাথা ঠান্ডা রেখেই কাজ করতে পারে।

আমি বলি,-এখন কি হবে? পটলাকে খুঁজতে এসে নিজেরাই তো বন্দী হয়ে গেলাম।

হোঁৎকা বলে,-হাওয়া চলাচল করত্যাছে, পথ নিশ্চয়ই আছে, চল দেহি।

আমরা এবার সামনের সরু বারান্দা মত পথটা দিয়ে চলেছি। টর্চের আলোয় দেখা যায় আশপাশে জমাট প্রাচীর। ওদিকে দু-একটা ঘরও আছে, তবে নীচের সুরক্ষিত অঞ্চল, তাই দরজায় তালা নেই। ঘরের মধ্যে কি আছে দেখার সময় আমাদের নেই, এখন বের হবার পথ খুঁজতে হবে।

হঠাৎ একটা ঘরের মধ্যে কার অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। হোঁৎকা কান পেতে আওয়াজটা শুনে বলে,-কারো গলার স্বর শুনছি না!

এবার সরু পথের পাশে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। টর্চ জ্বেলে সাবধানে এগিয়ে যাই। কে জানে এও কোনো কৌশল কিনা!

টর্চের আলোয় ঘরের কোণে দেখি একটা খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে আমাদের পটলাই। পটলার মুখে স্টিকিং-প্লাস্টার, হাত দুটো বাঁধা। পা-ও।

আমাদের দেখেছে পটলা। কিন্তু মুখ বন্ধ থাকার জন্য কোনো কথাই বলতে পারছে না।

আমরা ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে মুখের স্টিকিং-প্লাস্টারটা সাবধানে তুলে দিয়ে পটলা বলে,-ত-তোরা।

আমরা আমাদের অভিযানের ব্যাপারটা জানাই আর এখানে অতর্কিতে কিভাবে হুড়মুড়িয়ে এসে পৌঁছেছি, তা-ও বলি।

পটলা বলে,-ওই কা-কালুয়া, ট্রেনের ডাকাতগুলো এ-এখানেই থাকে। স-সবাই ওই নাগরমলেরই লোক। ওই কালুয়াই আমাকে একটা ঝুপড়ি থেকে এখানে এনেছিল। ওই গলি দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামিয়েছিল।

তাহলে ওঠা-নামার জন্য অন্য পথও আছে?

কতক্ষণ ধরে এই পাতালপুরীতে বন্ধ রয়েছি জানি না। ঘড়ি দেখে খেয়াল হয় ছ'টা বেজে গেছে। অর্থাৎ বাইরে এখন সকাল। শালবনের মাথায় নদীর বিস্তীর্ণ বালুচরে এখন দিনের আলো ফুটেছে। এবার আমাদেরও বের হবার পথ খুঁজতে হবে।

পটলার জন্য কিছু জলও রেখেছিল কুঁজোতে। সেই জল খেয়ে বের হই মুক্তিপথের সন্ধানে।

এদিকে ওদিকে চলেছি। ধারে পাশে দু'একটা পাথরের খিলানও রয়েছে।

হঠাৎ ওদিক থেকে সরু পথে বেশ জোর হাওয়া আসছে মনে হল। কোনো খোলা জানলা দিয়ে যেমন জোরে ঝড়ের হাওয়া আসে।

হোঁৎকা বলে,-এত জোরে হাওয়া আসতিছে-

আমি বলি,-ওইদিক থেকে আসছে।

আমরা ওই পথে এগিয়ে চলি। নীচের জমি স্যাঁতস্যাঁতে। উপরের খিলানগুলো এখানে একটু নিচু। মাথা নিচু করে চলেছি।

হঠাৎ জোরালো টর্চের আলোয় পাতালপুরীর অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আর কারা পিছন থেকে বলে ওঠেন-কালুয়া, ব্যাটাচ্ছেলেটা এখানে!

কালুয়া গর্জে ওঠে-বহুত রূপিয়াকা মাল! এইসা ভেগে গেলে শেঠজি আমাদেরই জবাই করবে। পাকড়ো!

ওরা ছুটে আসছে।

হোঁৎকা একজনকে সপাটে লাথি মারতে সে ছিটকে পড়ে। পটলাও দৌড়চ্ছে।

ওরা তিন-চারজন মিলে হোঁৎকা আর পটলাকে ঘিরে ফেলতে, আমি একটা থামের পাশ দিয়ে সোজা অন্ধকারেই ছুটতে থাকি।

আমরা ক'জন ছিলাম কালুয়ার দল ঠিক খেয়াল করেনি। ওদের নজর পটলার দিকেই। হোঁৎকাকে দেখে কে বলে,-এটাই তাহলে উপর থেকে খাঁচাকলে পড়েছে!

আমি দুর থেকে দেখছি,পটলা হোঁৎকাকে ওরা দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমার করার কিছুই নেই। কোনোরকম শব্দ পেলে আমাকেও এসে ধরবে, তাই দূরে ওইভাবে লুকিয়ে রইলাম।

পটলাকে উদ্ধার করেও বের হয়ে যেতে পারলাম না। ওরা এসে পড়ে আবার পটলাকে তো নিয়ে গেলেই, সেই সঙ্গে হোঁৎকাকেও নিয়ে যাচ্ছে। আমি তখনও থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি।

ওরা চলে যাবার পর বুঝতে পারি এই অজানা অচেনা পাষাণপুরীতে আমি একাই বন্দী হয়ে আছি।

বাইরের হাওয়াটা এখন জোরে বইছে। ওই হাওয়া এই পাতালপুরীর বদ্ধ পরিবেশে তাজা প্রাণের খবর আনে। আমি এবার ওই দিকেই এগোতে থাকি। কিছুটা যাওয়ার পর দেখা যায় পাথরগুলো এক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। আর সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে বালুচর, শালবন। অর্থাৎ মুক্তির পথ আমার সামনে।

বাইরে এদিকে কোনো লোকজন পাহারাতে আছে কিনা জানা দরকার। কিন্তু তেমন কাউকে দেখা যায় না। বেলাও হয়ে গেছে। চারিদিকে রোদের সোনালি আভা।

বের হয়ে ওই জঙ্গলের আড়াল থেকে চেয়ে দেখি বিশাল কেল্লাটাকে। ওর কোন্ অতল গহ্বরে আটকে রয়েছে পটলা, অন্যরা।

এখন আমাকেই যেভাবে হোক ওদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শেঠ নাগরমল জানে ওই পটলা তার কাছে বিশাল অঙ্কের ব্যাঙ্ক চেক, তাই তার উপর নজর রেখেছিল। আশা ছিল টাকাটা সহজেই পাবে, তারপর ছেড়ে দেবে পটলাকে।

কিন্তু হঠাৎ কেল্লার মধ্যে বাইরের ওই ছেলেদের আমদানী হতে দেখে চমকে ওঠে শেঠজি। এটা ছিল তার কল্পনার বাইরে। আমাদের দলের এহেন দুঃসাহসে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

শেঠজি জেনে গেছে যে তার এতদিনের নিরাপদ কেল্লার মধ্যে এবার বাইরের বেশ ক'জন ঢুকেছে। তারা অনেককিছুই জেনে যাবে। তার পক্ষে এটা খুবই বিপজ্জনক ঘটনা। তাই শেঠজি বলে,-কালুয়া, সবকটাকে ধরে অন্ধকার গুম ঘরে আটকে রাখ, যেন একটাও বেরুতে না পারে। এত বড় হিম্মৎ ওদের, আমার পিছনে লাগবে।

কালুয়াও জানে তাদের সকলকেই বাঁচাতে হবে। তাই সারা কেল্লায় তার লোকজন ছড়িয়ে পড়ে।

ওদিকে আমি আর হোঁৎকা পাতালপুরীতে ঢুকে যাবার পর মেঝেটা আবার কি কৌশলে যথাস্থানে সেট্ হয়ে যায়। গোবর্ধন ফটিক বিশুরা দেখে আমরা দুজন নেই। লাইকা কুকুরটা লাফ দিয়ে মেঝেতে এসে পা দিয়ে আঁচড়াতে থাকে, আর গোঁ গোঁ করতে থাকে।

গোবরা বলে,-ওইখানে কুকুরটা কালও আঁচড়েছিল, চিৎকার করেছিল। ওখানে কোনো গড়বড় আছে সেটা ও আগেই বুঝেছিল, আমরা বুঝতে পারিনি।

ফটিক বলে,-এখন কি হবে? এক পটলাকে আটকেছিল, এখন সঙ্গী হোঁৎকাকেও আটকেছে ওরা!

বিশু, নন্টু ও ভাবনায় পড়ে।

সজল বলে,-শেঠজি সাংঘাতিক লোক। ওর লোকজনও টের পেয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি।

ফটিক বলে,-চল, বের হয়ে যাই। বাইরে গিয়ে পুলিশকে খবর দিতে হবে, পটলার মামাদেরও।

হঠাৎ দু'তিনটে টর্চের আলো এসে পড়ে ওদের উপর। কে বলে,-বাকি ক'টা এখানেই রয়েছে, ধর ব্যাটাদের।

ওরা এগিয়ে আসছে, হঠাৎ লাইকা অন্ধকার ফুঁড়ে লাফ দিয়ে গিয়ে ওদের দলের পয়লা নম্বর সর্দারের টুঁটি টিপে ধরে। ওই প্রচণ্ড লাফের ধাক্কায় লোকটার হাতের পিস্তল ছিটকে পড়ে।

পিস্তলটা ছিটকে পড়তেই গোবর্ধন সেটা কুড়িয়ে নেয়। গোবর্ধনের মামার রিভলবার আছে, গোবরা লুকিয়ে চুরিয়ে সেটা দু-চারবার ফায়ারও করেছে। এবার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই গোবরা ওটা তুলে বলে,-এক পা এগোলে গুলি করব।

লোকগুলো দেখছে সর্দারের ওই অবস্থা, আর গোবরার হাতে সর্দারের পিস্তল। ওরা থেমে যায়।

গোবরা বলে,-কোথায় রেখেছিস পটলাকে?

লাইকা সর্দারকে ছেড়ে দিয়ে এবার লোকগুলোর দিকে লাফ মারে। এদিকে উদ্যত পিস্তল, ওদিকে মৃত্যুদূতের মত কুকুর। অন্ধকারেই যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালায়।

মেঝেতে পড়ে আছে লোকটা, ভয়ে বিবর্ণ। গলাটা ফুটো গয়নি, তবে কাঁধে বেশ চোট পেয়েছে। লোকটা কালুয়ার সহচর। একেই ট্রেন ডাকাতি করতে দেখেছিল সবাই।

এবার গোবর্ধন ওর পেটে পা চাপিয়ে বলে,-খুব যে বীরত্ব দেখাচ্ছিলি সেদিন ট্রেনে, নিরীহ প্যাসেঞ্জারদের মারিস, লুটিস, এবার?

লোকটা আর্তনাদ করে,-শেঠজি করায়।

দু'তিনটে উল্টো-পাল্টা লাথি মারতে সে কাতরাতে থাকে। গোবরা ওকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ওইখানে ফেলে রেখে বলে,-থাক এখানে। পরে এটার ব্যবস্থা করব।

বিশু বলে,-ওরা জেনে ফেলেছে আমরা এসেছি, বাকিগুলো পালিয়ে গিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই খবরও দিয়েছে নাগরমলকে।

গোবরা বলে,-ভয় কি? হাতে পিস্তল আছে, অন্য অস্ত্রও আছে। ওদের সঙ্গে লড়তে হয় লড়ব, তবু পটলা হোঁৎকাদের এখানে ফেলে যাব না।

নীচের মহলে তখন হোঁৎকা আর পটলাকে ধরে ফেলেছে কালুয়া। শেঠ নাগরমলও এসেছে। মালপত্রের তদারক করতে। সে এসে ব্যালারটা বুঝে খেপে উঠেছে। কালুয়া ওদের ধরে আনতে এবার শেঠজি বলে,-পালাবি এখান থেকে! এই কেল্লায় কতজনের লাশ গুম করেছি তা জানস? এবার তোদেরও শেষ করে দেব।

পটলা বলে,-আ-আমরা কি করেছি?

-কি করিসনি? আমার কারবারে বাধা দিবি? এখানে খুন করে পুঁতে দেব। মাটিতে আর দুটো কঙ্কালের সংখ্যা বাড়বে মাত্র।

হঠাৎ পাতালপুরী কাঁপিয়ে পর পর দু-তিনটে বোমা ফাটে। বদ্ধ বাতাস বারুদের গন্ধে ভরে ওঠে আর কেঁপে ওঠে সারা কেল্লা।

চমকে উঠে শেঠজি-ক্যা হুয়া! এতনা আওয়াজ?

গোবরার দল এগোচ্ছিল, এবার ওই পাতালপুরীর শয়তানের দল প্রথম পালিয়ে গিয়ে দলবেঁধে গোবরার দলের উপর আক্রমন করার চেষ্টা করে। ওরা এগিয়ে আসছে।

গোবর্ধন-নন্টুরা দেখেছে সামনে বিপদ।

লোকগুলো গর্জে ওঠে-শেষ করে দে ব্যাটাদের।

ওরা এগিয়ে আসছে, আর তারপরেই নন্টু পরপর দুটো বোমা ছোড়ে ওদের লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড শব্দে ফাটে বোমাগুলো। বেশ কয়েকজন ছিটকে পড়েছে। বাকিরা তখন আর নেই। ওই ধোঁয়ায় আড়ালেই তারা যে যেদিকে পেরেছে দৌড়েছে।

গোবরা দেখে পিছনে বের হবার খিলান পথ, তিনদিকে জমাট দেওয়াল আর সামনে ওই পলায়মান শত্রুর দল।

এবার বিশু বলে,-এখন কি হবে? ওরা সবাই জেনে গেছে।

গোবরা বলে,-তা সত্যি, এখানেই ঘাঁটি গেড়ে থাকতে হবে, থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে। ওদিক থেকেই ওরা আসতে পারে, এলেই বোঝাপড়া হবে।

শেঠ নাগরমল ওই বিকট আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে। তার সুরক্ষিত কেল্লায় নিশ্চয়ই পুলিশ ঢুকেছে। সে ভাবতেই পারেনি যে এখানে এসে কেউ হানা দেবে।

ছুটে আসছে সে।

হোঁৎকা পটলাও খুশি হয় ওদের ওই অবস্থা দেখে। কিন্তু তাদের করার কিছুই নেই। একেবারে বেঁধে রেখেছে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে।

এমনসময় ওই লোকগুলো ছুটে আসে।

শেঠজি শুধায়,-ক্যা হুয়া?

কে বলে,-তিন-চারজন একটা ইয়া কুত্তা নিয়ে এসে ঢুকেছে। তারা লালটুকে পেড়ে ফেলেছে, আমরা ভি ওদের ধরতে গেলাম এই সা বোম মারল-

গর্জে ওঠে শেঠজি,-কারা! কারা ঢুকছে এখানে?

-সে মালুম নেহি।

শেঠজি বলে,-কালুয়া, চল তো। ওই বাঁদরের দলই ঢুকেছে, দুটোকে আটকেছি, বাকিগুলোকেও খতম করে দিতে হবে, একটাও যেন পালাতে না পারে।

ওরা এবার তৈরি হয়ইচলেছে ওই শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। চোখে মুখে ফুটে ওঠে আদিম হিংস্রতার ছায়া।

আমি তখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই চলেছি একা। শালবন-নীচে ও ঝোপ-জঙ্গল, তার মাঝে একটু পথের রেখা জেগে আছে। হঠাৎ বনের মধ্যে গুরু গুরু শব্দ শুনে থামলাম।

দেখা যায় মোরাম ঢাকা বনের রাস্তাটার কাছেই এসে গেছি। আর শহরের দিক থেকে বেশ কিছু গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শালবনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চেয়ে থাকি, দেখি বনের মাথায় গাড়ি আসছে লাল ধুলো উড়িয়ে।

একটা নয়, বেশ কয়েকটা গাড়ি। পুলিশ ভ্যান, জিপ রয়েছে কয়েকটা। তার পিছনে পটলার মামার গাড়িগুলো দেখে মনে ভরসা পাই।

ওরাও তাহলে এইদিকেই আসছে। আমিও রাস্তার উপরে উঠে এসে হাত নাড়তে থাকি। বনের মধ্যে একলা আমাকে দেখে গাড়িগুলো থেমে যায়। পুলিশ সুপার নিজেই রয়েছেন।

ওদিক থেকে পটলার বাবাও এসেছেন। মামা শুধোন,-তুমি! ওরা সব কোথায়?

আমি জানাই কেল্লার মধ্যেই রয়ে গেছে তারা, ওদের শেঠজির লোক আটকে রেখেছে।

পুলিশ সাহেব বলেন,-সে কি! তাহলে যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে।

এবার পুলিশ ফোর্স এসে কেল্লাটাকে ঘিরে ফেলে। মাইকে ঘোষণা করা হয়, ধরা দিন শেঠজি, পুলিশ ফোর্স বাধ্য হয়ে ভিতরে ঢুকবে।

কেল্লার বুরুজের উপর এসে গুঁড়ি মেরে চারিদিক দেখে শেঠজি এবার বুঝতে পারে এই পুলিশের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। ওদিকে বেশ কিছু পুলিশ ফোর্স নিয়ে পুলিশ সাহেব নিজে আমার দেখানো পথে ভিতরে গিয়ে হাজির হন, পাতালপুরীর অন্ধকার পলিশের ইমার্জেন্সি আলোয় ভরে ওঠে। পাতালপুরী থেকে হোঁৎকা পটলাকে উদ্ধার করে এবার ওই কালুয়ার দলকে তাড়া করে পুলিশ।

শেঠজিও বুঝেছে পালাবার আর পথ নেই। কালুয়াও দলবল সমেত ধরা পড়ে।

এবার পুলিশ সার্চ শুরু করে অবাক হয়। কেল্লার বিস্তীর্ণ ওই ঘরগুলোতে রাশি রাশি বিভিন্ন কোম্পানির লাখ লাখ টাকার দামি মাল রাখা, সবই ওয়াগন ভাঙার মাল।

হোঁৎকা বলে,-স্যার, এখানের ট্রেন-ডাকাতির মূলেও এরাই।

পুলিশ সাহেব ওয়ারলেসে জরুরি খবর পাঠান। আর বিশাল ওই চোরাই মালের ভাণ্ডার পাহারার ব্যাবস্থা করেন, ওদের প্রিজন-ভ্যানে তুলে সদরে চালান করেন।

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বিধবস্ত দেহ নিয়ে আমরা পটলার মামার বাড়িতে ফিরে দেখি পটলার মা-ঠাক্‌মাও এসে পড়েছে। আমাদের সদলবলে ফিরতে দেখে বলেন,-ঠাকুর তোদের ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়েছেন। উঃ! এবার বাড়ি চল। ঢের হয়েছে।

মামিরা বলেন,-মা, ক'দিন ধরেই ওদের খুব ধকল গেছে। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। ওদের একটু বিশ্রাম নিতে দেন, তারপর যাবার কথা হবে।

সারা শহরে তখন সাড়া পড়ে গেছে। ওই শেঠ নাগরমল এতকাল এখানে আতঙ্কের রাজত্ব চালিয়েছিল, সেই আতঙ্কের কালোছায়া এবার লোকের মন থেকে মুছে গেছে।

এতদিন পর এই এলাকার মানুষ যেন রাহুমুক্ত হয়েছে আমাদের জন্য। পটলার গ্রামে গিয়ে শিক্ষার প্রসার করা আর সম্ভব হয়নি।

হোঁৎকা বলে,-তয় এক শয়তানকে উচিত শিক্ষা দিতে পারছি, ইডাও কম কি!

পটলার ভোট রঙ্গ

পটলা সেদিন ক্লাবের মাঠে এসে কিছু না বলতেই হাঁক পাড়ে,-অ্যাই পাঁড়েজি, ডবল করে ঝালমুড়ি লাগাও।

আমাদের ক্লাবের মাঠের ধারেই পাঁড়েজির ভুজিয়ার দোকান। মুড়ি-বাদাম-ছোলাসেদ্ধ আরও নানারকম মশলা সহযোগে পাঁড়েজি যা ঝালমুড়ি বানায়, তা এক কথায় ফার্স্টক্লাস!

পটলাকে অন্যদিন ছাপ-টাপ দিতে হয়, আজ যেন ও কল্পতরু হয়ে গেছে।

ঝালমুড়ির পরই আসে নন্টের মনোরমা কাফে থেকে গরম চা।

হোঁৎকা শুধোয়,-কেসটা কি ক'তো? অ্যাক্কেবারে ম্যাঘ্ না চাইতেই জল!

আমরাও অবাক।

পটলা এবার পাশে বসে বলে-একটা প্র-প্র-!

আমিই পাদপূরণ করি,-প্রবলেম?

পটলা বলে,-ঠি-ঠিকই বলেছিস। এখন তো-তোদের হেল্প চাই।

উত্তেজিত হলে পটলার তোতলামি বেড়ে যায়। আর তোতলামির মাত্রা বাড়া কমা দেখে আমরাও তার প্রবলেমের গুরুত্বটা অনুভব করতে পারি।

পটলা এরপর তার প্রবলেমটা জানায়।

তার নসুমামা থাকে কোনো মফঃস্বলের দূর গ্রামে-ওর পূর্বপুরুষরা সেখানকার জমিদার ছিল। এখন জমিদারি গিয়েছে, ওরাও প্রায় জমাদারে পরিণত হয়েছে। তবে নামটা আছে। এহেন নসুমামা এবার ভোটে দাঁড়িয়েছে। সামনেই ভোট।

পটলা বলে,-যে-যেভাবেই হোক, মা-মামাকে ভোটে জেতাতেই হবে।

হোঁৎকা বিরসবদনে বলে,-কই হাবিজাবি কস্? ভোটে দাঁড়ায় যারা তাগোর বিলিভ করস না। হক্কলেই 'ডেঞ্জার পার্সন'। ওই ভোটের ব্যাপারে আমি নাই।

গোবর্ধন বলে,-এখন কুমড়োর সিজন। চারদিক থেকে এখন মাল কিনতে হচ্ছে, দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে। আজ তারকেশ্বর কাল দশঘরা, পরশু আরামবাগ। এখন টাইম কই?

ফটিক কালোয়াতি গানের সাধনা করে। সে বলে,-সামনে সঙ্গীতবিশারদ পরীক্ষা-!

অর্থাৎ পটলার এতবড় বিপদে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না।

পটলা কাতরস্বরে বলে,-তা-তাহলে নসুমামা গো-গো গোহারান হেরে যাবে। তো-তোরা থাকতে!

তারপরেই পটলা বলে,-নসমামা ভোটের জন্য তো-তোদের হাতে এন্তার টাকা দেবে। খ-খরচাপাতি ক-করবি তোরাই। ক-ক্লাবের ফান্ডেও কিছু আসবে। খাওয়া-দাওয়াও ভালোই হবে।

আমদানির কথায় আর খাওয়া-দাওয়ার কথায় এবার হোঁৎকা নড়ে বসে। শুধোয়,-খরচার কথাটা যেন কি কইছিলি?

পটলা ব্যাপারটা বিশদভাবেই জানায়। তাতে মনে হয়, নসুমামা যেন রাজসুয় যজ্ঞই করছে। আর সেই যজ্ঞের হোতা হবার জন্য আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

সেদিন পটলাদের বাড়িতে আমাদের ক্লাবের জরুরি মিটিং। সামনেই সরস্বতী পুজো। হোঁৎকার ইচ্ছে এবার তাকলাগানো পুজো করতে হবে। তারপর হবে ফাংশান। নামিদামি গাইয়েদের আনতেই হবে। কুলেপাড়ার সেভেন বুলেটস্ ক্লাবের পাশেই পটলাদের বিশাল পুকুর। ওখানেই জলের উপর প্ল্যাটফর্ম করে চারিদিকটা চন্দননগরের আলোয় সাজাতে হবে। ডাইনোসোর, কুমির এসবও বানানো হবে আলোর খেলা দিয়ে।

কিন্তু টাকা! টাকা তো নেই। গোবর্ধন আমাদের ক্যাশিয়ার, সেই বলে,-ফান্ড তো নিল্। তাই ভাবনায় পড়েছি, এমনসময় ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষের মত এসে হাজির হয়, নসুমামা স্বয়ং।

নসুমামার চেহারাটা বেশ লম্বাটে, মুখখানা ফুলসাইজ নোড়ার মত লম্বা। উঁচু কপালে ভ্রূ জোড়া যেন একটা আস্ত ধনুকের মত মধ্যস্থল থেকে দুদিকে বাঁকানো। পরনে দামি সার্জের পাঞ্জাবি, ফুললতাপাতা কলকা বসানো শাল, কোঁচানো ধুতি।

নসুমামা বলে,-ওর জন্য ভাবিস না পটলা, তোর ক্লাবের পুজো বেশ ধুমধাম করেই হবে। তবে-

কথাটা শুনে খুশিই হয়েছি, কিন্তু তারপর ওই 'তবে' কথাটায় একটু ধন্দ লাগে। হোঁৎকা এদিকে চাইল। নসুমামা বলে,-ভোটে জিতিয়ে দে। তোরা শহরের চালু ছেলে, পাড়াগাঁয়ে শহরের মত ভোটের ক্যাম্পেন করলে জিতবোই।

গোবর্ধন বলে,-আর শহরের বৈজ্ঞানিক রিগিং-ওটা?

নসুমামা বলে,-সেটা করতে পারলে তো কথাই নেই, জিতবোই। আর তোদের জন্য বরাদ্দ থাকবে দশহাজার টাকা!

দ-শ-হা-জা-র!-গোবর্ধন ক্যাশে এতটা মাল পাবে তা ভাবতেই পারে না। তাই ঈষৎ ঘাবড়ে গেছে। আমরাও এই লোভ ছাড়তে পারি না।

পটলার মা অর্থাৎ আমাদের কল্পতরু মাসিমাও লুচি আলুরদম 'সার্ভ' করতে এসে নসুমামার কথায় বলেন,-নসু বলছে তোরা যা।

হাজার হোক ভাই-তা খুড়তুতোই হোক, তাকে এই বাজারে নেতা বানাবার মতলবে সকলেই সমর্থন করবে। পটলার মা-ও করেন। হোঁৎকা জানে কোন্দিকে কখন ঘাড় কাত করতে হয়।

বলে,-ঠিক আছে। যামু-ট্রাই করুম তোমারে জিতানোর।

নসুমামা যেন হাতে চাঁদ পায়!-তাহলে এই শনিবারই চলে আয়। পটলা পথ চেনে। খরচা বাবদ এতা রাখ।

কলকাতা থেকে বাসে সোজা হরিণখোলায় নেমে সেখান থেকে মাইল পাঁচেক গেলে নদীর ধারে পড়বে হাড়মাসপুর। আমরা সকালের দিকে আরমবাগগামী বাসে উঠেছি এসপ্ল্যানেড থেকে।

নামেই আরামবাগের বাস। ভেবেছিলাম আরামেই যাওয়া যাবে। কিন্তু বাসটা ডানকুনি পার হয়ে কিছুদূর গিয়েই বিকট শব্দ করে থেমে গেল। অবশ্য আর একটু হলে পাশের একটা পচা ডোবার মধ্যে গিয়ে থামত। সামনের চাকাটা ফেটে গিয়ে একেবারে ডোবার কাদায় মুখ নিচু করে গেড়ে বসেছে।

একজন যাত্রী মাটির হাঁড়িতে করে নলের গুড় নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে উপরের বাঙ্ক থেকে গোবর্ধনের গায়ে মাথায় গড়িয়ে পড়েছে খোসবুদার নলেন গুড়।

ওদিকে ড্রাইভার তখন অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে লাফ মেরেছে। দশ কেজি কাতলা মাছের মত ঝপাং করে গিয়ে পড়েছে পচা ডোবার

জলে।

কোনমতে নামলাম মালপত্র নিয়ে। সরকারি গাড়ি। পয়সা ফেরতের প্রশ্নই নেই। এখন যাই কিসে? দু'একটা লোকাল বাস যাচ্ছে তারকেশ্বর অবধি, কিন্তু তাতে ভিতরে, মায় ছাদে অবধি যাত্রীঠাসা

এদিকে বেলা বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত একটা সিমেন্টের লরিকে বেশ কিছু টাকা কবুল করে উঠে বসলাম সিমেন্টের বস্তার উপর। গাড়ি চলছে নেমে কুঁদে, ঝাঁকানিতে সিমেন্ট উড়ছে। আমরা যেন কংক্রিট হয়ে যাব! মাঝে মাঝে বিকট শব্দে হাঁচিও শুরু হয়।

কোনোমতে চাঁপাডাঙা পৌঁছলাম।

ততক্ষণে সিমেন্টওয়ালা একটা দোকানের সামনে গাড়িটা থামায়। বলে,-এখানে কিছু মাল নামবে।

হোঁৎকা বেছে বেছে একটা বড় মিষ্টির দোকানে ঢুকে ডজন খানেক গরম সিঙাড়া, আর বড় সাইজের রাজভোগ অর্ডার দিয়েছে। কলের জলে মুখচোখ গলার ভিতর থেকে সিমেন্টের পলেস্তারা ধুয়ে মুছে খেতে বসেছি। হোঁৎকা বলে,-নাহ্। সিঙাড়াখানা বানাইছে খাসা, আরও খান দুই দিতি ক!

এর মধ্যে ভেঁপু বেজে ওঠে, সিমেন্টওয়ালার ট্রাক এবার আরামবাগের দিকে রওনা হবে। আমরাও উঠে পড়লাম।

হরিণখোলা জায়গাটা মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর। এখন নদীর উপর পাকা ব্রিজ হয়েছে, আগে নৌকায় পার হতে হত খরস্রোতা দামোদরের এই শাখা নদী। বেশ নাব্য। এখন অবশ্য বালির স্তূপ।

নদীর ওপারে গিয়ে নামলাম যখন বেলা একটা বেজে গেছে। এখান থেকে নদীর ধারের কাঁচা সড়ক ধরে পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে। দেখি নসুমামার বাড়ি থেকে গরুর গাড়ি এসেছে। বাহারের ছই লাগানো গাড়ি। নিচে পুরু করে খড় পাতা-তার উপর সতরঞ্চি।

নসুমামার গাড়োয়ান গদাধরের চেহারাটা দেখার মতই। যেন নিরেট একখানা গদাই। আগাপাশতলা সমান, গোলগাল চেহারা। গাড়ির ছই-এ বেশ কয়েকটা 'হাঁড়ি' মার্কা পোস্টার। দরদি দেশসেবক নৃসিংহ রায়কে 'হাঁড়ি' মার্কায় ভোট দিন।

অর্থাৎ নসুমামার প্রতীক ওই হাঁড়ি। এখান থেকেই তার ভোটের এলাকার শুরু। গাছের ডালেও পোস্টার, অবশ্য আশপাশে জোড়া বলদ,লাঙল,সাইকেল, কাস্তে-নানা ছাপের ছবি নিয়ে বহু দরদি দেশসেবকদের নাম হাওয়ায় উড়ছে। ভোটের গাড়িও চোঙা ফুঁকে চলেছে। হাওয়া যে গরম তা বোঝা যায়।

গদাই বলে,-বাবু, যেতে 'টাইম' লাগবে। দুপুরের খাওয়াটা পেটচুক্তি করে ওই হোটেলে খেয়ে লেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেলের চেহারাটা মোটেই দর্শনধারী নয়। তবু কথাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। হোঁৎকা বলে,-তাই চল। খাই লই।

পটলা বলে,-খ-খাবি?

গোবর্ধন বলে,-না হলে এ বেলায় আর কিছুই জুটবে না।

হোটেলওয়ালা পড়তি বেলায় একসঙ্গে ছ'জন খদ্দেরকে দেখে খুশিই হয়।

কোনোরকমে আহার পর্ব সেরে এবার যাত্রা হল শুরু। এর মধ্যে দু-চারটে ভোটের দল ঘুরে গেছে। তারা শুনেছে নসুমামার জন্য কলকাতা থেকে তাঁর দল নাকি স্পেশাল ভলেনটিয়ার পাঠিয়েছে। কোনো এক প্রতিপক্ষ দলের লোকজন দেখছিল আমাদের। কে একজন বলে,-নসুবাবু কি-ফট্!

অর্থাৎ আমরা যে উত্তপ্ত পরিবেশেই এসে পড়েছি, বুঝতে পারছি।

হোঁৎকা বলে,-কি কয়, ওরা?

পটলা বলে,-মামার এগেনেস্ট পা-পার্টি।

গরুর গাড়ি চলছে হটর পটর করে, মেঠো সড়ক ধরে। দুদিকে দিগন্ত প্রসারী আলু গমের ক্ষেত। সবুজ পরিবেশ।

হঠাৎ গেল গেল রব। গাড়িটা টাল খাচ্চে। ছই-এর বাতা ধরে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করি। দেখি একটা চাকা বের হয়ে গড়িয়ে চলেছে, আর আমার সশব্দে বালিতে কাত হয়ে ছই চাপা পড়েছি। গরুর গলার দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। দুটো গরুর একটা নদীর বালিতে, অন্যটা আলুর ক্ষেত দিয়ে দৌড়াচ্ছে। গদা ডিগবাজি খেয়ে দৌড়াচ্ছে গরুটাকে ধরতে।

নেহাত বালিতে পড়েছি, তাই তত বেশি লাগেনি কারুর। অল্পসল্প ছড়ে গেছে।

গদা গরুদুটোকে ধরে এনে এবার অ্যাক্সিডেন্টের কারণটা পরীক্ষা করে বলে,-কুন্ শালা গাড়ির চাকার আলানগুঁজি খুলে দিয়েছে? এ ওই ধনাবাবুর লোকদেরই কাজ!

অর্থাৎ এর মধ্যে প্রতিপক্ষ ধনকেষ্টবাবুর লোকরা নসুবাবুর ভোটকর্মীদের উপর আক্রমণ হেনেছে।

নসুমামার বাড়িটা সাবেকি ধরণের। এককালে এঁদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল তো বোঝা যায়। বড় বড় থাম, এককালে পঙ্খের কাজ করা ছিল, এখন পায়রার বাসায় ভর্তি। কার্নিশ ভেঙে গেছে।

ধ্বংসস্তুপের পাশে নসুমামার নতুন বাড়িটা বেশ ছিমছাম। ওদিকে খামার-বড় বড় খড়ের পালুই। নসুমামার বাড়ির একদিকে দড়ি বেঁধে পোস্টারগুলো টাঙানো হয়েছে।

নসুমামা এগিয়ে আসে।-পথে কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

-না-না।

নসুমামা একজনকে বলে,-সুশীল, এদের ওদিকের ঘরে নিয়ে চল। আর খাওয়া-দাওয়া? হোঁৎকা বলে,-ওসব পথেই সারছি।

-তাহলে চলো। হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করবে। চা-টা খেয়ে, কথা হবে।

বাড়ির পিছনে বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে আম কাঁঠালের বাগান, একটা ঘাট বাঁধানো পুকুরও আছে। গোয়ালে তিনচারটে জারসি নধর গরু রয়েছে। এদিকের ঘরটাও ছোটখাটো হলঘরের মত। আগে থেমেই মামা পাঁচখানা তক্তপোশে পরিপাটি বিছানাও করে রেখেছে। লাগোয়া বাথরুম, ওদিকে বড় ইঁদারা। ব্যবস্থাদি ভালোই।

বৈকালেই বের হলাম গ্রাম দেখতে। সঙ্গে নসুমামার ভাইপো সুশীল। আমাদেরই বয়সি। গ্রামতা বড়সড়। মাটির ঘর খড়ের চাল, মাঝে মাঝে দু'চারটে দালানও রয়েছে।

ওদিকে বাজার পাড়ায় সন্ধের আলো জ্বলে ওঠে। দূর গ্রাম হলেও দোকানপশার ভালোই। আশপাশের এলাকার মধ্যে বড় গ্রাম, তাই ইলেকট্রিকও আছে।

ওপাশে একটা বড় বাড়ি-চারিদিকে পোস্টার। ধনকৃষ্ণ পালকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। বাড়িটার বাইরে একটা অফিস মত-সেখানে অনেকেই রয়েছে। ঘনঘন চা-ও যাচ্ছে।

-তোমরাই কলকাতা থেকে এসেছ, না?

মিটমিটে বাতির সামনে গেলে পিপের মত চেহারার লোকটি, মাথায় চুল নেই-চকচকে টাক। গায়ে একটা দামি শাল। আমাদের

দিকেই এগিয়ে আসে পিছনে দুচারজন চামচা। সুশীলই চাপা স্বরে বলে,-ইনিই ধনকেষ্টবাবু।

আমি জানাই,-আজ্ঞে!

ভদ্রলোক আমাদের দিকে জরিপ করা চাহনি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে,-নসু তাহলে ভোটে লড়বে?

হোঁৎকা বলে,-ক্যান! আপত্তি আছে আপনাগোর?

হোঁৎকার বেশ পাকাপোক্ত চেহারার দিকে চেয়ে ধনকেষ্ট বলে,-না না। ভোটে নামা তো গণতান্ত্রিক অধিকার। আপত্তি থাকবে কেন? তবে এই গাঁয়ের নাম শুনেছ তো? হাড়মাসপুর!

একজন শীর্ণকায় লগার মত লম্বা চামচা বলে,-হাড় মাস এখানে আলাদা করা হয়, কিনা! তোমরা নতুন এসেছ-

ধনকেষ্ট বলে,-এসো হে ভুবন। ভদ্রলোকের ছেলেদের ওসব কথা শোনাতে নেই। চলে যায় ওরা।

ফটিক বলে,-শাসাচ্ছে? ঠিক আছে!

নসুবাবুর ভোটের লোকজন অবশ্য কিছু আছে। পাড়ার কিছু বেকার ছেলে পোস্টার লাগায় আশেপাশের গ্রামে। চোঙা ফুঁকে এপাড়া ওপাড়ায় প্রচার করে। তবে ধনকেষ্টর লোকবল বেশি। লোকটা পরপর দুবার ভোটে জিতে অঞ্চল প্রধানের আসন অলঙ্কৃত করে এর মধ্যেই তার আখের গুছিয়ে নিয়েছে। নিজের ধানকল আছে, গঞ্জে সিমেন্ট লোহার হোলসেল এজেন্ট। এছাড়াও নানা ব্যবসা আছে। ছেলের নামে বাঁধ-রাস্তা তৈরির ঠিকাদারির কাজও বের করেছে।

লাখ লাখ টাকা মঞ্জুর হয় নদীর বাঁধের জন্য। যাতে বন্যার জল বাঁধ ভেঙে এই এলাকায় না ঢোকে, ফসল নষ্ট না হয়। কিন্তু বাঁধের মাটি ফেলা হয় অদ্ভুত কৌশলে। পরের বর্ষাতেই নদীর জলে জরাজীর্ণ তাপ্পিমারা বাঁধ ভেঙে যায়। বন্যার জল এসে সবুজ ধানখেত ডুবিয়ে ফসল নষ্ট করে, রাস্তাও ভেঙে দেয়। তখন আসে বন্যাত্রাণের টাকা, গম, কম্বল। সে সব বিলির মালিক ধনকেষ্টবাবু। সেখান থেকেই সিকি ভাগ তার পেটোয়া লোকদের বিলি করে বাকী সব মাল অন্ধকার পথে বিক্রি করে দিয়ে টাকা ঘরে তোলে সে।

এ যেন সোনার খনি। হাত মুঠো করে তুললেই পয়সা। তাই ধনকৃষ্ণবাবু এহেন রাজ্যপাট হাতছাড়া করতে চায় না। আর এতদিন বেশ ছিল সে। হঠাৎ নসুবাবুকে ওই পদের দিকে হাত বাড়াতে দেখে এবার প্রমাদ গনে সে। তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। নসুবাবুকে যেভাবে হোক ভোট থেকে সরাতে হবে। কারণ সে বুঝেছে এলাকার বেশ কিছু মানুষ তার এই উন্নতিতে মনে মনে ক্ষেপে উঠেছে।

ধনকেষ্টবাবুর ব্যাবসা বাণিজ্যে বেশ কিছু আজেবাজে লোককেও পুষতে হয়। এখন তাদেরও দরকার।।। আর সেই লোকগুলো বাঁকা পথের হদিশ ভালো ভাবেই জানে।

বল্টু, পরেশ মদনারা ছিল বখাটে বেকার। হাটে গঞ্জে মস্তানি করত। বল্টুটা তো পাকা ডাকাত। দু-একবার ডাকাতির কেসেও ফেঁসেছিল। ইদানীং সে বোম-টোমও বাঁধতে শিখেছে। ছেলেটার কয়েকজন ল্যাংবোট ও আছে।

সেবার বন্যাত্রাণের সময় বেশ কিছু লোক ঠিকমত সাহায্য না পেয়ে ধনকেষ্টকে ঘেরাও করেছিল পঞ্চায়েত অফিসে।

তাদের অভিযোগ অনেক। অবশ্য তার জন্য সদরেও দরখাস্ত করেছিল। তখন ছিলেন এক দুঁদে ছেকরা ম্যাজিস্ট্রেট।

রিলিফের অনেক মাল এসেছিল। গম, চাল, কম্বল, ত্রিপল-লাখ টাকার মাল। সে সব মাল গুদামে সরিয়ে দিয়ে, সামান্য কিছু মাল বাইরে রেখে, তার নিজের দলের লোকদের মধ্যে ভাগ করে সব মাল পাচার করার ব্যবস্থা করেছিল নদীপথে।

কিন্তু ওই সব বেআদব গ্রামবাসীরা গুদাম ঘেরাও করে। তারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখাবে হাতে নাতে। ধনকেষ্ট বিপদে পড়ে যায়।

কয়েকশো লোক ঘিরে আছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন। এমন সময় বল্টুর দল রাতের অন্ধকারে বোমা মেরে গোলমাল বাঁধিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গ্রামের সাদাসিধে মানুষ ভয় পেয়ে দে দৌড়। ওদিকে আকাশে গুলির শব্দ ওঠে। কে যেন রটিয়ে দেয় ডাকাত পড়েছে।

ধনকেষ্টবাবুও ছাদে উঠে আর্তনাদ করে,-বাঁচাও, বাঁচাও!

জনতা তখন গুলি, বোমার শব্দে ভীত। কে কোন্‌দিকে মিলিয়ে গেছে।

পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে খবর পান গতকাল ক্রুদ্ধ জনতাই সব রিলিফের মাল লুটপাট করে নিয়ে গেছে। ধনকেষ্ট ও তার কয়েকজন লোক আহত। গুদাম ছাড়িয়ে পড়ে আছে কিছু মাল। বাকি রাতারাতি সব উধাও।

এহেন ধনাবাবু এবার যেন বিপদের গন্ধ পেয়েছে। তাই সন্ধের পর ওই ছেলেদের দেখে একটু ঘাবড়ে যায়। কলকাতা থেকে নাকি সবে একদল এসেছে, আরও দলবল আসবে। আর স্থানীয় লোকদেরও বিশ্বাস নেই।

তাই বল্টু নন্টে, মন্টারা এসেছে ধনকেষ্টবাবুর ডাকে। তারাও জানে ওই ধনকেষ্টবাবুই তাদের ভরসা। কারণ হাটে গঞ্জে ওরা চুরি করে, হাটের ব্যাপারীদের কাছ থেকে ধমক দিয়ে নজরানার টাকা তোলে। ধনাকেষ্টবাবুর রাজত্বে তারা সুখে আছে।

ধনকেষ্টবাবুর রাজ্যপাট চলে গেলে জনতা মায় পুলিশও তাদের এবার ছাড়বে না।

তাই বল্টুরা এসেছে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে।

সব শুনে বল্টু বলে,-এত ঘাবড়াচ্ছ কেন কেষ্টদা? আমরা থাকতে তোমাকে ভোটে কে হারায়? এক ব্যাটাকেও ভোটের দিকে এগোতে দেব না। দেখবে সব ভোটই পড়বে তোমার নামে।

ধনকেষ্টবাবু বলে,-এবারে ব্যাপার আলাদা। নসুবাবুকে এলাকার মানুষ ভালোবাসে। হাজার হোক জমিদার বংশ। নামী ঘর।

বাজারে ধনকেষ্টবাবুর বাবার মুদিখানার দোকান ছিল। আর ধনকেষ্ট তখন থেকেই দোকানে বসে দাঁড়িপাল্লাতে খেল দেখাতো। পাঁচশো গ্রাম মাল দেখাতো চারশোকে। হাতের সাফাই ছিল। তাই অনেকে বলত চোর কেষ্টা।

এখনও আড়ালে অনেক ওই নামেই ডাকে। তাই নসুবাবু দাঁড়াতে বিপদেই পড়েছে ধনকেষ্ট।

বল্টুর চ্যালা গালকাটা গোবিন্দ বলে,-বলো তো উড়িয়েই দিই নসু-ফসুকে।

গোবিন্দ ওসব কাজ ভালোই পারে। এর আগেও একটা জমি দখলের জন্য সেই জমির চাষী রমেশকে খুন করে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। সে কথা এখনও কেউ জানে না। এবারও তাই করতে চায় সে।

কিন্তু ধনকেষ্টবাবু জানে এতে বিপরীত ফলই হবে। আর রমেশের মত গরিব চাষীকে খুন করা যত সহজ, নসুবাবুকে ওটা করা তত সহজ হবে না। ধরা পড়লে ফাঁসিই হয়ে যাবে। ধনকেষ্টবাবু বলে,-ওসবের কথা ভাবিস না। ক্যানভাস্ কর ভোটের জন্য। আর কিছু জনসেবামূলক কাজ নিয়ে লোকের কাছে।

বল্টু বলে,-লোকে যে আমাদের ভয় পায়, যা তা বলে। এড়িয়ে যেতে চায়। তাই ওসব তেল দিয়ে ভোট নয়, স্রেফ ধমকি দিয়েই কৌশলে তোমাকে জিতিয়ে দেব, দ্যাখো না!

ধনকেষ্টর ভাবনা তবু যায় না।

এদিকে আমরাও বসে নেই। দুচারটে ক্লাবের ছেলেরাও এসে নসুমামার পিছনে দাঁড়িয়েছে। সুশীল তাদের দিয়ে হাট তলায়,

আশেপাশের গ্রামে মিটিং করছে। নসুমামা বলেন,-এবার তোরই ভোটের প্ল্যান-ট্ল্যান কর।

এসব ব্যাপারে হোঁৎকা-গোবরার মাথা খোলে। পটলা বুদ্ধি যোগায়। আমি বেশ ভাষা দিয়ে কোথাও রবীন্দ্রনাথ, কোথাও লেনিনের কোটেশন দিয়ে, নরম গরম ভাষায় ইস্তাহার ছাড়ি। আর ফটিক গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে পথসভা মাইকে দারুণ ফাটাফাটি মার্কা গান গেয়ে লোক জুটিয়ে আমাদের প্রার্থীর জয়গান করে।

ওসব ছাড়াও হোৎকা আর একটা বুদ্ধি বের করেছে। এটা তার একেবারে অরিজিন্যাল আইডিয়া। বাগনানের ওদিকে তার পিসেমশাই-এর বাড়ি। তাদের আবার বাজি পটকার বিরাট কারখানা। নানা রকম বাজি, রংমশাল, হাউই, তুবড়ি এসব তৈরি হয়। হাউই বানায় অপূর্ব। হোৎকা এবার পিসেমসাই-এর কোম্পানি থেকে বেশ কিছু মাল আমদানি করেছে।

সেদিন হাড়মাসপুরের হাট বসেছে। নসুমামাদের জায়গাতেই বহুকাল আগে থেকেই এই হাট-এর পত্তন হয়েছিল। এখন এই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের আয়তন বেড়েছে। ফলে হাটে মালপত্র যেমন আসে, তেমনি কেনার লোকজনও আসে প্রচুর।

হাট একেবারে জমজমাট।

এর মধ্যে বটতলায় তক্তপোশ দিয়ে স্টেজ বানিয়ে সেখানে মাইক আর গাছের ডালে চোঙা ফিট করে, বিরাট একটা বাঁশের সাইকেল বনিয়ে প্রতীক বানিয়েছে ধনকেষ্টবাবুর দল।

বল্টুর চ্যালারা তদারক করছে। আর মঞ্চে ধনকেষ্টবাবুর গলায় কে যে গাঁদা ফুলের মালা দিয়েছে জানি না-সেই মালা পরে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছে! মঞ্চে আরও দুজন শীর্ণ টাকমাথার লোক। একজন সিটঁকে গলাবন্ধ কোট পরে বসে আছে, মুখের মধ্যে ঝুরো গোঁফ গুলোই নজরে পড়ে।

চারদিকের পাঁচিলে পোস্টার সাঁটা 'কনকৃষ্ণ পালকে সাইকেল মার্কা ছাপে ভোট দিন।' ধনকেষ্টবাবুও দুহাত নেচে নেচে ভাষণ দিচ্ছে,-ভাইসব ওই নসুবাবু কি করেছে তোমাদের জন্যে?

কিছু না!-বল্টুর জনতা চিৎকার করে।

এবার জোর পেয়ে গলা আর একপর্দা ওপরে তোলে ধনকেষ্ট,-তবে ওকে কেন ভোট দেবে? ভাইসব, আমি তোমাদের জন্যে খরায়, বন্যায় কত সাহায্য দিয়েছি। পথঘাট করেছি। তোমাদের জন্য ডাক্তারখানা করিয়েছি।

কে যেন বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে চিৎকার করে,-ডাক্তার নাই, ওষুধও নাই, সব কোথায় যায়?

ধনকেষ্ট এহেন মন্তব্যে মাইকের সামনেই গর্জন করে,-কে র্যা?

হেসে ফেলে জনতা? ধনকেষ্টবাবু চুপ। বল্টুরা অভয় দেয়,-বলো কত্তা! চালাও।

সাহস পেয়ে আবার শুরু করে ধনকেষ্টবাবু,-ভাইসব, আমার পেছনে বাঁশ দিতে চায় অনেকে, আমি সর্বত্যাগী অকুতোভয় দেশসেবক।

বেশ চলছে মিটিং। হঠাৎ শূন্যে কয়েকটা শব্দ ওঠে। যেন আকাশে বোমা ফাটছে। হাটতলার মানুষ হৈ চৈ করে ওঠে। মিটিং থেকে কলরব ওঠে, সকলে চাইছে উপরের দিকে। দেখা যায় আকাশে বড় বড় হাউই-এর মত কি উঠছে আর আসমানে শব্দ ফাটছে। সেই সঙ্গে শয়ে শয়ে, লাল নীল কাগজ হাওয়ায় ভেসে ভেসে নীচে নামছে।

কে বলে,-নোট বৃষ্টি হচ্ছে!

কেউ কেউ আসমানী নোট ধরে ভাগ্য ফেরাবার জন্য, কেউ নিছক কৌতূহল বশেই ভেসে আসা কাগজের পিছনে ছোটে।

শান্ত হোন, চুপ করে বসুন। ভাইসব!-চিৎকার করছে ধনকেষ্ট।

বল্টুরা ছত্রভঙ্গ মিটিং আবার শুরু করার জন্য চিৎকার করে। ধনকেষ্টবাবুও মঞ্চ থেকে নেমে একগলা মালা পরা অবস্থায় জনতাকে বসবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওই কাগজগুলো তখন হাতের কাছাকাছি এসে গেছে।

সারা হাটে তখন অসংখ্য কাগজ উড়ে আসছে। সকলেই কাগজ ধরার জন্য ব্যাস্ত।

তার মধ্যে দু'চারজন ধরে ফেলেছে কয়েকটা কাগজ।

একসময় নন্দলাল গ্রামে ফিরে এল। হাট তলায় একটা ছোট ঘর নিয়ে ডাক্তারি শুরু করল। গরিবদের ভিড়ই বেশি হয়। নন্দলালের টাকার খাঁইও বিশেষ নেই। কিছু ধানজমি আছে। পৈতৃক পুকুরে মাছের চাষে আয় হয়। তাই অল্প পয়সায়, কখনোও অ্যালোপ্যাথি, কখনও হোমিওপ্যাথি করে।

ক্রমশ তার নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা এলাকায়। সেবার আদর্শ নিয়েই ডাক্তারি করে, তাই এলাকার সাধারণ মানুষও তাকে মানে, ভালোবাসে।

সেবার অনেক একসঙ্গে মিলে নন্দলালকেই ভোটে দাঁড় করায়। নন্দলাল রাজি হয়নি। বলে-ডাক্তারি করছি এই ভালো ওসব রাজনীতি ফাজনীতি, ভোটের মধ্যে আমি নেই।

কিন্তু ওদের চাপেই শেষপর্যন্ত রাজি হতে হয় নন্দলালের মত সৎ মানুষকে। তার তখনই নন্দলাল দেখে ধনকৃষ্ণবাবুর আসল স্বরূপটাকে।

ধনকৃষ্ণ একদিন রাতে ডিসপেনসারিতে আসে। তখন রোগী নেই। হাট তলাও নিঝুম। নন্দলাল দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরবে। ধনকেষ্ট বলে,-ডাক্তার, এসব ভোটে-ফোটে দাঁড়ানো তোমার কম্ম নয়। তুমি নাম তুলে নাও। অবশ্য তার জন্য তোমাকে দশহাজার টাকা দেব।

তখন ওই টাকার অনেক দাম। অযাচিত ভাবে এত টাকা দিতে আসছে তাকে ধনকেষ্ট! তার কাছে এক পয়সা মা বাপের চেয়েও বেশি দামি। হাড় কেপ্পন লোক। সেই লোক তাকে এত টাকা দিতে এসেছে দেখে নন্দলাল অবাক হয়।

ধনকেষ্ট বলে,-তোমার ভোট খরচা তো হয়েছে।

নন্দলাল এমনিতে সৎ, কিন্তু একজায়গায় সে কঠিন। জেদী। সে-ও বুঝেছে, লোকে ধনকেষ্টকে যেসব অপবাদ দেয়,-সেটা সত্যিই।

নন্দলাল বলে,-যাদের কথায় দাঁড়িয়েছি, তাদের সঙ্গে কথা না বলে নাম তোলা ঠিক হবে না। ওদের সঙ্গে কথা বলে জানাব?

ধনকেষ্টও ঘোড়েল লোক। সে বুঝেছে ব্যাপারটা। তাই বলে,-তাহলে নাম তুলে নেবে না? লড়বে ভোটে আমার সঙ্গে?

কথাটার মধ্যে হুমকির সুর শুনে নন্দলাল বলে,-তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তবেই জানাব।

ধনকেষ্ট বের হয়ে যায়।

যথাসময়ে নন্দলাল দেখেছে ধনকেষ্টর প্রকৃত স্বরূপ।

রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে সে। আর বল্টুর দলও তৈরি। নন্দলাল দেখে ওরা লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে শাসায়-ভোট দিতে কেউ যাবে না।

তবু ভোটের দিন বেশ কিছু লোক জোর করে ভোট দিতে যায়। বল্টুর দল বোমা মেরে তাদের কয়েক জনকে আহত করে। ফলে আর কেউ বেরোয় না। পুলিশ ধনকেষ্টর কাছারিতে বসে তখন চা সিঙাড়া রাজভোগ খাচ্ছে। বল্টুরাই সব ভোট দিয়ে দেয়। ফলে ধনকেষ্টই আবার 'জনগণ' কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে মসনদে বসে।

এবারও সেইভাবেই বসতে চেয়েছিল ধনকেষ্ট, কিন্তু নসুবাবুই এবার ঝামেলা পাকিয়ে তুলেছে।

পটলা আমি গোবর্ধন হোঁৎকা বের হয়েছি পথসভা করতে। হাটের ওদিকে যাচ্ছি, হঠাৎ নন্দলালবাবুর ডাকে চাইলাম।

সেদিন হাটবার নয়, তাই হাটতলাও শুনসান। ওদিকে দু'একটা বাঁধা দোকান, লোকজন বিশেষ নেই। দু'একটা গরু হাটতলার চালা দখল নিয়ে নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে।

ডাক্তারখানার সাইনবোর্ডটা পুরোনো, নামটা রোদে জ্বলে গেছে। কয়েকটা বেঞ্চ পাতা। নন্দলালবাবুকে দেখে সুশীল বলে,-এখানকার ডাক্তার, নন্দবাবু।

নামটা আগেই শুনেছি। নন্দলালবাবু বলে,-তোমরা এসেই সাড়া ফেলেছ হে। তা ধনকেষ্ট কিন্তু খুব সেয়ানা লোক। সাবধানে থাকবে। তোমরা এসেছ তাতে ও খুশি হয়নি।

হোঁৎকা বলে,-তা হইবই। তয় দৈববাণী তো কাল হইছে।

নন্দলাল বলে,-ওরা চ্যালারা অবশ্য ঠিকই বের করবে কাদের কাজ। ওই বল্টু, গালকাটা গোবিন্দদের থেকে সাবধানে থাকবে।

আমি বলি,-ওদের উপরও নজর আছে। তবে ধনকেষ্টর মুখোশ খুলতেই হবে। কিন্তু গাঁয়ের লোকদের ও কাছে ভিড়তে দিচ্ছে না।

নন্দলাল বলে,-সন্ধের পর কাল যাব। কথা হবে।

দেখি হাটতলার ওদিকের চালার নীচে দু'একজন ঘোরাঘুরি করছে। সুশীল বলে,-ওদের দেখেছিস? ধনকেষ্টর চামচা।

অর্থাৎ আমাদের উপরও নজর রেখেছে ওরা। হোঁৎকা বলে,-ওগোর ধনকেষ্টরে এবার পথেই বসাইমু!

দুপুরে খেয়ে গোটা দশেক সাইকেল নিয়ে আমরা বের হবো ওদিকের কোনো গ্রামে। নসুমামা আমাদের থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধাই রাখেনি।

এর মধ্যে নসুমামা পল্লী উন্নয়নের কাজও শুরু করেছে। হোঁৎকা-গোর্বধন ছেলেদের নিয়ে পচা ডোবার পানা তুলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের কাজে শামিল হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের মানুষরা আমাদের নিঃশর্ত সেবার জন্য নসুমামাকে ধন্যবাদ দেয়।

নসুমামা ভাষণ দেয়,-মুখের কথাকে নয়, হাতে কাজ করে পল্লি উন্নয়ন করতে হবে। ওদিকে ভাঙা রাস্তায় মাটি পড়েছে। যেসব কাজে টাকা মেরেছে ধনকেষ্ট, সেসব কাজ আমরাই করব। দেশের মানুষদের স্বাবলম্বী করতে হবে।

সেদিন হাটতলায় ধনকেষ্টবাবুর মিটিং হবে। সারা এলাকার মানুষকে জানানো হয়েছে, সেখানে শ্রোতাদের নাকি লুচি আর বোঁদে দেওয়া হবে।

নসুমামা ভাবনায় পড়ে। লুচি-বোঁদের লোভ সাংঘাতিক। জনসমুদ্র হবে ওখানে। নসুমামা ভাবছে বসে বসে। আমরা তখন পচা ডোবায় পানা তুলছি।

সন্ধের পর ঘর ফিরে দেখি, আমাদের ঘরটা কারা তছনছ করে গেছে। অবশ্য জিনিসপত্র কিছুই নেয়নি। হোঁৎকার সেই ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ ইস্তাহার ঠাসা বাকি কিছু হাউই নসুমামার ঘরে রাখা ছিল উপরের তাকে। সেগুলো নেই।

নসুমামা এসে পড়ে-কি ব্যাপার?

হোঁৎকা বলে,-দ্যাহেন কাণ্ড, হালায় কারা ঘরে ঢুকছিল স্পাইগিরি করছে, ইস্তাহারও নাই।

সর্বনাশ!-নসুমামাও অবাক হয়!

আমি বলি,-এসব কেউ করে গেছে, কারা এসেছিল এখানে?

সুশীলই খবর দেয়,-পঞ্চাকে দেখেছিলাম এদিকে।

পঞ্চা ও বাড়িতে কাজ করে। নসুমামা বলে,-পঞ্চা? কই সে?

পঞ্চার দেখাও মেলে না। পটলা বলে,-ব্যাটা কে-কেটে পড়েছে বোধহয় মাল নিয়ে।

এমন সময় গোবর্ধন নন্দলাল ডাক্তারকে নিয়ে ফিরছে। নন্দলাল ঘরের অবস্থা আর ওই সব মাল চুরির কথা শুনে বলে,-পঞ্চা! ওকে তো দেখলাম একটু আগে ধনকেষ্টর বাড়িতে।

সে কি!-চমকে ওঠে পটলা। বলে, ওই স্-স্পাই। মামা জেনে শুনে ওকে রে-রেখেছেন?

নসুমামা ভাবতেই পারেনি যে তার ঘরের লোকদের মধ্যেই ধনকেষ্ট টাকা দিয়ে চর ঢুকিয়ে রেখেছে।

নন্দলাল বলে,-তখন বলিনি, ধনকেষ্টর অসাধ্য কাজ কিছু নেই! ও সব পারে। সরষের মধ্যেই ব্যাটা ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছে।

রাত নামছে। নন্দলালবাবু বলে,-নসুবাবু, আমি পারিনি। আপনাকে পারতে হবে। ওই শয়তান ধনকেষ্ট এই এলাকার মানুষকে পদে পদে ঠকিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করেছে।

অন্ধকারে একজন এসে পড়ে। লোকটার মাথায় একটা গামছা জড়ানো। পরনে ধুতির ওপর একটা ধুসো চাদর। হাতে একটা লাঠি আর হ্যারিকেন।

-ডাক্তারবাবু?

নন্দডাক্তার বলে,-নটবর?

নটবর বলে,-ছেলেটার খুব অসুখ!

নন্দ বলে,-যাব। বসো নটবর।

লোকটা কুণ্ঠিত ভাবে বসে বলে,-তা ভোটে এসেছেন আজ্ঞে এনারা?

নসুমামা বলে,-হ্যাঁ!

নটবর বলে,-পারবেন ওই শয়তানটারে হারাতে? এই অঞ্চলের গরিব চাষীদের বাঁচাতে পারবেন?

ওর কথার সুরে করুণ আবেদন ফুটে ওঠে। বলে,-ওই ধনকেষ্টর শয়তানি হাড়ে হাড়ে। গ্রামের করত চাষীর জমি যে জালিয়াতি করে নিজের করে নিয়েছে-তা বলার নয়!

নন্দবাবু বলেন,-শুনলে তো? আরও অনেক কীর্তির কথাই বলব। তবে খুব সাবধানে, পরে কথা হবে, চল নটবর।

নন্দবাবু চলে গেল নটবরকে নিয়ে।

পটলা বলে,-ব্যাটা ড-ডাকাত!

হোঁৎকা বলে,-মনে হয় আমাগোর পিছনে মোক্ষম লাগবো। তবে পঞ্চা ব্যাটারে তরা কিছুই কবি না। ওর উপর নজর রাখবি। ওর দৌড়খানও দেখনের লাগবে।

নসুমামা বলে,-ব্যটাকে চাবকে তাড়াবোই।

হোঁৎকা বলে,-না। ওরে রাইখা দ্যান। কিছুই কইবেন না।

গোবর্ধন বলে,-ও যেন জানতে না পারে ওর ব্যাপারটা আমরা জেনেছি।

হোঁৎকা বলে,-হ। কাঁটা দিই কাঁটা তুলতি হইব। থাউক পঞ্চা য্যামন আছে।

ধনকেষ্ট লোকটা কূটকৌশলী। সে জানে কাজ উদ্ধারের জন্য যখন যেমন দরকার তখন সেই পথই নিতে হয়। লোক বলে ধনকেষ্টর দুটো হাত-একটা লোকের গলায়, অন্যটা থাকে পায়ে। দরকার হলে পায়েও ধরতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে অন্য হাত দিয়ে নির্মম ভাবে কারো গলা টিপে ধরে, তাকে দমবন্ধ করে শেষ করতেও দ্বিধা করে না।

ধনকেষ্ট নসুবাবুর বাড়ির কাজের লোক ওই পঞ্চাকে আগে থেকেই টাকাকড়ি দিয়ে হাত করেছিল।

পঞ্চাও জানে কেষ্টবাবুর কথা না মানলে তার বিপদ হবে। মানলে টাকাকড়ি তো পাবেই তার ভাইটারও চৌকিদারির কাজ মিলবে কেষ্টবাবুকে ধরে। তাই পঞ্চা সহজেই টোপ গেলে।

সে কলকাতার বাবুদের দেখভাল করে, তাদের আলোচনা, তাদের কাজের ফর্দও শোনে। সেই দেখেছে আমাদের ছাদ থেকে হাউই ছুঁড়তে। তার ভিতর থেকে ওই দৈববাণীর কাগজপত্র-চোরা কেষ্টার কাহিনি, এসব বের হতে দেখেছে সেই-ই।

পঞ্চা নসুবাবুর বাড়িতে এতদিন নিশ্চিন্তে ছিল। নসুবাবুর টুকটাক ফাইফরমাস খাটত, বাজারের পয়সা চুরি করেও টু-পাইস রোজগার হত। নসুবাবুর সংসারে প্রাণী বলতে নসুবাবু, তার স্ত্রী আর, ওই ভাইপো সুশীল। সুতরাং তাদের খেয়েও যা থাকত, সেটা কম নয়। আমরা আসায় তার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। এখন বাজার করছে সুশীল।

তারপর আমরা এসে ওই ধনকেষ্টবাবুকেই ডোবাতে চাই। সুতরাং পঞ্চা আমাদের সহ্য করবে কেন? সেটা অবশ্য সে মুখে প্রকাশ করেনি।

এবার উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের পিছনেই। সব প্রমাণ তুলে দেয় কেষ্টবাবুর হাতে। আর বলে,-নসুবাবুকে তাতিয়েছে ওই কলকাতার বাবুরাই, ওরাই সেদিন বড় বাড়ির ভাঙা ছাদে উঠে এ সব হাউই ছেড়েছিল। আরও কি সব যন্ত্র এনেছে কে জানে!

ধনকেষ্টর ম্যানেজার হরেনবাবু বলে,-এখানকার বহু ক্লাবকে টাকা চাঁদা দিয়েছি। ফুটবল, হ্যাজাক, সতরঞ্চি কিনে দিয়েছি।

ধনকেষ্ট গর্জন করে,-আর সেসব হজম করে ব্যাটারা এখন নসুর কলকাতা পার্টির গঙ্গে ভিড়ে আমার সব্বেনাশ করছে!

বল্টু বলে,-হাউই ফাটাবে ব্যাটারা! বলো তো বোম ফাটিয়ে দিই ওদের ওপর।

ধনকেষ্ট জানে তাতে গোলমালই হবে। কলকাতার ছেলেরা বোমাকে ভালো করেই চেনে। আর হাউই যখন এনেছে, বোমা আনেনি তা হতে পারে না! বল্টুর দেশি বোমার থেকে কলকাতার বোমার জোর অনেক বেশি।

ধনকেষ্ট বলে,-ওসব এখন থাক। পঞ্চা, তুই বাবুদের উপর নজর রাখবি। ওদের কথাবার্তা কি হয় মন দিয়ে শুনবি, সব জানাবি আমাকে?

ধনকেষ্ট পঞ্চাকে শতখানেক টাকা দেয়। পঞ্চা খুশি হয়ে বলে,-সব খবরই পাবেন। তবে ছেলেগুলো মহা ধূর্ত। নিজেদের মধ্যে আবার ইংরেজিতে হট্ মট্ করে কথ বলে।সেসব তো বুঝি না।

ধনকেষ্ট বলে,-তবু কান খাড়া রাখবি।

পঞ্চা বলে,-আজ্ঞে, আর একটা কথা ছিল। নন্দ ডাক্তার কাল থেকে খুব যাতায়াত করছে নসুবাবুর কাছে। আর দেখলাম ওই আলগাঁয়ের নটবর ঘোষও কাল আপনার জমি দখল করার কথাবার্তা বলছিল।

-সে কি! নন্দ গতবারে গোহারান হেরে এবার তার শোধ নেবার জন্যে নসুবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?

ম্যানেজার হরেন মিত্তির বলে,-সে কি! নন্দ ডাক্তারের হাতে ওই অঞ্চলের চাষী-জেলে অন্যসব ভোট বাঁধা। লোকটা ফোকটিয়া ডাক্তারি করে বেশ জমিয়েছে।...তখন বললাম আপনাকে-সরকারি ডাক্তারখানা সরকারের পয়সায় চালু করে দিন। নাম হবে আপনার, ভোট ও বাড়বে। আর নন্দ ডাক্তারের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। তা করলেন না।

ধনকেষ্ট অবশ্য তার চেয়ে বেশি লাভই করেছে। সরকারি ডাক্তারখানা খাতে বেশ কয়েক লাখ টাকা এদিক ওদিক করে নিজের পকেটেই পুরেছে।

সে কথাটা প্রকাশ করাও যাবে না। তাই ধমকে ওঠে ধনকেষ্ট,-থামো তো হরেন। বড্ড বাজে কথা বলো। সরকার টাকা দিলে তো! এখন কিছু একটা করতেই হবে।

পটলার বৈষয়িক বুদ্ধিটা আমাদের চেয়েও বেশি। বড়লোকের ঘরের ছেলে। নিজেদের বিরাট ব্যাবসা। আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থাও ভালো। অনেকেই পদস্থ চাকুরে। কেউ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ পুলিশের বড় কর্তা, কেউ আয়কর বিভাগের বড় অফিসার। পটলার মাথাটাও সাফ। মাঝে মাঝে বেশ জব্বর প্যাঁচ ও কষতে পারে।

এবার মোক্ষম প্যাঁচ কষেছে ধনকেষ্ট। গ্রামের পঞ্চাননতলার গাজনের সব খরচা, এবার নাকি ধনকেষ্টই দেবে। দুদিন ধরে সেখানে ঢালাও প্রসাদ বিতরণ করা হবে। যাতে এই এলাকার সকলেই ভরপেট প্রসাদ পায়। সেই বস্ত্র বিতরণ, কম্বল বিতরণ।

সারা অঞ্চলে ধন্য রব পড়ে গেছে। এই অঞ্চলের বয়স্ক লোকজন, মেয়োরা ধনকেষ্টর এহেন ভক্তির পরিচয় পেয়ে ধন্য করছে।

নসুমামা বলে,-এত দান খয়রাত করলে ভোট তো সবাই ওকেই দেবে। তোরা এসে এত মেহনত করলি, সব জলে গেল। এবার নন্দ ডাক্তারের মত আমিও গোহারান হারব?

নন্দবাবু বলে,-বলেছিলাম না, ওই কেষ্টার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। আমাকে জোর করে হারালো, এবার তোমাকেও হারাবে।

হোঁৎকা বলে,-ব্যাটা শয়তানের ধাড়ি!

আমাদের শিবিরে সেই উন্মাদনা যেন উবে গেছে। বন্ধু ক্লাবের ছেলেরাও হতাশ।

পটলা কি ভেবে বলে,-চাল, কাপড়, কম্বল ও পয়সা দিয়ে কিনে বি-বিতরণ করবে?

নন্দবাবু বলে,-ছাই। ওসব রিলিফের মাল। কাউকে না দিয়ে নিজের গুদামে রেখেছিল।

গ্রামের মদনবাবু প্রবীণ লোক। বলেন,-অন্যায় অনাচারে দেশটা ভরে গেল হে। চোরদেরই এখন রাজত্ব।

পটলা বলে,-নে-নেভার। এর বিহিত হবেই।

কি ভাবছ পটলা? চা জলখাবার ক্ষীরের সন্দেশের স্বাদও পানসে লাগে।

পটলা কি ভেবে বলে,-কাল একবার সদরে যেতে হবে।

কেন?-নসুমামা প্রশ্ন করে।

পটলা বলে,-কি ওষুধপত্রের দরকার। আর বাড়িতেও ওখান থেকে একটা ফোন করে দিতে হবে।

হোঁৎকা বলে,-তাই দিবি। সমীও সঙ্গে যাক। একা যাবি না।

নসুমামা বলে,-তাই ভালো।

সদর শহর কয়েক ঘণ্টার পথ। ভোর রাতেই বের হয়েছি দুজনে। গ্রাম ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর আসার পর একটা কাঁদর পড়ে। বর্ষাকালে এখানে তালগাছের ডোঙায় পারাপার করতে হয়। এখন অবশ্য জল নেই। তবে কাঁদরটা বেশ খাল মত। পথ এখানে মাঠের সমতল ছাড়িয়ে নীচে নেমেছে। সামান্য জল, পার হয়ে পথটা ওদিকে উঠেছে মাঠের সমতলে। কাঁদরের ধারে কিছু জাম-অর্জুন গাছের জটলা।

তখনও দিনের আলো ফোটেনি, হঠাৎ নদীর মুখেই আড়াল থেকে দুজন লোককে উঁকি মারতে দেখে পটলা থামল। ও আগে ছিল, পিছনে আসছি আমি, আর বাসস্ট্যান্ড অবধি এগিয়ে দিতে আসছিল সুশীল। তার হাতে একটা খোঁটে লাঠি।

পটলাকে থমকে দাঁড়াতে দেখেই কোনো বিপদের আশঙ্কায় আমি থেমে গেছি। টর্চের আলোয় দেখা যায় দুটো লোককে গাছের আড়ালে। জোরালো টর্চের আলো চোখে পড়তে, তারা চমকে উঠেছে। সুশীল অবশ্য আগেই টের পেয়েছিল ওদের অস্তিত্ব। সে অন্ধকারে পিছন দিক থেকে গিয়ে সেই খেঁটে লাঠি দিয়ে একজনের মাথায় মারতে 'বাপরে' বলে সে ছিটকে পড়ে। এই অবকাশে আমি একটা শক্ত মাটির টুকরো তুলে সাপটে দ্বিতীয় জনের মুখে মারতে সে আর্তনাদ করে দৌড়লো অন্ধকারে। লাঠি খাওয়া লোকটাও আহত রক্তাক্ত অবস্থাতেই দৌড়চ্ছে।

পটলা বলে,-কে-কারা ওরা? চিনতে পারলি?

সুশীল বলে,-ওই ধনকেষ্টর চ্যালা কালু-অন্যটাকে ঠিক দেখতে পাইনি।

এবার চমকে উঠি,-বলিস কি রে? ব্যাটারা তাহলে আমাদের যাওয়ার খবর পেয়ে গেছে! কাল সন্ধ্যায় কথা হল, ওরা জানলো কি করে?

এবার পটলাই বলে,-জানবে না? স্‌-স্পাই ওই পঞ্চা ব্যাটা তো কাল ছিল ঘরে।

সুশীল বলে,-ওরই কাজ। ও গিয়ে বলতে ধনকেষ্ট তোদের মারার জন্য এখানে ওদের পাঠিয়েছে।

পটলা বলে,-ডেঞ্জারাস লোক ওই ধনকেষ্ট। মার্ডার করতেও পারে দেখছি।

সুশীল বলে,-এসব করেই তো এত কিছু করেছে। খুন জখম করা ওর পক্ষে কিছুই নয়।

পটলা বলে,-এবার ওর ব্যবস্থাই করছি। চল, বাস ধরতে হবে।

শহরে এসে পটলা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে চলেছে। সঙ্গে আমি। ওর কিছুই বুঝি না। শুধোই,-শহরে কোথায় যাবি?

পটলা কি যেন ভাবছে। বলে,-চুপ-চুপ করে বসে থাক।

বেশ কিছুটা এসে পড়েছি। দোকান পসার, লোকজনের আসা যাওয়ার এখানে বেশ কম। বাড়িগুলো আধুনিক ধরনের, প্রত্যেকটা বাড়ির লাগোয়া সাজানো বাগান। পাড়ার অধিবাসীরা যে অভিজাত তা দেখলেই বোঝা যায়।

পটলা একটা গেটওয়ালা বাড়ির সামনে নামল। দেখি পেতলের নেমপ্লেট লাগানো-জি. সি রায়, অ্যাডিশনাল ডি. এম।

গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দারোয়ান ওকে দেখে সেলাম করে। পিছনে আমি। একটু ঘাবড়ে গেছি। পটলা বলে,-আয়। আমার

পি-পিসতুতো দাদার বাড়ি।

ওর পিসতুতো দাদা কোথাকার পদস্থ অফিসার তা শুনেছিলাম। কিন্তু এ যে সেই, তা বুঝি নি।

সাজানো ড্রয়িংরুম। জানলা দরজায় শান্তিনিকেতনী পর্দা, দামি সোফাসেট, ঝকঝকে পিতলের পটে কয়েকটা পামগাছ সাজানো।

একজন বয়স্ক অভিজাত চেহারার মহিলাকে প্রণাম করে পটলা। তিনি অবাক হন,-পটল তুই!

পটলার পিসিমা হন। আমিও প্রণাম করতে তিনি বলেন,-বসো।

পটল শুধোয়,-গোরাদা আছেন পিসিমা? পিসিমা বলেন, আছে, বাড়ির খবর বল! কেমন আছে দাদারা, মা?

পটলা বলে,-ভালোই। গোরাদার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। অফিস বেরুবার আগেই ধরতে হবে।

পিসিমা বলেন,-বোস, চা-টা খা, তারপর কথা হবে।

আদর আপ্যায়নের ক্রুটি হয় না। পিসিমা আমাকে বলেন,-তোমাকে দেখেছি ওদের বাড়িতে। এসেছ, খুব খুশি হয়েছি। খাও।

কেক, প্যাস্ট্রি আর কলা এসেছে। খিদেও পেয়েছিল, সেই ভোর রাতে বের হয়েছি। পথেও একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যুৎ করে চা-টা খেতে পটলার গোরাদা এসে পড়েন। বলেন তিনি,-কি খবর রে পটলা?

পটলা আমাদের বর্তমান কাজের ফিরিস্তি দিয়ে বলে,-এখন নসুমামার গ্রামেই রয়েছি। আর যা সব ঘটনা দেখছি, তাতে মনে হয় তোমরা সদরে বসে আছ সরকারি প্রশাসনের মাথায়। আর গ্রামে গ্রামে অপশাসন, শোষণ, আর সরকারি পয়সার লুটপাট চলছে।

গৌরাঙ্গবাবু বয়সে তরুণ। সৎ কর্মঠ অফিসার। তিনি বলেন,-ওসব কথা অবশ্য কানে আসে, কিন্তু কেউ সাক্ষ্য প্রমাণ তো কিছুই দিতে পারে না। তেমন সত্যিকার কেস প্রমাণ সমেত ধরতে পারলে তাদের শাস্তি দেবই।

পটলা বলে,-যদি সাক্ষী প্রমাণ সব দি-দিতে পারি?

গৌরাঙ্গবাবু বলেন,-তাহলে কথা দিচ্ছি তার শাস্তি দেবই।

পিসিমা জানেন পটলাকে। একটা না একটা ঝামেলা বাধাবেই। এই নিয়ে অনেক কাণ্ডই ঘটেছে। পটলা বোধহয় এবারও তেমনি কোনো প্রবলেমে জড়িয়েছে। পিসিমা বলেন,-আবার কি করবি পটলা? ওইসব ঝামেলায় যাস্‌নে। যারা ওসব কাজ করে তারা সাংঘাতিক লোক। তাদের অসাধ্য কিছু নেই।

গোরাদা বলে,-তাই বলে একদল লোক যা খুশি তাই করে যাবে? পাবলিকের সর্বনাশ করবে? ঠকাবে? পটল, সাক্ষ্য প্রমাণ যদি কিছু থাকে বলো, আমি দেখবো।

পটলা এবার ব্যাগ থেকে একটা মোটা খাম বের করে। ক'দিন সে ঘুরে ঘুরে গ্রাম-গ্রামন্তরের বহুলোকের বেশ কিছু কেসের বিবরণ নোট করেছে। তাদের রসিদ-দরখাস্ত মায় রিলিফের কাগজের বেশ কিছু ফর্দও বের করে। সেখানে সইটিপছাপ সব রয়েছে।

নসুমামাই এসব তার কাছে দিয়েছেন। নন্দ ডাক্তারও কিছু গ্রামের লোক তাতে সই করেছে। রিলিফ নিয়ে যে কত অনাচার, বেআইনি কাজ হয়েছে, তার ফর্দও রয়েছে। রাস্তার কাজের হিসাব, বাঁধের হিসাবও রয়েছে। সর্বোপরি কয়েক লাখ টাকা খরচ করে সেই কাঁদরের উপর যে সাঁকোর কাজ হচ্ছে, তাও জানানো হয়েছে।

আমি বলি,-সাঁকো কোথায় রে? কাঁদর তো হেঁটে পার হলাম জল ভেঙে।

গৌরাঙ্গবাবু বলেন,-সে কি!

পটলা বলে,-গেলে প্রমাণ পাবেন। সেখানকার লোক ওই কেষ্টবাবুর ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। কারণ পুলিশ আইন সবই তাঁর হাতে। কেষ্টবাবু ক'বছরেই ধানকল করেছে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচা করে, নিজের লঞ্চ ও আছে।

গৌরাঙ্গদা বলেন,-ওঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি।

তারপরই ফোন করেন তাঁর এক ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বন্ধুকে। তাঁর সঙ্গে ফোনে কেষ্টবাবুর বিষয়ে কি সব কথাবার্তা হয়।

গৌরাঙ্গদা বলেন,-আমাকে বেরুতে হবে। পটলা তুই আজ থেকে যা। সন্ধ্যায় এ নিয়ে কথা হবে। আমি এই কাগজগুলো অফিসে নিয়ে যাচ্ছি, ও বেলায় এসে কথা বলব।

পিসিমাও বলেন,-হ্যাঁ, কতদিন পর এল, ওকে আজ ছাড়ছি না।

গাড়ি বের করে গৌরাঙ্গবাবু অফিসে চলে গেলেন।

ধনকেষ্ট তার দুজন বিশ্বস্ত চ্যালা ওই বল্টু আর গোপালকে পাঠিয়েছিল আমাদের উচিত শিক্ষা দিতে, যাতে আহত হয়ে আমরা রণে ভঙ্গ দিই।

ধনকেষ্ট আশা করেছিল কাজ ঠিক মতই হবে। কিন্তু তা হয়নি। উল্টে সকালে উঠেই তার অফিস ঘরে ওই দুই মূর্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে চমকে ওঠে।

-তোরা!

গোপালের মাথার পিছনে জব্বর ঘা লেগেছে। এখনও ঘাড় সোজা করতে পারছে না। সুশীলের লাঠিটা বেশ জোরেই বসেছে। আর বল্টুর নাকে শক্ত মাটির ঢ্যালাটা বেশ নিপুণ ভাবেই মেরেছে। জামা কাপড়ে রক্ত। নাক মুখ ফুলে গেছে।

ধনকেষ্ট বলে,-অ্যাঁ, বল্টে, খুব যে মস্তানি করিস! তোর মুখের নক্সাই বদলে গেছে। আর গোপলা, গেলি ঘাড় সোজা করে, এলি অষ্টাবক্র মুনির মত বেঁকে চুরে! ওদের কিছুই করতে পারলি না, উল্টে প্যাঁদানি খেয়ে ফিরে এলি?

নাক চেপে ধরে বল্টু বলে নাকি সুরে,-ব্যাঁটা সঁপাটে ঢিলটা মারলোঁ-

-আর গোপলা?

গোপলা কাত মেরে ত্রিভঙ্গ মুরারী সেজে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে,-আচমকা পিছন থেকে ঝাড়লো যে।

ধনকেষ্ট গর্জে ওঠে,-না ফুল ছুঁড়বে সামনে থেকে। অপদার্থ কোথাকার।

বল্টু বলে,-এর জঁবাব দেঁবই, ওই তোঁতলাটাকে চিনে রেঁখেছি। ওঁকে ছাঁড়বো না।

-থাক! দু'দিন আর বেরুস না। আজকের মিটিং সেরে আসি।

ততক্ষণে বাইরের হলঘরে ইলেকশন পার্টির ছেলেরা এসে গেছে। চা আর গরম সিঙাড়াও এসেছে তার জন্য। ধনকেষ্ট বলে,-খরচা তো করছি। ভোটে না জিততে পারলে চা সিঙাড়া দুপুরের মাছ ভাত সব উশুল করব।

ছেলেরাও শুনেছে ঘটনার কথা। অবশ্য পুরোটা শোনেনি। দলের লিডারদের ওপর নাকি কাল রাতে নসুবাবুর ছেলেরা হামলা করেছে। ওরাও এবার ঘোষণা করে,-কেষ্টদা, ইঁটের বদলা পাটকেল। আমরাও ছাড়ব না। হুকুম দ্যান, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিই।

ধনকেষ্ট জানে কখন কি করতে হবে, আর কাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে। সকলকে তার গোপন কাজের খবরও জানতে দেয় না। তাই ওদের বলে,-শোন, অহিংস নীতিই আমার জীবনের নীতি, আদর্শ। নিঃস্বার্থভাবে সেবাই করব। ওরে, গৌরাঙ্গদেব কি বলেছিলেন? মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না? তেমনি যে যা করে করুক। নিজের সেবাধর্ম থেকে সরে যাবি না। সামনে পঞ্চাননের উৎসব, কত বড় যজ্ঞ! তার কথা ভাব। আর লোকদের শুধু জানাবি-এই অন্যায়ের কথা। তারা যেন নির্ভয়ে আমাকে ভোট দেয়। নে, জিলাপি খা, অমৃতি খা।

ছেলেরা ভক্তিভরে অমৃতবাণী শোনে আর অমৃতিতে কামড় দেয়। রসাল অমৃতি। রোজই ভোট হোক-অন্যসময় তাদের খবর কেউ নেয় না। ভোটের সময়ই তাদের কদর বাড়ে।

ধনকেষ্ট বলে,-আর বিকালে গোপীনাথপুরে মিটিং। ওহে মাস্টার, এবার বক্তৃতাটা ভালো করে লিখে দিও। দেশ উদ্ধার, বেকার সমস্যা, রাস্তাঘাটের ব্যাপার-এসব লিখবে। আর, বাবা পঞ্চাননের মাহাত্ম্য, তার উৎসব পালন অবশ্য কর্তব্য সকলের-এসবও লিখো। আর হ্যাঁ-নিরক্ষরতা নিয়ে এখন হৈ চৈ হচ্ছে। দেশের মানুষকে সাক্ষর করার ব্রত নিয়েছি-এসব কথাও বেশ গুছিয়ে লিখো।

এমন সময় ম্যানেজার হরেনবাবু এসে কানে কানে কি বলে। রাতের অন্ধকারে লঞ্চ আসে। কলকাতা থেকে এদিক ওদিকে ঠেক খেয়ে ওই লঞ্চে বেশ কিছু চোরাই মাল-ইলেকট্রিক তার, পাম্পসেট, দামি বিদেশী কাপড়, ঘড়ি ইত্যাদি আসে। ওগুলো পরে সদরের মহাজনদের গুদামে পাচার করা হয়। খুবই গোপন ব্যবসা। ম্যানেজারের কাছে সেসব মালের ফর্দ আসে। আজও রাতে বেশ কিছু মাল এসেছে। ম্যানেজার সেই ফর্দ এনেছে।

ধনকেষ্ট খুশি হয়। পকেটে ফর্দটা পুরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ম্যানেজার চলে যায়। তারপর আবার ভোট নিয়ে পড়ে।

হোঁৎকা গোবর্ধনের দলও বসে নেই।

নসুমামা বলে,-আজ ভোরে পটলা আর সমীরের উপর হামলা করতে গিয়েছিল মাঠের মধ্যে কাঁদরের ধারে।

সুশীল বলছিল,-কিছুই করতে পারেনি, উল্টে তারাই মার খেয়ে পালিয়েছে।

হোঁৎকা বলে,-তারা কারা? নিশ্চয়ই ওই ধনকেষ্টর লোক?

সুশীল বলে,-তাই মনে হল।

গোবর্ধন বলে ওঠে,-ওদের সাবাড় করতে পারলি না?

হোঁৎকা বলে,-মামাবাবু, আজ ওগোর ওপর হামলা করছে, এবার আরও বড় হামলাই করতি পারে।

গোবর্ধন বলে,-আসুক না! মজা টের পাইয়ে দেব।

এমন সময় পঞ্চা চা নিয়ে আসে।

হোঁৎকা বলে,-মামাবাবু, হালায় আজ বৈকালে গোপীনাথপুরে ধনকেষ্টর মিটিং।

-হ্যাঁ।

হোঁৎকা দেখে পঞ্চা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে ওদের কথা।

হোঁৎকা গলা নামিয়ে বলে,-আজ ওই মাঠে মাটির তলে গোটা চারেক মাইন-মানে বিরাট বোমা রাইখ্যা এসেছি। তাতে চাপ পড়লেই স্টেজ মাইক সমেত ওই ধনকেষ্ট উইড়া গিয়া খতম হইব।

নসুমামা অবাক হয়। বলে,-সেকি রে? ওসব 'মাইন'-ও তো সাংঘাতিক জিনিস! উড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে?

হোঁৎকা বলে,-আজ ভোরে পটলা সমীরে মারতি গুণ্ডা পাঠাইল-তার জবাব দিমু না?

পঞ্চা চায়ের কাপগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। যেন কিছুই শোনে না।

একটু পরেই ফটিক বলে,-হোঁৎকা তুই সাইকেল লই যা। দ্যাখ, পঞ্চা ব্যাটা কনে যায়।

জানলা থেকে দেখা যায় পঞ্চা পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ওই বিশাল ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

ধনকেষ্ট তখন মিটিং-এর ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত। মিটিং-এর এন্তার লুচি বোঁদে প্যাকেটে করে বিলানো হবে। সেখানে আগেই লোক চলে গেছে। ভিয়েন বসেছে। খবর আসছে লোকজন জমায়েত হতে শুরু করেছে। ওদিকে মঞ্চও তৈরি করা হয়ে গেছে।

ধনকেষ্ট স্নানটান সেরে এখন ঘন্টাখানেক ধরে পূজা পাঠ করে। মা কালী, শিবঠাকুর, মা লক্ষ্মী-নানা দেবদেবীর ভক্ত হয়েছে সে। রাধাকৃষ্ণের ছবিও আছে ঠাকুর ঘরে।

পুজো করে খেয়ে দেয়ে বেলা থাকতে বের হবে, এমন সময় পঞ্চাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখল ধনকেষ্ট।

পঞ্চা নিশ্চয়ই ও বাড়ি থেকে জরুরি কিছু খবর এনেছে। তাই জিপে ওঠার মুখে ওকে ডাকল,-কি ব্যাপার রে?

পঞ্চা হাঁফাচ্ছে। বলে,-খবর সাংঘাতিক!

-কেন?

গোপীনাথপুরের মাঠময় মাটির নীচে, এসটেজের নীচে 'মাইন', খুব বড় বড় বোমা গো-ওই কলকাতার ছেলেগুলো ওসব রেখে এসেছে। চাপ পড়লেই 'বদাম'! একেবারে ফেটে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে সবাইকে। ওখানে মিটিং করবেন না বাবু।

-অ্যাঁ! বলিস কি!

ধনকেষ্ট 'মাইন' বোমা এসবের খবর রাখে। জানে কেমন শক্তিশালী জিনিস ওসব। আর কলকাতার বাঁদরদের বিশ্বাস করতে পারে না সে। ওদের পক্ষে ওইসব বোমা পুঁতে রাখা মোটেই অসম্ভব নয়। যদি উড়ে যায় রাজত্ব করা ঘুচে যাবে। তাই চিন্তায় পড়ে সে।

কিন্তু লোককে এসব কথা বলা যাবে না। তাহলে জনসাধারণ ভাববে যে ধনকেষ্টর চেয়ে ওই নসুবাবুই বেশি শক্তিমান। তাকে ভোটও দেবে না। সব ভোট যাবে নসুবাবুর দিকেই।

তাই ধনকেষ্ট ওই 'মাইন' বোমা এসবের খবর চেপে রেখে আজ গোপীনাথপুরের মিটিং ক্যানসেল করে সেই মিটিং করবে পাশের গ্রাম-খাদিলপুরে।

ধনকেষ্ট তখুনি তার সৈন্যবাহিনীকে বলে,-ওখানে আজ মিটিং হবে না বলে দে গা, মিটিং হবে পাশের গাঁ খাদিলপুরে।

দলবল অবাক হয়।-আজ ওখানে লোকজন আসবে যে!

ধনকেষ্ট বলে,-যা বলছি তাই করগে। ওখানকার লোকদের বল, আমি খাদিলপুরে যাচ্ছি। তোরাও চলে আয়। আগের মিটিং ক্যানসেল।

দলের ছেলেরা সেই আদেশ পালন করতে দৌড়লো।

হোঁৎকা খবর পেয়ে যায়। কারণ এবার খবর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। হোঁৎকা এর জন্য তৈরি ছিল। নসুমামাকে এবার বলে সে,-মামা, আমাগোর মিটিং হইব ওই গোপীনাথপুরেই।

-তাই হবে। তৈরি হয়ে চলুন। গোবরা, তুই ছেলের দলকে চারদিকে তাই ঘোষণা করতে পাঠা। ধনকেষ্ট ভেগেছে-তার জায়গায় হবে নসু রায়ের নির্বাচনী সভা।

আগে থেকেই হোঁৎকা তৈরি হয়ে ছিল। ওদিকে গোপীনাথপুরের জনতা তখন মাঠ ভরিয়ে ফেলেছে। ধনকেষ্টর সাইকেলও চলে গেছে সেখান থেকে। সেখানে জড়ো হয়েছে নৃসিংহ রায়ের হাঁড়ি চিহ্ন। বিশাল মাঠে এবার মাইক গম গম করে ওঠে-এখানের জনগণকে আজ অভিনন্দন জানাবেন আপনাদের প্রিয় নেতা নসু রায়। নসু রায়-জিন্দাবাদ।

মাঠে তখন ফটিকের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অর্থাৎ নসুবাবুর প্রিয় দেশাত্মবোধক গান শুরু হয়েছে।

ওদিকে খাদিলপুরের মাঠে তখন শ'কয়েক কৌতূহলী জনতা মাত্র উপস্থিত হয়েছে। আর বাকি যারা আছে তারা ধনকেষ্টরই ছেলের দল। বল্টু এসেছে নাকে ব্যান্ডেজ করে, গোপলা আসতে পারেনি। কারণ এখনও সোজা হতে পারেনি ঠিকমত। কেৎরে কেৎরে চলছে।

ধনকেষ্টর মনমেজাজ ভালো নেই। গোপীনাথপুরের মিটিং ভয়ে বাতিল করেছে সে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মাস্টারের লেখা ভাষণটা বের করে পড়ছে।

-চামরমণি চাল দুশো বস্তা। রঙিন সোনি টিভি চোদ্দটি পাঠাতে হবে কাদুরাম ঢনঢনিয়াকে। দু গাঁট বিলাতী জিন, পাঁচ বস্তা লবঙ্গ, দু পেটি বল বিয়ারিং যাবে মোহনলাল দুধোরিয়ার গদিতে।

জনতা এই ভাষণের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। তারা অবাক হয়ে ওইসব ফর্দ শুনছে। ধনকেষ্টও পড়ে চলেছে।

হরেনবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আজ সকালে সে ওইসব দু'নম্বরি চোরাই মাল লঞ্চে পাচার করেছে। তারই লিস্টটা দিয়েছিল ধনকেষ্টটা। ধনকেষ্ট সেটা পকেটে রাখে, মূল্যবান ভাষণটাও ওই পকেটেই ছিল। এখন ভুল করে ভাষণের বদলে ওই দু'নম্বরি মালের ফর্দই বের করে প্রকাশ্যে তার অন্ধকারের ব্যবসার খবর দিচ্ছে।

হরেনবাবু এবার মঞ্চে উঠে কানে কানে বলে,-এসব তো দু'নম্বরি কারবারের ফর্দ।

মাইকে সেই কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে। খাদিলপুরেও নসুবাবুর কিছু সমর্থক আছে। তারাও এবার চিৎকার করে,-দুনম্বরি ধান্দা করে মোটা টাকা কামাও! এসমাগলার!

এবার হুঁস হয় ধনকেষ্টর। সে দারুণ একটা বেফাঁস কাজ করে ফেলেছে। তখুনি রেগে উঠে হরেনকেই বলে,-শালা!

জনতা গর্জে ওঠে,-গাল দেবেন না!

হৈ চৈ ওঠে। ধনকেষ্টর দলও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জনতাও গর্জে ওঠে,-গলা দেবে, চোরাচালানি করবে, আবার শাসাবে? ভোট দেবো?-কাঁচকলা দেবো।

তারপরই শুরু হয়ে যায়, লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। দু'চারজনকে বাধা দিতে জনতাও এবার মারমুখী হয়ে ওঠে। কে যেন ওই কাঠের সাইকেল প্রতীকটাকেই আছড়ে ভেঙে ফেলে।

মিটিং এখানেও হল না। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ধনকেষ্ট গর্জায়,-এসব ওই নসুবাবুদেরই কাণ্ড। ওদের লোকরাই আমাদের মিটিং পণ্ড করেছে।

এইসময় বেশ কিছু ছেলে খবর এনে ধনকেষ্টর কাছে,-গোপীনাথপুরের মাঠে দারুণ লোক গে জুটেছে। এখানে আর লোক আসবে কেন? ওই মাঠে নসুবাবুর দলের সাংঘাতিক অনুষ্ঠান, মানে নাচগান চলেছে। লোকজন সেখানেই বসে গেছে। তারপর নসুবাবুর বক্তৃতাও হল।

চমকে ওঠে ধনকেষ্ট,-অ্যাঁ। ওই মাঠে নসুটা বক্তিতেও করেছে?

-হ্যাঁ গো। খুব কড়া কড়া কথা বলেছে। নন্দ ডাক্তারও ছিল।

-তাহলে ওই মাঠেই বক্তৃতা হয়েছে? মিটিং হয়েছে?

কথাটা ধনকেষ্ট যেন বিশ্বাস করতে পারে না। হটাৎ মনে হয়, পঞ্চাই বোধহয় নসুবাবুর টাকা খেয়ে তাকে এইসব গালগল্প শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে ওই মাঠ থেকে তাড়িয়েছে। আর ওই মাঠে এসে নসুবাবু মিটিং-এর নামে তার আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে।

ধনকেষ্টকে সকলে মিলে যেন পথে বসাতে চায়।

বাড়ি ফিরেই পঞ্চাকে ডাকিয়ে আনে ধনকেষ্ট। পঞ্চা খুশি মনেই বাড়িতে আসে। ধনকেষ্ট এবার সপাটে তার গালে চড় মেরে গর্জে ওঠে,-নেমকহারাম, আমারই টাকা খেয়ে আমার সঙ্গে গাদ্দারি করবি? বিশ্বাসঘাতক, বেইমান কোথাকার!

পঞ্চা অবাক,-আজ্ঞে আমি কি করলাম?

-কি করিসনি? তোর জন্য আজ গোপীনাথপুরে আমার মিটিং হল না। বেইজ্জত হলাম। মাঠে 'বোমা' 'মাইন' পুঁতে রেখেছে বলিসনি?

পঞ্চা বলে,-যা শুনেছিলাম, আপনাকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসে তাই বলেছি। বিশ্বাস করুন।

বল্টু বলে,-ওই ছোঁড়াগুলোই আমাদের ঠকাবার জন্য এইসব গুল দিয়েছে কেষ্টদা। ছোঁড়াগুলো বোধহয় মালুম পেয়েছে পঞ্চা আমাদের সব খবর এনে দেয়।

ধনকেষ্টর এবার সম্বিৎ ফেরে। সে বলে,-অ্যাঁ। এতবড় শয়তানি করবে ওরা? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে দেখছি!

গোপাল এবেলায় বাঁকানো পিঠ একটু সোজা করতে পারছে। তবু বের হতে পারেনি এখনও। মনে মনে তার রাগটা রয়েছে। বল্টুর নাক এখনও টনটন করছে। দলের সকলেই রেগে আছে ওই নসুবাবুর আমদানী করা ছেলেগুলোর উপর।

বল্টু বলে,-অনেক সহ্য করেছি, এবার জবাব দেব।

গোপাল বলে,-ওই তোত্‌লা ছেলেটাই পালের গোদা। ওটাকেই এমন মজা দেখাবো যে হাড়মাসপুরমুখো আর হতে সাহস পাবে না।

নসুমামা ক্রমশ, এবার পায়ের তলে যেন মাটি পাচ্ছে। সর্বত্রই তার মিটিংগুলোয় লোকজন ভিড় করছে। এই অঞ্চলের মানুষ

ধনকেষ্টকে সহ্য করতে পারছে না, তার অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি। এবার তারা সাহসী হচ্ছে।

সন্ধ্যার পর নসুবাবুর নির্বাচনী অফিসে অনেকেই আসছে। নন্দলাল বলে,-এই ভাবে মিটিং আর টেম্পো চালিয়ে যাও।

কে একজন বলে,-কিন্তু কেষ্টবাবু যে দানছত্র খুলছে। দরিদ্র নারায়ণকে ভোজন করাবে তিনদিন, কাপড় কম্বল বিলোবে, অনেকের কৃষিঋণও মাপ করে দেবে-তাদের ভোট ও কম নয়।

এটা ভাবনার কথা।

নন্দলাল বলে,-দেখাই যাক।

নসুমামা তবু দমে না। বলে,-শেষ অবধি লড়ব, দেখা যাক কি হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় পটলার পিসিমার বাড়িতে আমাদের জমাটি মিটিং বসেছে। গৌরাঙ্গবাবু তার চেনা জানা দু'তিনজন অফিসারকে এনেছেন, আয়কর দপ্তরের সেই অফিসারও এসেছে। তারা পটলার দেওয়া কাগজগুলোকে এর মধ্যে জেরক্স করিয়েছে।

একজন বলেন,-এ তো ক্রিমিন্যাল অপরাধ। এসব হচ্ছে তা শুনেছি, এবার প্রমাণও পেলাম।

অন্যজন বলেন,-অফিস ফাইলগুলো দেখে নিতে হবে। নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে।

আয়কর অফিসার বলেন,-লাখ লাখ টাকা আয় করেছে, অথচ এক পয়সাও ট্যাক্স দেয় নি সরকারকে।

গৌরাঙ্গবাবু বলেন,-এ তো খানিকটা আয় দেখছ। এহেন ব্যাক্তি লঞ্চে কি ব্যবসা করে, সেটাও দেখার দরকার। খবর আছে অন্ধকার পথ শহরে প্রচুর বিদেশী মাল আসছে। পুলিশও চেষ্টা করছে ধরতে।

একজন বলেন,-ওসব কাজ এদের মত লোকই যে করছে না, বা কে জানে!

ওঁদের আলোচনা শুনছি। মনে হয় ধনকেষ্ট খুব সাদামাটা লোক নয়। আমরা যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপের ল্যাজের সন্ধান পেয়ে গেছি।

গৌরাঙ্গবাবু বলেন,-এসব আমাদের কাছে থাক, দেখা যাক কি করা যায়। তোমরা কাল ফিরে যাবে, আর এসব খবর কাউকে বলবে না। জানাজানি হলে সব ভেস্তে যাবে, উল্টে তোমাদের বিপদ হতে পারে।

আমরা পরদিন সকালেই সদর থেকে বাসে উঠেছি, নসুমামার গ্রামে ফিরতে হবে। সকালের বাস ছাড়তে তখনও দেরি আছে। শীতের দিন। শহরের ঘুম ভাঙেনি তখনও। হালকা কুয়াশা জমে আছে। বাস স্ট্যান্ডে চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছি, দেখি দু তিনজন লোক এসে ওই দোকানেই ঢোকে।

লোকদুটোর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় হনুমানটুপি আর চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা। লোকদুটো ওদিকের বেঞ্চে বসে হাঁক পাড়ে,-দু'কাপ চা দাও হে। চারখানা লেড়ো বিস্কুট ও দেবে।

গ্রামের লোক, এমন অনেক যাত্রীই আসে, লোকদুটো চা খাচ্ছে আর আমাদের দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখে!

ওদিকে বাস ছাড়ার সময় হতে দুজনে গিয়ে বাসে ওঠে। এর মধ্যে বাসযাত্রী বোঝাই হয়ে গেছে। তার মধ্যে তরকারির ঝুড়ি, মাছের বড় বড় গামলা। বাস ছেড়ে দেয়।

শহর ছাড়িয়ে চলেছে বাসটা। কিছু লোকজন পথে নামতে, দেখি ওই লোকদুটোকে।

পটলা বলে,-সেই লোকদুটো না?

আমি বলি,-এই বাসে কোথাও যাবে হয়তো।

আমাদের স্টপেজ এসে গেছে। মাঠের মধ্যে স্টপেজ, গ্রাম অনেক দূরে। অবশ্য বাসরাস্তার ধারে দুচারটে চা পান বিড়ির দোকান, তেলেভাজা, মুড়ির দোকানও আছে। একটা কাঠগোলাও রয়েছে ওদিকে।

আমরা নেমেছি, দেখি লোকদুটোও নামল। আমরা দুজনেই একটু সাবধান হই। লোকদুটোর মতলব যেন ভালো নয়। ওদের এড়াবার জন্যই চায়ের দোকানে বসলাম।

লোকদুটো নেমে ওপাশের কাঠগোলার দিকে চলে গেল। পটলা বলে,-চ-চল। আমরা মেঠো সড়ক ধরি। এখানে পথটার দুদিকে বেশ ঝোপ-ঝাড় রয়েছে।

দুজনে গল্প করতে করতে আসছি, হঠাৎ দেখা যায় ঝোপের আড়ালে সেই দুজনকে। হাতে দুখানা লাঠি। কাঠগোলা থেকেই বোধহয় ওগুলো সংগ্রহ করে তৈরি হয়ে এসেছে। পটলা বলে,-দেখছিস?

আমিও দেখেছি ওদের। বলি,-দৌড়।

দুজনে তখন মেঠো রাস্তা ধরে একেবারে হাওয়ার বেগে দৌড় শুরু করেছি। লোকদুটো ভাবতে পারে নি যে এইভাবে আমরা নিমেষের মধ্যে দৌড় শুরু করব।

আমাদের দৌড়তে দেখে তারাও এবার মরিয়া হয়ে আমাদের পিছনে দৌড়তে শুরু করে।

কিন্তু দৌড়ে আমরাই এগিয়ে আছি। আর ওদের মধ্যে একজন বেশ মোটা। চাদর জড়িয়ে আলপথ দিয়ে দৌড়তে গিয়ে মোটকা লোকটা চাদরে লটাপটি খেয়ে পড়ে পাশের নয়ানজুলির জলকাদায়।

ফলে অন্যজনও থেমে গেছে। আমরা তখনও দৌড়চ্ছি। গ্রামের কাছে একটা পুকুরের ধারে গাছের নিচে বসে হাঁপাতে থাকি।

একজনকে শুধোই,-কোন্ গাঁ ভাই?

লোকটা কি একটা গ্রামের নাম করে। তাকেই বলি,-হাড়মাসপুরে যাব কোনো দিকে?

লোকটা বলে,-সে তো ওই দিকে। ওই ডাইনের গাঁ পার হয়ে একটা মাঠ পেরুতে হবে। অর্থাৎ ওদের তাড়া খেয়ে আমরা সোজা যেদিকে পেরেছি দৌড়েছি। বেশ বেলাতেই পৌঁছলাম নসুমামার আস্তানায়।

ওরাও অবাক, এত দেরি?

ওদের কথাটা বলতে নসুমামা বলে,-জানতাম ধনকেষ্ট তোদের পিছনে লোক লাগাবেই। হোঁৎকা বলে,-আজ খেয়ে দেয়ে রেস্ট নে। আমরা অন্য গাঁয়ে মিটিং-এ যাচ্ছি।

পটলা বলে,-আমরাও যা-যাব।

ধনকেষ্টর হাতটা অনেক লম্বা। এই গ্রামেই নয়, জেলা-শহরেও তার একটা আস্তানা আছে। সেখানেও তার বিশ্বস্ত কিছু কাজের লোক আছে। অন্ধকার জগতের লোক তারা। ওদের মধ্যে ভবতারণ আর গদাই বেশ কাজের লোক। তারা এই গ্রামেও আসে। কয়েকদিন আগেও এসেছিল তারা এখানকার হেড কোয়ার্টারে। তারা জেনে গেছে যে তাদের মালিকের ভাতে হাত দেবার জন্য কলকাতা থেকে আমরা এসেছি।

আমরা উঠে পড়ে লেগেছি ধনকেষ্টর গদি কেড়ে নেবার জন্য। দলের মধ্যে আমাদের দুজনকেও দেখেছে তারা। শুনেছে আমাদের কথা।

তাই ভবতারণ সেদিন শহরে আমাদের দু'একটা সরকারি অফিসে, আর জেলার বড়কর্তার সঙ্গে ঘুরছি দেখে, ভেবে নিয়েছিল আমাদের মতলব সুবিধেয় নয়। তাদের মালিকের গোপন খবরই বোধহয় দিতে এসেছি সদরের কর্তাদের কাছে।

আমাদের আটকে রেখে সব খবর বের করার জন্যই ওরা মতলব করেছিল। শহরের মধ্যে সেটা করা সম্ভব নয়, তাই লোকদুটো আমাদের পিছু নিয়েছিল।

কিন্তু আমরা তাদের চোখের সামনে থেকে এইভাবে পালাব, ওইভাবে শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি।

ধনকেষ্টর মন মেজাজ ভালো নেই, চুপ করে বসে আছে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে। এমন সময় বভতারণ আর সেই মোটকা গদাই এসে হাজির হয়। একেবারে ঝোড়ো কাকের মত। ধনকেষ্ট ওদের দেখে শুধোয়,-কি ব্যাপার? কোনো গোলমাল হয় নি তো রে?

ভবতারণ বলে,-গোলমাল হয়নি এখনও, তবে হতে পারে।

কেন?-ধনকেষ্ট ভাবনায় পড়ে। বলে, আবার কি হল? বভতারণ বলে,-নসুবাবুর ওই তোতলা ভাগ্নে আর ওদের দলের একটা ছেলেকে দেখলাম সদর শহরে কাছারিতে, রিলিফ অফিসে-অন্য সব জায়গাতে ঘুরছে একটা জিপে। অফিসারদের সঙ্গেও কি সব কথা বলছিল।

গদাই বলে,-শুনলাম শহরের কর্তাদের কাছে কিসব দরখাস্ত, গোপন কাগজপত্রও দিয়েছে।

ধনকেষ্ট জানে তার সব কাজেই বহু গলদ, জালজচ্চুরি করা আছে। সেসব কাগজপত্র কোনোমতে বাইরে গেলে, সদরের কর্তাদের নজরে গেলে, তার সমূহ বিপদ হবে। তাই চমকে ওঠে,-সে কি? ব্যাটারা এখানে আমাকে পদে পদে হেনস্থা করে এবার সদরে নালিশ করতে গেছে?

ভবতারণ বলে,-তাই মনে হল।

-ওদের ধরে গলা টিপে কথা বার করতে পারলি না?

ভবাতারণ বলে,-তার জন্যই তো শহর থেকে ওদের পিছু নিয়ে এসেছিলাম, মাঝমাঠে ওদের ধরেও ফেলতাম।

গদাই বলে,-ছেলেগুলো খুব স্যায়না। দেখে শুনে যা দৌড় মারল! ওদের ধরতে গিয়েই তো, এই দেখুন কি হাল হয়েছে। খালে পড়ে কাদায় জলে-!

ধনকেষ্ট গজরায়,-এই মুরোদ তোদের? দুটো ছেলে তোদের সামনে দিয়ে পালাল, আর তোরা দাঁড়িয়ে শুধু দেখলি? অকম্মার দল। একটার পর একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে চলেছে ওরা, আর তোরা বসে বসে দেখছিস? ওই বাঁদরের দল এখানে আমাকে ঠাকাচ্ছে, আর ওই তোতলাটা এবার সদরে গেছে! কি সর্বনাশ করবে কে জানে?

উত্তেজিত ধনকেষ্ট পায়চারী করছে। উপস্থিত সকলে প্রমাদ গণে।

ধনকেষ্ট বলে,-ওই ছোঁড়াদুটোকে আমার চাই।

ভবতারণ, বল্টু ও এবার তাদের এলেম দেখাতে তৈরি। তারা বলে,-তাই হবে।

ধনকেষ্ট বলে,-তবে যা করবি খুব সাবধানে। কেউ যেন টের না পায় কিছু। দরকার হলে ওদের এমন জায়গায় তুলবি, কেউ যেন

জানতে না পারে। তারপর দেখছি ওদের।

এমন সময় পঞ্চাও এসে পড়ে। পঞ্চা ধনকেষ্টবাবুর বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করছে। কাল ওই ছেলেগুলো তাকে ইচ্ছা করেই ভুল খবর দিয়েছিল। এখন সে আরও নজর রেখেছে।

আজ বিকেলে নসুবাবু অন্য গ্রামে মিটিং করতে গেছে। ক্রমশ তার দলেই লোক বেশি জুটছে। সাধারণ মানুষ এত ভাবে না। তারা দেখে হৈচৈ লোকজন কোনদিকে বেশি ভিড়ছে।

তাছাড়া নসুবাবুর দলে নন্দ ডাক্তার এসে ভিড়েছে। ওই লোকটিকে এই অঞ্চলের মানুষজন সকলেই শ্রদ্ধা করে। তাই নন্দবাবুর জন্যও বহু লোক এবার প্রকাশ্যে ধনকেষ্টর বিরুদ্ধে গেছে।

পঞ্চা দেখে তাদের। আর সেইসব খবর দেবার জন্যই সময়মত যায় ধনকেষ্টবাবুর ওখানে। আজ দেখছে নসীপুর, ভুবনপুর আরও দু'একটা গ্রামের মাতব্বররা এখানে এসেছে। পঞ্চা গেছে সেই খবর দিতে।

ধনকেষ্ট শুনে বলে,-ওরাও এসেছে তাহলে?

পঞ্চা বলে,-হ্যাঁ। ওদের নিয়েই ভুবনপুরে বিরাট মিছিল হবে। সেই গানবাবুও দলবল নিয়ে গেছে। হোঁৎকা গোবরবাবুও আছে। সেখানেও হাউই বাজি ছুঁড়বে গাঁয়ে গাঁয়ে।

ধনকেষ্ট চটে ওঠে,-আমার নামে আবার সেই ইস্তাহার ছাড়বে? এখন আর কে আছে বাড়িতে?

পঞ্চা বলে,-ওই তোতলাবাবু আর একজন ফর্সামত ছেলে আছে। ওরা ক'দিন ছিল না, আজ দুপুরে মেঘে নেয়ে ফিরেছে। তাই ওরা আর যায়নি।

ধনকেষ্ট যাচাই করে,-ঠিক তো? না বাকিগুলোও আছে? ওদের বিশ্বাস নাই।

পঞ্চা বলে,-দেখলাম ওরা সবাই চলে গেল মিটিং-এ ওইসব নে। ওরা দুজনে ঘুমুচ্ছে, তাই ছুটে এলাম।

ধনকেষ্ট বলে ভবতারণকে,-দ্যাখ, যদি কাজ হাসিল করতে পারিস।

আজ বেশ ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি আমরা দুজন। তাই পটলা আর আমি ওদের মিটিং-এ যাইনি। স্নান করে খেয়ে দেয়ে লেপচাপা দিয়ে শুতেই ঘুমে দু'চোখ বুজে আসে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। শীতের সন্ধ্যা পাড়াগাঁয়ে অতর্কিতেই নেমে আসে। বেশ অন্ধকার। ঘুমটা ভেঙ্গে যায় কাদের পায়ের শব্দে। মনে হয় হোঁৎকারা মিটিং থেকে ফিরেছে।

পটলা তখনও ঘুমুচ্ছে। আমি শুধোই,-কিরে ফিরে এলি?

তারপরই কয়েকজন লোক আমাদের দুজনের উপর লাফিয়ে পড়ে। মুক্ত হবার চেষ্টা করি, কিন্তু লোকগুলো আমাদের ঠেসে ধরে নাকে রুমাল চাপা দেয়, ঝাঁঝালো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ওঠে। তারপরই আর আমাদের কিছু মনে নেই।

নসুমামা দলবল নিয়ে ভুবনপুর, নসীপুর আর কখানা গ্রামে বিরাট মিছিল মিটিং করে ফিরেছে। দেখে আমাদের ঘরে আলো জ্বলেনি। সারা বাড়ি শুনশান।

হোঁৎকা বলে,-ওই দুটোতে এখনও ঘুমুচ্ছে!

এমন সময় অন্ধকার দাওয়া থেকে নেমে পঞ্চা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

নসুমামা শুধোন,-কি হয়েছে?

পঞ্চা বলে,-সন্ধ্যার আগে বাবুরা উঠে বেড়াতে গেল, তারপর থেকে এখনও ফেরেনি। তারপরই আরও কাতরস্বরে বলে,-কত খুঁজলাম চারদিকে। হাটতলায়, মদনার চায়ের দোকানে- কোথাও পেলাম না। কি যে হল!

নসুমামা চমকে ওঠে,-সে কি?

হোঁৎকা মন দিয়ে সব শুনছে। গোবর্ধন এমনিতে গোঁয়ার গোছের। সে পঞ্চাকে আগেই চিনেছে। ও যে ধনকেষ্টর গুপ্তচর, এতদিন জেনে শুনেও সে চুপ করেছিল।

এবার গোবর্ধন পঞ্চাকে সপাটে লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে,-ওরা বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে গেল তোদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে-না? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাসনি? তোর গুণের কথা সব জানি ব্যাটা বেইমান-ধনকেষ্টর কুকুর। বল-বল কি হয়েছে?

পঞ্চাও সত্যিকার ব্যাপারটা জানে না। ধনকেষ্ট কাঁচা কাজ করে না। পঞ্চা যখন ওইসব খবর দিতে গেছে, ধনকেষ্ট তাক বুঝে ওর পোষা গুণ্ডাদের এই বাড়িতে পাঠিয়েছে কাজ হাসিল করতে। আর পঞ্চাকে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে বলে,-বাড়িতে কড়াইশুঁটির কচুরি হচ্ছে, গরম গরম খেয়ে যা।

পঞ্চা মালিককে খুশি করার জন্য বসে থাকে।

এদিকে ধনকেষ্টর লোকজন ছেলেদুটোর মুখ হাত-পা বেঁধে অন্ধকারে পিছনের আমবাগান, বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে উধাও হয়।

পঞ্চা কচুরি খেয়ে বেশ খুশি মনে বাসায় ফিরে দেখে সারা বাড়ি অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। আলো জ্বেলে দেখে দোতলায় ঘরে জামা কাপড় বিছানা ছড়ানো। ছেলে দুটো নেই।

প্রথমে ভেবেছিল বাবুরা ধারে কাছে কোথাও বেড়াতে গেছে। এদিকে এখন হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে। শীতের ধমকেই ওরা ফিরে আসবে। কিন্তু রাত ন'টা অবধিও ফেরেনি। তারপর বাকি বাবুরা এসেছে।

পঞ্চা বুঝেছে ধনকেষ্টবাবুর ওখানে তার যাতায়াতের খবর এরা জেনে গেছে।

এবার হোঁৎকা বলে,-ঠিক কইরা ক' কি কেসখ্যান, নালি তর কেষ্টধনের বাপও তরে বাঁচাইতে পারবো না।

হোঁৎকা সাঁড়াশির মত শক্ত হাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরেছে। ছটফট করছে পঞ্চা। নসুমামাই বলে,-ছেড়ে দাও হোঁৎকা, মরে যাবে যে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,-ওরে মার্ডারই করুম। হোঁৎকারে চেনে না। ক' কি হইছিল। কি কইছস ওই কেষ্টারে? ক!

পঞ্চাও বুঝেছে এবার শক্ত পাল্লাতেই পড়েছে সে। এ মেরেই ফেলবে তাকে। প্রাণের ভয় বড় ভয়। পঞ্চা বলে,-বলছি। ছাড়ুন।

হোঁৎকা ওর গলা ছেড়ে দিয়ে বলে,-ক' কি হইছিল?

পঞ্চা এবার বলে কথাগুলো। সব শুনে নসুমামা বলে,-ধনকেষ্টর ওখানে ওই লোকগুলো ছিল, যারা বাবুদের মাঠে তাড়া করেছিল? বল!

পঞ্চা তাই বলে,-হ্যাঁ। সেই লোকদুটোও ছিল।

তাদের চেনস?-হোঁৎকা শুধোয়।

পঞ্চা ঢোক গিলে বলে,-আজ্ঞে না। ওরা এখানে থাকে না।

-তবে?

-শহরে-অন্য কোথায় থাকে। মাঝে মাঝে আসে।

দেখলে চিনতে পারবি?-গোবর্ধন জেরা করে।

পঞ্চা উভয় সঙ্কটে পড়েছে। বেশ বুঝেছে চিনলে সমূহ বিপদ। অথচ না বলার উপায়ও নেই। হোঁৎকা ধমকে ওঠে,-কি হইল? জবাব দে! পঞ্চা ওর রুদ্র মূর্তি দেখে বলে,-তা হয়তো পারবো।

হোঁৎকা বলে,-গরিব মানুষ, খেটে পাই।

গোবর্ধন বলে,-এখন খাটতেও হবে না। আরাম করেই বসে বসে খাবি। তবে ওখানে যাওয়া বন্ধ। বের হলেই ঠ্যাং দুটো খোঁড়া করে দেব জন্মের মত।

নসুমামার পৈত্রিক প্রজা লেঠেল দু'চার ঘর এখনও আছে। তারা এখনও নসুবাবুকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। তাদের সর্দার নরু বলে,-ভাববেন না ছোটবাবু, আমরা এখন পালা করে এই বাড়িতেই থাকব। কে জানে ওই ডাকাত ধনকেষ্ট আবার কি করে। এমন জানলে আগে থেকেই পাহারা দিতাম। কোথায় যে নে গেল ওই দুটো ছেলেকে-!

নসুমামাও এবার ভাবনায় পড়েন।

চারদিকে খবর হয়ে যায়, কলকাতার ছেলেদের মধ্যে দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারা তাদের উপর পথে হামলা করার চেষ্টা করেছিল, ওরা বেঁচে গেছে। তারপর থেকেই তাদের পাওয়া যাচ্ছে না।

নন্দবাবুও এসে পড়ে। বলে,-চারদিকে খুঁজেছ?

রাতভোর খোঁজাখুঁজি চলেছে। বাগান, বাদাবন, বাঁশবন, এখানে ওখানে বহুলোক খুঁজছে। গাং-এ ডোবার খবরও নেই।

হোঁৎকা বলে,-ওরা সাঁতার ভালোই জানে। সমী তো ইন্টার স্কুল সুইমিং-এ চ্যাম্পিয়ন। ডুইবা যাইব না।

নন্দলালবাবু বলেন,-এ ওই ধনকেষ্টর কারসাজি।

নসুমামা বিপদে পড়েন। বাড়িতেও মা ও স্ত্রী চাননি নসুমামা ভোটে দাঁড়ান। কিন্তু তাদের নিষেধ না শুনেই জেদের বশে, আর এই অত্যাচার, অন্যায়কে বন্ধকরার জন্যই তিনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। জিতবেনও। হাওয়া তাঁর দিকেই। কিন্তু এই সময় পটলা আর সমীকে গুম করায় তিনিও ভেঙে পড়েছেন।

নসুমামা বলেন,-কি জবাব দেব পটলার বাবা মা ঠাক্‌মাকে, যদি কিছু হয়ে যায় ওর!

নন্দলালবাবু বলেন,-এত ভেঙে পড়ছেন কেন? ওদের হদিস ঠিকই পাওয়া যাবে। আমরাও বসে নেই।

হোঁৎকা বলে,-থানাতেও একটা খবর দিয়া রাখুন।

নন্দলাল বলেন,-হ্যাঁ, এটা করা দরকার।

রাত কত জানি না। মনে হয়, ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরেছে আমার। দেখি পাশের একটা খালি বস্তার গাদায় পটলা শুয়ে আছে। আমাকে উঠে বসতে দেখে এবার চাইল পটলা। মুখের বাঁধন আর নেই। তবে হাত-পা দুটো বাঁধা। আর দুপাশে দুটো লোক বসে আছে। একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। লোকদুটো বিড়ি ফুঁকছিল। আমাকে উঠে বসতে দেখে চাইল।

ম্লান হ্যারিকেনের আলোয় দেখতে পাই ওদের। সেই বাসস্ট্যান্ডে দেখা লোকদুটোই। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সেই লম্বা মত লোকটার সঙ্গে গোল মত মোটা লোকটাও রয়েছে।

গোল মত লোকটার মাথায় চকচকে টাক। গায়ে সেই চাদর। বলে,-চুপ করে থাকবি। তখন মাঠে খুব কসরৎ করে পালিয়েছিলি, এবার!

এবার ওরাই আমাদের বিপদে ফেলেছে তা বুঝেছি। লম্বা লোকটাকে শুধোই,-আমাদের ধরে এনেছ কেন?

লোকটা বলে,-খুব বেড়েছিলি তোরা। কেষ্টবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিবি কলকাতা থেকে এসে তারই মুলুকে? দুটোকে ধরেছি, বাকি

তিনটেকেও ধরে এনে এখানেই শেষ করে দেব।

ওদের রাগের কারণটা এবার বুঝেছি।

রাত ভোর হয়। পাখিদের কলরব ওঠে। এবার বুঝতে পারি ওরা আমাদের এনে আটকে রেখেছে একটা গাদাবোটে। এর উপরে চারপাশে টিনের ছাউনি। এই গাদাবোটে করে পাটের গাঁট, ধানচালের বস্তা লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

জায়গাটার ঠিক হদিস পাই না। খোলা বিরাট দরজা দিয়ে দূরে দেখা যায় গাঙের বিস্তার। দূরে দূরে ছবির ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দু-একটা মালবোঝাই নৌকা পাল তুলে চলে যাচ্ছে।

আমাদের মাঝ গাঙে গাদাবোটের একটা কুঠুরিতে আটকে রেখেছে। বেলা বাড়তে ওরা চা আর পাঁউরুটি দিয়ে যায়।

পটলা বলে,-কে-কেন আটকে রেখেছ?

লোকটা শোনায়,-কৈফিয়ৎ চাইলে মুখ বন্ধ করে দেব। চুপচাপ থাক।

গাদাবোটের একদিকে পায়খানা। স্নানের জায়গা বলতে কাঠ দিয়ে ঘেরা একটু জায়গা। নীচের তক্তাগুলো কিছু ফাঁকা, নদী থেকে ছোট বালতিতে দড়ি বেঁধে জল তুলে ওই জলই গায়ে ঢেলে স্নান করতে হয়।

এই ফাঁক দিয়ে জায়গাটাকে দেখার চেষ্টা করি। নদীতে জোয়ার, তাই নদীর জল বেশ ঘোলা। জল বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

লোকটা তাড়া দেয়,-স্নান করতে কতক্ষণ লাগে রে? চলে আয়।

লোকগুলো আমাদের বেশিক্ষণ বাইরেও থাকতে দিতে চায় না। ওদের তাড়ায় ভিতরে আসি।

একপাশে রান্নার ব্যবস্থা আছে। ওরা ডাল ভাত আর একটা কি তরকারি দিয়েছে। খেতে রুচি নেই। এই ভাবে মাঝ গাঙে এনে আটকে রাখবে-রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে। শুধোই,-কি করবে আমাদের?

লোকটা বলে,-বাকি কটাকে তুলে আনি, তারপর কি করব দেখবি। গলা টিপে এক একটাকে খুন করে ওই বস্তার পাথর সমেত পুরে ডুবিয়ে দেব সব ক'টাকে।

পটলা চুপ করে থাকে। আমারও মনে হয় এই বন্দী অবস্থায় ওদের কথায় প্রতিবাদ করে লাভ হবে না। বরং ওদের কথা শুনে ওদের বিশ্বাস অর্জন করাই ভালো। তাতে হয়তো মুক্তির উপায় হবে।

আমি খেয়ে নিই। বলি,-দারুণ রান্না হয়েছে। চমৎকার!

মোটকা লোকটা খুব খুশি হয়। আমাকে বলে,-তুমি বেশ ভালো। ওই ছোঁড়াটার দ্যামাক দেখেছো। খেলই না! ঠিক আছে, কদ্দিন না খেয়ে থাকতে পারিস দেখি।

দিন যায়। সন্ধ্যা নামে। নদীর বুকে ঘন কুয়াশা জমে। দূরে আলো জ্বেলে একটা লঞ্চ বের হয়ে গেল। আবার সব চুপচাপ। লম্বা লোকটা এদিক ওদিক ঘুরছে। আর মোটকা লোকটা উনুন ধরিয়ে রুটি আর তরকারি বানাচ্ছে। আমাদের মনে পড়ে হোঁৎকা, গোবরাদের কথা। নসুমামার কথা। ওরা কী করছে কে জানে!

নসুমামা বসে নেই। চারিদিকে খোঁজ-খবর চলেছে। থানাতেও রিপোর্ট করেছে নসুমামা। দারোগাবাবু ধনকেষ্টরই পেটোয়া লোক।

নন্দ ডাক্তার দারোগাবাবুকে বলেন,-এসবের মূলে কে, তা আপনারা জানেন না?

দারোগাবাবু বলেন,-যত দোষ তো পুলিশেরই! খবর নেন-কলকাতার বখাটে ছেলে, সিধে হয়তো সেখানেই ফিরে গেছে! তারপর আসবেন।

নসুমামা বলেন,-খোঁজখবর আমরা নিচ্ছি। তবে তারা বখাটে ছেলে নয়। বড় ফ্যামিলির ছেলে, ভালোই পড়াশোনা করে।

দারোগাবাবু বলেন,-আজকালকার ছেলে তো! কখন যে কী করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

তারপর বলেন,-যান। দেখছি।

অবশ্য ওই পর্যন্তই। খবরটা ধনকেষ্টর ওখানেও পৌঁছেছে। ধনকেষ্ট বেশ বুঝতে পারছে ক'দিনেই নসুবাবু মুষড়ে পড়েছে। ভোটের সেই প্রচার, মিটিং-মিছিলও নেই।

এদিকে পটলা, সমীরের হারাবার খবর যায় সদরে। সদর থেকে পটলার পিসিমাই খবর দেন কলকাতায় পটলাদের বাড়িতে।

পটলার মা বাবা কাকারাও চিন্তায় পড়ে। ঠাক্মা তো রীতিমত কান্নাকাটিই শুরু করে দেন,-ওরে আবার কি ফ্যাসাদ বাঁধালো ছেলেটা দ্যাখ দিকি! তোরা যা, যেভাবে হোক পটলাকে ধরে আন।

বাধ্য হয়ে পটলার কাকা ছুটে আসে সদরে। গৌরাঙ্গদা এবং অফিসারদের এবার দৃঢ় ধারণা হয়, এসব ধনকেষ্টবাবুরই কীর্তি।

গৌরাঙ্গবাবু বলেন এস.পি-কে,-এসবের আদ্যোপান্ত তদন্ত করতে হবে।

পুলিশও তাই চায়। কারণ ওই হাড়মাসপুরে প্রায়ই খুন জখমের ঘটনা ঘটে, আর লোকাল থানা এ নিয়ে কোনো কথাই বলে না। এসব চলতে দেওয়া যাবে না।

ক'দিন ধরে ওই গাদাবোটেই বন্দী হয়ে আছি। এই ক'দিনে আমরা তেমন কোনো গোলমাল করিনি। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করেছি, ওদের কথা শুনেছি দেখে, ওরা কিছুটা সহজ হয়েছে।

এখন আমরা ওদের রান্নার কাজে সাহায্য করি, কথাবার্তা বলি। মোটকা লোকটা কিছুটা ভালো। হেসে কথা কয়। কিন্তু লম্বা লোকটা তবু আমাদের বিশ্বাস করতে পারে না। নজরে নজরে রাখে।

ক'দিন ধরে দেখছি তীর থেকে এদের ইশারা পেলে একটা ছোট ডিঙি আসে। তাতেই আমাদের জন্য চাল ডাল আনাজপত্র আসে, মায় খাবার জল অবধি। মাঝে মাঝে সেই ডিঙিওয়ালা এদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে রাতেই চলে যায় ডিঙি নিয়ে।

সেদিন বেশ ঠান্ডা পড়েছে, বৃষ্টি পড়ছে টিপি টিপি। আজ ওরা রাতে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করেছে। নদীতে হাওয়ার দাপট খুবই বেশি। তাই ওরা ঘেরা জায়গায় বসে রান্না করছে। আর নিজেদের মধ্যেই খোস গল্প করছে। বোধহয় গরম ইলিশ মাছ ভাজার সঙ্গে চা-টা খাচ্ছে।

এদিকের খুপরিতে আমি আর পটলা বসে আছি। কি খেয়াল বশে আমি একটু বের হয়ে গাদাবোটের পিছনে আসি। মনে হয় ওপাশের তীরভূমিতে দু'একটা আলো জ্বলছে। লোকবসতি বাজার আছে ওদিকে। মেঘলা আকাশ।

হঠাৎ নজরে পড়ে গাদাবোটের সঙ্গে ওই ছোট নৌকোটা বাঁধা রয়েছে। মাথায় বুদ্ধিটা খেলে যায়। ইশারায় পটলাকে ডাকি।

পটলা আসতে ইশারায় ওই ডিঙিটা দেখিয়ে বলি,-চল পালাতে হবে। যেভাবেই হোক ধারে উঠে পড়তে পারব।

লোকগুলোর হাসিঠাট্টার পর্ব চলেছে। ওরা জানে আমরা ঠিকই আছি। এই ফাঁকে ডিঙিতে উঠে দড়ি খুলে দিতে জোয়ারের টানে নৌকা ছিটকে বের হয়ে যায়।

ডিঙি বাইতে থাকি ওপারের আলো লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণের মধ্যে আর গাদাবোটটাকে দেখা যায় না। ঘন কুয়াশার মধ্যে সেটা হারিয়ে যায়। আমরাও বেশ জানি ওই গাদাবোটের পক্ষে একইঞ্চিও নড়া সম্ভব নয়। আর কোনো ডিঙিও নেই। ওরা আমাদের পিছনে তাড়া করতে পারবে না।

বেশ জোরেই দাঁড় বাইছি। তীরভূমিও কাছে এগিয়ে আসছে। আলোগুলো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। পটলা বলে, এই রা-রাতে কোথায় যাবি?

শীতে সোয়েটার মাফলার ঠান্ডা হয়ে গেছে। হাতগুলো কনকন করছে। তবু প্রাণের দায়েই দাঁড় বাইতে বাইতে বলি,-ডাঙায় তো নামি, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

নৌকোটা এসে তীরে ঠেকে, জোয়ারের সময় বলে জল অনেক উপরেই রয়েছে। তাই শুকনো ডাঙাতে লাফ দিয়ে নেমে নৌকোটাকে স্রোতের দিকে ঠেলে দিই।

কোথাও না দাঁড়িয়ে সামনের পিচ রাস্তা দিয়ে চলতে থাকি নির্জন অন্ধকারে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখা যায় উঁচু বাঁধ। পটলা বলে,-বাঁধের মত লাগছে। আবার কোনো নদী নাকি রে?

জায়গাটার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। হঠাৎ একটা ট্রাককে সশব্দে হেডলাইট জ্বেলে আসতে দেখে মনে হয়, বাঁধ নয়। কোনো রাস্তাই।

সেই দিকেই এগিয়ে চলি। তখন রাত কত জানি না। সঙ্গে ঘড়িও নেই। তবু পথের দিকেই এগোতে থাকি।

ওদিকে হাড়মাসপুরে তখন হইচই শুরু হয়েছে। পটলার কাকা এসেছেন। পুলিশও এবার সদর থেকে চাপ পেয়ে নড়ে বসেছে। তারা ধনকেষ্টর ধানকলের গুদাম, এদিক ওদিক, মায় নসুমামাদের জঙ্গলঢাকা বিশাল পোড়ো বাড়িতেও হানা দিয়েছে।

ধনকেষ্ট বলে,-ওসব নসুবাবুর প্যাঁচ স্যার। নিজেরাই ওদের কোথাও লুকিয়ে রেখে ভোটের সময় আমার বিরুদ্ধে বদনাম রটিয়ে ভোট কুড়োতে চায়। এসব পলিটিক্স স্যার।

পুলিশ হতাশ। ছেলেদুটো কর্পূরের মত উবে গেল!

হোঁৎকা, গোবর্ধন ফটিকরাও মিইয়ে গেছে। তাদেরও আর উৎসাহ নেই। পটলাকে হারিয়েছে তারা।

এবার নসুমামা ঘোষণা করে,-ভোটের জন্যই এই সর্বনাশ হয়ে গেল। ভোটে আর আমি নাই।

হোঁৎকা বলে,-এটা কি কন মামা? ভোটে জিততেই হইব।

-পটলা নাই, সমীও নাই। আর দরকার কি ভোটে? ভাবছি বসে যাব। ধনকেষ্ট যা পারে করুক।

খবরটা ধনকেষ্টর শিবিরে পৌঁছে যেতে সে খুবই খুশি।

ঘটা করে এবার পঞ্চাননের উৎসব করছে তারা। চারদিকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনদিন প্রসাদ দেওয়া হবে ভরপেট, আর বস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হবে।

বিরাট সমারোহ চলেছে। নসুবাবুর দলের সাড়া নেই।

হঠাৎ এমনি সময়, ওই ভবতারণ আর তার মোটকা চ্যালাকে আসতে দেখল ধনকেষ্ট।

লোকদুটো বলে,-সব্বোনাশ হয়েছে কত্তা!

ধনকেষ্ট ঘাবড়ে যায়।

ভবতারম বলে,-ছেলেদুটোকে নবীনগরের গাঙে আপনার গাদাবোটে আটকে রেখেছিলাম হুজুর, কিন্তু দুদিন হল ওরা পালিয়েছে।

চমকে ওঠে ধনকেষ্ট,-মনে? ওই বিশাল গাং পার হয়ে পালালো? তাদের কি ডানা গজালো যে উড়ে যাবে? কি করে পালালো?

লোকদুটো কিছু বলার আগেই ধনকেষ্ট এসে ওদের আচমকা চড় থাপ্পড় মারতে থাকে। ধনকেষ্ট গর্জে ওঠে,-গাঙে ডুবিয়ে শেষ করতে পারলি না? এখন কি হবে?

ধনকেষ্ট প্রমাদ গনে। সবকিছুই এখন তার কাছে বিশ্রি লাগে। বাইরে উৎসবের সমারোহ চলছে। ঢাক বাজছে পঞ্চাননের মন্দিরে। বেষ কয়েকটা ঢাক। ওদিকে বিরাট বিরাট উনুনে খিচুড়ি চেপেছে।

হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসে কয়েকটা জিপের শব্দ। সদর থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে রিলিফ অফিসার এ.ডি.এম, রাস্তাঘাটের ইঞ্জিনিয়াররা এসে পড়েন।

ধনকেষ্ট অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বের হয়। কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম চমকে ওঠে। জিপ থেকে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে নামছে সেই কলকাতার দুই পলাতক বিচ্ছু। যাদের ধনকেষ্ট গুম করে আটকে রেখেছিল নদীর বুকে গাদাবোটে।

ভবতারণ আর মোটকা লোকটাকে দেখিয়ে পটলা বলে,-এদের অ্যারেস্ট করুন। এই দুজনই গাদাবোটে আমাদের পাহারা দিত আটকে রেখে।

ধনকেষ্ট অবাক। এবার রিলিফ অফিসার বলেন,-অফিসে চলুন। রিলিফের কাগজপত্র বের করুন।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন,-আপনার এলাকার রাস্তার কোনো কাজই হয়নি। নিজেই দেখলাম। অথচ বাইশ লাখ টাকা তুলেছেন ফলস্ বিল দিয়ে। এবার ম্যানেজার হবেন মিত্তির বেগতিক দেখে কেটে পড়তে চায়। কিন্তু পুলিশই আটকায় তাকে।

এর মধ্যে নসুমামা, পটলার কাকা ও হোৎকাদের নিয়ে এসে হাজির হয়। ততক্ষণে ধনকেষ্টকে জিপে তোলা হচ্ছে। সঙ্গে হরেন মিত্তির, বল্টু, গোপলাকে।

মোটকা লোকটাকেও চুলের মুঠি ধরে ভ্যানে তোলা হল।

একদিনেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। এখানে ধনকেষ্টর সব পাপের সাজার ব্যবস্থা একদিনে হয়ে গেল।

এবার নসুমামাই বলেন,-এই ঢাক থামালি কেন? বাবার পুজো ভোগ উৎসব সবই হবে। খরচার জন্য ভাবিস না!

আবার আনন্দ কলরব ওঠে। বিকট শব্দে ঢাক ঢোল বাজছে। হাজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে,-জয় বাবা পঞ্চানন!

ডুবলো কে?-ধনকেষ্ট!

জিতছে কে-নসু রায় আবার কে!

সেবার নসুমামাকে ভোটে জিতিয়ে ফিরেছিলাম আমরা, হাড়-মাস আলাদা করা হাড়মাসপুর থেকে।

অদৃশ্য বন্ধু

ফটিক এর মনটা ভালো নেই। একা চুপচাপ বিলের ধারে বসে আছে। স্কুলের সেরা ছাত্র ফটিক। ওরা খুব গরিব, ওর বাবা গদাধর নিরীহ ভালো মানুষ। গদাধরের একাকালে ভালো অবস্থা ছিল। পাকা বাড়ি-ওদিকে সেরেস্তাঘর, নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, বেশ কিছু ধানজমি, বাগান পুকুর সবই ছিল! তখন নামডাকও ছিল গদাধর ঘোষের বাবার।

কিন্তু বাবা মারা যাবার পর গদাধরকে ভালোমানুষ পেয়ে ওর জ্ঞাতি ভাই হরিশবাবুই ক্রমশ মিথ্যা দেনার দায়ে ওদের জমি জায়গা, বাগান, পুকুর মায় জমিদারির দুটো মহলও সেই দখল করে নিল।

গদাধরবাবুও কোর্টঘর করেছিল, কিন্তু হরিশ ঘোষ আতি ধুরন্ধর লোক। সে কাগজপত্র এভাবে কৌশলে তৈরি করিয়েছে যে সেখানে আইনের কোনো ফাঁকই ছিল না। আর পয়সার জোর হরিশের বেশি, এ অঞ্চলের বহু লোকের প্রচুর বিষয় আশয় ছলে-বলে কৌশলে জবরদখল করেছে, তার পোষা লাঠিয়াল গুণ্ডার দলও আছে।

গুণ্ডার দলের সর্দার নীরু ঘোষ এ অঞ্চলের ত্রাস। কত লোককে সে খুন করেছে তার সীমা সংখ্যা নেই। তার দলবলকেও সবাই ভয় করে।

এ হেন হরিশবাবুই তাই সব মামলাতেই জেতে। শহরের সব চেয়ে নামীদামি উকিলদের সে কিনে রেখেছে। তারা ওর টাকার জোরে সত্যকে আইনের নানা ফাঁক দিয়ে মিথ্যে করে তোলে। আর জয়ী হয় হরিশবাবুই।

আজ হরিশবাবুই এ অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি ধনী, প্রতিপত্তিশালী লোক। সারা এলাকার মানুষের সর্বস্ব লুট করে সে ধনী হয়েছে।

ফটিকদের আজ সব নিয়েছে সে। ফলে ফটিকদের সেই চকমিলানো বাড়িটা এখন পরিত্যক্ত প্রায়। কাছাড়ি বাড়িতে লোকজন নেই, নাটমন্দির ধসে পড়েছে। কোনোমতে বিগ্রহের পূজাটুকুই হয়।

গদাধর ঘোষ, এককালের সেই অর্থবান সৎ মানুষটি, আজ বাজারে নটবর দত্তের গদিতে হিসাব-এর খাতা লেখে, মুহুরিগিরি করে যা পায় তাতে কোনোমতে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালায়

ফটিক তখন ছোট ছিল-সবটা বুঝতে না পারলেও দেখেছে তার খাবার দুধের বরাদ্দ কমতে কমতে উঠে গেল। তখন পুকুরের মাছ ধরা হত, তার মনে পড়ে তাজা রুইমাছগুলো উঠোনে লাফাত, মাছ খেতে ভালোবাসে ফটিক। তখন পাতে মাছের অভাব হত না, ক্রমশ পুকুরগুলোও হরিশ ঘোষ দখল করে নিতে মাছও আর জোটে না।

এখন কালেভদ্রে চিংড়ি না হয় পুঁটি মাছ বাবা আনে। বাজার থেকে। ফটিক আগে ঝোঁক ধরত।

-মাছের মুড়ো কই? দুধ নাই?

ওর মায়ের চোখে জল নামত। ওর মা দেখেছে তাদের সংসারের প্রাচুর্য। নিজেরা দুধ মাছ খেয়ে শেষ করতে পারত না, পাড়ার লোককে বিলাত। এখন নিজেদের তো দূরের কথা, একটা ছেলেকেও এতটুকু দুধ মাছ দিতে পারে না।

ওদের বাগানে ছিল রকমারি কলমের আমগাছ, বোম্বাই, হিমসাগর, ল্যাংড়া, পেয়ারাফুলি, ফজলি সব জাতের আমগাছ লাগিয়েছিলেন গদাধরের বাবা, তাছাড়া হত পেয়ারা, সবেদা, লিচু, কাঁঠাল, নারকেল নানা ফল।

সেই সাজানো বাগানটাকেও আটকাতে পারেনি। বাগানের আমগাছে সেবার প্রচুর আম ফলেছে, বোম্বাই আম পাকছে, রং ধরেছে মধুর মিষ্টি আর রসাল হিমসাগরে, লিচুগুলোর সবুজ পাতায় ছেয়ে এসেছে সিন্দুরের মত লাল আভা, ফটিক বাগানে এসেছে বাবার সঙ্গে, আম পাড়া হবে। বাগানে খুশিভরে ছুটছে ফটিক। কলমের গাছগুলো ফলভারে নুইয়ে পড়েছে, হাতে করে নীচে থেকে পাকা টুকটুকে আম পাড় যায়।

হঠাৎ কাদের চিৎকার আর গর্জনে চাইল।

হরিশ ঘোষ এসেছে সঙ্গে সেই নীরু সর্দার। ইয়া গোঁফ, চোখদুটো লাল, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল লাল ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। হাতে একটা রুপো বাঁধানো লাঠি। সঙ্গে আর দু'চারজন শাকরেদ আছে।

হরিশ ঘোষ বলে-গদধর কোর্টের ডিক্রি পেয়েছি, এ বাগান আমার! দখল নিতে এসেছি।

গদাধর চমকে ওঠে-সে কি! মামলার শুনানিই হয়নি, রায় পেয়ে গেলে। বিচার হয়ে গেল এর মধ্যে? এ আমার বাগান, তোমার দলিল মিথ্যে।

ফটিক চিৎকার করে ওঠে।

হরিশের ইঙ্গিতে নীরু সর্দার তার বাবার উপর লাফ দিয়ে পড়েছে, লাঠির আঘাতে ছিটকে পড়ে তার বাব, কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। ফটিক বাবাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদে কেঁদে ওঠে-আমার বাবাকে মেরো না!

ছোট দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখে বাবাকে।

গর্জাচ্ছে নীরু সর্দার-মারবে না? বেরোও বাগান থেকে!

হরিশের লোক বাগানের সদ্যপাকা আম লিচুগুলোকে পাড়ছে। নারকেল পাড়ছে ধুপ ধাপ করে, কাঁঠাল গাছে হানা দিয়েছে।

ফটিক বাধা দিতে যায়।

ধমকে ওঠে হরিশ, এটাকেও দু'ঘা দে! আবার আম নেওয়া হয়েছে। কেড়ে নে।

ওর হাতের দুটো পাকা আমও কেড়ে নেয় তারা। ধাক্কা দিয়ে ফটিককেও ছিটকে ফেলেছে। ওদের চোখের সামনে ওই হরিশ কৌশলে আর জোর করে বাগানটাও কেড়ে নিল।

সেদিনের কথা ফটিক ভোলেনি।

তারপর থেকেই তাদের সংসারে এসেছে কঠিন দুঃখ আর অভাবের ছায়া।

দেখেছে ফটিক কাছাড়ি বাড়ি নিঝুম হয়ে গেল, লোকজন গোমস্তা, কাজের লোক, দারোয়ানরাও চলে গেল। মায়ের চোখে জল দেখেছে। দেখেছে, বাবার মত হাসিখুশি লোকটা কেমন বদলে গেল। খাবার সময় মায়ের চোখেও জল আসত।

দুধ নেই, মাছ নেই, লাল মোটা চালের ভাত, একটু আলু বড়ির ঝোল, সঙ্গে খামারবাড়িতে গজানো কচুশাক, না হয় বুনো ডুমুরের ছেঁচকি।

ছোট বোন রূপা মাঝে মাঝে বায়না ধরত।

-মাছ নেই, দুধ নেই, জামাগুলো ছিঁড়ে গেছে। লতু সোনাদের কেমন সুন্দর জামা আছে। আমার নেই কেন?

মায়ের চোখে জল নামে।

ফটিক তখন সবে স্কুলে যাচ্ছে। ফটিক বুঝতে পারে তাদের সংসারের আবস্থাটা। বাবা এখন নটবর দত্তের গদিতে কাজ করতে যায় ময়লা কাপড় জামা পরে।

বোনকে ফটিক বলে আড়ালে, আমরা গরীব হয়ে গেছি রে, এখন ওই পর। আমি বড় হলে তোকে নতুন জামা কিনে দেব।

রূপা খুশি হয়। ডাগর চোখ মেলে বলে-ঠিক তো! তাহলে তাড়াতাড়ি তুই বড় হয়ে যা দাদা।

ফটিক বোনের বোকামিতে হাসে।

-পাগলি! বড় হতে সময় লাগবে তো। তবে এবার প্রাইমারিতে দেখবি বৃত্তি পাব। পণ্ডিতমশাই বলেছেন। ফার্স্ট হবই রে। সেই বৃত্তির টাকায় তোকে নতুন জামা কিনে দেব।

রূপা খুশি হয়, ঠিক তো?

ফটিক পড়াশোনাতে খুবই ভালো। সেবার মহকুমার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিল। দশটাকা করে বৃত্তিও পেয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়।

হেডমাস্টারমশায় নিজে বলেন-জীবনে সবেতেই ফর্স্ট হতেই হবে ফটিক।

ফটিক তখন থেকেই স্কুলের সেরা ছাত্র। তারপর নতুন হেডমাস্টারমশাই এলেন। তিনি খুব হাঁকডাক করেন স্কুলে।

সেইবার থেকেই হরিশবাবুর ছেলে বসন্তও তাদের ক্লাসে ভর্তি হল। হরিশ ঘোষ এখন স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছে। তার ছেলের জন্য সকাল বিকাল দুটো তিনটে মোট পাঁচজন টিউটর রাখা হয়েছে। স্কুলেও তার জন্য আলাদা বেঞ্চ। ফটিক ছিল ফার্স্ট বয়। সব সাবজেক্টই সে প্রথম হত, তারপর ছিল শৈলেন। দুজনেরই পাল্লা চলত। কিন্তু এবার হাজির হয়েছে বসন্ত।

মাস্টারমশাইদের নজর তার উপর। চাকর তার বই নিয়ে আসে। বসন্ত দামি র‍্যালে সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে। টিফিনের সময় ফটিকের খাওয়া তো কিছু জোটে না। অনেকেরই সেই অবস্থা।

ওদিকে কৌটোয় সন্দেশ, লুচি-ফ্লাস্কে দুধ সব আসে বসন্তর জন্য, এরা চেয়ে চেয়ে দেখে।

এ হেন বসন্ত অঙ্ক আর ইতিহাসে হাফ ইয়ার্লিতে ফার্স্ট হয়ে গেল। সেকেন্ড হল ফটিক।

অবাক হয় ফটিক।

সে সব অঙ্কের ঠিক উত্তর মিলিয়েছে। ইতিহাসের সব প্রশ্নও ভালো লিখেছে। কিন্তু কি যেন হয়ে গেল।

প্রথম আঘাতে তার চোখ দিয়ে জল নামে। তার স্কলারশিপ, বৃত্তি সব চলে যাবে।

সেকেন্ড টিচার সন্তোষবাবুও দেখেছেন ব্যাপারটা। ফটিককে তিনিও খুব ভালোবাসেন। ইংরেজি পড়ান ক্লাসে, স্বাধীনচেতা যুবক। তিনি বলেন, এতেই মুষড়ে পড়বি না ফটিক। তুই পড়াশুনা যেমন করছিস কর। আমার কাছেও পড়তে আয়। তুই ফার্স্ট হবিই।

ফটিক-এর দু'চোখে জল নামে।

বলে সে, স্কলারশিপ, বৃত্তির টাকা চলে গেলে পড়া হবে না স্যার।

সন্তোষবাবু বলেন-পাগল এসব ভাবছিস কেন?

গেমটিচার গজেনবাবুও ফটিককে খুব ভালোবাসেন। ফটিক শুধু পড়াশুনাতেই নয় খেলাধূলাতেও স্কুলের সেরা। ফুটবল মাঠে ফটিক একাই একশো। ক্রিকেট টিমও শুরু হয়েছে। টাউন ক্লাবের হয়ে জুনিয়ার টিমে খেলে সে। বলও ভালো করে, ব্যাট ও সমান চলে তার।

তার জন্যই স্কুলের টিম এখানের বহু ট্রফি জেতে। গজেনবাবু তাই ফটিককে ভালোবাসেন।

বলেন তিনি-খেলায় হার জিত আছে ফটিক। তাই বলে ভেঙে পড়লে চলবে না। লাইফ ইজ এ স্পোর্টস। এখানে খেলার মালিক তুই, খেলে যাবি প্রাণ দিয়ে, দেখবি জয় একদিন হবেই।

ফটিক এই আঘাতটা মেনে নিয়ে নতুন উদ্যমে পড়তে শুরু করে।

বাড়িতে ওর বাবাও শুনেছে খবরটা। গদাধরবাবু বলে,-মন দিয়া পড়।ফার্স্ট তুই হবিই।

ওর মা বলে,-ফটিক ফার্স্ট হতই, শুনলাম শৈলেনের মা বলছিল হরিশবাবুই নাকি মাস্টারদের বলেছে বসন্তকে ফার্স্ট করতে।

গদাধর জীবনের বহু কিছু হারিয়েছে। সব বিষয় আশায় হারিয়ে পথের ভিখারি হয়ে গেছে। তবু বিশ্বাসটুকু হারাতে চায় না সে। বলে গদাধর,-না, না। বিদ্যামন্দির। সেখানে এমন অপবিত্র কার্য হতে পারে না ফটিকের মা। হয়তো বসন্ত ভালো পরীক্ষা দিয়েছে।

ফটিকের মা সুধাময়ী দেবী স্বামীর কথাটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ভাবে হয়তো তাই হবে। তবু তার মনের সন্দেহ যায় না। ফটিকও কথাটা শুনেছিল স্কুলে।

শৈলেন, রবি আরও দু একজন বলে-নৃপতিস্যার বসন্তকে অঙ্ক শেখান। ও কে সব অঙ্ক, জিওমেট্রির প্রবলেম, থিওরেম, মায় কারোলারী অবধি বলে দিয়েছিলেন। ক্লাসের বোর্ডে সাধারণ সরলই কষতে পারে না, সে হবে ফার্স্ট। ইতিহাসের গোবিন্দ স্যারও ওকে পড়ান। না হলে হুমায়ুনের বাবার নাম জানে না, রোমের সম্রাটের নাম বলতে পারে না সে হল ফার্স্ট। কই-ইংরেজিতে তো সন্তোষ স্যারের হাতে পেয়েছে মাত্র বিয়াল্লিশ, ওকে কায়দা করতে পারে নি।

ফটিক চুপ করে থাকে।

মনে পড়ে, হরিশবাবুর সেই বাগান পুকুর দখল নেবার দৃশ্যটা। তার বাবাকে লাঠির ঘায়ে আহত করে তাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে ওরা বাগান কেড়ে নিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছে তাদের সবকিছু। বাবাকে পথের ভিখারির মত অবস্থা করেছে। আজ ফটিক নিজের পরিশ্রম, চেষ্টায় আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে স্কুলে ফার্স্ট হয়ে চলেছে। ভালোবাসা,সুনাম পেয়েছে। সেখানেও এবার হাত বাড়িয়েছে হরিশবাবু। তার ছেলেকেই ফার্স্ট করাতে হবে। তার জন্য হয়তো এইসব পথই নিয়েছে।

ফটিকের মনে পড়ে সন্তোষস্যার, গজেনবাবুর কথা। জীবনে এত সহজে সে ভেঙে পড়বে না। পড়াশোনায় আরও মন দেয়।

স্কুলের টিম এবার ফাইনালে উঠেছে।

ফটিকের ক'দিন জলে ভিজে জ্বর মত হয়েছিল। সামনে ফাইন্যাল খেলা। ফটিক সেরে উঠে স্কুলে এসে চমকে ওঠে।

বোর্ডে ফাইন্যালের টিম সিলেকশন হয়ে গেছে।

ফটিক খেলে সেন্টার পজিশনে। রাইট এ-ও খেলে। কিন্তু এবারে তার নামের বদলে বসেছে নতুন নাম। বসন্ত ঘোষ।

এখানেও সেই বসন্ত। ফটিককে ওরা খেলার জগৎ থেকেও যেন সরিয়ে দিতে চায়। খবর নিয়ে, জানতে পারে গজেন স্যার নেই, বি-এড পরীক্ষা দিতে চলে গেছেন, এখন গোবিন্দস্যারই স্কুলের গেম টিচার-এর কার্য দেখছেন।

ফটিক তার কাছেই গেছে।

গোবিন্দস্যার হরিশবাবুর বৈঠকখানাতে রোজ সকালে যায়, আরও অনেকে যায় ওখানে, নৃপতিস্যার নতুন হেডমাস্টার ত্রিদিববাবু তো ওরই লোক। সেখানে স্কুলের নানা বিষয়েও আলোচনা হয়। খেলার ব্যাপারেও ফাইন্যাল হয়েছে সেখানে।

গোবিন্দবাবু ফটিককে দেখে চাইল।

গম্ভীরস্বরে বলে, কি চাই?

ফটিক বলে ভয়ে ভয়ে, এবার ফাইন্যাল খেলায় আমার নাম দেখলাম না স্যার।

ফটিকের কথায় গোবিন্দবাবু ধমকে ওঠে।

-তার জন্য তোর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে? চুপ করে যায় ফটিক। কোনোমতে জানায় সে,-এতদিন স্কুলের সব খেলাতেই খেলেছি। ট্রফিও এনেছি।

গোবিন্দবাবু বলে, তোর চেয়ে ভালো প্লেয়ার পেলে তাকেই খেলাবে কমিটি। যা তো। ভারি আমার প্লেয়ার রে। হাওয়ায় উড়ছে পুঁটি মাছের মত জিলজিলে চেহারা নিয়ে। ফুটবল খেলবে।

ফটিক বের হয়ে এল। দু'চোখ তার জলে ভরে আসে।

বাইরে টিমের ক্যাপটেন ভূতনাথ, রমাই, হলধর সকলেই অপেক্ষা করছিল। তারাও শুনেছে গোবিন্দস্যারের কথাগুলো। ওরাও এবার বুঝেছে খেলা কি হবে।

ভূতনাথ বলে, দাঁড়িয়ে হারব। ওখানে কেউ খাতির করবে হরিশবাবুর ছেলে বলে।

ফটিক চুপ করে থাকে।

লজ্জায় অপমানে তার দু'চোখে জল নামে। আজ সারা স্কুলের ছেলেদের সামনে, পাড়ার সকলের চোখে ফটিক যেন হেয় প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। ওই হরিশ ঘোষ তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েও খুশি হয়নি। আজ ফটিকের কিশোরমনেও নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। এবার শেষ করে দেবে তাকে।

বৈকালে বাড়ি ফিরেছে।

সুধাময়ী ছেলের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে তার বেদনাটা। শুধোয় সে-কি হয়েছে রে ফটিক?

ফটিক কান্নায় ভেঙে পড়ে। আজ পড়ার ব্যাপারও নয়, খেলার ব্যাপারেও তার সব খ্যাতি প্রতিষ্ঠাকে কেড়ে নিয়েছে। হরিশবাবু ষড়যন্ত্র করেছে। তার টাকা আছে। তাই সেসব পাবার অধিকার আছে তার ছেলেরই।

সুধাময়ীও ছেলের দুঃখে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে-দুঃখ করিসনি বাবা। নিজে নিজে চেষ্টা কর। ভগবান একদিন নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন। এত সব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারি করেছে ও, তবু বেঁচে আছি বাবা। সব সয়েছি। তোর মনেও এসব সইবার ক্ষমতা ভগবানই দেবেন। আমরা গরিব, গরিবের মতই থাকব। কাজ কি ওসবে।

ফটিক আজ খেলার মাঠেও যায়নি। সেখানে আজ ফাইন্যাল সিলেকশনের প্লেয়াররা খেলছে। এর মধ্যে মাঠে সাড়া পড়ে গেছে। হরিশবাবু নিজে মাঠে যাবেন। তার ছেলে বসন্তও খেলবে আজ। ওই আনন্দ অনুষ্ঠানে আজ ফটিকের আমন্ত্রণ নেই।

বৈকালে একা একা এসে বসেছে ফটিক বিলের ধারে। এদিকটা এখনও নির্জন।

এককালে নদীর গতিপথই বোধ হয় এদিকে ছিল। এখন নদী সরে গেছে অন্যদিকে। এখন এই অর্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত দেহটা রয়ে গেছে। জেলেরা মাছ টাছ ধরে।

এই জলার ধারে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে শিমুল, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, পিটুলি গাছের ঘন বন গজিয়ে গজিয়ে উঠেছে। দু'চারটে আম গাছে লতার বেষ্টনি। জায়গাটার এদিকে এ সময় কেউ একটা আসে না। বলে এখানে নাকি অপদেবতার রাজ্য। মাঝে মাঝে অনেকেই রাত্রির অন্ধকারে আলো দেখেছে, কিসের শব্দ শুনেছে। এই ঠাঁইটাকে তারা এড়িয়ে চলে বৈকালের পর থেকেই।

ফটিক একাই বসে আছে।

মাঠে এখন পুরোদমে খেলার আনন্দ কলরব চলেছে।

হঠাৎ ফটিক চমকে ওঠে। বনের ওদিকে একটা ঘূর্ণিঝড় উঠেছে। গাছ-গাছালির মাথাগুলো ঝড়ে আলোড়ন তোলে, একটা ধোঁয়ার মত কি যেন ওই ঝড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেল, শোঁ শোঁ শব্দ করে।

ঝিলের জলে ঢেউ ওঠে।

সারা জায়গাটা যেন সেই ঝড়ের বেগে মেতে উঠেছে। ভয় হয় ফটিকের। পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেছে। উজ্জ্বল একটা আলোর বিন্দু যেন ওই বনের মাথায় স্থির হয়ে আবার হারিয়ে গেল।

ঝড়ও থেমে আসে। আকাশে দু চারটে তারা দেখা যায়। শান্তি নামে বনে, ঝিলের জলে। কি যেন দেখছে সে, বিচিত্র একটা দৃশ্যকে। মনে হয় স্বপ্নই। কেন না সেই তাণ্ডবের কোনো চিহ্নই আর নেই।

ফিরে যাবে ফটিক। হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল-ফটিক।

ফটিক এদিকে ওদিকে চাইল। হয়তো তার কোনো বন্ধুই এসেছে এখানে তার সন্ধানে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। আবার যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। সেই ডাক শুনে চমকে ওঠে।

একটা নীলাভ মূর্তি তার সামনে ফুটে ওঠে। মাথাটা চকচক করছে। চুল নেই, কানের বদলে ছোট দুটো শুঁড় যেন উপরে তোলা। মুখচোখগুলো দেখা যায়, পা হাত দুটো ঠিক মানুষের মত নয়। যেন কোনো ধাতুরই, শক্ত আর চকচক করছে ওর কপালের মৃদু আলোর দীপ্তিতে।

ফটিক দেখছে তাকে। শুধোয় ফটিক,-কে তুমি? তোমাকে আমি চিনি না, তুমি আমাকে চিনলে কি করে? নামই বা জানলে কেমন করে?

মূর্তিটা হাসে।

ওর চোখদুটোয় মৃদু দীপ্তি ফুটে ওঠে। মাথার শুঁড় দুটো নড়ছে। বাতাসে যেন কিসের সন্ধান করছে ওর শুঁড় দুটো।

বলে মূর্তিটা-আমরা সব বুঝতে পারি, জানতে পারি। তোমাকে জোর করে সেকেন্ড করে দিয়েছে, টিম থেকে বের করে দিয়েছে ওই হরিশবাবুরা, না?

চাইল ফটিক। অবাক হয় সে।

-তুমি জানলে কি করে? কোথায় থাক তুমি?

হাসে সেই প্রাণীটি। বলে সে-তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার দুঃখে হঠাৎ এখানে এসে পড়লাম।

তোমার বাড়ি কোথায়? ফটিক শুধোয়।

বলে সে-তোমাকে এর আগে কখনও দেখিনি।

মূর্তিটি বলে, কাউকে বলো না, আমার দেশ ওই দূর আকাশের কোনো এক নক্ষত্রলোকে। মানুষ এখনও মহাকাশ যান পাঠিয়ে আমাদের নক্ষত্রের কোনো সন্ধান পায়নি। আমরা আমাদের মহাকাশ যানে করে তোমাদের পৃথিবীতে আসি। সব খবরই রাখি। আমাকে সিরিন বলেই ডাকতে পারো।

ফটিক এর আগে লাইব্রেরিতে দু'একটা বই পড়েছে মহাকাশ সম্বন্ধে। পৃথিবীর জানা চেনা গ্রহমণ্ডল ছাড়াও মহাকাশ জগতে বহু লক্ষ নক্ষত্র গ্রহ আছে। তাদের সকলের আলো এখনও অবধি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়নি। মানুষও মহাকাশ যান পাঠিয়ে সন্ধান করছে। আজ সেই দূর অচেনা গ্রহের কোনো মানুষকে তার সামনে দেখে অবাক হয়েছে ফটিক। সিরিন বলে,-খুব অবাক হয়েছ না? ভয় পাওনি তো!

ফটিক মাথা নাড়ে।

সিরিন বলে,-আমাকে বন্ধু বলেই জানবে।

ফটিক শুধোয়,-কিন্তু এখানে থাকবে কোথায়?

হাসে সিরিন। নিমেষের মধ্যে আবার তাকে দেখাও যায় না। কেউ নেই। ফটিক চমকে ওঠে। তাহলে সে কি ভূতটুতই দেখেছিল। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ তার সামনে দেখা যায় সিরিনকে। হাসছে। সে বলে,-আমাদের এখানে থাকার কোনো সমস্যাই নেই। তোমাদের পৃথিবীর মূল উপাদান ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম। অর্থাৎ মাটি জল আলো বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূত। মানুষ মরে গেলে তার দেহটা এই পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। আর ফেরে না। আমরা ইচ্ছে করলেই পঞ্চভূতে মিলিয়ে যেতে পারি আবার যে কোনো রূপই নিতে পারি ইচ্ছামত। সুতরাং থাকার কোনো সমস্যা আমাদের নেই। ইচ্ছা করলে তোমাকেও অদৃশ্য করে দিতে পারি, আবার ফিরিয়ে আনতে পারি

এই রূপে।

ফটিক ঘাবড়ে গেছে।

বলে সে-ওসবে কাজ নেই।

ফটিক বলে-সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ি যেতে হবে। আজ চলি। আবার দেখা হবে তো?

সিরিন বলে,-নিশ্চয়ই। আমার নাম ধরে তিনবার ডাকবে তাহলেই আমি এসে যাব।

দুজনে আসছে। ফটিকের সন্দেহ হয়, ভয়ও হয়, ওই রকম বিচিত্র দর্শন একটি সঙ্গীকে দেখলে শহরের অনেকেই সন্দেহ করবে। আর সত্যিই যে সিরিন মহাকাশের কোনো নক্ষত্রবাসী না আর কেউ তাও জানে না সে।

ফটিক ফিরছে বাড়ির দিকে। সামনে গিরিধারীর চায়ের দোকান।

অবাক হয় ফটিক, সিরিনকে না দেখে।

এখন একাই ফিরছে সে বাড়ির দিকে।

তাদের বাড়িটার বাইরের দিকের কাছারি ঘরগুলোর বারান্দা এখন মেরামত অভাবে জীর্ণ হয়ে গেছে। লোকজন কেউ থাকে না।

বাড়ি ঢুকেছে, সামনেই সিরিনকে দেখে চাইল।

-তুমি!

সিরিন বলে-তোমাদের বাড়িটা তো বিরাট, এখন ধসে পড়েছে। ত এখানেই থাকা যাবে।

খুশি হয় ফটিক। বলে, বেশ তো, থাকো। হঠাৎ মাকে দেখে চাইল ফটিক।

ছোট বোন রূপাও রয়েছে। মা বলে-কার সঙ্গে কথা বলছিলিরে?

চমকে ওঠে ফটিক-মা বোধহয় সিরিনের খবর জেনে গেছে। কিন্তু দেখে ফটিক সিরিন এর কোনো চিহ্নই আর নেই। ফটিকও ওসব কথা মাকে জানাতে চায় না। বসে সে,-কই কার সঙ্গে কথা বলব? ও, তুমি ভুল শুনেছ মা।

সুধাময়ী চুপ করে যায়। ওসব কথা না তুলে বলে,-এত দেরি অবধি বাইরে থাকিস না, তাই ভাবছিলাম বাবা।

ফটিক বলে,-গোলকস্যারের ওখানে গেছিলাম মা। চলো।

ফটিকের ঘরটা আলাদা। একটা খাট রয়েছে। সেকালের খাট। দুটো চেয়ার টেবিলও রয়েছে। ফটিক হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করে এসে পড়তে বসে।

বাবাও দোকান থেকে ফিরেছে। রূপা এর মধ্যে শুধোয়-এবার তুই নাকি ফাইন্যালে খেলবি না দাদা?

রূপা ওর দাদার খুব ভক্ত। সেও শুনেছে কথাটা। ফটিক এতক্ষণ ওসব ভুলেছিল সিরিনকে নিয়ে। এবার মনে পড়ে খেলার কথাটা। বলে সে।

-না রে। যাঃ অঙ্কগুলো শেষ করি।

রূপা চলে যেতে ফটিক অঙ্ক নিয়ে বসেছে। আজজেবরার কঠিন অঙ্ক সহজে মাথায় ঢোকে না। আর নৃপতিস্যার এবার ট্রিগনমেট্রিও পড়াচ্ছে। কস্ আলফা কস্‌বিটা-এসব তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে।

প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ্যও তার বাবার নেই।

এবার যেন সত্যিই হেরে যাবে ফটিক।

হঠাৎ সামনে সিরিনকে দেখে চাইল। সিরিন বলে,-ওমা, এত সোজা অঙ্ক কষো তোমরা?

ফটিক চটে ওঠে। বলে সে-যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো না সিরিন। পারবে এসব কষতে? দারুণ কঠিন।

হাসল সিরিন। বলে সে-এবার দ্যাখো, তোমার কাছেও এসব জলবৎ তরল হয়ে যাবে।

চমকে ওঠে ফটিক-সিরিনের মাথার শুঁড় দুটো শূন্যে ঘুরছে। ওর গা থেকে মৃদু নীলাভ জ্যোতি বের হয়। ফটিকের মাথার জট গুলো যেন খুলে যাচ্ছে।

ওই দারুণ কঠিন অঙ্কগুলোর মূলতত্ত্ব সে জেনে ফেলেছে। চটপট করে নিজেই এবার ট্রিগনমেট্রির সেই চ্যাপ্টারের সব অঙ্ক কষে ফেলেছে।

জিওমেট্রির দুরূহ থিয়োরেম-এর মূলতত্ত্বটা তার কাছে সহজ হয়ে ওঠে।

-খেতে আয়। মায়ের ডাকে ফটিক চাইল।

তন্ময় হয়ে অঙ্ক কষছিল তৃপ্তিতে। রাত্রি হয়ে গেছে। মায়ের কথায় ফটিকের মনে পড়ে সিরিনের কথা। সত্যিই তার বন্ধু সিরিন।

ফটিক বলে মাকে-খাবারটা রেখে দাও মা, এগুলো শেষ করেই খেয়ে শুয়ে পড়ব। খিদে বেশি লেগেছে মা-দুখানা রুটি বেশি দিও।

মা বলে-ঠিক আছে। তবে বেশি রাত্রি জাগিস না বাবা।

খাবার বলতে কয়েকখানা রুটি, কুমড়ো আলুর তরকারি আর একটু গুড়। আগে রুটি খেত না সে। ভাত ভাজাভুজি, মাছের তরকারি, দুধ সন্দেশ বাগানের পাকাকলা এসবই খেত।

এখন এই জোটাতে বাবাকে কি পরিশ্রম করতে হয় তা জানে ফটিক। ডালও সব দিন জোটে না। ডালের দাম নাকি অনেক।

রাত্রি হয়ে গেছে। ফটিক হাতমুখ ধুয়ে খাবারটা বের করে ডাক দেয়-সিরিন-

দুবার ডাকতেই দেখা যায় সিরিনকে সত্যি সত্যি। ইঁট কাঠের বেড়া তাকে আটকাতে পারেনি। এসে পড়েছে সে।

ফটিক বলে,-এসো খেয়ে নাও।

সিরিন দেখছে খাবারগুলোকে। ফটিকের মনে হয় বোধহয় এ খাবার সিরিনের পছন্দ হয়নি। বলে ফটিক।

-আমরা খুবই গরিব সিরিন। আমাদের সবকিছু জমি বাগান জমিদারি সব হরিশবাবু কেড়ে নিয়েছে মিথ্যা মামলা করে-ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে। এ ছাড়া আর কিছুই খেতে পাই না আমরা। এসব খাবে না?

সিরিন দেখছে ওকে। বলে সে-কেন খাবো না? বসছি।

দুজনে ওই ক'খানা রুটি তরকারি ভাগ করে খায় বন্ধুর মতোই। দুটি ভিন গ্রহের জীব, তবু অদৃশ্য এক প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। ভালোবাসা প্রীতির সীমানা বোধহয় কোনো গ্রহের প্রভাব পার হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ড-বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তার কোনো দেশ বা কাল এর সীমারেখার বন্ধন নেই।

নৃপতিস্যার বসন্তকে ফার্স্ট করেছে। কিন্তু ফটিকই ভালো ছেলে। এরকম কথা ওঠে। একমুখ থেকে অন্যমুখে ছড়ায়।

হরিশবাবু ওখানে ইদানীং যাতায়াত করে নৃপতিবাবুও, হরিশ ঘোষ ছোট শহরের আজ নামকরা লোক। বিরাট সম্পত্তি, বাগান, পুকুর বড় বড় দীঘিতে তার লাখ টাকার মাছের ব্যবসা চলে। ফার্ম ফলের বাগানের সরেস জাতের আম কলকাতা ছাড়িয়ে প্লেনে বিলেতেও চালান যায়। শহরের একদিকে বিরাট জুট মিলও গড়েছে, তাছাড়া লোহা সিমেন্টের বড় ব্যবসা ফেঁদেছে। গ্রাম আজ শহর হচ্ছে, তেমনি হরিশ ঘোষও ফুলছে।

নৃপতিবাবু কৌশলে বসন্তকে অঙ্কে ফার্স্ট করিয়েছে, হরিশবাবু চতুর লোক। তার ইঙ্গিতেই এসব হয়েছে, অথচ সেই কড়া স্বরে বলে,-এসব কথা শোনাও অন্যায়। এর বিহিত দরকার।

নৃপতিস্যার হেডমাস্টার ত্রিদিববাবুকে বলেন,-একদিন ক্লাসের বোর্ডে নিজে দেখুন গিয়ে কে ভালো অঙ্ক কষতে পারে? ওই ফট্‌কে না বসন্ত? সর্বজনসমক্ষে সেই পরীক্ষা দিয়ে আজ বসন্তের প্রাধান্য দেখাতে চায় হরিশবাবুও।

ফটিক, অন্য ছেলেরা এসবের কিছুই জানে না। আজ ক্লাসে হরিশবাবু, অন্য টিচাররা হেডস্যার সকলেই এসেছে।

নৃপতিস্যার ট্রিগনমেট্রির জটিল দুটো অঙ্ক বোর্ডে দিয়ে বলে-তোমাদের কেউ এটা করতে পারবে? এনিবডি?

নৃপতিস্যার এই অঙ্ক দুটো কাল বসন্তকে বার বার করিয়ে মুখস্থ করিয়ে রেখেছে। তারপর এই পরীক্ষার আয়োজন হয়েছে। ক্লাসে সবাই নীরব। জটিল অঙ্ক। নৃপতিবাবু ডাকছেন-ইউ, ইউ।

ফটিক দেখছে অঙ্ক দুটো। এ তার জানা নেই।

হঠাৎ বোর্ডের পাশেই দেখা যায় সিরিনকে। চকচক করছে মাথাটা, শুঁড় দুটো নড়ছে। ডাকছে ফটিককে ইশারায়।

ফটিক চমকে ওঠে। কে জানে হেড স্যার অন্যরা তাকে দেখেছে কিনা। কিন্তু মনে হয়, ওকে কেউই দেখতে পায়নি। সেই অলোকতরঙ্গ ওদের দুজনের মধ্যেই বিস্তৃত ছিল। আর কারোর ওকে দেখার উপায় নেই।

নৃপতিবাবু বলে-ফটিক, খুব তো ফার্স্ট হও, করো অঙ্ক দুটো।

ফটিক উঠে বোর্ডের দিকে চলেছে। অবাক হয় সকলেই। নৃপতিবাবুও। বই ঘেঁটে হায়ার ম্যাথামেটিকস্ এর অঙ্ক দুটো বের করেছে, স্কুলের ছাত্রের পক্ষে করা অসম্ভব।

কিন্তু ফটিক তখন বোর্ডে গিয়ে চকটা হাতে নিয়েছে। ওর চোখের সামনে সিরিন-সেই অঙ্কের প্রতিটি স্টেপ তারই নির্দেশে লিখে চলেছে অবলীলাক্রমে। তারপর উত্তরটা সঠিক করেছে। অন্য অঙ্কটাকেও।

সন্তোষবাবুও ছিলেন। তিনি অবাক হন-সাবাস!

নৃপতিবাবু ভেবেছিল ফটিকও পারবে না। এবার সেই অঙ্ক বসন্তকে দিয়ে করিয়ে তার যে ফার্স্ট হবার যোগ্যতা আছে সেটাই প্রমাণ করবে। হরিশবাবুও এটা ভেবেছিল। কিন্তু ছেঁড়া বিবর্ণ জামা পরা ছেলেটা সব কিছু ভেস্তে দিল।

সিরিনই যেন অঙ্কটা তার মাথায় বাতলে দেয়।

বোর্ডে একটা আরও জটিল অঙ্ক লিখে ফটিক বলে নৃপতিস্যারকে-স্যার এই অঙ্কটা আমি কষতে পারিনি। এটা যদি একটু দেখিয়ে দিতেন।

এই বলে ফটিক বিনীতভাবে এসে বেঞ্চে বসলো।

এবার ঘামছে নৃপতিবাবু। জব্বর অঙ্ক। নৃপতিবাবুরও এখন হায়ার ম্যাথামেটিকস-এর চর্চা নেই। ফলে প্রায়ই ভুলে গেছেন। এদিকে হেড স্যার, হরিশবাবুরাও রয়েছে। তাদের সামনে আজ ফটিক তাকেই এমনি বিপদে ফেলবে ভাবতে পারেনি।

সারা ক্লাস স্তব্ধ, নৃপতিস্যার শুকনো মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলে-এটা পারিসনি? এ তো সোজা অঙ্ক রে-

ভগবান রক্ষা করেছেন। পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়ে যেতে নৃপতি বাবু বলে-পরে ওটা দেখিয়ে দেব।

হরিশবাবু ব্যাপারটা বুঝে অবাক হয়। অবাক হয়েছে হেড স্যার, নৃপতিবাবুও।

ভূতনাথ, রবি অন্যান্য সকলেই বলে,-দারুণ অঙ্ক কষেছিস ফটিক। ও ক্লাসে আর কেউ পারত না।

বসন্তের কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ দেয়নি ফটিক। আগেই সে অঙ্কদুটো কষে দিয়েছে। বসন্তকে তার প্রাপ্য খ্যাতি থেকে বঞ্চিত করেছে। নৃপতিবাবু নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। আড়ালে হরিশবাবু গজগজ করে, এটা ঠিক করলে না নৃপতি! ফটিকই তো খ্যাতি কুড়িয়ে নিল। বসন্তকে সুযোগই দিল না। ছেলেটার সম্বন্ধে সাবধান থেকো মাস্টার।

নৃপতিবাবুও আজ অবাক হয়েছে। ফটিক যে এমনি অঙ্ক কষে দেবে তা ভাবেনি। বলে সে-দেখছি স্যার ওটাকে।

ফটিক তার হৃত সম্মান কিছুটা আজ ফিরে পেয়েছে। সন্তোষবাবু বলে-নিজের পড়াশুনা করে যা, দেখবি তুই ফার্স্ট হবিই।

ফাইনাল খেলার দিন এগিয়ে আসছে।

মাঠে জোর প্র্যাকটিস চলছে। স্কুলের মান ইজ্জত নির্ভর করছে এই খেলার উপরও, এই খেলায় স্কুল জিতলে জেলার সেরা স্কুলের সম্মান পাবে। এখান থেকেই খেলোয়াড় বাছাই হতে পারে কলকাতায় জাতীয় দলে খেলার জন্য।

হরিশবাবুর ইচ্ছা বসন্ত জাতীয় দলে খেলবে। তার জন্য দু'চারজন মাতব্বরকেও আনছে নিজের খরচায়, সেইদিন। যাতে বসন্তকে তারা বাছাই করেন।

ভূতনাথ টিমের ক্যাপ্টেন, গোবিন্দবাবু এখন টিমের সর্বাধ্যক্ষ। তবু ভূতনাথ আড়ালে বলে-কি হবে বুঝছি না। বসন্তকে সব বল দিতেই হবে। আর ও তো দেখি গোলকানা। কিছুই করতে পারে না। ওদিকের ব্যাক এর তাড়ায় সরে আসে।

রবি বলে-সোজা বল গোলে মারতে গেলে গোবিন্দস্যার বলে-পাস দাও বসন্তকে।

অর্থাৎ যা গোল হবে সব বসন্তই করবে, না পারলে অন্য কেউ গোলদাতা হয়ে যাক, এটা চায় না এরা। ভূতনাথ বলে-খেলা পড়েছে জেলা স্কুলের সঙ্গে।

দারুণ মারকুটে টিম। এসবে ফটিকের বলার কিছুই নেই। সে আজ এদের টিমের যেন কেউ নয়। রবি বলে-ফটিক তুই থাকলে ভরসা পেতাম। তোকে ওদের ডিফেন্স আটকাতে পারত না।

কিন্তু কি করবে সে। মনের দুঃখ চেপেই বলে-আমি কি করব বল? গোবিন্দস্যার হরিশবাবুরা আমাকে কোনো চান্সই দেবে না।

সারা মাঠটাকে সাজানো হচ্ছে। একপাশে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সকাল থেকেই আয়োজন চলছে। লাইন মার্কিং করা হচ্ছে চুন দিয়ে।গোলপোস্টে নেট টাঙ্গানো হয়েছে। ঘোষ পাড়ার ব্যান্ড পার্টিও আসবে। আর প্রাইজগুলোও আনা হয়েছে। রুপোর কাপ হবে বেস্টম্যান প্রাইজ।

একাই ফিরছে ফটিক। বৈকালে আজ ছোট শহর জেগে উঠবে। দুপুরের বাসেই জেলা সদরের টিম, কর্মকর্তারা এসে পড়বে। হরিশবাবুর বিরাট বাড়ির এক দিকের কয়েকটি ঘরে ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও চলছে। পাঁঠার মাংস, সন্দেশ এসবের ত্রুটি নেই। প্লেয়ারদেরও খাওয়ানো হবে। এর আনন্দ অনুষ্ঠানে ফটিকের কোনো ঠাঁই নেই।

আনমনে আসছে, হঠাৎ পাশেই দেখা যায় সিরিনকে। সিরিন বলে-খুব কষ্ট হচ্ছে, না? খেলতে পারবে না।

ফটিক ধরা গলায় বলে-কাউকে এই কষ্টের কথা বলিনি সিরিন। আমাকে ওই হরিশবাবুই জোর করে বসিয়ে দিল, ওর ছেলেকে বেস্টম্যান করার জন্য। ও আমাদের কেন, বহু লোকের এমনি সর্বনাশ করেছে। সৎ লোকেদের নানা লোভ দেখিয়ে অসৎ করে তুলেছে। আমারও সর্বনাশ করেছে ও। আমিই বেস্টম্যান হতাম আজ। কিন্তু-আমরা গরিব।

ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

নিস্তব্ধ পথ। বকুল গাছের ছায়া নেমেছে। সিরিন এর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। মাথায় ছোট শুঁড় দুটো নড়ছে।

বলে সে,-তুমি কিট ব্যাগ, জুতো নিয়ে তৈরি হয়ে মাঠে এসো ফটিক।

ফটিক অবাক হয় সে কি? টিমে তো নাম দেয়নি।

হাসে সিরিন-না দিক্। আমি বলছি তুমি খেলবে। দেখে নিও।

ওর দিকে চেয়ে থাকে ফটিক।

কারা আসছে এদিকে। সিরিন এ বিষয়ে খুবই সাবধানী। ওর শুঁড় দুটো খুবই সজাগ। নিমেষের মধ্যে আর তাকে দেখা যায় না।

বৈকালে মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।

ফটিকও গেছে দর্শকের মতই। তবু ব্যাগটা নিতে ভোলেনি, ওদিকে মাঠে টিম নেমেছে। বসন্তের পায়ে দামি বুট, হরিশবাবু অতিথিদের, কর্মকর্তাদের নিয়ে বসেছে সামিয়ানার নীচে। ওদিকে জেলা স্কুলও নেমেছে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গোবিন্দবাবু ঘোরাফেরা করছে, প্লেয়ারদের কি বলছে।

গজেনবাবুও খেলার খবর পেয়ে ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে সদর থেকে। কিন্তু টিমে ফটিককে না দেখে অবাক হয়। বলে সে-এ কি করেছ গোবিন্দ? স্ট্রাইকারই রাখোনি দলে? ফটিককে বসালে?

কর্মব্যস্ত গোবিন্দস্যার জানত গজেনবাবু দু'দিনের জন্য এসে ঝগড়া বাধাবেন, সে খুশি হয়নি ওর কথায়। বলে-ট্রায়ালে বসন্তকেই চাইলেন সবাই।

-সে কি! ওর মত প্লেয়ার বা আছে কে? গজেনবাবু বলে।

গোবিন্দস্যার বলে-আমাকে এ নিয়ে কিছু বলবেন না। দেখবেন বসন্ত ইজ দি বেস্ট সিলেকসান।

খেলা শুরু হয়েছে। ভূতনাথ ব্যাক, ওদিকে ফরোয়ার্ড লাইনে রবি, উৎপল গণেশ রমাপতি আর বসন্ত তাদের মধ্যমণি।

জেলা স্কুল টিমও কড়া। তবু ওর মধ্যে ভূতনাথ একটা বল থ্রু করেছে রবিকে, রবি বসন্তকে দিয়েছে, ফাঁকা সামনে। চিৎকার করে ওঠে গোবিন্দস্যার। কিন্তু বসন্ত পজিশন নিতে নিতে ততক্ষণে ওদের ব্যাক নিশ্চিত গোলের বলটাকে অনায়াসে ক্লিয়ার করে দিয়েছে।

ওদিকে জেলা স্কুলই চেপে ধরেছে তাদের। ওদের ডিফেন্সও দারুণ বল জোগাচ্ছে। তাদের আক্রমণ শুরু হয়েছে এবার এদের গোলে। ভূতনাথ, বিমল আর দু'তিনজন হিমশিম খেয়ে যায়।

তার মধ্যেই জেলা স্কুল একটা গোল দিয়েছে। ভূতনাথও মরিয়া, আবার বল পেয়েছে-এদের ফরোয়ার্ড রবি, গোলের কাছেই রবি শট নেবার আগেই চিৎকার করছে গোবিন্দস্যার-বসন্তকে দে! অ্যাই।

রবিও ঘাবড়ে গেছে। ফাঁকা গোল, বসন্ত ছুটে এসে বলটাকে গোলের দিকে না মেরে সোজা আউট-এ পাঠিয়ে দিল উত্তেজনার বশে।

আবার জেলা স্কুল চেপে ধরেছে।

এদের ডিফেন্স তবু প্রাণপণে খেলছে। আবার বল পেয়েছে এদের ফরোয়ার্ড। ভূতনাথ, বিমল এর মধ্যেও আক্রমণের বল জোগাচ্ছে, জানে গোল দিতে পারলে জেলা স্কুল দমে যাবে।

এদের ফরোয়ার্ড লাইন আজ ফটিকের অভাবে কানা হয়ে গেছে।

আবার ফাঁকা গোল, আবার বসন্ত মারার আগেই ওদের ব্যাট বল ছিনিয়ে নেয়। তিন তিনটে নিশ্চিত সুযোগ হারালো এদের স্কুল, ওদিকে জেলা স্কুল এর মধ্যেই দুগোলে জিতছে। সারা মাঠে এবার চাপা প্রতিবাদ ওঠে দর্শকদের মধ্যে-বসন্তকে বসিয়ে দাও।

হরিশবাবু এদিকে ওদিকে চাইছে। গোবিন্দস্যারও খুঁজছে সেই দর্শকদের। ওদিকে কারা চিৎকার করে বলে বসন্তকে-বসে পড়

বসন্ত। বাড়ি যা বাপ্।

বসন্তও এবার ঘাবড়ে গেছে। সেও বুঝেছে তিনটে গোল দিতে পারলে তাদের স্কুলই জিতত। আর এই পরাজয়ের জন্য সেইই দায়ী।

এবার বসন্ত বল পেয়েছে আবার, কিন্তু দৌড়বার আগেই কার প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল মুখ থুবড়ে, ডানপায়ের হাঁটুতেও চোট লেগেছে। ওঠার সাধ্য নেই। বল অবশ্য জেলা স্কুলের ব্যাক আগেই ক্লিয়ার করে দিয়েছে, আর সেই বলটাকে এনে ওদের লেফট উইঙ্গার সোজা গোলে শট করতে কে হেড দিয়ে গোলও করেছে।

হাফটাইমের বাঁশি বেজে যায়। হাফটাইমের আগেই তিনগোল খেয়েছে এদের টিম। ওদিকে বসন্তকে মাঠের বাইরে নিয়ে গেছে।

দর্শকরা চিৎকার করে-ওকে বসিয়ে দে। সন্তোষবাবু, গজেনবাবুরা দেখেছে গোবিন্দবাবু জোর করেই বসন্তকে নামিয়ে এই বিপর্যয় এনেছে।

হরিশবাবু সম্মানিত দর্শকের আসনে চুপ করে বসে আছে।

ওদিকে নির্বাচকমণ্ডলীও নির্বাক। খেলার মোড় এভাবে ঘুরে যাবে তা ভাবেনি হরিশ। ওর টাকা প্রতিপত্তি দিয়ে সবকিছু করা যাবে না এটা বুঝেছে।

মাঠের মধ্যে ভূতনাথ অন্য প্লেয়াররা বলে গজেনবাবুকে-গোবিন্দস্যারই এসব করলেন স্যার। আমরা এতগুলো ওপেন নেট মিস করেছি বসন্তর জন্য। দুটো গোল আগে দিতে পারলে ওদের মর্যাল থাকত না। খেলা অন্যরকম হত।

গোবিন্দবাবু চুপ করে গেছে।

গজেনবাবু বলে-ফটিককেই নামাও গোবিন্দ।

গোবিন্দবাবু ইতিউতি করে-আর কি হবে? বসন্তও চোট পেয়েছে। ভাবছি নিতুকে নামাই।

গজেনবাবু বলে-না, ফটিককেই দ্যাখো।

ফটিক মাঠের একদিকে বসেছিল। ও দেখছে বসন্ত দলের কি সর্বনাশ করেছে। তিনটে গোল শোধ করে জিততে পারা আজ যাবে না। সামনেই গাছের ওখানে সিরিনকে দেখে চাইল।

ওদিকে ভিড় নেই। ফটিককে বলে সে-এবার তৈরি হও। খেলতে হবে। পথ করে দিয়েছি বসন্তকে চোট করে।

-সে কি! অবাক হয় ফটিক। বলে-তাহলে বসন্তকে তুমিই ধাক্কা মেরেছিলে।

সিরিন বলে-একটু ছুঁয়ে গেছি মাত্র। এবার নামো।

ফটিক বলে-নেমে কি হবে? জেতা যাবে না। জেলা স্কুলকে চারটে গোল দেওয়াও যাবে না।

সিরিন হাসল।

হঠাৎ মতিলালকে দেখে চাইল। সিরিনও মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। মতিলাল বলে-তুই এখানে? শিগগির চল। নামতে হবে তোকে।

সিরিনের কথাগুলো ফলে যাচ্ছে।

তবু ফটিক সন্তোষবাবুকে বলে-আর কি করব স্যার নেমে?

ভূতনাথ বলে-তবু চাপ রাখলে আমাদের গোল দিতে পারবে না ওরা। না হলে ডজন পুরিয়ে দেবে।

মাঠে নেমেছে এবার ফটিকই।

হরিশবাবুর মুখটা বোদা হয়ে যায়। গোবিন্দবাবু তবু কানে কানে বলে, আর ওর করার কিছু নেই স্যার। নেহাৎ বসন্ত 'উনডেড' হয়ে গেল, ওরা সবাই বললে, না নামালে কথা হত। তাই নামালাম।

ফটিক পরমুহূর্তে বল পেয়েছে।

সামনে রবি, রবিকে বল ঠেলে ও গিয়ে পজিশন নেবার সঙ্গে সঙ্গে বলটা তার কাছেই এসেছে, সেই রানিং বলেই কিক্ করতে সোজা গোল।

সারা মাঠ আনন্দে ফেটে পড়ে।

আবার খেলা শুরু হয়েছে। এবার জেলা স্কুল তৈরি হবার আগেই ফটিক বল নিয়ে দৌড়চ্ছে, ওদিকে কানুকে ঠেলে দিয়েছে। উইঙ্গার কানুও উঁচু করে সেন্টার করতেই ফটিকের মনে হয় কে যেন তার শরীরটাকে এক ধাক্কায় আশমানে তুলে দিয়েছে আর সেই অবস্থাতেই বলটা তার মাথায় লেগে গোত্তা খেয়ে সেকেন্ড বারে ঢুকে গেছে।

আবার আকাশ ফাটানো চিৎকার ওঠে-গো-ও-ও-ল।

দু'গোল শোধ করে দিয়েছে ফটিকের দল হাফটাইমের দশ মিনিটের মধ্যে। এবার খেলার মোড় ঘুরেছে। জেলা স্কুলও বুঝেছে ফটিক, ওই লম্বা মাঝারি গড়নের ছেলেটাকে ছাড়া যাবে না। তিন চারজন ওকে গার্ড দিয়ে রাখছে। আর এগোতে পারছে না ফটিক।

এবার বলটা পেয়ে ফটিক মাঠের বাঁ দিকে গেছে। তাকে ঘিরে রেখেছে চারটে প্লেয়ার, ফটিকও তাক বুঝে ফাঁকায় ফাঁকায় দাঁড়ানো রবিকে বল দিতে রবিও গোলেই মেরেছে।

তিন গোল এরাও দিয়েছে। মাঠে হৈ চৈ কলরব চলছে। অতিথিরাও মুগ্ধ হয়ে খেলা দেখছে। একটিমাত্র প্লেয়ার মাঠে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

জেলা স্কুল দলও মরিয়া হয়ে খেলছে। বল, আর আসতে দিচ্ছে না। এদিকে ভূতনাথ বিমলও আটকে রেখেছে ওদের। আর ফটিককে ওরা চারজন পাহারায় রেখেছে।

খেলা শেষ হতে আর মিনিট তিনেক বাকি তখনও ড্র চলেছে।

জেলা স্কুল কিছুতেই বল গলাতে দেবে না। খেলা অমীমাংসিত থেকে যাবে, উভয়ে যুগ্ম বিজয়ী হবে হয়তো।

ফটিক বলটা পেয়েছে, হঠাৎ তার সামনেই দেখা যায় জেলা স্কুলের ব্যাক দৌড়ে আসছে, ওকে কাটাতে পারলে ফাঁকা গোল। হঠাৎ মনে হয় ব্যাক এর প্লেয়ারটাকে কে যেন পায়ে পায়ে আটকে দিতে সে ছিটকে পড়ে, পথ পরিষ্কার। ফটিক তীর বেগে বলসমেত গোলে ঢুকে পড়েছে।

-গো-ও-ও-ল।

সারা মাঠে উৎসাহী দর্শকরা নেমে পড়েছে। ফটিকের টিমই জিতেছে। আর জিতেছে শুধু মাত্র ফটিকের জন্যই।

সন্তোষবাবু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে-আজ তুই মান রাখলি ফটিক।

ওকে ফিরে ধরেছে সবাই। সেই নির্বাচকমণ্ডলীও বলে হরিশবাবুকে-দারুণ একটা প্লেয়ার রেখেছেন স্কুলে। ওকেই ন্যাশনাল টিমে চান্স দেব। আগে নামলে খেলা অন্যরকম হত।

হরিশবাবু হাসবার চেষ্টা করে বলে-একটু বাজিয়ে নেবার জন্যই ওকে শেষে নামলাম। কি হে গোবিন্দ?

গোবিন্দস্যারও সায় দেয়-হ্যাঁ স্যার।

শিল্ড জিতেছে এদের স্কুল এবারও। পরপর তিনবার জিতল ওরা। বেস্টম্যান প্রাইজ রুপোর কাপটা পেয়েছে ফটিকই।

আর সকলেই খুশি হয়েছে ওই ন্যাশনাল টিম কর্তিৃপক্ষের ঘোষণায়। ফটিক ঘোষই এবার জাতীয় টিমের হয়ে দিল্লীতে খেলতে যাচ্ছে।

হাততালি-চিৎকার করে ওরা ফটিককে সম্বর্ধিত করতে চায়।

ফিরছে ফটিক বাড়ির দিকে। ছোট্ট শহরে আজ সে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। হারানো প্রতিষ্ঠা ফিরে পাচ্ছে।

হঠাৎ নির্জন পথের মাঝে সিরিনকে পাশে দেখে চাইল। হাসছে সিরিন। বলে সে-কি বলেছিলাম ফটিক? খেললে-জিতলে তো বন্ধু৷

চাইল ফটিক। বন্ধুই সে! ফটিক বেশ বুঝেছে শেষের গোলটা সে দিতেই পারত না হঠাৎ ব্যাককে মনে হয় সিরিনই ওই রামধাক্কা দিয়েছিল। না হলে পথ পেত না ফটিক।

ফটিক বলে,-ওদের ব্যাককে ওভাবে ঠেলে দিলে কেন?

সিরিন বলে-না হলে গোল করতেই দিত না। তাই-

হাসছে সিরিন। ওর শুঁড় দুটো নড়ছে। চোখে নীলাভ দীপ্তি। দুজনে পরম বন্ধুর মত ফিরছে।

সিরিন বলে-হরিশবাবু কিন্তু খুব রেগে আছে তোমার ওপর। আবার কিছু করতে পারে।

ফটিক বলে-তোমার মত বন্ধু থাকতে ও আমার কিছু করতে পারবে না।

সিরিন কি ভাবছে।

হরিশবাবুর কাছে ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় বলেই বোধহয়। বসন্তও বুঝতে পারেনি কে যেন হাওয়ার মধ্যে তাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলেছিল। আবার শেষ গোলের সময়ও ওদের ব্যাক হঠাৎ তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল আর সেই ফাঁকে গোল করেছে ফটিক।

গোবিন্দস্যার বলে-এ যেন মিরাক্যাল মানে রহস্যজনক ব্যাপার স্যার। ফটিকটা মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়। এ তো যেন ভৌতিক কাণ্ড। হাফটাইমে চারখানা গোল দিল ওই টাফ্ টিমকে। নৃপতিস্যারের সেই অঙ্কের রহস্যটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। ওই অঙ্কটা বোস আইনস্টাইন-এর থিয়োরির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নৃপতিস্যার বলে-আমার কাছেও ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক ঠেকছে হরিশবাবু, ওইসব উদ্ভট অঙ্ক ও ছোঁড়ার মাথায় এল কি করে?

শশী ভট্টাচার্য হরিশবাবুর বাড়ির বিগ্রহের পূজারী, এমনিতে ভূত ব্রহ্মদত্যির ওঝাগিরি করে। সাপের কামড়ের মন্ত্রতন্ত্রও জানে। শীর্ন চেহারা, বুকের হাড় ক'খানা গোনা যায়। তেমনি লম্বা, গলাটা বকের মত। কিন্তু গলার স্বর তেমনিই বাজখাঁই। যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে কথা বলছে। কপালে সিন্দুরের লাল মাডুলি। শশী ভট্টাচার্য খ্যান-খেনে গলায় বলে,-ওটাকে ভূতে পেয়েছে নাকি হে? ভূত বেহ্মদত্যি যাতেই পাক না কেন বলো তো এক সরষে পোড়া দিয়ে সারিয়ে দেবো।

হরিশবাবু ভাবছে কথাটা।

ওই ছেলেটার জন্য বসন্ত এমনি অপদস্ত হল। আর এত লোকের সামনে ছেলেটা খেলে গোল করে আজ জাতীয় দলে চান্স পেয়ে গেল। হরিশবাবু তার বাবা গদাধরের জমি-বাগান সর্বস্ব মিথ্যা দলিল করে কৌশলে লুট করেছে, কিন্তু কৌশল করে ফটিককে থামাতে পারছে না।

হরিশবাবুরও জেদ চেপে গেছে।

স্কুলের কেরানিবাবুই খবরটা দেয়, ফটিকের স্কুলের মাইনে অন্যান্য ফি প্রায় সাত মাসের বাকি। ওর বাবা গরিব, কোনোমতে দিন আনে দিন খায় অবস্থা। ছেলের স্কুলের মাইনেও বাকি পড়েছে।

এ সময় স্কুল থেকে নাম কাটাতে পারলেই ফটিকের জাতীয় স্কুল দলে খেলার অধিকারও থাকবে না।

হরিশবাবু বলে হেডমাস্টারমশাইকে-স্কুল না দানছত্র করেছেন যে সাত মাসের মাইনে বাকি থাকবে ছেলেদের? আর তারা সব সুবিধা পাবে। তিনদিনের মধ্যে সকলকে বকেয়া মাইনে শোধ করতে বলুন, না হলে নাম কেটে দেবেন। স্কুল ফান্ডে টাকা নেই-আর এই সব চলবে?

ফটিকের বাবাও চিঠিখানা পেয়েছে। বিপদে পড়ে গদাধর ঘোষ। টাকাও হাতেও নেই। ফটিকও শুনেছে কথাটা। ওদিকে ন্যাশন্যাল টিমে পাঠানো হবে স্কুল থেকে সাতদিনের মধ্যে। সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। এবার সে ফার্স্ট হবেই। কিন্তু ঠিক সময় বুঝেই হরিশবাবু, প্রেসিডেন্ট, স্কুলে এই হুকুম দিয়েছে।

তিনদিনের মধ্যে মাইনে সব মিটিয়ে না দিলে নাম কাটা যাবে। পরীক্ষা দিতে পারবে না, জাতীয় দলে খেলার অধিকারও থাকবে না।

এতদিনের সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুঃখে দু'চোখে জল নামে।

গদাধরও স্ত্রীকে বলে,-ওর আর এভাবে পড়ে লাভ কি? দত্তমশায়ের গদিতেই ঢুকিয়ে দিই ফটিককে।

অর্থাৎ ফটিকের জীবনের সব আশা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে এইবার।

মা বলে-একটা মাত্র ছেলে, তাকেও মানুষ হতে দেবে না ওই হরিশবাবু। আর কত নেবে আমাদের ওই লোকটা।

গদাধর ঘোষ বলে-একা আমাদেরই সর্বনাশ করেনি সে। বহু লোকের সর্বস্ব নিয়েছে।

ফটিকও চোখে অন্ধকার দেখছে।

কারো কাছে হাত পাতার উপায় নেই। সন্তোষবাবু, গজেনস্যারও বাইরে। এই সুযোগে তার নাম কেটে দিতে চায় স্কুল থেকে।

বাইরের ঘরে বসে আছে ফটিক। চার দিকে ভাঙা কাছারি-ওদিকে এককালে তাদের সমৃদ্ধির ধ্বংসাবশেষ। আজ কিছুই নেই।

হঠাৎ সিরিনকে দেখে চাইল ফটিক। তার দু'চোখে জল নামে। বলে ফটিক-আজ আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে সিরিন। তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। পড়াশুনা খেলাধুলা কিছুই আর হবে না টাকার অভাবে।

সিরিন হাসছে।

ওর শুঁড় দুটো নড়ছে। দুচোখে নীলাভ জ্যোতি। সিরিন বলে-তোমাদের কিছু সঞ্চয় এখনও আছে। চাইল ফটিক। সিরিন বলে-তোমারা জান না আমি জানি। সব খবর পাই। একটা শাবল আনো দেখাচ্ছি।

ফটিক ঠিক বুঝতে পারে না।

ওদের কাছারি বাড়ির ওদিকে এখন আগাছার বন। বুনো মানকচু, ওল এর গাছ গজিয়েছে। সিরিন-এর মাথার শুঁড় দুটো নড়ছে। যেন মাটির নীচের দিকে কিসের সন্ধান করছে।

বলে-খোঁড়ো এখানে।

বনের মধ্যে একটা বড় ওলগাছের পাশে খুড়তে থাকে ফটিক। একটা ওল ও তুলেছে। এই মানকচু ওল তাদের এখন প্রধান সব্জি, আর একটু খুঁড়তে শাবলটাকে কিসে লেগে ভারী শব্দ হয়। বুক কাঁপছে ফটিকের।

সিরিন হাসছে। দেখা যায় একটা ঘটির মত। মুখ বন্ধ ঘটিটাকে দুরু দুরু বুকে তুলেছে ফটিক। উপরে মাটির আস্তর। মুখটা খুলতে দেখা যায় তাতে একঘটি রুপোর টাকা, সেকালে কেউ পুঁতে রেখেছিল।

সিরিন বলে-ভয় কী, নিয়ে চলো, ও টাকার মালিক তুমিই। এ সব জানতে না, আমি বলছি। ওসব তোমার।

ফটিক সিরিনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে-তুমি আমাদের বাঁচালে সিরিন।

সিরিন বলে-সেকি, বন্ধুকে ভালোবাসা তার জন্য বন্ধুর কোনো কর্তব্য নেই? আমি তো কিছু দিতে পারিনি। খবর দিয়েছি মাত্র।

ফটিকের মা সুধাময়ী ওল আর পুরোনো ঘটিটাকে দেখে অবাক হয়। তাদের পূর্ব পুরুষরা বড়লোকই ছিল, কাছারির ওখানে এমন কিছু টাকা থাকা অসম্ভব নয়। ওই রুপোর টাকাগুলোর তবু অনেক দাম এখন।

গদাধর ঘোষও অবাক হয়। তবু কিছুদিন তারা নিশ্চিন্তে থাকবে এই টাকাটা পেয়ে।

হরিশবাবু খবরটা রাখছে।

নোটিশের দু'দিন পার হয়ে গেছে। তখনও ফটিক মাইনে জমা দিতে পারেনি। আজ শেষ দিন। বেলা তিনটের মধ্যে টাকা দিতে

না পারলে নাম কাটা যাবে। হরিশবাবু আজ নিজে স্কুলে এসেছে।

বেলা আড়াইটা নাগাদ ফটিককে অফিসে ঢুকতে দেখে চাইল হরিশবাবু। ও বোধহয় সময় চাইতে এসেছে।

হরিশবাবু বলে-আজই মাইনে না দিলে সবকটার নাম কেটে দেবেন কেরানীবাবু। না হলে আমি স্টেপ নেব।

স্বয়ং প্রেসিডেন্টের হুকুম। কিন্তু ফটিক কোনো কথা না বলে টাকাটা বের করে বলে কেরানীবাবুকে-আমার মাইনেটা নিন। বিরাশি টাকা আছে।

ফটিকের কথায় হরিশবাবু চাইল।

টাকাটা বের করছে সে। ও যেন হরিশবাবুর গালেই প্রকাশ্যে আজ চড় মারছে। হরিশবাবু বের হয়ে গেল।

তবু সন্দেহ হয় তার! এত টাকা ওদের কাছে অনেক, কোথায় পেল ফটিক? এটা জানতে হবে। আর যদু স্বর্ণকারই খবরটা আনে।

কিছু পুরানো আমলের রুপোর টাকার কথা বলেছিল হরিশবাবু। যদু আজ গোটা দশ সেই আমলের টাকা এনেছে। সবুজ শেওলার আভা রয়েছে তখনও।

হরিশ টাকাগুলো নিয়ে বলে-কোথায় পেলে হে এ জিনিস?

যদু স্বর্ণকার বলে-আজ্ঞে গদাধর ঘোষ বিক্রি করে গেল। বহু পুরোনো আমলের গেঁড়ি টাকা। খাঁটি মাল।

চমকে ওঠে হরিশ! তখন আর কথা বাড়াল না।

যদু চলে যেতে ভাবছে সে, গদাধর তাহলে গুপ্তধনটন পেয়েছে। আর সে বিষয়ে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। তাহলে সেসব যেভাবে হোক কেড়ে নিতে হবে।

তার জন্য নীরু সর্দার মজুত আছে। সে বলে-আমি ওখানে দেখছি খুঁজে পেতে। গুপ্তধন মানে মাটির নীচে থাকবে তো। খুঁড়ে তুলতে হবে। আমি খবর লাগাচ্ছি।

নীরু সর্দারও এবার টাকার গন্ধ পেয়ে খেপে উঠেছে।

হরিশবাবুর বাড়িতে ওর বাবর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। এই দিনটিতে সারা মহল্লার লোককে সে খাওয়ায়। এলাহি ব্যাপার। দই তিনরকম মিষ্টি, রাজভোগ, সন্দেশ, কমলাভোগ, ছানাবড়া বানানো হয় সেরা কারিগর দিয়ে। আর হাজারখানেক লোককে খাওয়ায়।

তার আয়োজন চলছে। হরিশবাবুর সুনাম নির্ভর করে এর উপরেই। শহরে হাকিম, মুনসেফ, পুলিশসাহেব দারোগাবাবুও আসেন-শহরের নামি উকিলরাও। বিরাট ভোজই হয়। এত কিছু সত্ত্বেও হরিশবাবুর মনে কাঁটার মতন বিঁধছে ওই গদাধর আর ফটিকের ব্যাপারটা।

ফটিকের নাম জাতীয় টিমে গেছে। আটকাতে পারেনি হরিশবাবু। আর পড়াশুনাতে, এবার সেই ফার্স্ট হবে। কারণ এর মধ্যে শহরের বেশ কিছু মহলে গুঞ্জন উঠেছে, হরিশবাবুই কৌশলে ফটিককে খেলতে দেয়নি, সেকেন্ড করিয়েছে অঙ্কে। অথচ যে অঙ্কে কেউ কষতে পারেনি বোর্ডে তাই কষেছে ফটিক। আর যে অঙ্কটি কষতে বলেছিল নৃপতিস্যারকে সেটা আজ অবধি কষতে পারেনি স্যার। সন্তোষবাবুর দলও এবার নজর রাখছে।

হরিশবাবু মান সম্মান যেতে বসেছে। তবু নীরু সর্দার যদি খবর আনতে পারে গুপ্তধনের তাহলে হরিশবাবু ডাকাতির চার্জে ফেলে এবার গদাধর আর ফটিককে জেলে পাঠাবে।

নীরু সর্দারকে তাড়া দেয় হরিশবাবু।

-কিছু খবর বের কর।

নীরু সর্দার সেদিন সন্ধ্যার পরই এসেছে ফটিকদের বাড়িতে।

এখানে ওখান ঘুরছে সে, আবছা অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে। সে কাছারির ওদিকের বনেও ঢুকে এখান ওখানে দেখছে কোথাও গর্ত খোঁড়ার চিহ্ন আছে কিনা।

নীরু সর্দার সেই জায়গাটার দিকে চলেছে, কিন্তু ততদূর যাবার আগেই হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলকে দাঁড়াল, আলোটার তেজ বাড়ছে, উজ্জ্বল নীলাভ আলোটা যেন তীক্ষ্ণ বল্লমের ফলার মত ঢুকছে তার দেহে, সারা দেহে অসম্ভব জ্বালা, চোখ যেন অন্ধ হয়ে আসছে, দুঃসহ জ্বালায় একবার আর্তনাদ করে প্রাণভয়ে নীরু সর্দার লাফ দিয়ে দৌড়তে থাকে।

-বাঁচাও বাঁচাও!

জ্বলে যাচ্ছে সারা দেহ। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দৌড়চ্ছে সে ভয়ে। ফটিক ওদিকের ঘরে পড়ছিল। সে বের হয়ে আসে।

লোকটা তখন বুকফাটানো আর্তনাদ করে দৌড়ে বের হয়ে গেছে।

চাইল ফটিক। সিরিন হাসছে মিটি মিটি করে। ফটিক শুধোয়-কি ব্যাপার বন্ধু?

সিরিন বলে-একটা শয়তান এসেছিল গুপ্তধনের খোঁজে। হরিশবাবুর চর।

অবাক হয় ফটিক-সে কি!

সিরিন বলে-একটু ওষুধ দিয়েছি মাত্র। আর আসবে না। ভয় নেই।

ফটিক বলে-তোমার জন্যই ভয় পাই না বন্ধু। না হলে ওই হরিশবাবু তো শেষই করে দিত। এতদিন বাইরে যা করার করেছে, এবার বাড়ি চড়াও হয়েছে কিনা। তাই ভয় হয়।

সিরিনের চোখ দুটো জ্বলছে। বলে সে-ও নিয়ে তুমি ভেব না বন্ধু।

সুধাময়ীও চীৎকারটা শুনেছে, সে বের হয়ে আসে ঘর থেকে।

ওদিকে ফটিককে কার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে সে। মা শুধোয়-কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে?

ফটিক চাইল, সিরিন হাওয়ায় মিশে গেছে।

ফটিক নিশ্চিন্ত হয়ে বলে-কই না তো।

কার চিৎকার শুনলাম-তাই বের হয়ে এসেছি।

সুধাময়ী তখনও বাতাসে যেন কাতর আর্তনাদটা শুনছে।

বলে সে,-কে জানে কার! চ, ভেতরে চ।

হরিশবাবুর বৈঠকখানায় তখন আগামী ভোজের ব্যাপারে ফর্দ হচ্ছে।সকলেই রয়েছে। এবার হরিশবাবু এখানে সদর থেকে ফ্রিজ

আনিয়ে আইসক্রিম সন্দেশ খাওয়াবে। বরফের মত ঠাণ্ডা ক্ষীর কিসমিস, পেস্তা জমানো সন্দেশ, ইতিপূর্বে এখানে কেউ খায়নি।

হরিশবাবু বলে-খরচ পড়বে।

হেড স্যার বলে-কিন্তু নতুন একটা জিনিস হবে।

এমন সময় আর্তনাদ করে এসে ছিটকে পড়ে নীরু সর্দার। চোখ দুটো আতঙ্কে ঠেলে বের হয়ে আসছে।গাঙাচ্ছে জ্ঞান নেই। সারা শরীরে কালচে দাগ। পরনের জামাটাও কালচে হয়ে পুড়ে গেছে।

হরিশবাবু, আর সকলেই অবাক হয়।

মুখে চোখে জল দিতে জ্ঞান ফেরে, বৃন্দাবন ডাক্তারকেও ডাকা হয়েছে।

রাত্রি নেমেছে। ওদিকের একটা ঘরে পড়ে পড়ে আর্তনাদ করছে নীরু সর্দার। দেখে আর চেনা যায় না। বৃন্দাবন ডাক্তারও অবাক হয়। শুধোয় সে-কি হয়েছিল নীরু?

নীরু এর মধ্যে একটা চোখে দেখতেই পাচ্ছে না। ডান দিকটাই যেন পুরো ঝলসে গেছে। নীরু বলে-আলো। জোর আলোর আভা যেন জ্বালিয়ে দিল ডাক্তারবাবু, উঃ-বাঁচান। আলোটা আসবে আবার। পুড়িয়ে দেবে।

বৃন্দাবন ডাক্তারও কিছু হদিশ করতে পারে না।

-এমন বিচিত্র কেস্ আমি দেখিনি। একটা দিক যেন ঝলসে গেছে। অথচ আগুনেও পোড়েনি। ওষুধ দিচ্ছি, খেতে আর লাগাতে থাকুক। তবে একটা চোখ বেচারার নষ্ট হয়ে গেল বোধ হয়।

হরিশবাবু ঘাবড়ে গেছে। নীরু তাকে বলে সব ব্যাপারটাই। কোথায় যেন একটা অদ্ভুত কি ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে ওই গদাধর ঘোষ, এর বাড়িতে। ফটিকও কেমন এক নতুন এক সত্তায় পরিণত হয়েছে। আর নীরুর মত সহচরকে এমনিভাবে আঘাত দেওয়ায় হরিশও দমে গেছে।

শশী ভট্টাচার্য তবু সাহস দেয়-ও সব অপদেবতার ব্যাপারে। কোনো গুণিনকে দিয়ে পিশাচ সিদ্ধ করিয়েছে। ও আমি এক দিনে ঠাণ্ডা করে দেব। আপনার বাড়ির কাজটা চুকে যাক, তারপর এই অমাবস্যাতেই ওই ভূতের দফা রফা করে দেব।

হরিশেরও এখন সময় নেই। সামনে কাজ।

বিরাট আয়োজন করেছে এবার হরিশবাবু। সামনের মাঠ জুড়ে বিশাল সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। ওদিকে বিশজন কারিগর রসগোল্লা, ছানাবড়া, কমলাভোগ বানাচ্ছে।

কাল সকাল থেকেই ভোজ শুরু হবে।

সারা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আমন্ত্রিত।

সারা শহরে খবর রটে গেছে বরফ সন্দেশও খাওয়ানো হবে। তার জন্য ট্রাকে করে বহু খরচ করে বরফের বাক্স আনানো হয়েছে।

গদাধর ঘোষের বাড়িতেও নেমন্তন্ন করে গেছে। হাজার হোক একটা সম্পর্ক তো আছে।

ফটিক বলে-যাব না বাবা!

গদাধর ঘোষ বলে-নারে। না গেলে কথা হবে। চল।

তাই সে এসেছে বাবার সঙ্গে।

ওদিকের সামিয়ানার নীচে ঝকঝকে সানমাইকার টেবিল চেয়ার পাতা, সকলেই বসেছে সেখানে গদাধরও ফটিককে নিয়ে বসেছে।

পাতা পড়েছে। হরিশবাবু বসন্ত ম্যানেজারবাবু তদারক করছে। হঠাৎ হরিশবাবু গদাধর আর ফটিককে এখানে দেখে এগিয়ে এসে কর্কশস্বরে বলে-কে এখানে বসতে বলেছে তোমাদের?

বসন্ত গর্জে ওঠে,-এটা স্পেশাল গেস্টদের জন্য। উকিল, দারোগাবাবু, পুলিশসাহেব হাকিমদের মধ্যে বসতে লজ্জা করে না? এত বড় সাহস?

গদাধর, ফটিক সবে লুচি একখানা ভেঙে মুখে পুরেছে।

হরিশবাবু বলে-উঠে যাও ওখান থেকে, ওই যে মাটিতে বসেছে ওখানে যাও। ওঠো-

ফটিক চাইল,কে একজন এসে গদাধরের হাতটা ধরে টেনে তুলছে, অন্যজন ধরেছে ফটিককে। গর্জায় হরিশবাবু-যাও, কাঙ্গালীর মত পোশাক পরে এখানে এসে বসেছ? আস্তাকুঁড়ের কুকুরের সমাজে ওঠার সখ!

ফটিক বলে-চলো বাবা।

সকলেই দেখছে ওদের এই অপমান। গদাধরের চোখ ফেটে জল আসে। বলে সে-ভিখারী আমি নই হরিশ। আমারই সব নিয়ে আজ তুমি বড়লোক, ঠকিয়ে নিয়েছ সব। তবু এসেছিলাম।

ফটিক বলে-চলো বাবা।

বাবাকে টেনে আনে সে।

আর ওখানে দাঁড়ায়নি। ওই সমারোহ, বিরাট উৎসব এর প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসছে ওরা। গদাধর কান্নাভেজা স্বরে বলে-ডেকে নিয়ে গিয়ে এইভাবে অপমান করবে তা ভাবিনি রে। তুই ঠিকই বলেছিলি, আমিই শুনিনি তোর কথা। যদি পারিস এই অপমানের জবাব দিবি।

সুধাময়ীর চোখেও জল নামে। তার স্বামী, ছেলেকে এভাবে অপমান করবে হরিশবাবু তা ভাবেনি সে। ফটিক বাড়ি ফিরে গুম হয়ে বসে আছে। হঠাৎ সিরিনকে দেখে চাইল।

হাসছে সিরিন। বলে সে-একটু কাজে গেছিলাম এর মধ্যে এই সব ঘটে গেল বন্ধু!

ফটিকের চোখে জল। বলে সে-আমাকে যা করে করুক, এত লোকের সামনে বাবাকে এভাবে অপমান করল।

সিরিন ঘাড় নাড়ছে।

ফটিক বলে।-অনেক রকম মিষ্টি করেছিল। ভাবলাম তোমার জন্যও আনব।

হাসে সিরিন। বলে-ওর অভাব হবে না। আর হরিশও একটু বুঝবে এবার।

ফটিক চমকে ওঠে। নীরু সর্দার দেখেছে কাল। আধমরা হয়ে গেছে। আর সিরিনই করেছে। তবু সিরিন বলে-কিছুই করিনি।

আমাদের দেহের জেনারেটিং সেট এ যা রশ্মি বের হবে তা জাগতিক আলোর চেয়েও বহুগুণে তীব্র। কসমিক রে! ওই রশ্মিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ওকে তো কিছুই করিনি।

আজ আবার সিরিনকে ওকথা বলতে দেখে ফটিক।

-আবার কি করবে?

হাসে সিরিন-তেমন কিছুই না।

বিরাট প্যান্ডেলের নীচে খাওয়া দাওয়া চলছে। হরিশ, বসন্ত বীরদর্পে ঘুরছে। লুচি পোলাও ছানার ডালনার পর শুরু হবে আসল পর্ব।দই রাবড়ি, রাজভোগ, কমলাভোগ, সন্দেশ তারপর সেই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ আইসক্রীম সন্দেশ।

হঠাৎ কলরব ওঠে-রসুইখানার কাছে বড় বড় ডেকে রাজভোগ নামানো হয়েছে, এবার পরিবেশন শুরু হবে। চোখের নিমেষে চার ডেক রাজভোগ আর দেখা যায় না। যেন উবে গেছে।

হরিশবাবু চিৎকার করে-ওই ব্যাটাদেরই কাণ্ড, পুরো রাজভোগের স্টক সব সরিয়েছে। ওদের বেঁধে রেখে ছানাবড়া আন-

রাজ ভোগ শেষ। হরিশবাবু গর্জন করে।

রাজভোগ পড়েছে দু লাইনে, তারপরই ছানাবড়ার দুটো ডেকও শেষ, ওদিকে ভাঁড়ার থেকে সন্দেশ-এর কোনো পাত্তাই নেই। হাওয়ায় যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। হরিশবাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেছে। গর্জাচ্ছে সে।

-বন্দুক লাও। গুলি করে ওই চোর রসুইকর ব্যাটাদের উড়িয়ে দেব। এভাবে বিপদে ফেল্বে? ম্যানেজার, আইসক্রিম সন্দেশই লাগাও, যে যত চায় দিতে বলো।

আইসক্রীমওয়ালা এবার চিৎকার করে-ক্যারেন্ট নাই-আর তার সব সন্দেশ গলে জল।

ক্ষীর, কিসমিস, পেস্তা গলে বের হচ্ছে। সবকিছু মাঠময় গড়িয়ে চলেছে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আকর্ষণও এবার নিকৃষ্ট ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এত অতিথিরা অভুক্ত প্রায়ই রয়ে গেছে। তারা রাজভোগ থেকে প্রকৃত খাওয়া শুরু করত,লুচি, ডাল, ছানার ডালনা কে খাবে। ফলে পেটও ভরেনি তাদের, এদিকে স্টকও বিলকুল শেষ। হৈ চৈ পড়ে যায় এতজন লোকের মধ্যে। কেউ হাঁকে-কই হে রাজভোগ, সন্দেশ আনো।

কেউ বলে -আইসক্রীম কই বাপধন, হরিশের গুল নাকি রে।

হরিশের মাথায় যেন বাজ পড়েছে। তারপরই হঠাৎ প্রবল বেগে আসে ঝড়টা। ঝড় তো নয় যেন প্রচণ্ড একটা দমকা হাওয়া উঠেছে, ঘুরছে ধুলোবালি বিকট বেগে, হঠাৎ ওই বিরাট প্যান্ড্যালের বাঁশগুলো ভেঙে পড়ে। নীচে ওই প্রচণ্ড বেগে হাওয়া ঢুকে তেরপলগুলোকে বেলুনের মত ফুলিয়ে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

তারপর বাঁশগুলো ভেঙে পড়ে আর ওই শ'কয়েক নিমন্ত্রিত জন চাপা পড়তে ওই তেরপলের নীচে। ওদের খাওয়া তখন মাথায় উঠেছে। রাজভোগ, ছানাবড়া, সন্দেশের কথা ভুলে গিয়ে তখন চাপা পড়া বন্দী লোকগুলো প্রচণ্ড কলরব আর্তনাদ করছে বাঁচার জন্য। লোকজন চারিদিক থেকে ছুটে আসে। ঘূর্ণিঝরটাও থেমে গেছে। তারপর সেই তেরপলের নীচে থেকে ওরা ভোজন বিলাসীদের টেনেটুনে বের করছে। দারোগাবাবু তো ডালকুমড়ো মাখা অবস্থায় বের হয়েছে, পুলিশসাহেবের অবস্থাও তেমনি। হাকিম সাহেবকে টেনে বের করেছে, ওদিকে জগদীশ উকিল পড়েছিল ছানার ডালনার টবে, ওকে আলু মশলার মত দেখাচ্ছে।

দারোগাবাবুর টাকে তখন দই এর হাঁড়িটা টুপির মত বসে গেছে, হরিশবাবুর পায়েই পড়েছে একটা খুঁটি। ল্যাংচাচ্ছে সে।

আজ তার মান সম্মান যেন ধুলোয় মিশে গেছে। লোকজনদের তখন ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, পাড়ার ছেলেরা টেনে বের করছে।

শ্রাদ্ধই হয়ে গেছে যেন হরিশবাবুর।

সারা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। বিরাট একটা খবর!

হরিশবাবু সারা শহরের লোককে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতেও দেয়নি। উলটে পালচাপা দিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। গদাধর, সুধাময়ীও শুনেছে ব্যাপারটা।

গদাধর বলে-ভগবান আছেন।উঃ এতবড় অপমান করেছিল হরিশ, তার দর্পচূর্ণ হবে না। ফটিক ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করেছে।

তাই নিরিবিলিতে সিরিনকে শুধোয়-আবার এই সব করেছ?

সিরিন মিটিমিটি হাসে। বলে সে-সামান্য একটু করেছি।

যদি ওরা জানতে পারে?ফটিক বলে।

সিরিন বলে-জানতে পারবে না। ওই হরিশের সাজা হওয়া উচিত বদ্ধা ও বহু ক্ষতি করেছে লোকের, সারা শহরের।

অর্থাৎ আরও কিছু ঘটতে পারে এটা অনুমান করে ফটিক বলে-তাতে তোমার কি?

সিরিন বল-অন্যায় অন্যায়ই। তার কোনো দেশ কাল নাই। তার প্রতিকার করা দরকার।

হরিশ-এর কাছেও ব্যাপারটা বিচিত্র ঠেকে। থানায় রসুইকার, ঠাকুর চাকরদের ধরে নিয়ে গিয়েও রাজভোগ ছানাবড়া এত সন্দেশ চুরির কোনো কিনারাই হয়নি।

পুলিশসাহেবও দেখেছেন ব্যাপারটা। বলেন-কেমন বিচিত্র ঠেকছে। তাহলে এত মালপত্র গেল কোথায়? আর হঠাৎ ওই ঘূর্ণিঝড়ই বা এল কি করে?

দারোগাবাবু বলে-সাইক্লোন টর্নাডো এসব তো ঘটে স্যার।

হরিশবাবু কাতরস্বরে বলে-ধনে প্রাণে মারা গেলাম। এতবড় বেইজ্জত হলাম একটু তদন্ত করুন স্যার। আমারও ভয় হচ্ছে এবার। আবার অন্য কিছু কাণ্ড না ঘটে।

এই সময় নীরু সর্দারের ব্যাপারটাও একটু রেখে ঢেকে বলে হরিশ-আমার লোক নীরু সর্দার আসছিল তাগাদা থেকে রাতের বেলায়। কিভাবে তার একদিক ঝলসে দিয়েছে স্যার। বেচারার একটা চোখও গেছে। ডাক্তারও দেখে অবাক হয়েছে। তারপর আবার এই সব ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেছে।

পুলিশসাহেবও এসে নীরুকে দেখে গেছেন।

তার মুখেও শুনেছে সেই আলোর ঝলকের কথা, আবার এই ভোজবাড়ির ভোজবাজি, ওই ঘূর্ণিঝড় সব মিলে একটা রহস্যজনক ব্যাপারই চলেছে।

শশী ভট্টাচার্য হরিশবাবুর পূজারীই হয়, মোসাহেবও। সেদিন সকালে বৈঠকখানায় হরিশবাবু মুখ চুন করে বসে আছে। নৃপতিস্যার হেডমাষ্টারবাবুর, গোবিন্দবাবুরাও রয়েছে। তারাও সেদিন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিল। পাল চাপা পড়ে নৃপতিবাবুর ঠ্যাং-এ চোট লেগেছিল, এখনও খোঁড়াচ্ছে। সকলেই চিন্তিত।

কারণ নীরু সর্দারের ওই চোট হওয়ার পর আবার হরিশবাবুর বাড়িতে এমনি কেলেঙ্কারি হয়ে গেল।

শশী ভট্টাচার্য তার বাজখাঁই গলা তুলে বলে-এসব পিশাচ, ভূত প্রেতের কাণ্ড। আর এসব কাণ্ড করাচ্ছে গদাধর ঘোষই কোনো তান্ত্রিককে ধরে।

হরিশবাবু এখন এসব কিছু কিছু মানতে বাধ্য হয়েছে। গোবিন্দবাবু বলে-তা হতে পারে হরিশবাবু। এসব সম্ভব।

হরিশ ক্লান্ত স্বরে বলে-আর কি ক্ষতি করবে তাহলে কে জানে। এমনিতে শহরে মুখ দেখাতে পারছি না। জগদীশ উকিল তো সেদিন আলুর দম হয়ে বাড়ি যাবার সময় বলে গেছে-জীবনে আর আমার বাড়িতে আসবেন না। উঃ, তোমরা থাকতে এসবও সহ্য করতে হবে?

শশী ভট্টাচার্য বলে-দেখুন না, এই বুধবার ভর্তি অমাবস্যা। এবার ওই গদাধরের গুষ্টিকে মারণ বাণ ঠুকছি। আর ভূত পিশাচ যাই আনুক গণ্ডীবন্ধন এইসা দেব ব্যাটা ভূত ওখানেই দম বন্ধ হয়ে খতম হয়ে যাবে।

হরিশ বলে-তাই করো।

শশী ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে-কিন্তু ওসব তান্ত্রিক ক্রিয়ার খরচা একটু বেশি পড়ে। আর একজন চ্যালাকেও নিতে হবে। হোম যজ্ঞি করতে হবে।

হরিশবাবু বলে-তাই করো। নাও একশো টাকা, কাজ হলে আরও একশো পাবে।

শশী কবরেজ বড় নোটটা পকেটস্থ করে টিকি নেড়ে বলে, দেখুন এবার মজা।

গদাধর ঘোষ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু মনে হয় কোথায় একটা বিচিত্র কিছু ঘটছে। হটাৎ ওই এক হাঁড়ি পুরানো টাকাগুলোও যেন দৈবাৎ মিলে গেছে তাদের।

ফটিক এখন মন দিয়ে পড়ছে। এবার ভারতের জাতীয় দলেও খেলতে যাবে।

সুধাময়ী বলে-এ নিয়ে এত ভাবছ কেন? কারো তো কোনো অনিষ্ট করিনি, ঠকিয়েও নিইনি। ভগবান ঠিক বিচার করবেন। দেখো দিন বদলাবেই।

গদাধর তবু বলে-কেমন ভয় হয় ফটিকের মা, হরিশবাবুর টাকার জোর আছে ওইসব কাণ্ড হয়েছে-এবার আমাদের না জড়ায়।

সুধাময়ী বলে-আমরা এ সবার কি জানি বলো। তবে কেন জড়াবে?

গদাধর এর জবাব দিতে পারে না।

অমাবস্যার অন্ধকার নেমেছে। জমাট অন্ধকার। সারা বাড়িটা আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকের বুনো ওল কচু ভেরেণ্ডা গাছের বন গজিয়েছে উঠানে। কাছারি বাড়ির এদিকটা নির্জন। শশী ভট্টাচার্য এসেছে তার চ্যালা হরকান্তকে নিয়ে চুপিচুপি। কাছারি বাড়ির এককোণে এবার তন্ত্রমতে ভূত বধের সব আয়োজন করে এনেছে। আসন পেতে জবাফুল, আতপচাল, চ্যাং মাছ, আলতা, সিঁদুর, ঘট সব এনে তোড়জোড় করে বসেছে। আজ তার মন্ত্রের চোটে এ বাড়ির মানুষদের সর্বনাশ করে যাবে। আর ভূতকেও ঠাণ্ডা করে দেবে।

শশী ভট্টাচার্যের চোখ জ্বলছে, যজ্ঞের আগুন জ্বেলেছে। পরনে লাল ধুতি চাদর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। শশী ভট্টাচার্য হুঙ্কার ছেড়ে আগুনে সরষে ছিটোচ্ছে।

ওঁ হুং তুং ফট্!

সিরিন দেখছে ওকে। গর্জাচ্ছে শশী ভট্টাচার্য আগুনে সরষে ছুড়তে ছুড়তে।

গদাধরং ফট্, ফটিকং ফট্-

সিরিনের ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। লোকটাকে এর আগে দেখেছে সে হরিশের ওখানে। ও এসেছে ফটিকদের অগোচরে তাদেরই বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষতি করতে তার জন্যই হরিশের কাছে টাকা নিয়েছে। আর এখানে এই সব বিটলেমি করছে।

সিরিন দেখছে ওকে।

হটাৎ শশী ভট্টাচার্য চমকে ওঠে সামনে ওই বিচিত্র দর্শন একটা কি দেখে। আগুনের আভায় ঝক ঝক করছে তার দেহটা। না মানুষ, না কিছু।

একটা আর্তনাদ করে ওঠে শশী।

আর তস্য চ্যালা হরকান্ত ওই না দেখে বাবারে মারে করে দৌড়ে গিয়ে কচুবনেই পড়ে জ্ঞান হারায়। দমকা একটা ঝড় ওই আগুন জিনিসপত্রগুলো ছত্রাকার করে দেয়।

শশী ওই হাওয়ার বেগে বোঁ করে একটা পাক খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ে। কে যেন তার গলাটা ধরে তুলেছে শূন্যে।

হরিশবাবু অপেক্ষা করছে, শশী ভট্টাচার্য যজ্ঞসিদ্ধির খবর আনবে। কিন্তু কোথায় শশী। মনে মনে রেগে উঠেছে হরিশবাবু, সব ব্যাটাই জোচ্চর। এমন সময় বিকট চিৎকার শুনে চমকে ওঠে।

বৈঠকখানার চাতালে বসেছিল হরিশবাবু, ঠিক সেইখানেই শূন্য থেকে যেন বিকট আওয়াজ করে এসে ছিটকে পড়েছে শশী ভট্টাচার্য।

চোখ দুটো কি আতঙ্কে ঠেলে বের হয়ে আসছে। আছড়ে পড়ে শশী ভট্টাচার্য জ্ঞান হারিয়েছে। গলার রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে গেছে, চাদরটাও নেই।

জল টল দিয়ে হাওয়া করতে জ্ঞান ফেরে শশীর। ভীত চকিত স্বরে বলে-কোথায় রইছি?

হরিশবাবু বলে-আমার বৈঠকখানায়!

হুঁশ হয় শশী ভট্টাচার্যের।

বিড় বিড় করে সে-গদাধরের পোড়ো কাছারি বাড়িতে ছিলাম, এখানে এলাম কি করে?

ক্রমশ ব্যাপারটা মনে পড়ে শশীর।

বিবর্ণ মুখ চোখ। তখন কাঁপছে শশী ভট্টাচার্য। বলে-সাংঘাতিক কাণ্ড হরিশবাবু, বিকট একটা বস্তু। তেমনি তার চেহারা। ঝকঝক করছে। দুটো চোখ জ্বলছে। মনে হল হাওয়ার দাপটে বোঁ করে আসমানে তুলে এনে এখানে ফেলে দিয়ে গেল। ওরে বাবা। আর ওদিকে যাব না হরিশবাবু। সাংঘাতিক কিছু ব্যাপার আছে ওখানে।

হরকান্তের জ্ঞান ফেরে অনেক পর। তখন পোড়ো কাছারিবড়িতে আর কেউ নেই। হরকান্ত কোনোরকমে বন থেকে বের হয়ে সোজা দৌড়ে এসে পড়ে হরিশবাবুর এখানে। শশী ভট্টাচার্যকে দেখে অবাক হয় হরকান্ত।

বেঁচে আছ কাকা? আমি তো ভাবলাম কোথায় নে গেল তোমায় ওইটা। ওটা কি গো ভূত না বেহ্মদত্যি না অন্য কিছু?

হরিশবাবু বলে-ডাকাতের আস্তানাই করেছে। নানারকম মুখোশ পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটা সর্বনাশ করার মতলবে আছে ওরা।

শশী ভট্টাচার্য বলে-তা হতে পারে বাবু! ভূত, বেহ্মদত্যি হলে শশী ভট্টাচার্যকে যমের মত ডরাত।

ওরা নির্ঘাত ডাকাত ফাকাতই হবে।

হরিশ এবার ভাবছে কথাটা! বলে সে শশীকে-ওসব কথা বাইরে কোথাও জানাবে না। আমি এবার দেখছি।

তবু সারা শহরে এই নিয়ে নানা আলোচনা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। নীরু সর্দার এখন ঠান্ডা, হরিশবাবুর বাড়িতেও দারুন ব্যাপার ঘটেছে, শশী ভট্টাচার্যকে নাকি শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছিল কারা!

চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে নানা আলোচনা চলছে। মুষড়ে পড়েছে নৃপতিস্যার, গোবিন্দবাবুও।

সেদিন ক্লাসের পর নৃপতিস্যার ফটিককে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে-সেবার পরীক্ষার খাতায় তোর একটা নম্বর যোগ দিতে ভুল হয়ে গেছল বাবা। তাই সেকেন্ড হয়েছিলি পরে দেখলাম তুই-ই ফার্স্ট হয়েছিস। ভুলের জন্য মনে কিছু করিস না বাবা খাতায় এবার ঠিক করে দিয়েছি। তোর কাছে মানে বসন্ত? ওটা একটা গাড়োল। তুই গুড বয়, স্কুলের গৌরব রে।

ফটিক অবাক হয়। আজ তাকে নৃপতিস্যারও যেন ভয় করে।

গোবিন্দস্যার বলে খেলার পর।

-হ্যাঁ। তোকে তখন ঠিক চিনতে পারিনি রে ফটিক। তুই 'বর্ন প্লেয়ার'। স্কুলের গৌরব। ন্যাশনাল টিমে গিয়ে সেরা খেলোয়াড়

হবিরে।

গোবিন্দবাবুও আজ ফটিককে চটাতে চায় না।

এক হরিশবাবুর রাগটা বেড়েই চলেছে।

ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন পুলিশ সাহেবের বাংলোতে এসেছে হরিশবাবু। পুলিশ সাহেবের কানেও নানা কথা আসছে। এদিকে শুরু হয়েছে উগ্রপন্থীদের হামলা। কোথায় পুলিশ থানার ওপরও হামলা হয়েছে। পুলিশ এখন খুবই সজাগ।

হরিশবাবুর কথাতে পুলিশসাহেব অবাক হন-সে কি!

হরিশবাবু বলে-ওই বিরাট পোড়ো বাড়িটা এখন বনজঙ্গলে ঢাকা। লোকজনও কেউ যায় না। পিছনেই নদীর খাত, ওদিক দিয়ে ওরা যাতায়াত করতে পারে। ওখানেই আড্ডা গেড়েছে বোধহয়। আমার থেকে দু'একজনকে সন্দেহ হতে পাঠিয়েছিলাম, নীরু সর্দারের কি হাল করেছে দেখেছেন। কয়েকদিন আগে শশী ভট্টাচার্যকে তো মেরেই ফেলত ওরা।

পুলিশ সাহেব ভাবছেন কথাটা।

বলেন তিনি-তাহলে একবার সার্চ করা দরকার ওখানে।

হরিশ বলে-তা করুন স্যার। না হলে কে জানে আবার কি সর্বনাশ করবে ওরা। আর গদাধরের ছেলে ওই ফটিক, ওর সঙ্গে ওদের নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে স্যার। ও ছেলেটাকে ধরে এনে একটু চাপ দেন, দেখবেন সব বেরুবে।

পুলিশ সাহেব বলেন-তা-ও দেখব।

হরিশবাবু এবার বলে-কিন্তু আমি যে এসব খবর দিয়েছি গোপন রাখবেন স্যার। না হলে ওদের অসাধ্য কিছু নেই। কিছু করে বসবে। নিরীহ লোক স্যার।

পুলিশ সাহেব বলেন-না, না। এসব কথা কেউ জানবে না।

খুশি হয়ে বের হয়ে আসে হরিশবাবু। এবার গদাধর-ফটিককে একসঙ্গে ঠান্ডা করে দিতে পারবে।

ফটিক এসবের কিছুই জানে না। গদাধর ঘোষও বাইরের কোনো খবরে থাকে না। সকালে স্নান করে গদিতে চলে যায়।

ফটিকের সামনে পরীক্ষা, ভোরে উঠে পড়তে বসে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। গদাধরও ঘুমুচ্ছে।

হঠাৎ সারা বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ, হাতে বন্দুক, টর্চের আলোয় অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। গদাধরের ঘুম ভেঙে গেছে। সুধাময়ীও উঠে পড়েছে।

ভিত কণ্ঠে বলে সে-পুলিশ এসেছে বাড়িতে!

-সে কি! গদাধরও চমকে ওঠে।

ততক্ষনে বিরাট পুলিশ বাহিনী ওদের বাড়ি ঘর, ভাঙা বাড়ির জঙ্গল সব ঘিরে ফেলেছে। দারোগাবাবু গদাধরকে দেখে হুঙ্কার ছাড়ে-দেশের শত্রুদের এখানে ঘাঁটি গাড়তে দিয়েছেন মশাই? বোমা গোলাগুলি বন্দুক এসব কোথায় আছে।?

গদাধর আকাশ থেকে পড়ে। কাতর কণ্ঠে বলে সে-বিশ্বাস করুন, এ সবের কিছুই জানি না। এখানে ওসব কিছুই নেই।

-নেই। সব খুঁজে বের করব। ঘটিরাম দারোগা আমার নাম। বুঝলেন।

ঘটিরাম না হয় ওর নাম জালারাম হলেই ভাল মানাত।

ওদিকে ফটিককেও টেনে বের করেছে।

সুধাময়ীর চোখে জল। বলে সে-আমার ছেলে কিছুই জানে না।

ফটিককে দেখে গর্জায় দারোগাবাবু-কে কে আসে এখানে বলো?

ফটিক অবাক হয়ে জানায়-কেউ আসেনা।

-চোপ্। তুলে নে গিয়ে কচুয়া ধোলাই দিলে সব বের হবে। দারোগা গর্জন করে।

সকাল হয়ে গেছে। পুলিশ সাহেবও এসেছেন। সারা শহরের লোকও জমে গেছে। পুলিশ তখনও বনবাদাড়, ভাঙাবাড়ির এদিক ওদিক সার্চ করছে, কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। কেউ থাকে এখানে তারও চিহ্ন নেই। কোনো অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা বাঁশের লাঠিও একখানা মেলে না।

পুলিশসাহেব বলেন-কিছুই তো পাওয়া গেল না। এখানে বাইরের লোক থাকারও কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। এসব খবর ঠিক নয় বোধহয়।

দারোগাবাবু কিন্তু কড়া লোক। এর মোধ্যে হরিশবাবুর কাছে কিছু বকশিশও মিলেছে। সুতরাং বলে সে-ওই ছেলেটাকে একটু আটকে রেখে জেরা করতে চাই। স্যার। ওরা নিশ্চয়ই এখানে আসে। কোনো রকমে খবর পেয়ে ওইই তাদের সরিয়ে দিয়েছে। আমার ডেফিনিট খবর আছে স্যার।

পুলিশসাহেবও আর বিশেষ কিছু বলেন না। শুধু শোনেন।

-বেশি চাপ দেবেন না। ছেলেটা পড়াশুনায়-খেলাধুলোতে ভালো। দুচারটে কথা জিজ্ঞাসা করে তেমন কিছু না পেলে ছেড়ে দেবেন। না হলে শহরে গোলমাল হতে পারে। ওর সাপোর্টারও কম নেই।

ঘটিরাম আপাতত ধরেই নিতে যাবে ফটিককে। ফটিকের মায়ের চোখে জল।

গদাধর বলে-ও কিছু জানে না স্যার। বিশ্বাস করুন এখানে তারা কেউ আসে না।

কিন্তু ঘটিরাম নাছোড়বান্দা। বলে-ওকে নিয়ে যাব। দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেবো। চলো হে!

রাগে দুঃখে ফটিকের দুঃচোখ ফেটে জল নামে। আজ বিনাদোষেই তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল, কে দিয়েছে সেটাও অনুমান করতে পারে সে। কিন্তু বলার কিছুই নেই।

গদাধর আর কোনো পথ না দেখে শহরের বড় উকিল জগদীশবাবুর ওখানেই এসেছে। জগদীশ উকিল সেই দিনের ঘটনার পর থেকে হরিশবাবুর উপর চটেছিল। আজ আবার ফটিককে থানায় নিয়ে যাবার খবর শুনে চটে ওঠেন। লোকটা এমনিতে দয়ালু। বলেন তিনি-আমি দেখছি, আর হরিশবাবুও দারুণ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। লোকটা খুব বেড়েছে হে।

অন্ধকার ঘরে একা বসে ফটিক। এরপর ঘটিরাম বাড়িতে গেছে স্নান খাওয়া করে ঘুমিয়ে আসবে, তারপর জেরা করবে। হটাৎ সিরিনকে দেখে চাইল ফটিক।

সিরিন কিছু সন্দেশ আর জলও এনেছে। ফটিক-এর চোখে জল।

সিরিন বলে-হরিশবাবুরই কাজ এসব। ওর ব্যবস্থা এবার করছি। নাও, খেয়ে নাও এসব।

ফটিক বলে-খেতে ইচ্ছা করছে না সিরিন। এতবড় বিপদে ফেলল শুধু শুধু আমাদের।

সিরিন বলে-ওর সর্বনাশ এবার করছি ফটিক। তোমাদেরও দুঃখের শেষ হবে বন্ধু। এটুকু আমাকেই করতেই হবে। নাও-খেয়ে নাও।

ফটিককে দেখতে এসেছে ঘটিরাম।

ফটিক সন্দেশ জল খেয়ে বসেছে। ঘটিরাম বাইরে এসে হুঙ্কার ছাড়ে-সিপাই, ওকে একফোঁটা জল অবধি দেবে না। শুকিয়ে থাকুক। তবেই সত্যি কথা বলবে।

ফটিকের অবশ্য খাবার বা জলের দরকার এখন নেই। আর জানে সে ওসবের দরকার হলে সিরিন ঠিক এনে দেবে। একজন বন্ধু সে পেয়েছে। তাই এত দুঃখ কষ্টও সইতে পারছে ফটিক।

ঘটিরাম দারোগা হরিশবাবুকে দেখে চাইল। আপ্যায়ন করে সে,-আসুন হরিশবাবু।

হরিশবাবু দেখছে গারদের ভিতরে ফটিককে। আর দেখে খুশি হয়েছে এটা বোঝা যায়। তবু ন্যাকামির স্বরে বলে-একে এনেছেন দারোগাবাবু?

ঘটিরাম গর্জন করে বলে-আর বলবেন না স্যার, ওসব বিচ্ছু ছেলে এর মধ্যেই বাঁদরামি শুরু করেছে। এবার ওকে সিধে করে দেবো। চলুন।

ওদিকের ঘরে নিয়ে গেল দারোগাবাবু হরিশবাবুকে। চা, সন্দেশও আসছে দেখা গেল। ফটিক একা চুপ করে বসে আছে। বেশ মনে হয় তাকে বিপদে ফেলার জন্য এটা একটা চক্রান্ত চলেছে।

একটা শব্দ হতে চাইল ফটিক।

সিরিন এসেছে। ফটিক বলে-হরিশবাবুই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে বন্ধু। ওই লোকটাই আমাদের সর্বনাশ করবে।

হঠাৎ বাইরে মোট্‌কা বিরাট এক পাহারাদার গর্জন করে ওঠে হাতের লাঠি তুলে-চোপ্‌বে। চেল্লাবি তো ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে হামি।

বিরাট বিড়ালের ল্যাজের মত গোঁফ, ইয়া ভুঁড়ি। হটাৎ সিরিনকে দেখা যায় না, বিরাট চিৎকার ওঠে। ওই বিশাল পাহারাদারকে কে যেন শূন্যে ফুটবলের মত তুলে দিয়েছে, শূন্যে ঝুলছে, পায়ের জুতো খসে পড়েছে। খসে পড়েছে বিশাল ভুঁড়ি ঘেরা বেল্টটা, প্যান্টটা বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে, পাগড়িটা খুলে টাক বের হয়ে গেছে, আর পরিত্রাহি চিৎকার করছে পাহারাদার-জান বাঁচাও, বাঁচাও। মার ডালা।

ওর চিৎকারে দারোগাবাবুও ছুটে আসে, হরিশবাবুও। ঘটিরাম এই দৃশ্য দেখে অবাক, কে যেন পাহারাদারের বিশাল পিপের মত দেহটাকে সশব্দে মেঝেতে ফেলে দিল। ঘটিরাম চিৎকার করে। হঠাৎ ঘটিরামের টুপিটাই উড়ছে উপরে-অ্যাই, অ্যাই!

হরিশবাবু ঘাবড়ে গেল।

দেখা যায় ঘটিরামবাবুর টুপিটা উড়ে গিয়ে বাইরে অশ্বত্থগাছের ডালে আটকে গেছে, আর পাহারাদার তখনও মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে চিৎকার করছে। হরিশবাবু বলে-ভূত! ভূত প্রেতের কাণ্ড দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু শিউরে ওঠে-অ্যাঁ ভূত!

দু'চারজন কনস্টেবলও বিচিত্র দৃশ্য দেখে তখন তারস্বরে রাম নাম শুরু করেছে। এর মধ্যে দেখা যায় ঘটিরামবাবুর চেহারাটা শূন্যে যেন উড়তে উড়তে চলেছে।

চিৎকার করে ঘটিরামবাবু-আই বাপ! চেয়ার ভাগতা হ্যায়! পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো-

চেয়ারটা ওই গাছের উপর বসিয়ে রেখে কে যেন থেমে গেল। ঘটিরামবাবুর টাক ঘামছে। মনে হয় আবার কি ঘটবে কে জানে।

ঘটিরাম বলে হরিশবাবুকে-এসব ঝামেলায় আমি নেই হরিশবাবু। ও ছেলেটার ওখানে কিছু পাওয়া যায়নি। ওকে ছেড়েই দিচ্ছি।

ফটিককে ডাকে ঘটিরাম-বাইরে এসো ফটিক। যাও বাবা, আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। ফটিক অবাক হয়।

দেখা যায় ঘটিরামের চেয়ার উইথ টুপি আবার শূন্যে যেন উড়ে এসে যথাস্থানেই বসল।

দারোগাবাবু ফটিককে ছেড়ে দিতে দেখে রেগেমেগে বের হয়ে যায় হরিশ। শাসায়-পুলিশ সাহেবের কাছে যাব। দরকার হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছেই যাব।

ঘটিরামবাবু বলে-আর এইসব ব্যাপারে আমি নেই। দেখলাম কাণ্ড। আপনিও অনেকেন অনেক সর্বনাশ করেছেন মশাই। তাই বলছি এবার সাবধান হোন।

হরিশবাবু রেগে বের হয়ে গেল।

তার মত মানী লোককেও এবার দারোগা অবধি অপমান করেছে। এর শোধ নিতে হবে।

হরিশবাবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছেই গেছে আজ। এবার খুশি হয়েই ফিরেছে হরিশবাবু। ম্যাজিস্ট্রাট সাহেব ব্যবস্থা নেবেন। রাত্রি নেমেছে। হরিশ এখন সাবধান হয়েছে। সুরক্ষিত বাড়ি তার। ঘরে কালোবাজারির ব্যবসার প্রচুর লোক ঠকানো টাকা তার আছে। আর সোনার বাট ও রয়েছে সুরক্ষিত আলমারি ঠাসা। অন্য আলমারিতে রাজ্যের লোক ঠকানো দুনম্বরি জাল দলিল, কাগজপত্র সব বোঝাই।

এ ঘরটা খুবই পোক্ত। দেওয়ালে পোঁতা ওই দামি আলমারিগুলো।

দরজায় লোহার মজবুত গেট। জানালাগুলোয় ডবল গ্রিল দেওয়া।

হরিশ ঘরে বসে রাতের বেলায় হিসাবপত্র করছে। হঠাৎ চোখ ধাঁধানো একটা তীব্র আলোর রেখা দেখে চাইল। আলোর উজ্জ্বল বিন্দুটা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

চোখ ঝলসে ওঠে। সামনে বিচিত্র একটা মূর্তি। সাদা দেহ মাথায় দুটো শুঁড় মত, চিৎকার করতে যাবে হরিশ, ওর চোখের নীলাভ উজ্জ্বল জ্যোতিটা এসে লাগে তাকে।

তার চিৎকার করার শক্তিও হারিয়ে গেছে। নড়বার সামর্থ্যটুকুও নেই।

ওই আলোর রেখাটা আলমারির তালাগুলোকে গলিয়ে দিচ্ছে, পাল্লাগুলো খুলে যায়।ঘরময় টেনে ফেলছে পাঁজা পাঁজা নোট, সোনার বাট।

ছটফট করছে হরিশ। কিন্তু হায় কিছু করতেও পারে না। হাত পা-ও নড়ছে না। কণ্ঠস্বরও নীরব হয়ে গেছে। ওই বিচিত্র জীবটা তার সামনে আলমারি থেকে এক তাড়া দলিল, কাগজপত্র নিয়ে আবার জানলা দিয়ে বের হয়ে গেল।

সারা ঘর তছনছ হয়ে আছে। ও চলে যাবার পর চিৎকার করছে হরিশ। বাড়ির লোকজন জুটে যায়। বসন্তও ছুটে আসে। হরিশ পাগলের মত চিৎকার করে।

-সর্বনাশ হয়ে গেছে। থানার খবর দে! ওরে বাবা।

পুলিশ সাহেব, দারোগাবাবু এসে ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে ওই লাখকয়েক টাকার নোট আর সোনার বাট দেখে।

পুলিশসাহেব বলেন-এত এত টাকা, এত লাখ টাকার বেআইনি সোনা আপনার ঘরে? কোথা থেকে পেয়েছেন এসব?

হরিশের এবার খেয়াল হয় হাজারো মানুষকে ঠকিয়ে এসব করেছে সে। তার কোনো হিসাবই নেই। এটা সামাজিক অপরাধ। আর আজ হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে।

হরিশ এবার পুলিশসাহেবের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে।

বাঁচান স্যার।

পুলিশসাহেব বলেন-এসব আপাতত সরকারে জমা পড়বে। তারপর হিসাব দেখিয়ে ফেরত পাবেন।

এতদিন শয়তানি করে, এত লোকের সর্বনাশ করে জমানো টাকা-সোনা সব আজ সরকারে জমা হয়ে গেল। আর্তনাদ করে হরিশ-মরে যাব স্যার।

পুলিশসাহেব বলেন-আমাদের আইন মত কাজই করতে হবে।

সারা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

ওদিকে সিরিন গেছে ফটিকের কাছে। ওর হাতে ওদের বাড়ি, জমি, বাগান, পুকুর মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দলিল জাল করে কেড়ে নেবার কাগজপত্র নিয়ে।

সিরিন বলে-এগুলো তোমার বাবাকে দিয়ে বলো ভালো উকিলকে দেখাতে। তোমাদের ঠকিয়ে জালিয়াতি করে হরিশ যা নিয়েছিল তা ফেরত পাবে।

গদাধর ঘোষ যেন স্বপ্ন দেখছে। হ্যাঁ-এসব দলিল জাল।

আর জগদীশ উকিল ওসব কাগজপত্র দেখে বলেন গদাধরকে-আজই কোর্টে জালিয়াতির মামলা করছি। হরিশ যে এতবড় শয়তান তা জানতাম না।

গদাধর বলে-কিন্তু টাকা পয়সা তো আমার নেই উকিলবাবু।

জগদীশ উকিল শহরের সবচেয়ে নামি উকিল। পয়সার অভাব তার নেই। ভালো মামলা পেলে বিনা খরচেই করে। জগদীশবাবু বলে-এতবড় শয়তানকে শাস্তি দেওয়া মানুষের কর্তব্য হে। এর জন্য তোমার খরচা লাগাবে না গদাধর। আমি দেখছি।

হরিশ-এর টাকাকড়ি চোরাই সোনাদানা সব গেছে। এবার এই জালিয়াতির মামলায় পড়েছে। এতদিন অন্যায় অত্যাচার করে সারা এলাকার মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তার সাম্রাজ্য গড়েছিল হরিশ। সেই সাম্রাজ্য, সেই প্রাসাদ আজ তাসের প্রাসাদের মত ধসে পড়েছে।

সারা শহরের লোক আদালতে ভেঙে পড়েছে। হরিশবাবুও ভাবতে পারে না যে তার এত শত্রু ছিল। এতদিন এরাই তাকে খাতির করে এসেছে। আজ সেই হাজারো বঞ্চিত মানুষ এসে ভিড় করেছে ধিক্কার জানানোর জন্য।

তার চোর কারবার, সিমেন্টে বালি মেশানোর ব্যাপার-আর ওই জালিয়াতির অনেক খবরই পুলিশ বার করেছে।

গদাধর ঘোষ তার হারানো সম্পত্তিগুলো ফিরে পায় আর জালিয়াতি-প্রবঞ্চনা ওইসব নোংরা অসামাজিক কাজের শাস্তি হিসাবে হরিশ-এর কারাবাসের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

চমকে ওঠে হরিশ। আজ তার করার কিছুই নেই। গদাধর ঘোষের দুঃখের দিন বদলাচ্ছে। সুধাময়ী বলে,-বলিনি গো, দুঃখকষ্ট চিরকাল থাকে না। সৎপথে থাকলে সব কষ্ট সয়েও মানুষ আবার দাঁড়াতে পারে।

কথাটা আজ গদাধরও বিশ্বাস করে।

আজ সে আবার সব ফিরে পাচ্ছে।

এবার ফটিকও অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আবার ফার্স্ট হয়েছে। বসন্ত কোনো পজিশন পায়নি, টেনেটুনে পাস করেছ মাত্র।

ফটিক সেদিন স্কুলে খবরটা পায়।

হেডস্যার তাকে অফিসে ডেকে বলেন-জানীয় টিমে খেলতে যাবার চিঠি এসেছে ফটিক। সামনের মাসেই যেতে হবে। এই জেলার মধ্যে তুমিই চান্স পেয়েছ।

আজ গোবিন্দস্যারও বদলে গেছে। বলে সে-তুই স্কুলের গর্ব রে! জিততেই হবে।

সন্তোষবাবু, গজেনস্যার বলেন-চেষ্টা করবি ফটিক, বি সিনসিয়ার, দেখবি জীবনে সব বাধা উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাবি।

ফটিক আজ ওদের প্রণাম করে।

আজ তার খুশির দিন।

বৈকালে বাড়ি ফিরেম গেছে সেই ঝিলের দিকে। সেই নীরব নির্জন ঠাঁইটা তার ভালো লাগে। সে আর সিরিন এখানে বসে কথা বলে। ওই তার নিকটতম বন্ধু।

আজও সিরিন এসেছে।

মিটিমিটি হাসছে সে।

ফটিক বলে-তোমার জন্যাই আজ সব ফিরে পেয়েছি বন্ধু। তুমি আমার জন্য অনেক করেছ।

সিরিন বলে-এ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য ফটিক। তার বদলে তুমিও আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ। এই পৃথিবীকে দেখে গেলাম, চিনে গেলাম। বুক ভরা ভালোবাসা পেয়ে গেলাম।

ফড়িক দেখছে ওকে। সিরেনের মাথার ছোট শুঁড় দুটো নড়ছে। বলে সে-আমাদের গ্রহের জীবরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। তারা সব করতে পেরেছে। প্রাণের উৎসের সন্ধানও পেয়েছে। আমার মত জীবদের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু একটা জিনিসের সন্ধান আমাদের গ্রহের বিজ্ঞান আজও পায়নি, সেটা হচ্ছে ভালোবাসা।

যন্ত্র ভালবাসতে জানে না। ওটা ছাড়া সৃষ্টির কোনো সার্থকতাই নেই বন্ধু।

তাই সেই দূর নক্ষত্রলোক থেকে আমরা আসি এই পৃথিবীতে, মানুষের কাছে ভালোবাসার সন্ধান পেতে। আর সেই নিবিড় ভালোবাসার স্পর্শে তুমি আমাকে সার্থক করেছ বন্ধু। তার জন্য আমার অসীম ক্ষমতা দিয়ে তোমার জন্য সামান্য কিছু করেছি মাত্র।

আজ আমার কাজ শেষ। আমাকে তাই ফেরে যেতে হবে বন্ধু।

চমকে ওঠে ফটিক।

এতদিন ওই বিচিত্র জগতের জীবই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিনরাতের সঙ্গী। আজ তাকে হারাতে হবে। বড় বেদনায় ফটিক বলে-তুমি চলে যাবে?

হাসে সিরিন-হ্যাঁ বন্ধু। আমার থাকার আর উপায় নেই। যে সঞ্চিত শক্তিটুকু দিয়ে আমাকে ওরা পাঠিয়েছিল এই জগতে তা ফুরিয়ে আসার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। বৈকালের আলো মুছে সন্ধ্যা নামছে।

দু'একটা তারা ফুটে ওঠে। হঠাৎ শান্ত অরণ্যভূমি, ঝিলের জলে জাগে তুমুল আলোড়ন।

গাছগুলো যেন ভেঙে পড়বে। তীব্র গর্জন ওঠে। একটা আলোর বৃত্ত নেমে আসছে। আরও নীচে, হঠাৎ দেখা যায় সিরিন আর নেই।

ওই বৃত্তটা জ্বলন্ত অগ্নিপুঞ্জের মত আকাশে উঠে দূর তারার ভিড়ে হারিয়ে গেল। ঝিল-বনরাজ্যে আবার শান্তি নামে।

একাই দাঁড়িয়ে আছে ফটিক। তবু ডাকছে সে-সিরিন-সিরিন-বন্ধু। আজ আর কেউ সাড়া দেয় না।

তার বন্ধু আজ আবার কোনো দূর সবুজ নক্ষত্রের দেশে ফিরে গেছে। আর কোনোদিনই আসবে না। ফটিকের দুচোখে জল নামে। সিরিন বোধহয় এ খবরও আর রাখবে না।

পটলার নাট্যচর্চা

পটলা খুবই রেগে গেছে। রাগাটাই স্বাভাবিক। 'তিনসঙ্গী ক্লাব' ওকে তাদের নাটকে অভিনয় কারার জন্য নিয়ে গেছে, বন্দীপুরের রাজপুত্রের রোল। এর আগে পটলা ক্লাবে মুকুট-এর নাটকেরও রাজপুত্রের অভিনয় করেছিল। পটলার চেহারাখানা সুন্দরই। ফর্সা রং, টানা টানা চোখ, বেশ গত্তিলাগা শরীর।

কিন্তু গোল বাধে পটলা যখন কথা বলে।

জিবটা আলটাকরায় আটকে যায় বেশ টাইট হয়ে। আর পটলাও ব্যাকুলভাবে জিবটাকে ছাড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে।

ফলে অঘটন ঘটে তখুনিই।

বন্দীপুরের রাজপুত্রবেশী পটলা প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রথম গাড্ডায় পড়ল। এতক্ষণ অবধি কোনোরকমে সাবাধানে পার্ট বলে এসেছে। খুব তেজি সিন নয়। তৃতীয় দৃশ্য থেকেই নাটক জমে উঠেছে। রাজপুত্রকে এবার তার পিতৃদেব রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে।

উত্তেজিত রাজপুত্র এইবার পিতৃদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেই মুহূর্তেই রাজপুত্রের জিবটা গেল জম্পেশ হয়ে আলটাকরায় আটকে।

পিতা.ত.ত.

জিব আর ছাড়ে না। সেঁটে লেগে গেছে। পটলার দু চোখ কপালে উঠেছে, তরবারি বের করে শূন্যে তুলেছে কিন্তু বাক্য আর সরে না-ত ত.তো-

তিনসঙ্গী ক্লাবের হলধরের ছিল এই পার্ট। সে আবার ল্যাংড়া। রাজপুত্র ল্যাংড়া হলে অচল, ওদের মোশন মাস্টার তাই বাতিল করেছিল হলধরকে। হলধরকে অন্য দলবলও রেডি ছিল।এবার তারাই আওয়াজ দেয়-ব্যাকগিয়ার মারছে রে। শালা তোতলা-

পটলা ততক্ষণে জিবটাকে ছাড়িয়ে বীরদর্পে হুঙ্কার তোলে-মারে করিব বধ! তারপর রাজ্য প-প-প-

জবাবে ওরা একঝাঁক গুলি ছুঁড়ল।

আবার চেঁচালাম, বোকামো কোরো না। বিশাল হিন্দুস্থানী ফৌজ তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তোমাদের সাহায্যকারী দলকে আমরা মেরে বর্ডারের ওপারে ভাসিয়ে দিয়েছি। এটাই শেষ সুযোগ, আত্মসমর্পণ কর।

এবার জঙ্গীরা কোনো জবাব দিল না। গুলিও ছুঁড়ল না।

সুখদেব রেডিওতে বলল, ওরাহাল ছাড়বে না। বেকার চেষ্টা স্যার হুঁ। আমি বললাম।

লেট আস কিল দেম স্যার। চলুন, ছেঁচে আসি ব্যাটাদের।

দাঁড়াও। আমি বললাম, জয়কারা বলো। সমস্ত দল।

আমার নির্দেশে সৈন্যবাহিনীর সব কটা দল নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুযায়ী জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে অ্যাটাক শুরু করবার আগে এরকম জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।

শিখ সৈন্য গর্জন করল, বোলে সো নিহাল, সৎ শ্রী অকাল।

ডোগরা সৈন্যদল বলল, বোলে জয়, ভগবতী মাতা শেরাওয়ালি দুর্গে-

গোর্খা সৈন্যরা উত্তরের পাহাড়ে কুকরি খুলে মাথার ওপর তুলল। আয়ো গোরখালি-ই-ই-

রি-ইনফোর্সমেন্টের মারাঠি সৈন্যরা গর্জে উঠল, হর হর মহাদেও-

অতগুলি সৈন্যদলের সম্মিলিত জয়ধ্বনি মেঘের আওয়াজের মত গমগম করতে লাগল। প্রতিধ্বনিত হল পাহাড়ে পাহাড়ে। আমি চোঙে চেঁচালাম, এই শেষ সুযোগ। যারা যারা আত্মসমর্পণ করতে চাও-

এবার গেরিলাদের দলে একটা ব্যাপার ঘটল। প্রথমে ক্যাট ক্যাট, তারপর ক্যাটা ক্যাটা ক্যাট, কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ পাওয়া গেল। গেরিলারা নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি শুরু করল। আত্মসমর্পণে ইচ্ছুকরাই দলে ভারী ছিল। খানিক পরে গুলির শব্দ থামল। একের পর এক জঙ্গীরা দুহাত অপরে তুলে বেরিয়ে আসতে লাগল ব্যাহকের আড়াল থেকে। বিভিন্ন জাতির বিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভয়ে ওরা অস্ত্রত্যাগ করে বসল, সব আদর্শ, অস্ত্রশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে।

একটিমাত্র বুলেট ব্যবহার করে নীলসান্দ ব্যাহকের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করল। হতাহত-শত্রুর পক্ষে সাত জন নিহত, আহত শূন্য, বন্দী চৌত্রিশ জন। ভারতীয় পক্ষে হতাহত শূন্য। সাত জন শত্রুর মধ্যে ছয় জনই মারা পড়েছে নিজেদের গুলিতে, তার মধ্যে জঙ্গীদের এরিয়া কমান্ডার মহম্মদ মকবুল লোনও রয়েছে।

চোখধাঁধানো বিজয়। কর্নেল রেডিওতে চেঁচালেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে, দারুণ! অভিনন্দন, বুদ্ধদেব। বীরচক্রের জন্য তোমাদের নাম সুপারিশ করা হচ্ছে।

থ্যাংক ইউ স্যার। আজকের আসল হিরো কিন্তু লেফটেনান্ট সুখদেব। মেডেলটা ওরই পাওয়া উচিত।

সন্ধের আগেই আমরা মহুয়াতে নেমে এলাম। সুখদেব সিং আজকের রাতটা এখানেই কাটাবে। কাল সকালে ও ফিরে যাবে ঈগলের বাসায়, মানে ওর ক্যাম্পে, পাহাড়ের টঙে। সন্ধের পর আমি হেড-কোয়ার্টারে ফোন করলাম মেজর শ্রীবাস্তবকে। স্যার, আমার ক্যাসেটটার কি হল?

ও প্রান্তে আজিজুলের গলা পেলাম, হ্যাঁ স্যার। আমি আজিজুল বলছি। না, স্যার, পুরো শহরে কোথাও পাওয়া গেল না। আমি তো কদিন আগেই বাড়ি গিয়েছিলাম ঈদের ছুটিতে। আপনি যদি বলতেন, নিয়ে আসতাম।

দূর ছাই! আমি হাসি, আমি কি জানতাম? ভেবেছিলাম ছুটি পাব।

ভোরে রেডিও খুলবেন, স্যার। আমি তো প্রায়ই বাংলা সেন্টার ধরতে পারি।

নিরাশ মনে ঘুমোতে গেলাম। পাগল নাকি, বাংলা সেন্টার! শেষরাতে ঘুম ভাঙল।রেডিওটা বিছানাতেই ছিল। নব ঘোরাতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে কানে এল, অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর, যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা-

বাংলা নয়। হিন্দিতেও একটা সংস্করণ আছে ওই অনুষ্ঠানের। তবে চণ্ডীপাঠ সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের, গানগুলিও বাংলা। মহুয়ার সেই সুদূর পর্বতমালার কোলে যেখানে ঝিলম নদীর কলকল শব্দ ছাড়া শেষরাতে অন্য কোনো শব্দ নেই, পাথরের একতলা বাড়ি থেকে চারদিকে উপচে পড়ল সুরের নদী। বাজল আবার সুরের বেণু।

কলকাতার বাড়িতে হলে মা এখন চা বসাতেন। আমি শুয়ে শুয়ে আধঘুমে শুনি। হঠাৎ চটকা ভেঙে দেখি আর্দালি হরপ্রীত। চা এনেছে।

সৎ শ্রী অকাল সাব। আ কেরা পোগরাম, সাব?

বাংলা ভাষায় গুরুবাণী পাঠ। ওকে বলি। বীরেন ভদ্র এতক্ষণে কেঁদে ফেলেছেন। স্তব্ধ হয়ে সমস্ত ক্যাম্প শুনছে সেই কান্না। মাগো, আমাদের শুভবোধ দাও।

মহিষাসুরের পরাজয় অনিবার্য। চিরকাল।

দর্শককুলের মধ্য থেকে আওয়াজ ওঠে-পেড়ে ফেলব!

কে সরবে ঘোষণা করে-পালচাপা দেব।

কে আবার হেঁকে ওঠে-প্যাঁদাব পটলা।

প'কারান্ত অনেক রকম ব্যবস্থাই পাকাপাকি নেবার কথা ঘোষণা করে তারা-শেষ অবধি পটলচন্দ্র ভিতরে এসেছে, এই শীতেও ঘামছে।

মোশন মাস্টার ততক্ষণে গোলমাল থামাবার জন্য জিপসি নাচ-এর ব্যবস্থা করেছে মঞ্চে।

আমরাও গেছি, পটলা আমাদের ক্লাবের প্রধান সভ্য। দায়ে-আদায়ে পটলাই টাকাকড়ি দেয়, আলুকাবলি-ফুচকা মায় গুপির দোকানের চা-বিস্কুট-মামলেট-এর বিল মেটায়। বাবার বিরাট ব্যবসা-ওদিকে গুদাম, করাতকল!

এ হেন পটলাকে 'হায়ার' করে এনেছে অভিনয় করার জন্য, আমরাও এসেছি, কিন্তু পটলার যে এমনি বিপদ হবে ভাবিনি। পটলা দর্শকদের ওই সব মন্তব্যে তরবারি খাপে পুরে রণে ভঙ্গ দিয়ে এসে সাজঘরে সেঁদিয়েছে।

আমরা বলি-ভয় কি পটলা! এবার ঠিক হয়ে যাবে।

না, পারব তো র্‌্যা! পটলা শুধোয়।

হোঁৎকা আমাদের ক্লাবের পারমানেন্ট বৃকোদর সাজে। সে বলে-আলবত পারবি। লড়ে যা।

কিন্তু ওদের ক্লাবের ডিরেক্টার কন্দপদা এর মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে তোতলা রাজপুত্রের চেয়ে ল্যাংড়া খোঁড়া রাজপুত্রই ভালো হবে। বলে সে-হলধর, তুই মেকআপ করে নে। নেকস্ট সিন থেকে তুই রাজপুত্রের রোলে নামবি। পার্ট মুখস্থ আছে তো?

হলধর বলে-হ্যাঁ। পুরো।

কন্দর্পবাবু ড্রেসারকে বলে-ওকেই রাজপুত্র সাজাও। পটল, তোমার ড্রেস খুলে দাও। এ যেন কাপড় খুলে নেবার মতই অপমান।

পটলা রাগে গরগর করছে। এই ঝুটো মুক্তোর মালা, জরির পোশাক, টিনের তলোয়ার সব ফেলে রাজপুত্র আবার পটলাতে পরিণত হল।

পটলার গোঁফ জোড়াটা স্পিরিট গাম দিয়ে সাঁটা ছিল, সহজে ছাড়ানো যাবে না। ড্রেসারের টানাটানিতে সে বলে-নারকেল তেল দেন।

ড্রেসার বলে-কোথায় পাব নারকেল তেল-ফেল? রাজপুত্রের সিন এখুনিই, গোঁফ আভি মাংতা।

ড্রেসার হ্যাঁচকা টানে চামড়া যেন তুলে ফেলবে। পটলার চোখ দিয়ে জল বের হয়ে আসে অপমানে, জ্বালায়।

রাগে দুঃখে অপমানে বের হয়ে এল পটলা। আমরাও চলে আসছি। তখন মঞ্চে ল্যাংড়া হলধর নেচে নেচে রাজপুত্রের পার্ট করে চলেছে।

পটলা বলে-ত-তিনসঙ্গী ক-ক্লাবকে দেখিয়ে দেব ন-নাটক কাকে বলে!

ফটিক আমাদের মিউজিক ডিরেক্টার কাম অভিনেতা। ফটিক বলে-হ্যাঁ, দেখাতেই হবে।

ন্যাড়া দেশজ ভাষায় শোনায়-দেইখা লমু ওগোরে, তয় আমার নাম ন্যাড়া হাওলাদার।

পটলার অপমানটা আমাদের অপমানই আর পটলাকে যে তিনসঙ্গী ক্লাব পোশাক কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, এ খবরটা সারা পাড়া জেনে গেছে।

অবশ্য তিনসঙ্গী ক্লাবের নাটকে দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে। তৃতীয় অঙ্কে নাকি রাজার দাড়ি-চুল সব খসে পড়ে বিনোদ দত্তের টাক মাথা বের হয়ে পড়েছিল যুদ্ধের সিনে, আর দুটো পটকা সাজঘরে বেকায়দায় ফেটে গিয়েছিল, তাতে হলধরের প্যান্টুল বেশ খানিকটা পুড়ে গেছল, রাজপুত্র তালিমারা প্যান্ট পরে যুদ্ধ করার সময় ল্যাংড়া পায়ে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়েছিল দর্শকদের ঘাড়ে।

কন্দর্পবাবু ড্রপসিন ফেলেছিল ঠিকই, হলধর কিন্তু তখন মঞ্চ থেকে নীচে। পরাজিত রাজপুত্র প্যান্টুল ফাটা অবস্থায় মুঠো করে ধরে দর্শকদের মধ্য দিয়ে প্রস্থান করেছিল।

তাতে অবশ্য পটলার দুঃখ ঘোচেনি।

পরদিনই 'পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবে'র জরুরি মিটিং-এ ঠিক হয় নাটকই হবে। এবার হবে প্রগেসিভ নাটক-'ফাঁসির মঞ্চ থেকে'। লিখেছে আমাদের ক্লাবের গদাই গড়াই। ইদানীং গদাই-এর দুখানা নাটকের মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় চলছে মাঝে মাঝে। একখানা তো ছায়া-কায়া নাটক। ভূত-মানুষ অনেক কিছু আছে। অমৃতবার্তা কাগজে দারুণ সমালোচনা বের হয়েছে।

নাট্যকার গদাই বলে-সবকিছু বাস্তব করতে হবে। সে সব ব্যবস্থা করে দেব। আর পটলা যে অভিনয় করতে পারে তাও দেখিয়ে দেব। হিরো-একেবারে টপ্ টু বটম্। আর নো ডায়ালগ। নতুনত্ব করতে হবে। ডায়ালগ বলবে অন্য সবাই। হিরো কথা বলতে পারে না। মূক, বধির। খুব সিমপ্যাথেটিক রোল। দেশের জন্য ফাঁসিতে আত্মত্যাগ করল।

ন্যাড়া সব শুনে বলে-তা মন্দ হইব না। হালায় এহন চোরের দ্যাশে দ্যাশপ্রেমিকদের নাটক হক্ক লেই লইব।

ফটিক কালোয়াতি গান গায়। শীর্ণ লম্বা চেহারা। সে শুধোয়-মিউজিক ক্যামন হইব?

গদাই গম্ভীর ভাবে বলে-ভালো হবে।

পটলা খুব খুশি। এবার কথা-টথা বলতে হবে না। পোজপশ্চারেই মেরে দেবে।

হোঁৎকা বলে, মন্দ হবে না প্যাঁচটা।

চা-মামলেট এসে গেছে। গদাই গড়াই নাটক পড়ছে। চোখ-মুখ পাকিয়ে হাত-পা ছুড়ে গদাই নাটকে প্রাণ সঞ্চার করেছে আর পটলা দেখছে তার চরিত্রটা।

হ্যাঁ! মনের মত একটা রোল পেয়েছে। এবার এই চরিত্রই হবে তার ধ্যানজ্ঞান, পটলা বলে।

-ন-নাটক জ-জ-জমবে দারুণ। -যা পোস্টার লাগা। নো ফিয়ার!

হোঁৎকা করছে জবরদস্ত পুলিশ অফিসার। সেই আমাদের আর্টিস্ট। হোঁৎকা আমি ফটিক লেগে গেছি পোস্টার লিখতে।

গদাইদা বলে-ছাপা পোস্টারও চাই, না হলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

পটলা অভয় দেয়-হোগা!

কুলেপাড়ার দেওয়াল, গাছের ডাল, বাড়ির থাম, মোড়ের দেওয়াল ছেয়ে গেছে পোস্টারে। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের অবদান। গদাই গড়াই-এর নাটক ফাঁসির মঞ্চ থেকে।

শ্রেষ্ঠাংশে-পটলচন্দর, হোঁৎকা-ইত্যাদি।

সঙ্গীত পরিচালকদের নাম বাদ পড়েছিল-ফটিক তো ক্লাব-এ রেজিগনেশন লেটার লিখে এনেছিল। পটলা থামায় তাকে।

-ত-তোর নামও থাকছে এবার!

দ্বিতীয়বার পোস্টার ছাপা হয়ে দেওয়াল ভরে গেল-ফটিকচন্দ্র সুরকার।

তিনসঙ্গী ক্লাবও খবর পেয়েছে এবার নতুন প্রয়োগ রীতিতে নাটক মঞ্চস্থ করছি আমরা।

পটলার পিসি শুধোয়-হ্যাঁরে পটল, তা ঠাকুরদেবতার পালা-টালা হবে তো? রাধাকেষ্ট শিবদুর্গা, এ-সব থাকবে?

পিসিমা থোক টাকা চাঁদা দেন। সেবার দক্ষযজ্ঞ পালা দেখে আর হোঁৎকার শিব সেজে ওই দুমদাম নৃত্য দেখে পিসি মহাখুশি। তাই পিসি দশ টাকা চাঁদা দেন।

পিসির কথায় হোঁৎকা বলে-থাকবে বৈকি পিসিমা। তবে পিসি, শিবের সঙ্গে এবার অসুরের যুদ্ধ-টুদ্ধ হবে, তাই আরও কিছু বেশি চাঁদা দিতে হবে। কেষ্টও থাকবে কিনা!

পিসিমা শিব-দৈত্য-কেষ্ট এসব দেখার লোভেই পনেরো টাকা নগদ দিলেন। নরহরি দত্তের জমাটি ব্যবসা। এককালে দত্তমশায় কারবার করে আর সুদ বন্ধকিতে বেশ রোজগার করেছেন। এখন ছেলেরা কারবার দেখে। দত্তমশায় সকাল বিকাল রকে বসে খঞ্জনী বাজিয়ে নামগান করেন। দত্তমশায়ও শুধোন, কেত্তন-টেত্তন হবে তো?

ফটির বলে-তা হবে দত্তমশায়। নামগান হবে আর ভক্তিমূলক গীতও আছে।

গদাই গড়াই এদিকে ক্লাবঘরের মেঝেতে চক দিয়ে দাগ কেটে এক একজনকে দাঁড় করিয়েছে দাবার ছকের ঘুঁটির মত। মেপে মেপে চলতে হবে-কথা বলতে হবে।

মুস্কিল হয়েছে ন্যাড়াকে নিয়ে, ন্যাড়া এ জন্মে বাংলাদেশ দেখেনি, কিন্তু মাতৃভাষা ওর আদি অকৃত্রিম পদ্মাপারের বুলি। ন্যাড়া রিহার্সেল দিতে গিয়ে সেই ভাষাই বলে ফেলে-তোদের দ্যাশ থান তাড়াইমুই আর ইংরেজ কুত্তা, হালায় গুলি-বোম মাইরা উড়াইয়া দিমু।

নাট্যকার গদাই গড়াই গর্জে ওঠে-এস্টপ্! এস্টপ্! কিৎসু হচ্ছে না।

ন্যাড়া ঘাবড়ে গিয়ে বলে,

-ক্যান হইব না? পশ্চারখ্যান দ্যাখলা নি!

-না। এদেশী ভাষায় বলো-লোভী ইংরেজ, তোদের এই দেশ থেকে তাড়াইবোই-

ন্যাড়া বিড়বিড় করে-কি যে কও।

ধনপতিদা থিয়েটারের ভক্ত। তিনিই এগিয়ে এসেছেন। পটলার ছোটকাকা বলেন-থিয়েটার করছিস আবার! সেবার দক্ষযজ্ঞ করে তো ডেকরেটারের আড়াইশো টাকা, ড্রেসারের দেড়শো টাকা গচ্চা দিতে হল।

গদাই বলে-এবার ড্রেস লাগবে না। সোশ্যাল ড্রামা।

ছোটকাকা বলেন-আর কোনো হাঙ্গামা হলে সব কটাকে দূর করব।

পটলা মত দেয়-কি-কিৎসু হবে না।

পটলার বাবা অবশ্য কড়া ধাতের মানুষ। পটলার এক একটা বাতিক নিয়ে তিনিও বিপদে পড়েন। পটলা যখন যেটা ধরে তখন সেটা একনিষ্ঠ ভাবে করে। কবিতা লেখা নিয়েই সেবার আত্মবিসর্জন দিতে বসেছিল। দিন কতক ফুটবল নিয়ে মাতলো। পেলে হবে। হাঁটুর মালাইচাকি ঘুরে গিয়ে মাসখানেক প্লাস্টার করে পড়ে থাকার পর সে বাতিক গেছে। এবার নাটক নিয়ে পড়েছে। জাতীয় নাট্যশালা গড়ার প্ল্যানও করছে।

পটলার বাবা বলেন-শিশির ভাদুড়ি হবেন! এদিকে ক্লাসের পরীক্ষার নম্বর তো দেখছি। থিয়েটার করা ঘুচিয়ে দেব।

তবু মা, পিসির জন্য পটলা বেঁচে যায়। মা বলেন-ছেলেমানুষের খেয়াল, দু দিনেই থেমে যাবে।

পটলা আড়ালে বলে আমাদের-দেখবি নাটকের পথ বদলে দেব। পটলচন্দর যা নিয়ে পড়ে, তার শেষ দেখে, বুঝলি? দরকার হয় শহিদ হয়ে যাব নাটকের জন্যই।

হোঁৎকা বলে, ওসব পরে হবি-এখন কার্ড বিলি হয়ে গেছে, পোস্টার পড়েছে, এস্টেজ বাঁধা হচ্ছে। এখন হোস না।

দেশপ্রেমী তরুণ ত্রিদিবের রোল করছে পটলা। দেশকে ভালোবাসার অপরাধে ইংরেজের ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে হবে তাকে।

ডায়ালগ বলতে শেষ সিনে-বন্দে মাতরম্! পটলার ওই কথাটা যাতে ক্লিয়ার বের হয়, তার জন্যই আজকাল সে কথায় কথায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিচ্ছে। মহড়ার পর গুপির চায়ের দোকানে গিয়ে আউড়ে দেয়-গুপি, দশটা ম-মামলেট আর চ-চা। বন্দে মাতরম্।

লোকে লোকারণ্য। সারা মাঠ ভরে গেছে। নাটক শুরু হতে দেরি নেই। গদাই গড়াই বাস্তবধর্মী নাটক করছে, এর মধ্যে ডেকরেটারকে দিয়ে বেশ মজবুত শালকাঠের ফ্রেম করে ফাঁসি-কাঠ বানিয়েছে। আমি শুধোই-এ যে বেশ পোক্ত গো গদাইদা!

গদাই বলে-পটলাকে রিয়্যাল সিন করতে হবে। তাই পোক্ত চাই ওটা।

চমকে উঠি-সেবার নবপল্লীর 'ক্ষুদিরাম' বই দেখেছিলাম, ফাঁসির মঞ্চই করেছিল, এসব তো করেনি।

গদাই ধমকে ওঠে-ফাঁসির সিন এর তুই কি বুঝবি! এইটাই আমার ক্লাইমেক্স সিন, যা মেকআপ করে নিজের পার্ট গিয়ে পড়গে। এসব ব্যাপার তোরা কিছু বুঝবি না।

পটলা দারুণ মেকআপ নিয়েছে। একেবারে মূর্তিমান দেশপ্রেমিকই হয়ে গেছে। খদ্দরের ময়লা পাঞ্জাবি, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ পায়ে চপ্পল।

হোঁৎকাও জবরদস্ত পুলিশ অফিসার সেজেছে। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলভার, ওটা অবশ্য ওর ভাইপো টাবলুর। সে এর মধ্যে দুবার দখলদারি জানিয়ে গেছে।

পটলা অবশ্য এবার নিরাপদে পার্ট করছে। দর্শকরাও ভেবেছিল পটলা ডায়ালগ শুরু করলেই মজা হবে। তোতলামিটা বেশি হয় নার্ভাস হলে, ওকে নার্ভাস করে দিতে পারলেই ব্যস!

কিন্তু হতাশ হয় তারা। পটলার ডায়ালগ নেই। পটলা স্রেফ চোখ ছানাবড়া করে, হাত-পা নেড়ে অভিনয় করছে, মাঝে মাঝে অব্যক্ত গোঙানি করে পুলিশরূপী হোঁৎকার কোঁতকা খেয়ে। বড় বড় হাততালি পড়ছে।

গদাই-এর বুকখানা ফুলে উঠেছে। এর মধ্যে ন্যাড়াই আওয়াজ খেল। দেশনেতার ভূমিকায় সে উত্তেজিত হয়ে লেকচার দিতে হঠাৎ থেমে গেল, পার্ট ভুলে মেরেছে। জানতাম মারবেই।

দশ লাইন কবিতা মুখস্থ পারে না যে, সে ওই ভাষা বলতে পারবে না তা জানতাম। ইদানীং পটলার ডান হাত সে। তাই পটলার জোরেই ওই পার্ট পেয়েছিল। আর স্রেফ ভুলে যেতেই দর্শকদের দিকে চেয়ে জিব বের করেছে মাকালীর মত।

হৈ-হৈ শব্দ ওঠে।

পরক্ষণেই ন্যাড়া গর্জে ওঠে-হালার ইংরাজের বাচ্চা, তোগোর এই সুনার বাংলা থনে তাড়াইমু-

হাসির তুবড়ি ছোটে!

ন্যাড়া ফিরে আসতে গদাই ওর চুলের মুঠি ধরেছে, শেষ করে দেব ব্যাটাকে। কতবার বলেছি ঠিক করে বল।

ন্যাড়া গজরায়-ভুইলা গেলাম পার্টখান, এক জম্পেশ কতা ল্যাখছ, হালায় মনে থাকব ক্যান। আর হইব না।

পুলিশরূপী হোঁৎকা একবার হুঙ্কার ছাড়তে গিয়ে গোঁফ জোড়াটাই রেখে এসেছে মঞ্চে। আর নরেশের মঞ্চে ঢুকে হাঁটু দুটো ঠকঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। গদাই যত বলে এস্টেডি, কিন্তু সে শোনে, কার কথা? কাঁপুনির চোটে পার্ট না বলেই সে পালিয়ে এসেছে তুমুল হাততালির মধ্যে। কেবল পটল আজ একাই পার্ট করে যাচ্ছে। একেবারে ধ্যানস্থ অভিনেতা হাততালিও কুড়োচ্ছে।

শেষ দৃশ্য। আমি বলি, ওসব রিয়্যাল করে কাজ নাই রে। ধমকে ওঠে গদাই।

ফাঁসির মঞ্চ রেডি। গদাই শেষবারের মত চেক আপ করে সিন তুলেছে হুইসিল বাজিয়ে। দেশপ্রেমিকের ফাঁসি হবে। পটলাও প্রাণ দিয়ে অভিনয় করছে। দারুণ গ্যাস খেয়েছে সে। সে বলে, অভিনয় করতে হবে মনপ্রাণ দিয়ে-

পিছনে নিধু ব্যায়লাদার আর পশুপতি বাঁশের বাঁশিতে করুণ করুণ সুর বাজাচ্ছে। গদাই লাল আলোর ফোকাসে দিয়েছে মঞ্চে। পিছনে নেপথ্যে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি ওঠে। পটলাও ঝুলে পড়েছে।

তারপর ঘোঁতনার একটা বড় ডায়ালগ। কলরব লোকজন স্তব্ধ! পটলা সত্যিকার দড়িতেই ঝুলে পড়েছে। আর ঘোঁতনা চোখ বুজে করুণ সুরে ডায়ালগ শুরু করবে, হঠাৎ কাণ্ডটা বেধে যায়। নিজেও এবার বুঝেছে ব্যাপারটা। গলায় চাপ পড়তেই ফাঁসির মঞ্চের মাঝখানের কাঠটা দু হাতে হোরাইজোনটাল বার ধরা করে ধরে চিৎকার করছে, অ্যাই হোঁৎকা, দড়িটা কেটে দে। গলায় লাগছে।

অ্যাই হোঁৎকা। দ-দ-দড়িটা ক্-ক্-

হোঁৎকা তখন পুলিশ অফিসার, তার হুকুমেই ওকে টাটকা ফাঁসিতে লটকানো হয়েছে, সে খোলে কি করে! এদিকে ফাঁসির আসামী তখন বারে দোল খাচ্ছে সার্কাসের ক্লাউনের মত। কলরব, হইচই চলছে দর্শকদের মধ্যে।

এই ফাঁকে ফাঁসির সুতলির দড়িটাও পটাং করে ছিঁড়ে গিয়েছে। আর দেশপ্রেমী মৃত্যুঞ্জয় বীর বালক ফাঁসির মঞ্চ থেকে টপাক করে নেমে সিধে ভিতরে দৌড় দিয়েছে। তখনও স্টেজের সামনে ঘোঁতনা করুণ সুরে মৃত্যুঞ্জয় বীরের প্রশস্তি গাইছে।

তুমুল হাসির শব্দে ওর চমক ভাঙে। কোথায় শহিদ? ফাঁসির মঞ্চ ফাঁকা। পটলা কেটে পড়েছে।

আর সামনে উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ছে দর্শককুল। কে আওয়াজ দেয়-কাট্ বে।

যবনিকা পতন হয়ে যায়।

গদাই তখন গর্জাচ্ছে-নাটকের তেইশটা বাজিয়ে দিলি পটলা। ভীরু কাওয়ার্ড।

ন্যাড়া বলে-তয় কি গলায় দড়ি দিই মরবে? ফ্যালাই তোমার থ্যাটার। আপনি বাঁচলি বাপের নাম!

হোঁৎকার কোঁৎকা

আমাদের স্কুলের নতুন হেড মাস্টারের চেহারাটা বেশ লম্বা-চওড়া। গুরু-গম্ভীর ধরনের মানুষ। গলার স্বরটাও বেশ কঠিন ও ওজনদার তার চেহারার মতই। একজোড়া পুরুষ্ঠ গোঁফ আর চোখদুটো যেন বাঘের মত-যেন চারদিকে সব সময় ঘুরছে।

নতুন স্কুলে জয়েন করেই-আমাদের স্কুলে নতুন হেডমাস্টার বিক্রম সরখেল বেশ কিছু নিয়ম জারি করলেন-পাঁচ মিনিটের লেটে কেউ ক্লাসে ঢুকলে তাকে ক্লাসে কল দেওয়া হবে না।

স্কুল চলাকালীন পাঁচিল টপকে কোনো ছাত্র পালাবার চেষ্টা করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

ক্লাসে বদমাইশি-মারপিট করলে গার্জেন কল করা হবে ইত্যাদি।

ফলে হোঁৎকা এবং তার দলবলের খুবই অসুবিধা হয়ে গেল। কারণ স্কুলের বেশিরভাগ বেনিয়মই তারা করে। ফলে এইরকম বেনিয়ম করতে গিয়ে এর মধ্যেই হোঁৎকা ধরা পড়ে গেছে-সেদিন পাড়ার ফুটবল ম্যাচের ফাইনাল খেলা, হোঁৎকা নিজে খেলছে-হোঁৎকা আর গোবর্ধন ওরফে গোবরা দুজন দলের ব্যাক। তাই ফোর্থ পিরিয়ডের ক্লাস না করেই পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়বি তো পড় একেবারে হেড স্যারের চোখে পড়েছে।

বিক্রমবাবু সেদিন স্কুলের পিছনদিকে বিল্ডিং-এর কাজ দেখে ফিরছিল আর সেই মুহূর্তে হোঁৎকা পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে তার ঘারেই পড়েছে। হোঁৎকা-গোবরা ভাবতেই পারেনি যে হেড মাস্টার এভাবে এদিকে এসে পড়বে। হেড স্যার তাদের দুটোকে ধরে নিয়ে এসে সেদিন স্কুলের অফিসের সামনে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখেন স্কুল ছুটির পর অবধি।

ওদিকে গোবরা আর হোঁৎকাকে ছাড়াই তার ফুটবল টিম ফাইনাল খেলায় নেমেছে-শেষ পর্যন্ত তাদের টিম ছ-খানা গোল খেয়ে গো-হারান হয়েছে।

স্কুল থেকে ছাড়া পাবার পর ক্লাবে এসে দেখে দলে জয়জয়কার নয়-হাহাকার চলছে। টিম ছয় গোল খেয়ে বসে আছে। হোঁৎকার এবার রাগ গিয়ে পড়ে স্যারের উপর। হোঁৎকা বলে, ওই হেডুরে আমিও দেইখা লইমু। অর জন্যে জেতা খেলা হাইরা গেলাম। ছ-ছয় খান গোল খাইলাম।

গোবরা বলে-কি করবি?

হোঁৎকা বলে-কি আর করব? যা হবার তো হইয়া গেছে।

চ্যালেঞ্জ কাপ খানা হাত থেকে চলে গেল।

গোবরা-ছেড়ে দে যা হবার হয়ে গেছে।

হোঁৎকা বলে-যা লজ্জাজনকভাবে আমাদের হারতে হইল তাতে আমাগো সুইসাইড ছাড়া কোনো পথ নাই।

আমি বলি-হ্যাঁরে। সুইসাইড মানে তো আত্মহত্যা। তুই কি তাই করবি ভাবছিস।

গোবরা ভরসা দেয়-থাম তুই। উঃ বুকখানা ফেটে যাচ্ছে রে হোঁৎকা। ওই হেডু স্যারই আমাদেরকে মার্ডার করল।

ক্লাসে আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত। পান থেকে চুন খসলেই হেড স্যারের তলব। স্কুলে কেউ গোলমাল পাকালে কেউ মারপিট করলে অমনি বিক্রম স্যারের তৎপরতা শুরু হল।

সেবার পলাস ক্লাসে যেভাবে নিত্যকে সামান্য কি কারণে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে-তার বুকের ওপর চেপে বসে স্কুলের নাটকের

দুঃশাসনের মত গর্জন করে বলছিল, -রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটাইবো মোর।

হেড স্যারের নজরেই পড়ে যায় সেই রক্তপানের দৃশ্যটা। তিনি দুঃশাসনরূপী নেত্যর কান ধরে টেনে তুলে বেশ করে মুলে দিয়ে গার্জেন কল করে গার্জেনকে ডেকে নিত্যর মহাভারত কাহিনি ব্যাখ্যা করে তাঁদেরকে হুঁশিয়ারি দেয়।

ক্লাস নাইনের দোল গোবিন্দ ভালো হিন্দি গান গায়। আমরা ওকে ক্লাস কুমার বলি। তার গান শুনে সেবার স্যার ক্লাসে ঢুকে দোল গোবিন্দের গলাটাই টিপে ধরে-তাতে করে বেচারার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। এমনকী পাঁচ পিরিয়ড পর্যন্ত বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এ যেন আমাদের সকলেরই অপমান।

এভাবেই যতদিন যায় বিক্রম স্যারের বিক্রম ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল আর আমাদের লাইফ ও হেল হয়ে উঠল।

এদিকে হোঁৎকাও নীরব রাগে ফুঁসছে-তার টিম ছ-গোলে গোহারান হেরেছিল। হোঁৎকার মাথায় মাঝে মধ্যেই নানা উদ্ভট বুদ্ধি খেলে। আমাদের ক্লাসে সেই বিশেষ পরামর্শদাতা। যতিন-অর্করাও বলে-একটা কিছু কর হোঁৎকা। এ তো স্কুল নয় রে-যেন জেলখানা হয়ে গেছে রে।

হোঁৎকা বলে-ভাবতাছি এই স্কুলই ছাইরা দিমু-তয় মোকা খুঁইজ্যা হেডুরে এমন গোঁৎতা দিয়া যাইবো। হোঁৎকা তার দেশজ ভাষাতেই কথা বলে।

আমি বলি-যাবার আগে কিছু একটা কর। একটা ফিনিসিং টাচ্‌ দিয়ে যা।

কদিন পরেই আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা উৎসব। এবারে বৈশাখের শেষদিকে পড়েছে উৎসবটা। এতদিন স্কুলের মাঠেই মঞ্চ বেঁধে উৎসব পালন করা হত-সেখানে কিছু নেতা-শিক্ষকরা ভাষণ দেন। তারপর আমাদের নাচগান-নাটক করা হত।

এইবারে বিক্রম সরখেল এই উৎসব আরও ঘটা করে করতে চান-যাতে স্কুলের প্রচার বেশি করে হয়। এবার সব ছাত্রদের নিয়ে বিক্রমবাবু বলেন-বেলা নয়টায় স্কুল থেকে পদযাত্রা শুরু হবে প্রসেসান করে। সব ছেলেকে সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিতে হবে। শহর পরিক্রমা করে দুপুরে এই পদযাত্রা ফিরে আসবে স্কুলে।

বিকালে আবার সন্ধে পর্যন্ত ভাষণ-নাচগান অন্যান্য অনুষ্ঠান হবে।

বিক্রমবাবু অর্ডার দেন-সব ছাত্রকেই উপস্থিত থাকতে হবে পদযাত্রায়।

বৈশাখ মাস-অনেকদিন বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। সকাল থেকেই রোদ, সঙ্গে ভ্যাপসা গরমে জেরবার হতে হচ্ছে।

আমাদের শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। রোদের তাপও বাড়ছে। সমবেত গান গাইতে গাইতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। রোদের তাপটা ক্রমশ বাড়ছে। বোতলে জলও শেষ। এদিকে আবার গান থামালেই বিক্রমবাবু গাড়ি থেকে চিৎকার করবে-থামলে কেন? গান গেয়ে যাও-

আর গান। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঘামছি-রোদের তাপে চোখে সরষের ফুল দেখছি-পথ চলতে চলতে মনে হয় মাথা ঘুরেই এবার ছিট্‌কে পড়তে হবে। তবু গলা ছেড়ে গাইতে হচ্ছে।

পথের দুদিকে উৎসাহী দর্শকের ভিড়-ঠা ঠা রোদে আমাদের করুণ অবস্থা তারাও দেখছে। জনতার মধ্যে থেকে গুঞ্জন ওঠে-এই ঠা ঠা রোদে ছেলেগুলোকে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে?

কে বলে-বেচারারা আধমরা হয়ে গেছে। সান স্ট্রোক না হয়ে যায়।

ওদের দেহয় দয়ামায়া আছে, হেড স্যারের তা নেই। চলতে আর পারছি না।

গোবরা বলে-মাথা ঘুরছে রে।

ওদিকে গুম হয়ে চলেছে হোঁৎকা। সেও শুনেছে-গোবরা কি বলেছে-পা আর চলতে চাইছে না তবু চলতে হচ্ছে,-তবু গান গাইতে হচ্ছে।

হরিসাধন বলে-মরে যাব রে হোঁৎকা। কিছু একটা কর।

হোঁৎকা গুম মেরে চলেছে। হেড স্যারের আবার চিৎকার শোনা যায়। হঠাৎ কলরব ওঠে-হোঁৎকা রোদের মধ্যে হঠাৎ ছিট্‌কে পড়েছে রাস্তায়।

হোঁৎকা রাস্তায় ছিটকে পড়ে ছটফট করছে-চোখ কপালে উঠে গেছে-মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। শোভাযাত্রা থমকে যায়। পথচারীদের ভিড় জমে যায় মুহূর্তে। এর মধ্যে পথের ধারে দোকান থেকে জল এনে চোখে-মুখে দেওয়া হয়েছে। হোঁৎকা তবু ছটফট্ করেই চলেছে সঙ্গে গোঙানির শব্দ ওঠে।

লোকজন এবার ফুঁসে ওঠে-এই রোদে ছেলেগুলোকে পদযাত্রা করাচ্ছেন মশাই। আপনারা মানুষ না অন্যকিছু। বিক্রম স্যারও গাড়ি থেকে নেমে এসেছে-পথচারীরা এবার হেড স্যারকেই আক্রমণ করে।-মারবেন নাকি মাশাই, এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে। এ রোদে কেউ ছেলেদের নিয়ে এইভাবে বাইরে বেড়ায়। আপনি মাষ্টার না মার্ডারার। বন্ধ করুণ আপনাদের এই পদযাত্রা। না হলে আমরাই প্রতিবাদ করব।

এর মধ্যে কে যেন অ্যাম্বুলেন্সেও খবর দিয়েছে-ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সও এসে পড়ে। চোখে-মুখে জল দিতে হোঁৎকা এবার একটু সাড়া দেয়।

হেড স্যারও ঘাবড়ে গেছে-বাবা হোঁৎকা। এখন কেমন লাগছে?

-আঁ্যা। হোঁৎকা একটা শব্দ করেই আবার লেপটে পড়ে। এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় হোঁৎকাকে।

হেডু-র পদযাত্রা এখানেই ভেস্তে যায়। হেড স্যার বাধ্য হয় তার সাধের পদযাত্রার ইতি টানতে।

আমরা হোঁৎকাকে হাসপাতালে রেখে বাড়ি ফিরে গেলাম। মনটা ভালো নেই। বিকালে তবু স্কুলে আসতে হয়েছে। আমাদের

অনুষ্ঠান আছে-তাছাড়া হেড স্যারের হুকুম।

পরের দিন দেখি যথারীতি ক্লাবে এসেছে হোঁৎকা। সঙ্গে গোবরাও আছে।

আমি বলি-কি রে? হাসপাতাল থেকে এত তাড়াতাড়ি তোকে ছুটি দিয়ে দিল?

হোঁৎকা বলে-ধুস। ওসব আমার কিছুই হয়নি। তোরা রোদে আর হাঁটতে পারছিলি না আর হঠাৎ লোকজনের মুখে সান স্ট্রোকের কথাটা শুনে হেডুকে একটা শিক্ষা দেবার মওকা হাতছাড়া করতে পারলাম না। আর তাই রাস্তায় ছিট্‌কে পড়ে একটা নাটক করলাম। আমার কিছুই হয়নি। ডাক্তাররাও তাই আমাকে ছাইরা দিল।

পরের দিন থেকে হেড স্যারের ব্যবহারটা কেমন যেন একটু নরম হয়ে গেছে। শুধু হোঁৎকা কেন অনেককেই একটু ছাড়পত্র দিয়েছেন। হোঁৎকাও তাই এই স্কুলেই রয়ে গেছে আগের মতই।

ললিত চ্যালেঞ্জ শিল্ড

ঘটনার বিশদ বিবরণ আমরা শুনেছি হোঁৎকার কাছেই। বেশ মজাদার ঘটনা। হোঁৎকা বেশ ক'দিন ছিল না, সে গিয়েছিল বীরভূমের কোনো গ্রামে তার মামার বাড়িতে। অবশ্য দু'-চারদিনেই বাড়ি ফিরে আসবে ঠিক ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে মামার অনুরোধে আরও বেশ কয়েকদিন থেকে যেতে হয়েছিল।

মামাদের গ্রামটা বেশ বড়ই। কয়েকটা পাড়া নিয়ে গ্রামটা। গ্রামে একজন নাকি বিরাট জমিদার পরিবার ছিলেন। তখন তাঁদের বেশ রমরমা ছিল। এখন জমিদারি গিয়েছে, তবুও তাঁদের দু'-একজন এখনও বেশ দাপটের সঙ্গেই আছেন। শশীপদবাবু তাঁদেরই একজন। বয়স হয়েছে, তবে সেটা কখনও তাঁর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শশীপদবাবু, তিনি বড় ফুটবলার হবেন। তাঁর ঘরে মোহনবাগান ক্লাবের নামি ফুটবলারদের ফোটোর পাশে মারাদোনা ও আরও কয়েকজন বিদেশি প্লেয়ারের ফোটোও আছে।

শশীপদবাবু নিজে অবশ্য ফুটবলার হতে পারেননি। কিন্তু এখনও তিনি গ্রামের ছেলেদের নিয়ে রোজ মাঠে ফুটবল খেলেন। নিজে ফুটবলার না হয়েও ছেলেদের ট্রেনিং দেন। শশীপদবাবু তাঁর নিজস্ব খেলার পোশাক, পায়ে ক্যাম্বিস জুতো পরে মাঠে নামেন। এসব ছেলেদের নিয়েই তাঁর দিন কাটে। বেশ কিছু ভালো ছেলে যারা ভালো খেলে, শশীপদবাবু তাদের নানাভাবে সাহায্যও করেন।

হোঁৎকার মামা এই শশীপদবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু। সেই মামাও ফুটবল ভালোবাসেন। তাই তিনি শশীবাবুর সহকারী হয়ে উঠেছেন।

গ্রামের পাশেই বয়ে যাওয়া নদীর চরে বিস্তীর্ণ জায়গা শশীবাবুর এলাকা। এক-একদিকে চরের পাশে অবশ্য চাষাবাদ ভালোই হয়। আখ, অন্য আনাজপত্র প্রচুর হয়। এর থেকে যা আয় হয় শশীবাবু সেটা ফুটবলের জন্যই খরচ করেন। এই আনাজখেতের একদিকে বেশ খানিকটা জায়গায় তিনি দু'টো ফুটবলের মাঠ গড়ে তুলেছেন। গোলপোস্টও তৈরি আছে। চারপাশে চুন দিয়ে মার্কিংও করা হয়েছে। মহকুমা শহর, আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেক টিম এখানে আসে খেলতে। অবশ্য এসবের উদ্যোক্তা শশীবাবু নিজেই। সঙ্গে গজাবাবুর মত কয়েকজন বাবুও আছেন। ফলে এই গ্রামে শশীবাবুর স্বপ্নের ফুটবল বেশ আদরেই লালিতপালিত হয়।

শশীবাবু তাঁর প্রিয় ফুটবল টিমকে আশপাশের গ্রামে ম্যাচ খেলতেও পাঠান। তাঁর টিম যেসব ট্রফি জিতে আসে, শশীবাবু সেগুলোকে তাঁর বাড়ির একটা ঘরে বেশ সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন ওইসব দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়দের পাশে।

শশীবাবুর পিসিমা বলেন, 'শশী আমার ফুটবল নিয়েই পাগল।' শশীবাবু বলেন, 'এটা বাংলার গৌরব পিসিমা। এর কথা তুমি বুঝবে না।'

শশীবাবুর ক'দিন থেকে মনমেজাজ ভালো নেই। ওদিকে মানিকপুর গ্রামের ভূপতি জমিদার ললিতমোহনবাবুর নামে বিরাট শিল্ডের প্রতিযোগিতা চালু করেছে মানিকপুর বয়েজ ক্লাব। ক'বছর ধরেই চলছে ওদের প্রতিযোগিতা। মানিকপুরে এই পরিবার এখনও স্বনামে বিরাজ করছে। এরা আবার শশীবাবুর দাদার সম্বন্ধী।

মানিকপুরের ছেলেরাও ফুটবল খুব ভালোবাসে। ভূপতিবাবুর ছেলে কিশোরীবাবুর অনুরোধে শশীবাবুও বারদুয়েক ওঁর টিম নিয়ে গিয়েছিলেন সেই শিল্ডের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু দু'বারই বেদম হেরে এসেছেন কিশোরীবাবুদের টিমের কাছে। কিশোরীবাবু বললেন, "শশী, তোমার এত মুরোদ নেই যে মানিকপুর থেকে শিল্ড নিয়ে যাবে।"

ইঙ্গিতটা শশীবাবুও বুঝেছিলেন। বললেন, "দেখা যাক। এক মাঘে তো আর শীত যায় না! এই শশীপদবাবুর দিনও একদিন আসবে।"

কিশোরী বলেনন, "সেদিন কবে আসবে তার ঠিক নেই হে। তুমি আজীবন চেষ্টা করে যাও, কিন্তু পারবে না।"

মানিকপুরও বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামে কিশোরীবাবুর বিরাট ধানকল রয়েছে। শশীবাবুদের মত সমগোত্রীয়। তবু এই দুই পরিবারের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা লেগেই রয়েছে। আর সেটা ছড়িয়ে পড়েছে এই দুই গ্রামেও।

শশীবাবুর ইজ্জতে ঘা লাগে কিশোরীবাবুর কথায়। শশীবাবু তখন থকেই ভাবছেন কী করে ওই কিশোরীবাবুর টিমকে পর পর কয়েকটা গোল খাইয়ে তাঁকে মুখের মত জবাব দিতে পারবেন।

তাই শশীবাবু এবারও ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক মানিকপুর বয়েজ ক্লাবকে হারাতেই হবে। তাই তিনি এবার তাঁর বাবার নামে একটা চার ফুট উঁচু শিল্ড চালু করলেন। মানিকপুরের শিল্ডের উচ্চতা তিন ফুট। তাঁর শিল্ড হবে মানিকপুরের শিল্ডের চেয়েও উঁচু। আর তিনি মানিকপুরকে চ্যালেঞ্জ করলেন শিল্ড নিয়ে যেতে। এর ফলে তিনিও তাঁর টিমকে শক্তিশালী করে তুলবেন।

সেই শিল্ড তৈরি করাতে কলকাতায় পাঠিয়েছেন শশীবাবু হোঁৎকার মামাকে। কলেজ স্ট্রিটের অনেক দোকানে এসব খেলার সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়। তাই কলকাতায় মামাবাবু এসেছিলেন। ফেরার সময় হোঁৎকা তার মামার সঙ্গে মামাবাড়িতে গিয়েছে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে।

মামাদের আমবন আছে, এবার নাকি আম-লিচু বেশ ভালোই হয়েছে। হোঁৎকা আমের ভক্ত। অবশ্য এমনিতেও সে ভোজনরসিক। সুতরাং আম-লিচুর লোভেই যে সে মামার বাড়ি গিয়েছে, এ কথাটা হোঁৎকাকে যে চেনে সেই বলবে।

বিকেলে মামাবাবু মাঠে গিয়েছেন। শশীবাবুর কোচিং-এর সহকারী তিনি। হোঁৎকাও রয়েছে। হোঁৎকা ওদের টিমের জবরদস্ত ব্যাক। সে শুধু ভোজনরসিকই নয়, তার স্বাস্থ্যটাও দেখার মত। এমনিতে 'পঞ্চপাণ্ডব' ক্লাবের ছেলেদেরই স্বাস্থ্য দেখার মত। একদিকে হোঁৎকা, অন্যদিকে গোবরা। ওদের শুধু বুদ্ধিই নয় গায়ের জোরও তেমনি। ফুটবলে লাথি মারলে বল নয়, যেন কামানের গোলা ছুটছে মনে হয়।

সেই হোঁৎকা ওখানে গিয়ে খেলতে নেমেছে। শশীবাবু প্রথমে খেয়াল করেননি। তারপর হোঁৎকার দু'-একটা শট আর খেলার ধরন দেখে শশীবাবু ওর কাছে এলেন, "এটা কে রে! নতুন মনে হচ্ছে?"

একজন বলল, "শশীদা, ও তো রতনবাবুর ভাগ্নে।"

শশীবাবু খুশি হলেন। বললেন, "তুমি রতনের ভাগ্নে?"

রতনবাবুও এবার ওদের কাছে এলেন।

শশীবাবু বললেন ,"তোমার ভাগ্নে যে এত ভালো খেলে তা তো বলোনি?"

মামা বললেন, "ওদের টিম কলকাতার ডিভিশন খেলে।"

"খেলতেই হবে। ওর ব্যাকিং শটের সেন্স দেখেই বুঝেছি ও জাত প্লেয়ার। ভালোই হল, একজন জবরদস্ত ব্যাক খুঁজে পেলাম।"

পশুপতি বলল, "স্যার, দারুন পজিশন জ্ঞান ওর। পায়ে দারুন জোর, দু'টো পা'ই সমান চলে। আর গার্ডটা যা দিচ্ছে!"

"নে নে, খেলাটা আবার শুরু কর দেখি। আর একটু খেলা দেখি ওর।"

শশীবাবুর কথা শেষ হতেই আবার খেলা শুরু হল। হোঁৎকাও খেলতে থাকল তার নিজের স্টাইলে।

শশীবাবুও খুব খুশি হলেন। এবার শশীবাবুর মনে হল, টিমটা যা তৈরি হয়েছে তাতে করে এবার তিনি কিশোরীবাবুকে তাঁর মুখের মত জবাব দিতে পারবেন।

হোঁৎকা সেই সব কথাই ফিরে এসে আমাদের বলেছে। ক্লাবের মাঠ, আমরা সকলেই রয়েছি। পটলাও আজ বেশ খোশমেজাজেই রয়েছে। এর মধ্যে সে আজ গোবিন্দদার দোকান থেকে আইসক্রিম অর্ডার দিয়েছে।

পটলা বলল, "তা হলে মানিকপুরের শিল্ড নিয়ে এসেছিস?"

হোঁৎকা বলল, "না। হইল না। তীরে আইসাও তরী ডুইবা গেল গিয়া।"

আমি বললাম, "কেন? ফাইনালে উঠেও হেরে গেলি?"

হোঁৎকা বলল, "হারলাম কি? তারপর যা হইল তা সাংঘাতিক কাণ্ড।"

হোঁৎকা তার অভিজ্ঞতার কথা শুরু করল, "আর একখান আইসক্রীম দে। গলা শুইখা আইতাছে।"

আরও একটা আইসক্রিম দেওয়া হল হোঁৎকাকে। হোঁৎকা শুরু করল তার মানিকপুরের কাহিনি, "শশীবাবু তো এবার একটা দুরন্ত টিমই তৈরি করেছেন। শশীবাবু সেদিন রতনবাবুকে বললেন, 'কয়েকদিন তোমার ভাগ্নেকে থেকে যেতে বলো রতন। ওকে আমাদের দরকার। এবার ও থাকলে মনে হচ্ছে কিশোরীবাবুকে মুখের মত জবাব দিতে পারব।' "

এর মধ্যে কয়েকটা প্র্যাকটিস ম্যাচও হয়ে গিয়েছে। শশীবাবুও তাঁর টিমকে পাঠিয়েছেন এবার মানিকপুরের শিল্ডে। এবার হোঁৎকা আসায় তাঁর টিমের চেহারাটাই বদলে গিয়েছে। এর মধ্যে মানিকপুরে ললিতমোহন শিল্ডের কয়েকটা খেলায় শশীবাবুর টিম বেশ কয়েকটা নামি টিমকে পরাজিত করে একদিক থেকে ফাইনালে উঠেছে। আর অন্য দিকে কিশোরীবাবুর টিমও বেশ কয়েকটা প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। তবে এর মধ্যে শশীবাবুর টিমই গ্রামের দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেকেই বলছে, এবার বেস্ট প্লেয়ার হবে ওই শশীবাবুর ব্যাকই। কী খেলাটাই না খেলে ছেলেটা!

শশীবাবু বললেন, খেলবে না! ও তো কলকাতার ডিভিশন খেলে।

কিশোরীবাবুও দেখেছেন হোঁৎকার খেলা। তিনিও বললেন, ছেলেটা দারুন খেলে হে গুপি! দু'টো পা'ই সমান চলে, আর চার্জিংও তেমনই! ওর জন্যেই না আমরা হেরে যাই!

গুপিবাবু কিশোরীবাবুর ধানকলের দালাল। সারা এলাকার ধানচাষীদের কাছ থেকে দু'নম্বরি করে কিনে আনে। সেসব চাল পাঠায় শহরেও। গুপি এভাবে দু'দিক দিয়েই ভালোই রোজগার করে। তাই কিশোরীবাবুকে খুশি রাখতে হয় তাকে। গুপিনাথ এমনিতেই করিৎকর্মা। সে জানে, কোনো পথে কীভাবে কাজ আসান করতে হয়। এই খেলায় সেও জানে মানিকপুরকে জিতিয়ে আনতেই হবে।

কিশোরীবাবু বললেন, শশীবাবুর টিম যদি জিতে শিল্ড নিয়ে চলে যায়, তার মানে বাবাও চলে যাবেন গ্রামের বাইরে।

গুপিনাথ বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। শশী চৌধুরীর টিমকে জিততে আমি দেব না।"

কিশোরীবাবু বললেন, "দ্যাখ, যদি কিছু করতে পারিস।"

গুপিনাথ বলল, "সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

তবু কিশোরীবাবুর ভয় গেল না। ঠাকুরের কাছে প্রর্থনা করলেন যেন তাঁর টিম মুখরক্ষা করতে পারে। মানিকপুরের দূরত্ব শশীবাবুর গ্রাম থেকে খুব বেশি নয়। তবে মন্দারক্ষী নদী, তারপর খানিকটা ধানমাঠ, তারপরেই মন্দারক্ষীর একটা শাখানদী। সেই নদীর নাম কোনো নদী।

ওর ওপারেই নদীর ধারে আমবাগানের লাগোয়া খেলার মাঠ। গ্রাম একটু দূরে। ফাইনালে উঠল একদিকে মানিকপুর বয়েজ ক্লাব, আর অন্য দিকে শশীবাবুর টিম রায়চৌধুরী ক্লাব। ফাইনাল খেলার দিন শশীবাবুর দল তৈরি হয়ে এল মানিকপুরের মাঠে। মাঠটা এর মধ্যে রঙিন কাগজের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ওদিকে একটা মঞ্চও করা হয়েছে। সেখানে একটা উঁচু টেবিলের উপর সেই তিন ফুটের শিল্ড টাকে লাল জবাফুলের মালা পরিয়ে সাজানো হয়েছে। পাশে রাখা আছে বিজেতা টিমের জন্য ছোট-বড় নানা সাইজের ট্রফি। ওদিকে মাইকে তখন হিন্দি গানের রেকর্ড চলছে। মাঠের চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়। আর কিশোরীবাবুর অনুরোধে অনেক মান্যগণ্য মানুষও এসেছেন খেলার মাঠে।

শশীবাবুর টিমের সঙ্গে হোঁৎকা এল এখানে। সে দেখল, এই গ্রাম-অঞ্চলেও ফুটবল নিয়ে কী উত্তেজনা! মাঠ ভর্তি লোক উৎসাহে দাঁড়িয়ে। তাদের তুমুল শব্দ। ওদিকে গোলপোস্টে লাগানো হয়েছে মাছ ধরার জাল। বাদ্য-বাজনার শব্দ উঠেছে, সেইসঙ্গে সারামাঠে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। দেখা গেল, মাঠের একদিকে বাদ্যি বাজিয়ে প্লেয়াররা সেজেগুজে আসছে।

অবাক হল হোঁৎকাকে বলল, "ওরা কিশোরীবাবুর কাছে বয়ই। ওরাই এই ক্লাবের প্লেয়ার।"

"আমাদের দলে সকলে তরুণ। ওদের তুলনায় আমাদের সকলের বয়স কম। ওদের দলের প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ই আমাদের বাবার বয়সি। লাল জার্সি, সাদা প্যান্ট। ওরা মাঠে নামার আগে একটু নেচে নিচ্ছে। কিশোরীবাবুর সমর্থকরা হাততালি দিয়ে ওদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। সারা মাঠে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'জিতছে কে, মানিকপুর বয়েজ ক্লাব আবার কে,'। এদিকে হোঁৎকাদের জন্য কোনো জয়ধ্বনি নেই। হোঁৎকাও ক'দিন এখানে খেলে গিয়েছে। সে বুঝেছে এদের হারানো সহজ নয়।

এর মধ্যে হোঁৎকা শশীবাবুর টিমের প্রিয় নেতা হয়ে উঠেছে। সকলে ওর কথা মানে। হোঁৎকা যা বলে, তাই ওদের কাছে বেদবাক্য। হোঁৎকা দেখল মাঠের পাশেই নদী আর তাতে জলের গভীরতা প্রায় বুক-সমান। তার স্রোতও বেশ তীব্র। নদীর চরেই রয়েছে একটা ইট ভাঁটা, ইটের পাঁজা। এই ইট গ্রামেরই নানা দরকারে কাজে আসে। সেখানে কিছু ইট নেওয়া হয়েছে আর বাকি ইট স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে।

হোঁৎকার মাথায় একটা মতলব এসে গেল।

হোঁৎকা দেখল শশীবাবুর দলের সঙ্গে ওই গ্রামের কিছু উৎসাহী দর্শকও রয়েছে। তারাই বলল এসব ব্যাপার দেখে, "কিশোরীবাবু লোকটা ভালো নয় গো। ও আমাদের কিছুতেই জিততে দেবে না। আর জিতলেও শিল্ড নিয়ে যেতে দেবে না।"

অন্যরাও বলল, "তাও করতে পারে। ওই লোকটা সব পারে।"

হোঁৎকা ও তার টিম তখন চলে এসেছে। দলের তখন নেতা সে। এরকম সংকট মুহূর্তে তার বুদ্ধিটা বেশ ভালোই খোলে। হোঁৎকা বলল দলের বেশ কিছু সমর্থককে, ওরা গিয়ে নদীর ওপারে যেন ইট ভাঁটার দখল নিয়ে রেডি হয়ে থাকে। গোলমাল হতে পারে।

বাকি টিমের প্লেয়ারদের বলল, "মাঠে নেমে আজ যেভাবে হোক জিততেই হইব।"

হোঁৎকার বিশ্বাস, মানিকপুরের বয়সি খেলোয়াড়দের চেয়ে তার টিমের তরুণ খেলোয়াড়রা অনেক ভালো খেলবে। হোঁৎকা এও বুঝেছে, ওই টিমের খেলোয়াড়রা খেলার চেয়ে মারপিটটা ভালোই করবে।

ওদিকে ওদের টিমে রয়েছে দু'দিকে দুই গাট্টাগোট্টা চেহারার লোক। তার মধ্যে একজন তো গ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, মানুষের চিকিৎসা ছাড়া গোরু-ছাগলের চিকিৎসাও করে। সে আবার কিশোরীবাবুর পেয়ারের লোক।

এদের মধ্যে একজন বেশ পাক খাওয়ানো গোঁফওয়ালাও আছে, তার আবার একটা চোখ ট্যারা। কোনো দিকে কখন সে তাকায় সেটা বোঝাই মুশকিল।

ওদিকে কিশোরীবাবুর ধানকলের দালাল গুপিনাথসহ আরও কয়েকজন ভীমদর্শন লোক রয়েছে।

খেলা শুরু হল। খেলা তো নয় যেন বয়েজ ক্লাব একজোট হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমানে হাত-পা চালাচ্ছে শশীবাবুর টিমের ছেলেদের উপর। তবু সফল হচ্ছে না। ওদের ফরোয়ার্ড-স্ট্রাইকারদের একটু লাগলেই বাঁশি বেজে উঠছে, ফাউল।

রেফারি শুধু সুযোগ খুঁজছে কখন পেনাল্টি দেওয়া যায় একটা। শশীবাবুর দলের দু'টো ফরোয়ার্ড প্লেয়ার ওদের কয়েকজন প্লেয়ারকে ডজ করে দূর থেকে শর্ট নিতেই বলটা জালে জড়িয়ে গেল।

চকিতার মধ্যে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। সকলে দেখল, মানিকপুর গোল খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিশোরীবাবু গর্জন করে উঠলেন, "অফ সাইড। এ গোল, গোল নয়।"

রেফারিরও কিছু করার নেই, গোল হয়ে গিয়েছে।

এবার শশীবাবুর দলও চেঁচিয়ে উঠল। তার মধ্যে বয়েজ ক্লাবের একটা ধুমসো, শশীবাবুর ক্লাবের দু'জনকে স্রেফ ঘুসি মেরেই আধা ঘায়েল করল।

আবার খেলা চলতে-চলতে কিশোরীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "বল যায় যাক, ওদের ফিনিস করে দে। হরি, এই ব্যাটা হরি রেফারি হয়েছে! দে, পেনাল্টি দে।"

বল ওদিকে যাচ্ছে না। হোঁৎকাও এগিয়ে এসেছে। এবার হোঁৎকার পায়ে বল। ওদিকে একটা ব্যাক তাকে পিছন দিক থেকে বেশ জোরেই লাথি মারার জন্য পা ছুড়ল।

হোঁৎকাও চকিতের মধ্যে সরে গিয়ে ওদের গোল লক্ষ্য করে শর্ট মারল, আর সেটাও গোলপোস্টের পিছনে সেই মাছ ধরার জালে জড়িয়ে গেল।

হরিহর বাঁশিতে ফুঁ মারতেই কিশোরীবাবু গর্জন করে উঠলেন, "অ্যাঁ, ফুঁ মারছেন? খেলার পর দেখাচ্ছি ব্যাটাকে।"

এর মধ্যে হাফটাইম হয়ে গেল। শশীবাবুও খুব খুশি। কিন্তু ওদের দলের তিনজনকে বেশ জোরেই মেরে ঘায়েল করেছে ওরা।

কিশোরীবাবুর মন-মেজাজ ভালো নেই। রেফারি এসেছে কাছে, "কী করছ কী হরি? পেনাল্টি দাও! কলকাতার ছেলেটাকে লাল কার্ড দেখিয়ে বাইরে বের করে দাও। শিল্ড গাঁয়ের বাইরে চলে গেলে তোমাকেও ছাড়ব না। যাও, সেই বুঝে বাঁশিতে ফুঁ মারো।"

আবার খেলা শুরু হল। এবার বয়েজ ক্লাবের ছেলেরা আরও মারমুখী। ওদের টার্গেট এবার হোঁৎকা। বয়েজ ক্লাবের এক ধুমসো, হোঁৎকাকে মারতে রেফারি মওকা পেয়ে হোঁৎকার বিরুদ্ধেই ফাউল আর পেনাল্টি দিল।

হোঁৎকা বলল, "না। এখন কেউ কিছু করিস না। খেলাটা জিতে শিল্ড নিয়ে তারপর যা করার করতে হবে।"

হোঁৎকা এবার সতীশকে বলল, "দলের অন্যদের নিয়ে নদীর পাশে সেই ইটভাঁটায় চলে যা। ওরা ফের যদি মারপিট শুরু করে, এবার আর আমরা ছাড়ুম না।"

হোঁৎকা এবার সত্যিই রেগে গেল। ওদিকে রেফারি তখন পেনাল্টি দিল। কিশোরীবাবু হাঁক পাড়লেন, "অ্যাই, বাদ্যি-বাজনা রেডি রাখ। গোল হলেই জোরে বাজাবি।"

বয়েজ ক্লাবের ক্যাপ্টেন সেই গোঁফওয়ালা বয় শট নিল, আর বাদ্যি-বাজনা বেজে উঠল। কিন্তু কোথায় গোল? বল গোলকিপারের হাতে। এমন সুযোগও চলে গেল?

কিশোরীবাবু গর্জে উঠলেন, "বাজাও, বাজাও আরও জোরে। কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। গোল হল না, ওঁরা বাজিয়ে যাচ্ছে! অ্যাই, চোপ, চোপ।"

কিশোরীবাবুর তর্জন-গর্জনে এদের টিম আরও শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সতীশ ততক্ষণে নদীপারে সেই ইটভাঁটায় চলে গেল অন্য ছেলেদের নিয়ে। সতীশও দেখল, কিশোরীবাবুর দলের ছেলেরা অন্যরকমভাবে মেরে ঘায়েল করেছে শশীবাবুর দলের ছেলেদের।

কিশোরীবাবুর দল অনেক চেষ্টা করেও কোনো গোল দিতে পারল না। কিশোরীবাবু এবার নিশ্চিত হারবেন জেনে গ্রামবাসীদের নিয়ে হইহই করে এলেন কোনো এক বাহানা করে।

হোঁৎকারাও তৈরি ছিল আগে থেকেই। এমন একটা কিছু হবে অনুমান করেছিল। হোঁৎকা জানত, এখান থেকে জিতে শিল্ডে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না।

কিশোরীবাবুর মত গ্রামবাসীরাও এই হারটাকে সহজে মেনে নিতে পারছিল না, তাই বারুদে একটা দেশলাই কাঠি পড়তেই গ্রামবাসীরাও কিশোরীবাবুর সঙ্গে হইহই করে ধেয়ে এল শশীবাবুর দলের লোকজনের উপরে। গ্রামবাসীরাও শিল্ড গ্রামের বাইরে যেতে দিতে নারাজ। তাই বুকভরা জলের মধ্যে দলবল ঝাঁপিয়ে পড়ল, এদিকে এসে শশীবাবুর দলের লোকদের তাড়া করে মারবে।

হোঁৎকা এসব আগেই ভেবেছিল। শশীবাবুর দলের লোকরা পালিয়ে এসেছে, পিছনে কিশোরীবাবুর দলের লোকরা। ওরা রে-রে করে জলে নামল পার হবে বলে। তখন নদীতে শুধু মানুষ। ঠিক তখনই শুরু হল ইট-বৃষ্টি।

লোকগুলো স্রোতের সঙ্গে লড়বে, না মাথা বাঁচাবে? বৃষ্টির মত ইট এসে পড়ছে। অনেকের মাথা ফাটছে। কারও আবার হাত ভাঙছে। কারও কপাল ফাটছে। হোঁৎকা তখন নদীর পার থেকে সেই মাছ ধরার জালে ইট পুরছে।

ওদিকে জলবন্দি লোকগুলোর তখন চোট পেয়ে বেহাল অবস্থা। হোঁৎকা এবার জালটা কিশোরীবাবুকে লক্ষ্য করে ছুড়ল, আর কিশোরীবাবুও নিজের মাথা বাঁচাতে খেয়াল করলেন না জালটাকে। তখন তিনি জালে জড়িয়ে বক-ভর্তি জল-কাদায় নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন।

এদিকে খেলা তো ভণ্ডুল হয়ে গেল। হোঁৎকারা খেলায় জয়ী হয়েও শিল্ড পেল না। তবে হোঁৎকারা যুদ্ধ জয় করেই ফিরে এল।

কিশোরীবাবু তবু খুশি।

গুপি বলল, "যাক, খেলা ভেস্তে গিয়ে ভালোই হয়েছে! শিল্ড তো আর হাতছাড়া হয়নি।"

কিশোরীবাবু বললেন, "শশী চৌধুরীকে আমি শিল্ড ছুঁতে দেব না।"

শশীবাবুও সব শুনলেন। এ নিয়ে গ্রামের দর্শকরাও নানা আলোচনা করছে। অনেকেই বলছে, এটা মানিকপুরের অন্যায় কাজ হয়েছে।

শিবপুরের লোকরা আরও বলল, "কান ধরে ললিত চ্যালেঞ্জ শিল্ড এই গ্রামে আনা উচিত। খেলা পুরোটা হলে আমাদের দলের কাছে ওরা হারতই। তাই মারপিট শুরু করে খেলাটা ভণ্ডুল করে দিল।"

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। হোঁৎকা আবার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। তবু বিকেলে ক্লাবে গেল।

হঠাৎ একদিন হোঁৎকার মামা এসে হাজির।

শশীবাবুর জেদও কম নয়। যেভাবেই হোক শশীবাবু ওই ধানকলের মালিক কিশোরীবাবুর কাছ থেকে শিল্ড জয় করে আনবেনই। তার জন্য যা করার তাই করাবেন তিনি। শশীবাবুর কাছে এটা তাঁর ইজ্জতের প্রশ্ন।

রতনমামা ক্লাবে এলেন। তিনি এবার আমাদের টিমের সবাইকে মানিকপুর নিয়ে যেতে চান।

শশীবাবুও চান এবার তাঁর টিম আরও বেশি শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক মানিকপুরের বিরুদ্ধে। শিল্ড তাঁকে জিততেই হবে। আর তাই শশীবাবু গাড়ি নিয়ে রতনমামাকে পাঠিয়েছেন কলকাতায়।

পটলা একটু সাবধানি ছেলে, তবে দলের হোঁৎকা আর গোবর একটু গোঁয়ার ধরনের। আর ফটিকও ভালো ফরোয়ার্ড খেলে।

আমি বললাম, "ওই মারপিটের জায়গায় যাবি খেলতে? হোঁৎকার মুখে যা শুনছি, তাতে তো ভয়ই হয়। ওরা কি আমাদের খেলতে দেবে? জিতলেই তো মারপিট শুরু করে দেবে।"

পটলা বলল, "তা সত্যি। সেবার ইট ভাঁটার জন্যে বেঁচে এসেছিস। এবার কী হবে?"

রতনমামা বললেন, "এবার আর ওসব করতে পারবে না। সেবার হাঙ্গামার পর শশীবাবু নিজে সদরে ডি এম সাহেব ও পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করেছেন। পুলিশ কিশোরীবাবুদের ওয়ার্নিং দিয়ে এসেছে। এবার গ্রামে খেলা হলে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। কাজেই এখন আর কনো ভয় নেই। তোমরা চলো। শশীবাবুর খুব ইচ্ছে, তোমরা আসবে। আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না।"

হোঁৎকারও ইচ্ছে, এবার শিল্ড জিতে ফিরবে, গতবার যেটা পারেনি। এবার সেটা পারতেই হবে।

আমাদের মধ্যে গোবর্ধন ওরফে গোবরা মারপিটে ওস্তাদ। হোঁৎকার মুখে সব ঘটনা শোনার পর গোবরার তখন থেকেই হাত-পা নিশপিশ করছিল। তাই এরকম সুযোগ এসে যেতে খুশিই হল। সে বলল, "চল পটলা, হোঁৎকার মামা যখন এত করে বলেছেন, আমরা যাই। তা ছাড়া আমরা গেলে শশীবাবুও খুশি হবেন।"

মামা বললেন, "তোমাদের কথা বলেছি আমি। সারা এলাকার লোক পটলার গোলকিপিং দেখার জন্য বসে আছে। যা পাবলিসিটি হয়েছে তোমাদের!"

"তাই নাকি?" পটলার এবার গলা বেরোল। বলল, "তা হলে চল হোঁৎকা। আমরা যাব।"

"হ্যাঁ, যাইব। শিল্ড আমাদের এবার জিততেই হইব।" হোঁৎকাও উৎসাহ দিল পটলাকে।

"তা হলে চল, ঘুরেই আসি।"

পটলার কথায় আমাদেরও আপত্তি ছিল না। আমরা সকলেই রাজি হয়ে গেলাম। মামাবাবুও খুশি। কলকাতা থেকে গাড়ি চলল শশীবাবুর গ্রামের দিকে।

আমরা বিকেল নাগাদ শশীবাবুর গ্রামে এসে পৌঁছলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। একদিকে শশীবাবুদের পাড়া। এ পাড়াটা এঁদেরই পরিবার নিয়ে গড়ে উঠেছে। এঁদের একজন ছিলেন এই অঞ্চলের জমিদার। এখন অবশ্য সেই জমিদারি নেই। তবে সেই বাড়িগুলো রয়ে গিয়েছে।

গ্রামের ধারে একটা বাড়িতে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। বিশাল একটা হলঘর আর তার চারদিকে আম-লিচুর বাগান। কেমন সেকেলে ধরনের জায়গাটা। এদিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। এই হলেই রয়েছে পাঁচ জনের পাঁচটা তক্তাপোশ। এ ছাড়া আলমারিও আছে। তক্তাপোশে সুন্দর করে বিছানা পাতা রয়েছে। ওদিকে বেশ বড়-বড় জানলা। সেগুলো জানলা তো নয়, যেন এক-একটা দরজা। মেঝেয় সেকালের ইতালিয়ান মার্বেল বসানো। আমাদের জন্য রাঁধুনি রেখে রান্নার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পাশে পুকুর, সেখানে বেশ বড় সাইজের মাছও রয়েছে। সব দেখেশুনে হোঁৎকা বলল, "কী রে পটলা, আম-লিচু তো কাঁড়ি-কাঁড়ি! কত খাবি খান!"

শশীবাবু নিজে এসে তদারকি করেছেন।

সেদিন বিকেলে আমরা মাঠে নেমেছি শশীবাবুর প্লেয়ারদের নিয়ে। একসঙ্গে দু'দিন প্র্যাকটিস করলাম নিজেদের মধ্যে।

এবারও সেই মানিকপুরের খেলায় ওদিক থেকে মানিকপুর হরিহর রেফারির সাহায্যে একটা-একটা করে বাধা টপকে এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে ফাইনালে উঠছে চলেছে শশীবাবুর টিম। কিশোরীবাবু আবার এই টিমটাকে হারাবার জন্যে মতলব করছেন। কারণ, সেবার যেভাবে প্রকাশ্যে মারপিট করে খেলাটাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছিলেন! কিন্তু শশীবাবুসহ গ্রামের সকলে চান, পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলা দেখতে। তাই খেলা আজ ব্যক্তিগত ভুয়ো মান-সম্মানের তোয়াক্কা না করে মাঠে ফাইনাল খেলার দিন নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেই কারণে বাইরে থেকে নিরপেক্ষ রেফারিকেও আনা হয়েছে। খেলার সময়ও থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশি পাহারা।

তাই কিশোরীবাবু এবার অন্য মতলব পাকাচ্ছেন, যাতে করে শশীবাবুর টিমকে হারানো যায়।

শশীবাবুর টিম এবার আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নেমে গ্রামের দর্শকদের কাছে প্রিয় টিম হয়ে উঠেছে। শশীবাবুর টিমের গোলকিপার আমাদের পটলা, দুই ব্যাকে গোবরা আর হোঁৎকা। আর ওদের দলের বাছাই করা প্লেয়ার আর ফরোয়ার্ডে রয়েছে ফটিক।

ফটিকও দুর্দান্ত প্লেয়ার, সে স্ট্রাইকার। সে পায়ে বল পেলে গোলে পাঠাবেই। আর আমিও ওকে এই কাজে সাহায্য করি। আমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়াও বেশ ভালো। আমি জানি, ও কখন বল ছাড়বে। তখন আমিও গোলে শট নিই।

তাই সব মিলিয়ে শশীবাবু এবারের ম্যাচে সবচেয়ে ফেভারিট টিম। আর শশীবাবুও আমাদের উপর যারপরনাই খুশি। এবার মনে হয়, শশীবাবু কিশোরীবাবুকে মুখের মত জবাব দিতে পারবেন।

এর মধ্যে খবর চলে গিয়েছে মানিকপুরেও। কিশোরীবাবুর লোকজনই খবর নিয়ে গিয়েছে যে, শশীবাবু এবার কলকাতা থেকে নামি-দামি পাঁচজনকে এনে খেলাচ্ছেন। তাদের একজনের খেলা দেখেছিলেন কিশোরীবাবু, আর তাতেই তাঁর দলের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এবারে আবার একেবারে পাঁচজন প্লেয়ার! কিশোরীবাবু তাই এবার বেশ চিন্তায় পড়লেন তাঁর টিম নিয়ে।

কিশোরীবাবু বলেন, "গুপিনাথ, একটা কিছু করো।"

গুপিও ভাবছে কথাটা। সেবার শিল্ডটা কোনোরকমে বাঁচানো গিয়েছিল। এবার কী হবে? কারণ, রেফারি আসছে বাইরে থেকে। তার উপর পুলিশ প্রোটেকশনও থাকছে।

কিশোরীবাবু বললেন, "তুমি সদরে যাও। টাউন ক্লাব থেকে বেশ কিছু ভালো প্লেয়ার আনো। এবার ভালো খেলতেই হবে। শিল্ড গ্রামের বাইরে যাওয়া চলবে না।"

আমাদের কাছেও খবর এল, মানিকপুর বয়েজও নাকি শহর থেকে বেছে-বেছে প্লেয়ার এনেছে।

হোঁৎকা বলল, "আনুক প্লেয়ার। আমাদের ভালো খেলতেই হইব।"

গোবরা বলল, "তুই ভাবিস না। আমরাই জিতব।"

কিন্তু ভাবনার কারণ অন্যখানে। ওরা আমাদের থাকা-খাওয়ার কোনো ত্রুটিই রাখল না। মাছ, দুধ, বাড়ির তৈরি ক্ষীর, বাগানের আম-লিচু, সবই জুটেছে। রান্নার ঠাকুরও আমাদের রাতের খাবার দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

তারপরে নামল স্তব্ধতা। আমবাগানে নামল জমাট অন্ধকার। মাঝেমধ্যে শিয়ালের ডাকও ভেসে এল। পুরো বাড়িটায় গা ছমছম করেছে। মনে হল, এই বিশাল বাড়ির চারপাশে কোনো ছায়ামূর্তির দল এসে হাজির হল।

গোবরার আবার ভূতের ভয়টা একটু বেশি। হোঁৎকা অবশ্য বেশ সাহসী। তবে সে বলল, "মানুষের সঙ্গে লড়তে পারুম। কিন্তু ভূত-প্রেতের সঙ্গে লড়ুম কেমন কইর্যা।"

পটলা বলল, "যদি ভূত আসে, তা হলে তো আমাদের ঘাড় মটকে দেবে?"

আমি বললাম, "কী যে শুরু করলি তোরা! ভূতটুত বলে কিছু নেই। ওরা কেন আমাদের ঘাড় মটকাবে?"

গোবরা বলল, "তুই জানিস না। ওরা সব পারে।"

রাত নামল। চারপাশে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা, তার উপর আবার অমাবস্যার রাত। হঠাৎ ঘরের আলোটা নিভে গেল। আমরা চমকে উঠলাম।

আমি বললাম, "এখানেও লোডশেডিং?"

হঠাৎ ঘরের ওদিকে কারা যেন ছায়ামূর্তির মত ঢুকল বলে মনে হল। কে যেন নাকিসুরে বলল, "শিল্ড নিয়ে যাবি? হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ.!"

ওদের বিকট হাসির শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। সারা গা যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। গোবরা ভীত চোখে এদিক ওদিক চাইছে।

হঠাৎ দেখা গেল, সাদা শাড়ি পরা সারা শরীর ঢাকা এক মূর্তি। হাসির শব্দ উঠে অন্ধকারে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল। গোবরা আর্তনাদ করে উঠল, "ভূ-ভূ-ভূত!"

হোঁৎকার মত সাহসী ছেলেও কেমন যেন মিইয়ে গেল। সে উঠে পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কে যেন বলল, "ওটাকে ধর। ওরই ঘাড় মটকাব।"

অন্ধকারে কে যেন এগিয়ে এল হোঁৎকা, গোবরার দিকে। হঠাৎ পটলা হাতের কাছে টর্চ পেয়ে সেটা জ্বালতেই দেখল, সেই ছায়ামূর্তি দু'টো নাকি সুরে বলছে, "কালই কেটে পড়। এখান থেকে না গেলে কাল রাতেই তোদের দু'টোকে শেষ করব।"

কার ধাক্কায় পটলার হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল দূরে। অন্ধকারে খুঁজে পেল না।

সেই ছায়ামূর্তির দল তখন শাসাচ্ছে, "কাল সকাল হলেই চলে যা।"

গোবরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বলল, "তাই যাব। চলে যাব এখান থেকে ভূতমশাই।"

ভূতরা হাসছে। আমি অন্ধকারে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কোথায় একটা সজোরে ধাক্কা খেলাম।

ভূতজোড়ার মধ্যে একটা শীর্ণ দেহধারী রয়েছে, সে আবার বেশ লম্বাও। ওরা কাছে আসতেই এবার আমিই সাহস করে একটা ভূতকে চেপে ধরলাম। কিন্তু ভূতটার গায়ে মনে হল, তেল চপচপে করে মাখা। ফলে তাকে ধরতে পারলাম না। সে পাঁকাল মাছের মত পালাল। আমার সন্দেহটাই সত্যি হল। এরা কেউ ভূতটুত নয়। হয়তো গ্রামেরই লোক।

এর মধ্যে পটলাও হারানো টর্চটা হাতের কাছে পেয়ে গেল। টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম, আরও একটা লোক শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার শাড়িটা পড়ে আছে।

টর্চের আলোয় দেখলাম, লোডশেডিং নয়। বাইরে থেকে মেনটা অফ করা ছিল। সেটা অন করতেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল, তাদের পরিত্যক্ত জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে। আমি বললাম, "ওরা ভূত নয়। ভূতের নকল করে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছিল।"

গোবরা এবার ব্যাপারটা বুঝে বলল, "তার মানে, এরা ওই কিশোরীবাবুর লোক। আমাদের ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়াতে চাইছে।

এর মধ্যে আমাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে সদাজাগ্রত শশীবাবু রতনমামাকে নিয়ে হাজির হলেন। ঘরের অবস্থা দেখে আর ওদের জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো দেখে তিনি বললেন, "কাল থানায় একবার খবর দাও। এসব ওই কিশোরীবাবুর দলেরই কাজ। ভয় দেখিয়ে ছেলেগুলোকে চেয়েছিল।"

আমরা বললাম, "ভয় আমরা পাইনি। আর আমরা যাচ্ছিও না। ওদের সব জারিজুরি শেষ করে শিল্ড এনে তবেই যাব এখান থেকে। এবার ওই বদমাশটাকে জবাব আমরাই দেব।"

শশীবাবু খুশি হয়ে বললেন, "ভেরি গুড ইয়াংম্যান। লড়ে যাও। আমি আজই এখানে দু'জন দরোয়ান মোতায়েন করছি।"

গুপিনাথ কিশোরীবাবুর কথামতো ভজু আর গজুকে এই কাজে পাঠিয়েছিল। ভজু-গজু মানিকপুরের নামি ছিঁচকে চোর। ওরা নাকি চোখে ধুলো দিয়ে ঘর থেকে নিমেষে সব জিনিস সাফ করে দেওয়ায় ওস্তাদ। গুপিনাথ কিশোরীবাবুকে বলল, আপনি ভাববেন না বাবু। এবার ভূতের ভয়ে পালাবেই কলকাতার ছেলেরা। মাঠে আর নামবে না।"

কিশোরীবাবু বললেন, "তোমার বুদ্ধি আছে দেখছি।"

ঠিক এমন সময় ভজু আর গজু ঢুকল। ভজুর নাকটাই গিয়েছে ফেটে পটলার টর্চের ঘায়ে, আর গজু ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছে। গায়ে তেল মাখা ছিল বলে ধরা পড়েনি।

সব শুনে কিশোরীবাবু বললেন, "হতভাগাগুলোকে এবার আমিই পুলিশে দেব।"

ভজু তার নাক টিপে ধরে বলল, "ওরা ধরে ফেলল যে। না হলে বেশ জমিয়েই ভূতের মজাটা শুরু করেছিলাম। ওদের দু'জন তো বলেই ফেলল যে, 'আমরা বলে যাবই।' তারপরই!"

কিশোরীবাবু বললন, "বেশ হয়েছে। তোমাদের দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়।"

কিশোরীবাবু এবার সত্যি বিপদে পড়েছেন। শিল্ড এতদিন নিজের গ্রামে রেখে দিলেও এবার বুঝি আর করতে পারবেন না। কালই সব ফাইনাল হয়ে যাবে।

পরের দিন সেই মহারণ। কিশোরীবাবু তবু শেষ চেষ্টা করবেন। শহর থেকে এর মধ্যে বয়েজ ক্লাবের জন্যে জনাচারেক প্লেয়ার তুলে এনেছেন।

মাঠটাকে কিশোরীবাবুরা খুব ভালোভাবেই রঙিন কাগজে সাজিয়েছেন। কিশোরীবাবুর শিল্ডটাকেও মালা পরিয়ে সাজানো হয়েছে, সঙ্গে টেবিলে রাখা অন্য ট্রফিগুলোও।

কিশোরীবাবু শিল্ডটার দিকে চেয়ে বললেন, "গুপিনাথ, এতদিন ধরে বাবাকে এখানে রেখেছিলাম। এবার কি বাবা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে হে? যা কড়া নজর রেখেছে পুলিশ, তাতে তো কিছু উপায় নেই। তোমার বুদ্ধিটাও কাজে লাগল না। ভজু-গজু সে রাতে ধরা পড়লে যে কী হত, কে জানে? এত করেও কি এবার শশী চৌধুরী আমার মুখে ঝামা ঘষে শিল্ড নিয়ে যাবে?"

গুপিনাথ বলল, "খেলার শেষ এখনও অনেক বাকি। দেখাই যাক না কী হয়?"

এবার বর্ষা বেশ ভালোই হয়েছে। ফলে মন্দারক্ষী নদীর জল কানায়-কানায় পূর্ণ।

শশীবাবু বললেন, "শিল্ড জয় করতেই হবে। দু'টো নদী পার হয়ে এখান থেকে হেরে ফিরব না। মানিকপুরে আমাদের কাছারির বাড়িটা আছে। তাতে বেশ বড়-বড় ঘর। রাতে খেলার পর টিম ওখানেই থাকবে। আমিও থাকব। কাল সেসব বন্দোবস্ত করে রাখো। যেন ওখানে কোনো অসুবিধে না হয়।"

সেই মত বিছানাপত্র আনা হল। রান্নার ব্যবস্থাও হল। শশীবাবুর টিম দুপুরেই এখানে এসে পৌঁছেছে। এখানে বিশ্রাম নিয়ে টিম মাঠে নামবে ফাইনাল খেলতে।

এর মধ্যে মাঠে এসেছে বহু মানুষ। হাজির সদর থেকে স্বয়ং ডি এস পি সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী। মাঠের চারদিকে পুলিশ।

ওদিকে শশীবাবুও দলবল নিয়ে মাঠের বাইরে রয়েছেন। শশীবাবু আমাদের বললেন, "জেলাসদর থেকে ডি এস পি সাহেব এসেছেন খেলা শান্তিপূর্ণ চালানোর জন্য। এবার আর কোনো ভয় নেই। রেফারিও আনা হয়েছে বাইরে থেকে। এবার আর কিশোরীবাবুর টিম ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না। এবার তোমরা নিশ্চিন্তে খেলতে পারবে।"

রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে মাঠে দাঁড়ানো দর্শকদের চিৎকার ভেসে এল। শশীবাবুর সমর্থকরা চিৎকার করে তাদের মনোবল বাড়াচ্ছে।

খেলা শুরু হল। বয়েজ ক্লাবও সদর থেকে বেশ কয়েকজনকে ভালো খেলার জন্য তুলে এনেছে। খেলার প্রথম থেকেই আমরাই ধরার চেষ্টা করছি।

ওদিকে গোবরা, হোঁৎকাও আজ প্রাণ দিয়ে খেলছে। কাল রাতে ভূতের ভয় দেখানোর জন্য কিশোরীবাবুকে তাঁর মুখের মত জবাব দিতে চায় তাদের খেলা দিয়ে।

একটা বল এসে পড়ল আমার পায়ে। হোঁৎকাই বলটা পাস করেছে। সামনে একজন ব্যাক এগিয়ে এল বলটা কেড়ে নিতে। আমিও সুযোগ বুঝে বলটা পাস করলাম সোজা ফটিকের পায়ে। ফটিক দু'জনকে ডজ দিয়ে বলটা কিক করল, আর বলটা সোজা গোলে।

রেফারির বাঁশিও বেজে উঠল, 'গো-ও-ল'।

মাঠের চারধারে দর্শকরা চৌধুরী ক্লাবের জয়ধ্বনি করে উঠল।

মাঠের ওদিকে কিশোরীবাবু চুপচাপ রয়েছেন। আজ যেন তাঁর হাত-পা বাঁধা। পাশে সেই হরিহর বলল, "এ কেমন গোল? এটা পুরো অফ সাইড।"

কিশোরীবাবু অসহায়ভাবে বললেন, "ওরা এবার ধরেবেঁধে হারাবেই। আজ আর তুমি রেফারি নও। আজ আমরা হারবই।"

দেখতে-দেখতে চৌধুরী ক্লাব মানিকপুর বয়েজ ক্লাবকে দু'-দু'টো গোল দিয়ে দিল।

সাত বছর হল, কিশোরীবাবু এই শিল্ড চালু করেছেন। যা এত বছর হয়নি, এবার তাই হবে। এবার কিশোরীবাবুর এনিমি নাম্বার ওয়ান শশীবাবুই এই শিল্ড নিয়ে যাবেন।

কিশোরীবাবু বসে পড়ে আর্তনাদ করছেন। ওদিকে চৌধুরী ক্লাব আরও একটা গোল দিল।

শেষ বাঁশি বাজার আগে চৌধুরী ক্লাব ফাইনালে মানিকপুর বয়েজ ক্লাবকে মোট চার গোলে বেদম হারিয়ে শিল্ড জিতল।

স্বয়ং ডি এস পি ও'র হাত থেকে প্রত্যেক প্লেয়ার মেডেল নেওয়ার পর সেই কাঙ্ক্ষিত শিল্ড উঠে এল চৌধুরী ক্লাবের হাতে।

ওদিকে জয়ধ্বনি উঠল, 'জয়, চৌধুরী ক্লাবের জয়! জিতল কে চৌধুরী ক্লাব, আবার কে?'

জনতা আনন্দে নাচছে, ঢাকঢোল বাজছে। শশীবাবুও আজ এই নাচে যোগ দিয়েছেন।

ওদিকে গুপিনাথ ও হরিহর কিশোরীবাবুকে কোনোরকমে ধরে নিয়ে গেল বাড়িতে। আজ কিশোরীবাবু হেরে গিয়েছেন। জিতেছে তাঁর এনিমি নাম্বার ওয়ান শশী চৌধুরী। সাত বছর ধরে বাবার স্মৃতি আগলে রেখেও আজ তা হাতছাড়া হয়ে গেল!

লজ্জায়-অপমানে- গভীর মনোকষ্টে কিশোরীবাবু খুব ভেঙে পড়লেন।

এদিকে খুশির জোয়ার শশীবাবুর কাছারিবাড়িতে। শিল্ড নিয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করল শশীবাবুর দলবলেরা। গ্রামের মানুষও দেখল তাদের জয়ের উৎসব।

শশীবাবু আজ ভীষণ খুশি। তাঁর স্বপ্নপূরণ হয়েছে। এতদিন পর কিশোরীবাবুকে মুখের মত জবাব দিতে পেরেছেন। রাতে তাই বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আজ রাতটা কাটিয়ে শশীবাবু নিজের গ্রামে ফিরে আরও বড় করে জোরদার শিল্ড শোভাযাত্রা বের করবেন বলে নানা পরিকল্পনা করছেন।

আজ শশীবাবুদের খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল। সকলে ক্লান্ত, ঘুমও আসছে। প্রত্যেকের শোওয়ার জন্য ভালো ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাই বিছানায় গা এলাতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সবাই।

রাত নামল। আজ সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। শশীবাবুও ক্লান্ত। সারাদিন মাঠে বেশ লাফা-ঝাঁপা করেছেন। তাই বিছানায় গিয়ে শুতেই গভীর ঘুমে চলে গেলেন।

শশীবাবু স্বপ্ন দেখলেন, গ্রামে এতদিন পর তাঁর শিল্ড জয়যাত্রা চলেছে।

কারও ডাকে ঘুম ভাঙল শশীবাবুর। কাজের লোক চা এনেছে সকালেই। শশীবাবুর আবার বেড টি'র অভ্যেস। ঘুমচোখে উঠেই শশীবাবুর চোখ গেল টেবিলে রাখা শিল্ডের দিকে। কিন্তু দেখলেন, সেখানে শিল্ড নেই। টেবিল ফাঁকা। নীচে পড়ে আছে জবা ফুলের মালা আর কুচো ফুল। শিল্ডটা নেই।

মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। শিল্ডটা কাল রাতেই উধাও হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দরজাটা এমনিতেই নড়বড়ে ছিল। কাল রাতে বোধ হয় চোর ঢুকে দামি শিল্ডটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। চারদিকে খোঁজা হল। গ্রামের লোকজন, পুলিশও এসেছে। শশীবাবু

মাথায় হাত দিয়ে হাহাকার করছেন। "আমার ইজ্জত জড়ানো শিল্ড চুরি হয়ে গেল। আমার স্বপ্ন চুরি হয়ে গেল। হায়, হায়...!"

অনেক খোঁজ করেও শিল্ড পাওয়া গেল না। বেলা বাড়ছে। আমাদের ফিরতেও হবে। শিল্ড জিতেও মানিকপুর থেকে শিল্ড নিয়ে যাওয়া আর হল না। আমরাও আক্ষেপ করলাম। শশীবাবু বললেন, "এটা ব্যাড লাক ছাড়া আর কী!"

কিশোরীবাবুও বাড়ি ফিরলেন। তবু শান্তি পেলেন না তিনি। শশীবাবু শিল্ড জিতে মানিকপুর থেকে নিয়ে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু তাঁর বাবার স্মৃতি কে চুরি করল? আর শিল্ডটাই বা গেল কোথায়? তাই নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছেন। এদিকে শিল্ড হারানোর দুঃখে কাল থেকে কিশোরীবাবু খাওয়াদাওয়া ছেড়েছেন। শেষে বাবাকে যে এভাবে কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে, এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি।

হঠাৎ সেই ছিঁচকে চোর দু'টো ভজু আর গজুকে দেখা গেল। পাশে গুপিনাথ। ওরা চাদরটা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল সেই ঝকঝকে তিন ফুটের শিল্ডটা।

কিশোরীবাবু যেন হারানো বাবাকে ফিরে পেলেন, "এ কী রে! শিল্ড এখানে এল কী করে?"

গুপিনাথ বলল, "বলেছিলাম না, শিল্ডকে ভিটেমাটি ছাড়া হতে দেব না।"

এবার ভজু আর গজু বলল, "বাবু, ওরা এগারোজন প্লেয়ার ম্যাচ জিতে শিল্ড জিতেছে, কিন্তু মহাফাইনালে ওরা এই দু'জন প্লেয়ারের কাছে হেরে ভূত হয়েছে। আসল খেলাতেই ওরা হেরে গিয়েছে।"

কিশোরীবাবু বললেন, "দেখিস, কেউ যেন টের না পায়। আর কাল থেকে ভজু, গজুর ধানকলে চাকরি পাকা। ওরাই আমার কাছে বেস্ট প্লেয়ার। তাই পুরস্কারটা ওদের প্রাপ্যই।"

আমরা গ্রামে ফিরছি। ভেবেছিলাম, শিল্ড নিয়ে এসে কত আনন্দ করব কিন্তু আমরা শিল্ড জিতেও সেই ললিত চ্যালেঞ্জ শিল্ড হেরে গেলাম।

নসুমামার কেরামতি

কথায় বলে বৃহস্পতিবারের বারবেলা-ও নাকি সাংঘাতিক অলক্ষুণে ব্যাপার। কিন্তু ট্রেনের টিকিট অন্যদিনের নেই। সব হাউসফুল। কাউন্টারের বুকিং ক্লার্ক-এর চেহারাটা একফালি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে যেন ছোবড়া ছাড়ানো নারকোল। তেমনি রুক্ষ গলায় বলে,-ওই বেস্পতিবারের টিকিটই আছে। নিতে হয় নাও, না হয় সরো।

পটলার নসুমামাও এসেছে। সে নাকি এসব মানে না। বলে,-তাই দিন।

আমি বলি,-মামা, বেস্পতিবার-এর বারবেলায় যাবে?

-চোপ। ডরপোক কাঁহিকা। বি ব্রেভ! ওসব কুসংস্কার কি এখনও এই যুগে মানে কেউ? চাঁদে মানুষ যাচ্ছে-দুদিন পর বেস্পতির ঘাড়েও গিয়ে চাপবে। ছাড় তো টাকা!

পটলা টাকা বের করে দেয়। ওদিকের কাউন্টারবাবু যে বেশ রসস্থ ব্যক্তি তা বোঝা যায়। অশ্বত্থগাছ পাথরের বুকেও রস গ্রহণ করতে পারে, উনিও সেই রকম। শুকনো টিকিট থেকেও রস টেনে বের করেন। ছ'জনের টিকিটের পুরো দামই দেয়েছি। তাও উনি বলেন,-আরও একশো টাকা লাগবে। পার টিকিট পঁচিশ করে নিই, দেড়শ টাকা পাওয়ার কথা, তা তোমাদের পঞ্চাশ টাকা ছেড়ে দিলাম।

মানে?-হোঁৎকা শুধোয়।

টিকিটবাবু বলে ওঠেন,-তাহলে টিকিটও নাই।

নসুমামার দরাজ দিল। পরের পয়সাকে মাটির মতই হীন বস্তু ভাবে। বনেদি পরিবারের ছেলে। তাই বলে,-দিয়ে দে পটলা। এত করে বলছেন। না হলে তো টিকিট নাই-!

যেতেই হবে। তাই পটলা দিল একশো টাকা। রসিক ভদ্রলোক এবার টিকিটও দেন।

হোঁৎকা বলে,-ঘুষ! সরকারি কর্মচারী ঘুষ খাচ্ছে?

নসুমামা বলে-বকশিশ। বুঝলি, প্রণামী না দিলে ভগবানও চোখ তুলে দেখে না। তাই তো মন্দিরে এত প্রণামী পড়ে।

-সে তো দেবতা।

নসুমামা বলে,-এরা নরদেবতা। সবচেয়ে বড় দেবতা। এদের তো প্রণামী দিতেই হবে।

গেল টাকাটা ক্লাব ফান্ড থেকে। ভেবেছিলাম দূর বন অঞ্চলে যাচ্ছি, সেখানে খরচা আছে। কিন্তু রেলবাবু সেই বাজেট থেকে একশো টাকা সাফ করে দিল।

পটলার নসুমামা বলে,-ভয় নাই ম্যানেজ করে দেব পরে।

যেতে হবে সারান্দার জঙ্গলে। সারান্দার অরণ্য বিশাল, বিস্তৃত। ওকে বলা হয়, সাতশো পাহাড়ের দেশ। গহীন দুর্গম বনরাজ্য। বাঘ, হাতি, বাইসন, সম্বর, হরিণ সবই আছে।

ঠাক্মা পটলাও যাবে শুনে প্রথমে রাজি হয়নি। শেষে নসুমামার কথায় রাজি হয়, আর আমাদের অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাকি চার মূর্তিকে বলে,-সাবধানে যাবি ভাই। পটলার ওপর নজর রাখিস।

যথারীতি হাওড়ার গিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

নসুমামার আদিবাড়ি হুগলিতে। নসুমামার ঠাকুরদা ওই দুর্গম বনপাহাড়ে কাঠ-এর ব্যবসা করতে গিয়ে প্রচুর টাকা কামিয়ে ওই সারান্দার বাইরে বড়জামদায় বিশাল বাড়ি, কারখানা, ব্যবসা এসব করেন। সেই বিষয়সম্পত্তি কারখানার মালিক এখন নসুমামারা।

তবে নসুমামা যে কোনো কাজ করে, তা বিশ্বাস হয় না। নসুমামা উড়ো পাখির দলে। তেমনি নড়বড়ে লোক।

প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে, তখন সিগন্যাল হয়ে গেছে। নসুমামা বলে,-তোরা এক নম্বর লেট লতিফ! কাজ করবি ঘড়ি ধরে। তা নয় যাচ্ছি যাব। ওঠ-ওঠ, ট্রেন ছেড়ে দেবে। এই তো এস-থ্রি কামরা।

আমাদের বার্থও রিজার্ভ করা আছে। নসুমামা বলে,-উঠে বেশ জমিয়ে বার্থে বিছানা পেতে নিবি। খাবার দাবার খাবো তারপরে। ওঠ।

কামরায় দুমদাম উঠে পড়ি। বরাতজোরেই ট্রেনটা পেয়ে গেছি। উঠতে না উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমরা এবার ধীরে সুস্থে বার্থ নাম্বার খুঁজছি। রাত-ভোর জার্নি। ভোরে টাটানগরে নেমে বড়জামদার ট্রেন ধরতে হবে। সেটা টাটানগরের স্টেশনের ওদিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে।

ট্রেন থামবে একেবারে খড়গপুরে।

হুড়মুড় করে ট্রেন চলেছে। ওদিকে বার্থের সন্ধানে গিয়েছি। বিছানা পেতে এবার আরাম করে বসবো। ওমা! দেখি আমাদের ছ'খানা বার্থের তিনখানাতে এর আগেই গোলগাল এক শেঠজি, তার লটবহর লোকজন নিয়ে জমিয়ে বসেছে। আর দুটো বার্থ খালি আছে, তাও টং-এর উপর। অন্যখানা ওদিকে জানলার ধারে।

নসুমামাই বলে,-এ বার্থ তো হমলোগকা। ছোড় দিজিয়ে-

সেও বলে,-ক্যা! হাম্ টিকিট কাটা-

এমন সময় টিকিট চেকার চার্ট নিয়ে আসতেই আমরা বলি,-আমাদের বার্থ!

টিকিট চেকার আমাদের টিকিট নিয়ে দেখে শুনে বলে,-এ কোন্ ট্রেনে উঠেছেন? এ তো আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস। আপনাদের টিকিট তো টিটলাগড় এক্সপ্রেসের-সেটা ছাড়ে এর পর। এখানে আপনাদের বার্থ তো নেই।

বৃহস্পতিবারের বারবেলার খেলই শুরু হয়েছে।

চেকার বলে,-খড়গপুর নেমে যেতে হবে।

এবার অবাক হই। নসুমামার ঘড়িটা দেখি, একঘণ্টা দশ মিনিট ফাস্ট। নসুমামার ঘড়ি না-ঘোড়া। তাই নসুমামা আমাদের তার ঘড়ির টাইমে এসে অন্য ট্রেনেই তুলেছে।

টিটলাগড় এক্সপ্রেস খড়গপুরে আসবে মাঝরাতে, তখন দরজাই খুলবে না কেউ। তাই চেকারকে বলি,-টাটানগরে নেমে যাব। একটু যেতে দেন যদি-

চেকার অম্লান বদনে বলে,-ছ'জনের একশো টাকা লাগবে।

এরা একশোর নীচে কথা বলে না। বলি,-টিকিট তো রয়েছে।

চেকার সাহেব বলেন,-এ ট্রেনে উঠেছ পেনাল্টি দিতে হবে।

নসুমামার দরাজ দিল। বলে,-দিয়ে দে টাকাটা। রাতদুপুরে আর ঝামেলা করিস না।

বাড়তি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে কামরার এক দিকে মালপত্রের উপর বসে ঝিমুচ্ছি। রাত কত জানি না। খড়্গপুর পার হয়ে রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলেছ। ওই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, গাড়ি থেমেছে। তখন ফর্সা হয়ে গেছে। নসুমামা জেগে উঠে বলে,-নাম, নাম, লেট-লতিফের দল! আবার লেট। এত ঘুমোয়? টাটানগর ছাড়িয়ে চক্রধরপুর এসে গেছি। কি ঘুম রে তোদের? কুম্ভকর্ণের ঘুম।

আবার বিপদ। চক্রধরপুর থেকে বড়জামদা যেতে গেলে পিছিয়ে রাজঘরসোয়ান স্টেশনে আসতে হবে। সেখান দিয়েই বড়জামদার ট্রেন যায়। আর এখন কোনো ট্রেনও নেই ওদিকে যাবার। ওদিকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন কমই চলে।

বড়জামদার ওদিকে আছে অনেক আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানিজ ওর মাইন। এছাড়া বনের কাঠের ব্যবসা। লোহা কারখানাগুলোয়, অর্থাৎ দুর্গাপুর, ভিলাই, বার্নপুর, রাউরকেল্লা, বোকারো, টাটানগর-যেখানে যত লোহা কারখানা আছে, সেখানেই ওই বড়জামদা থেকে খনিজ লোহা, পাথর, ম্যাঙ্গানিজ এসব যায়। তাই ওদিকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পৌঁছতে গেলে বৈকাল হয়ে যাবে, অথচ যে ট্রেনে যেতাম-সেটা ধরতে পারলে বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছে স্নান খাওয়া করে রেস্ট নিতাম।

সেসব এখন স্বপ্নের কথাই।

রাগ হয় নসুমামার উপর। পথ ছেড়ে বেপথে এসে গুনোগার দিয়ে এখন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে হাতমুখ ধুয়ে বসে আছি।

হঠাৎ নসুমামা কোথা থেকে ঝড়ের মত এসে বলে,-চল। যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এর আগে নসুমামা লম্বা লম্বা গল্প অনেক শুনিয়েছে কলকাতায়। 'ওদিকের কাকপক্ষীতে আমাদের চেনে'

তাই যাবার ব্যবস্থা হয়েছে শুনে বলি,-কারো গাড়ি-টাড়ি পেলে নাকি?

-চল তো!

ভাবলাম, ওই অঞ্চলের কোনো প্রাইভেট গাড়িই পেয়েছে বোধ হয়।

যাক, গাড়িতে আরামেই যাওয়া যাবে।

হোঁৎকাও খুশি,-নাঃ, নসুমামার এলেম আছে। প্ল্যাটফর্মের ওদিকে গিয়ে দেখি, একটা মালগাড়ি খালি ভক্সওয়াগনের মালগাড়ি। নসুমামা গার্ডকে কি বলেছে। গার্ড বলে,-উঠে পড়ুন। গাড়ি ছেড়ে দেবে, সিগন্যাল পেয়েছি।

-ওঠ-ওঠ!

আমি বলি,-মালগাড়ি যে মামা!

-গার্ডের কামরায় ওঠ তো। হোক মালগাড়ি। বড়জামদা যাচ্ছে, ম্যানেজ করেছি। দেখবি খাবার সময়েই পৌঁছে যাব।

গাড়ির কামরার মঝেতে আমরা সমাসীন। মালগাড়ি টিক টিক করতে করতে চলেছে। রাজঘরসোয়ান হয়ে বড়জামদার ব্রাঞ্চ লাইনে যখন ঢুকল, তখনই দশটা বেজে গেছে।

বড়জামদার এই লাইন গেছে সারান্দার অরণ্যের শেষ স্টেশন গুয়ামাইনস অবধি। এই লাইনে যাত্রীবাহী ট্রেন চলে একেবারে গোনা গুনতি, বাকি সব যাতায়াত করে মালগাড়িই। লোহাপাথর আনতে যায়।

আমাদের মালগাড়ির ড্রাইভার ফিরিঙ্গি সাহেব। শীর্ণ কালচে চিমসে চেহারা, বাঁশের লগার মত লম্বা। প্যান্টটাও ধুলো কালিতে ময়লা, শার্টটার আসল রং কি ছিল তা বোঝা যায় না এখন। সঙ্গে একজন সহকারী আছে।

রাজঘরসোয়ান স্টেশনে চা আর শুকনো বিস্কুট মেলে। খিদেও লেগেছে। এর আগে রাতের খাবারও শেষ। হোঁৎকার আবার ঘন ঘন খিদে পায়। সে বলে,-ওই বিস্কুট প্যাকেট চারেক নে।

নসুমামা বলে,-দেরি হবে না। দুপুরের আগেই পৌছব।

ওর কথায় আর বিশ্বাস নেই। কাল রাতে যা খেল দেখিয়েছে তা এখনও ভুলিনি। পটলা গোটা ছয়েক প্যাকেট বিস্কুটই তুলল। আমি তার থেকে একটা প্যাকেট ওই গার্ডসাহেবকেও দিলাম।

সঙ্গের লোকটা বলে,-চা কই?

রাজঘরসোয়ান স্টেশনে দেখি ট্রেনের ড্রাইভার আর গার্ড কি কথাবার্তা বলছে। ওদের সেই অনুচরও রয়েছে।

বেশ আলাপ টালাপের পর ট্রেন এবার জামদা লাইনে ঢুকেছে।

তারপরই শুরু হল আসল ব্যাপার।

গার্ডের সেই অনুচর-ওর নাম নাকি পিটার, সে বলে আমাদের,-ইউ ম্যান, তোমাদের ছজনের লাগবে দেড়শো টাকা।

মানে?-অবাক হই টাকার কথা বলতে। ভেবেছিলাম নসুমামার চেনা জানা গার্ড, এমনিই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

বলি,-আমাদের তো টিকিট আছে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। গার্ডের সেই অনুচর পিটার সাহেব বলে,-তাহলে সামনের স্টেশনে নেমে যাও, সেই ট্রেনেই যাবে। দিস ইজ গুডস্ স্পেশাল ম্যান। এর জন্য আলাদা চার্জ দিতে হবে। পার হেড টোয়েনটি ফাইভ। না দাও-নেমে যাও।

তেপান্তরের মাঠে একটা স্টেশন ঘর, দূরে নীল পাহাড়ে বনের সূচনা। জনমানবহীন এই মাঠে নামতে হবে? খাবার জল অবধি মেলে না, আর পরের গাড়ি সেই বেলা চারটেয়।

রেলের লোকরা যে এমনি অর্থপিশাচ তা জানা ছিল না। উঠে অবধি রকমারি গচ্চা দিয়ে চলেছি। নসুমামার সেই এক ডায়লগ,-দিয়ে দে। এরা পেয়ে থাকে। না হলে কখন পৌঁছব কে জানে!

এত টাকা! একটু কমাও গার্ড সাহেব। -গোবরা বলে।

পিটার বলে,-কম হবে না। এই রেট।

অগত্যা গুনে গুনে আবার দেড়শো টাকা গেল। নেহাত পটলা আছে তাই রক্ষে, না হলে কি যে হত কে জানে।

এরপর শুরু হল গার্ড সাহেবের আসল ব্যবসা।

এইসব লাইনে ট্রেন কম। প্রত্যেক স্টেশনে কুলি, আদিবাসী লোকজন, হাটের যাত্রীরা, মালপত্র আনাজ মহুয়ার ইয়া বড় বড় হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রতি স্টেশনেই মালগাড়িও থামছে।

পিটার নেমে গিয়ে ওইসব খালি ওয়াগনে লোকজনদের তুলছে, আর নগদ পয়সা আদায় করছে। ওদিকে ড্রাইভারও নজর রাখছে কত লোক উঠছে। পিটার রয়েছে এই কাজের জন্যই।

ফি স্টেশনে লোক তুলছে-কিছু নামছেও, আর পিটার নোটের তাড়া এনে গার্ডের ওদিকের ড্রয়ারে পুরছে। গার্ড সাহেবের এমন আমদানির বহর দেখে আমরা তো অবাক।

বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। পথে খাবার-দাবার কিছুই নেই। পেটের মধ্যে খোলকরতাল বাজছে। হোঁৎকা গুম হয়ে গেছে। শুধোই,-আর কতদূর মামা?

নসুমামা বলে,-এই তো এসে গেছি, গোটা ছয় সাত স্টেশন।

মানে আরো তিনঘণ্টা! -গোবরা গর্জে ওঠে।

ওদিকে দেখি গার্ড সাহেব এবার টিফিন কেরিয়ার খুলে লাঞ্চ-এর আয়োজন করছে। অবশ্য সুখাদ্য কিছু নয়, পান্তা ভাত আর কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি। সঙ্গে পিঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা।

ওরা লাঞ্চ করছে, আমরা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ট্রেন থেকে পাহাড় বনের শোভা দেখছি। এখন বন বেশ গভীর হয়েছে। শালবন-মাঝে মাঝে দু-একটা পাহাড়ি ঝর্না, ব্রিজও আছে, আর দিগন্তে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়গুলো যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

নসুমামা সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলে,-আর বেশে দেরি হবে না। কাল কেসটা গড়বড় হয়ে গেল-

পটলা বলে,-কত লোকসান হল জ-জানো?

হোঁৎকা বলে,-আমি যামু না। এইখানেই নাইমা যামু।

নসুমামা বলে,-এখানে কোথায় নামবে? আর দুঃখ করো না, সব পুষিয়ে যাবে। এ-ও একটা অ্যাডভেঞ্চার হে!

ওদিকে ওদের পান্তা খাওয়া শেষ হয়েছে। সামনে স্টেশন আসছে। নসুমামা বলে,-এর একটা স্টেশন পরেই জামদা। আর একটু কষ্ট কর। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না হে! জীবনে কত কষ্ট করেছি!

কেষ্ট পেয়েছ?-আমার কথায় নসুমামা বিজ্ঞের মত হাসল।

বনের মধ্যে স্টেশন। স্টেশনটা বড়ই। চারিদিকে ছড়ানো বনপাহাড়ের মধ্যে বড় বড় আয়রন মাইন। এখান থেকেও কয়েকটা লাইন বের হয়েছে। গার্ড সাহেব নেমে গেছে, প্ল্যাটফর্মে দেখি সেই ড্রাইভারও নেমে এসেছে। তিনজনে বেশ হাসিখুশির মধ্যে আলোচনা করছে।

গোবরা বলে,-আজকের যে টাকা উঠেছে তারই ভাগা-ভাগির হিসাব হচ্ছে। মাইনে ছাড়া দিনে ব্যাটারা কতটাকা চুরি করে রেল কোম্পানিকে ঠকাচ্ছে দ্যাখ!

আমাদের যে বেশ কয়েকশো টাকা রেলের অসাধু কর্মচারীদের জন্য গেছে এটা বুঝেছি হাড়ে হাড়ে।

আবার বেশ কিছু যাত্রী উঠল। ছাগল-ভেড়াও তুলেছে। নসুমামা বলে,-আজ বড়জামদার হাট, তাই এত ভিড়।

অবশ্য আমাদের কজনকে গার্ড সাহেব মালগাড়িতে তোলেনি, বরাবর তার কামরাতেই রয়েছি। বারান্দায় বসে বনের শোভা দেখছি।

এই জামদার পরের স্টেশনই গুয়া। তবে এই মালগাড়ি নাকি বড়জামদা স্টেশন থেকে ভিতরে কোনো আয়রন মাইনের দিকে চলে যাবে। যাত্রীরা সবাই নেমে যাবে ওখানে।

পিটার, গার্ড সাহেব এবার বাইরের বারান্দায় এসে খুশি মনে গান ধরেছে। পিটারও খুশি, আর আদায়ের ঝামেলা নেই-যা হয়েছে তা মন্দ নয়। নসুমামাকে দেখছি না, বোধহয় ভিতরে ঘুমোচ্ছে।

বড়জামদার স্টেশনে গাড়ি ঢুকতে নসুমামা বলে,-আমি স্টেশনে নেমেই বাইরে গে একটা অটো ধরব। আগে ধরতে না পারলে অটো মিলবে না, আজ হাটবার। তোরা নেমেই বাইরে চলে যাবি।

স্টেশনে ট্রেন ঢুকতে মামা নেমেই হাওয়া। আমরাও নেমেছি। মালগাড়িতে এত লোক ছিল ভাবিনি। পিল পিল করে লোক নামছে-মালপত্র, ছাগল, মুরগি, ভেড়া নিয়ে।

কোনো মতে বের হবার জন্য ওভারব্রিজ পার হয়ে এদিকে এসে পৌঁছেছি। তখন ওদিককার প্ল্যাটফর্ম অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে দেখি সেই পিটার আর গার্ড সাহেবের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। সিঁটকে গার্ড পিটারকে বলছে,-ইউ থিপ্! চোর কাঁহিকা!

পিটার কি বলার চেষ্টা করে, এবার গার্ডের কামরায় ঢুকে বের হয়ে এসে বলে,-গড নোজ! আমি কিছু জানে না।

এমন সময় মোটকা ড্রাইভারও এসে পড়ে। কি শুনে সে এবার ওই সিঁটকে গার্ডের দিকে একহাত তুলে গজরায়,-ইউ লায়ার, থিপ্। হাম্‌কে ফাঁকি দেবার মতলব। আই শ্যাল কিল ইউ।

গার্ড সাহেব তখন আশমানে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে,-বিলিভ মি দেশপাণ্ডে।

ড্রাইভারের পদবি বোধহয় দেশপাণ্ডে। সে তখন গর্জাচ্ছে-হম্‌কে শেয়ার নেহি দেনা? ইউ ডেভিল, নিকালো রুপেয়া।

গার্ড বলে,-নাই, অল গন! আপন গড!

-শাট আপ!

হঠাৎ নসুমামার ডাক শুনে এমন সার্কাস দেখা ফেলে পেছন দিকে চাইলাম। নসুমামা ভিড়ের মধ্যে থেকে ডাকছে,-চলে আয় শিগগির। নালে গাড়ি পাবি না।

আমরাও স্টেশন থেকে বের হয়ে পথে ওই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। নসুমামা বলে,

-চল ওদিকে। অটোওয়ালাকে ফিট করে রেখেছি।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক গেলে তবে মামাদের বাড়ি বড়বিলে। সেইটাই এখানকার মধ্যে নাকি বড় শহর। পাহাড় বন নদী সবই আছে।

বড়জামদা ছাড়িয়ে অটোটা চলেছে। চারিদিকে পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের বুক ঘন বনে ঢাকা। মামা বলে,-এসবই সারান্দার মধ্যে।

হাটতলার পাশে একটা দোকানে গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে। গন্ধেই খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। হোঁৎকা বলে,-পটলা আমি মইরা যামুরে, প্যাট হাঁচড় পাঁচড় করত্যাছে।

মামাই বলে,-নাম, এদের কচুরি খুবই উৎকৃষ্ট।

নামলাম।

কিন্তু গোবরা কোষাধ্যক্ষ। এর আগে রেলে দিতে হয়েছে একশো টাকা বুকিং ক্লার্ককে, গাড়ির চেকারকে একশো, আর গার্ডকে দিতে হয়েছে দেড়শো। এছাড়া চা বিস্কুট আর চিনেবাদামেই গেছে প্রায় শত খানেক।

গোবরা বলে,-হিসাব করে খাবি। ক্যাশের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। অনেক গচ্চা গেছে। হোঁৎকাকে সামলাবি।

চারখানা করে কচুরির অর্ডার দেওয়া হয়।

হোঁৎকা বলে,-তরাই খা। আমি খামু না।

হোঁৎকা যে অনশন সত্যগ্রহ করবে জানা ছিল না। এমন সময় সকলকে অবাক করে নসুমামা বলে,-আটখান করেই দাও, তারপর দেখা যাবে।

গোবরা বলে,-কিন্তু মামা-!

মামা অভয় দেয়,-এ আমার জায়গা, তোরা খা-যা খুশি।

এই কথা শুনে হোঁৎকা ডজন দেড়েক কচুরি, সেই সঙ্গে বার তিনেক আলুর তরকারি, শেষ পাতে গোটা আষ্টেক রাজভোগ আর চারটে কালাকাঁদ খেয়ে, গেলাস দুয়েক জল খেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল,-এবার মনে হয় বাঁইচা গেলাম।

আমরাও মন্দ খাইনি। বেলা তখন চারটে বাজে। দেখলাম সেই যাত্রীবাহী ট্রেনটাও এসে স্টেশনে ঢুকছে। পটলা বলে,-ওই ট্রেনে এলে আর দেড়শো টাকা গচ্চা যেত না। একসঙ্গেই তো এল।

নসুমামা সান্ত্বনা দেয়,-যা হয়ে গেছে তার জন্য ভাবতে নেই।

দোকানদার সব হিসাবপত্র করে বলে,-দুশো বারো টাকা হয়েছে।

চমকে উঠি টাকার অঙ্ক শুনে। মামা কিন্তু নির্বিকার। হাতের ব্যাগটা নিয়ে উঠে গিয়ে অনায়াসেই টাকা মিটিয়ে কিঞ্চিৎ মৌরি কাউন্টার থেকে নিয়ে মুখে ছিটিয়ে বলে,-আয়। এবার বাড়ি যেতে হবে।

মামার এই ব্যাপারে আমরাও অবাক। কৃপণ নসুমামা হঠাৎ যেন দাতাকর্ণ হয়ে গেছে।

অটো চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে প্ল্যাটফর্মের সেই লড়াই-এর দৃশ্যটা। আগে গার্ড আর ড্রাইভারে দেখেছি গলাগলি ভাব। শুধোই,-মামা, হঠাৎ ওই লরেল হার্ডির মারপিট শুরু হল কেন বলো তো? মোটকা ড্রাইভার গার্ডকে তুলে লাইনেই আছড়াতে গেল।

নসুমামা পাহাড়-বনের দিকে চেয়ে বলে,-কোনো রিজন নিশ্চয়ই আছে।

-সেই কারণটাই তো জানতে চাইছি।

মামা বলে-পরে জানবি। ওদের বখরা নিয়ে এমন প্রায়ই হয়। ওই যাত্রীদের কালেকশন গার্ড আর ড্রাইভারের মধ্যে ভাগ হয়। বেধেছে তাই নিয়েই হয়তো। ছাড় তো! এসে গেছি।

নসুমামাদের বাড়িটা শহরের উপকণ্ঠে। চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে একটা সবুজ উপত্যকার বুকে এই শহর। ভালো বাড়ি-রাস্তা-বড় বড় দোকান পশার-নানা জিনিস সবই মেলে। ব্যাঙ্ক, কাছারি-তাও আছে। একটা মহকুমা শহর এটা।

মামাদের বাড়িটা নদির ধারে বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে। আম, লিচু, কলাগাছ, কাঁঠালগাছ রয়েছে বাগানে। এখানে বেশ জমিয়েই রয়েছে নসুমামারা ক'পুরুষ ধরে।

আমাদের জন্য ওদিকে একটা খালি বাংলোর ব্যবস্থা হয়েছে। বিশাল এলাকাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনেই পাহাড়-বন।

ফটিক বলে,-দারুণ জায়গা।

হোঁৎকা অবশ্য কবি, শিল্পী-টিল্পী নয়। সে বলে,-হাঁরে, খাওয়ার ব্যবস্থাটা কনে হইব?

নসুমামা বলে,-ওসব হয়ে যাবে, ভেবো না।

মালগাড়ির আয়রন ওরের লাল ধুলো সর্বাঙ্গে। তাই প্রথমে স্নান করে, ফ্রেশ হয়ে নিই। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে।

এর মধ্যে নসুমামার ভাই রাসুমামাও এসে পড়েছে। ওদের বড়দা শিবুবাবুই ব্যবসাপত্র দেখেন, আর ওই দুই ভাইকে সামলান।

কারখানা জমি জিরেত সবই আছে। নিজেদেরই পোলট্রি ফার্ম। ওদিকে বেশ কয়েকটা নধর জার্সি গাইও রয়েছে।

স্নানাদির পর এসে গেছে গরম পরোটা আর মুরগির মাংস এখানকার জলও দারুণ। সেই কচুরি কখন হজম হয়ে গেছে।

এবার একটা গড়াগড়ি দিচ্ছি। নসুমামা আসে। বলে,-কেমন জায়গা রে!

বলি,-দারুণ!

নসুমামা এবার গোবরাকে বলে,-নে। রেল কোম্পানির লোকগুলোকে গুনোগার দিলি সাড়ে তিনশো টাকা, রাখ সেটা তোদের ক্যাশে।

এবার অবাক হই,-সে কি মামা, তুমি কেন টাকা দেবে? ওটা তো আক্কেল-সেলামি, তুমি কেন গচ্চা দেবে?

পটলা বলে,-তা তো বটেই। টাকা কেন দেবে?

নসুমামা বলে,-এ টাকা ওই শালাদের চুরির টাকা রে-আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি ওদের শিক্ষা দেবার জন্যে।

মানে?-গোবরা অবাক হয়।

নসুমামা এবার ওই গার্ড ড্রাইভারের মারপিটের 'রিজন' প্রকাশ করে। বলে,-ওই পিটার আর গার্ড যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ড্রয়ারে রাখছিল। স্টেশনে নামার আগেই ওদের ড্রয়ার থেকে সব চুরির মাল ব্যাগে পুরে কেটে পড়েছিলাম। সব সাফ।

ওই টাকা নিতে বাধে। পটলাই বলে,-ও লাগবে না মামা। কত এনেছ?

মামা ব্যাগটা বের করে দেখায়। বলে-হাজার তিনেক হবে।

-একদিনে এত টাকা?

মামা বলে,-বোঝ তাহলে, রেল কোম্পানির কত ঝাড়ে ওরা।

পটলা বলে,-সব টাকাটাই রেখে দাও, কোনো ভালো কাজে লাগানো যাবো।

নসুমামা বলে,-নিতে চাইনি, ওদের শিক্ষা দেবার জন্য নিয়েছি। তা যখন বলছিস, থাক এটা। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাবে।

নসুমামা এমনিই অসাধারণ। তবে এরপর রাসুমামার যে পরিচয় পেলাম তাও কম নয়।

সন্ধ্যায় রাসুমামা এসে জোটে। পরনে এখন রাসুমামার হাফ প্যান্ট। হাতে বন্দুক, গলায় টোটার মালা,মাথায় টুপি।

বাংলোর বাগানে বসে আছি,ওই ধড়াচূড়া পরে রাসুমামা ঢুকল।

-তোরা এসে গেছিস? বহুৎ আচ্ছা হয়েসে। বৈঠ, বৈঠ। চা আনো-চঞ্চল। গুটে বিস্কুট ও দিবা।

রাসুমামার ভাষাটাও খিচুড়ি মার্কা। বড়জামদার অবস্থান বড় বিচিত্র জায়গায়। শহরের অর্ধেকটা বিহার, রাস্তার ওদিকটা উড়িষ্যা। তাই বিহারি-ওড়িয়া ভাষায় খিচুড়ি চলে এখানে। বাঙালিরা তো তিনরকম ভাষাতেই কথা বলে। রাসুমামা এদেশেই মানুষ,তাই ওর ভাষাটাও বিচিত্র।

রাসুমামা নাকি বিরাট শিকারি। ওকে ওই পোশাকে ঢুকতে দেখে পটলা বলে,-কোথায় গেছলে?

রাসুমামা বলে,-পোলট্রি ফার্মের ওদিকে দুটো চিতা ঘুরছে। তাই ওগুলোকে তাড়াতে গেছলাম। বুঝলি সরকার আইন করেছে বন্যপ্রাণী মারা যাবে না। তখন তো কত কি মেরেছি। সম্বর, হরিণের মাংস ছাড়া ভাত খাইনি।

আমার ঠাকুরদা প্রথম এদিকে এসে ওই নদীর ধারেই বাঘ মেরে শিকারে হাতেখড়ি দেয়। তারপর তো কত হাতি,বাঘ,বাইসন মেরেছে তার হিসাব নেই। বাবাও...

রাসুমামার গল্প শুরু হলে থামে না। হোঁৎকা বলে,-তা এহন হরিণ টরিণ মারতি পারেন না?

রাসুমামা বলে,-আইন বড় কড়া। তা সারান্দার বাংলোতে যাচ্ছ তো?

পটলা বলে,-সেই সব পারমিশান নিয়েই এসেছি।

-গুড! কোনো ভাবনা নেই। যাবার সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। আমি আছি যখন,কোনো অসুবিধাই হবে না।

আমি বলি,-তা জানি।

রাসুমামা বলে,-তখন কত শিকার করেছি। অন ফুট। এখন সব মাচানে বসে।

হোঁৎকা বলে,-শিকারি তাহলে আছে এখনও!

রাসুমামা চায়ের কাপে চুমুক দিতে বলে,-শিকারি! এখন আর কেউ শিকারি আছে নাকি? আমিই কিছু শিখেছিলাম গুরুর কাছে।

শিকারের পরম্পরা, গুরু, এসব আছে নাকি?-বলে উঠি।

রাসুমামা বলে,-শিওর,সব কিছুই শিক্ষা করতে হয় গুরুর কাছ থেকে।

ফটিক বলে,-নিশ্চয়ই। গুরুর ঘরওয়ানা থাকবে,সাধনা থাকবে।

রাসুমামা ফটিকের কথায় খুবই খুশি। বলে,-তুমিও শিকার করো নাকি?

আমিই বলি,-ও গান-টান গায়।

রাসুমামা যেন আশমান থেকে ধপাস করে পড়ে,-গান গাও!

তারপর বলে,-তবে গুরুর কথা যা বললে সেটা খাঁটি সত্যি। কাউকে দিয়ে যাননি।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পাহাড়গুলো যেন আঁধার পাঁচিলের মত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে স্তব্ধতা নেমেছে, মাঝে মাঝে বনের দিক থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে। ওদিকে কিরিবুরুর পাহাড় চুড়ায় স্টিল কলোনির দু'চারটে আলো দেখা যাচ্ছে। যেন আকাশে তারা উঠেছে।

এই পরিবেশে আদিম আরণ্যক রূপটা যেন ফিরে এসেছে।

নসুমামা বলে,-রাসু,তোর গুরুর চেয়ে আমার গুরুর নামডাকই ছিল বেশি।

রাসুমামা চটে ওঠে,-থাম তো! আমার গুরু ধম্মদেওজির কথা এখানে সবাই জানে।... বুঝলে-বুনো হাতি,বাঘ,সকলের ভাষাই বুঝতেন তিনি। বনে গিয়ে গন্ধ শুঁকে জানতে পারতেন বাঘ, হাতি কোন্ দিকে গেছে। স্বচক্ষে দেখা হে,মাত্র একটা গুলি। ব্যস-এত বড় হাতির মাথা দিয়ে গুলি ঢুকলো আর সেই গুলি করাতের ফালার মত ইয়া বড় হাতিকে সমান দু'খণ্ড করে বের হয়ে গিয়ে পরের শিকারে লাগল। হাতি দু'খণ্ড হয়ে ছিটকে পড়ল দুদিকে। তাঁর গুলি কখনও ফসকাতে দেখিনি। গুলি ফসকালে,গুলি নিজেই ঘুরে এসে লক্ষ্যে ঠিক লাগত।

-সে কি!

আমার কথায় রাসুমামা বলে,-স্বচক্ষে দেখা হে। তাজ্জব ঘটনা।

নসুমামা বলে,-শুধু কথাতেই বাঘ মারতেন ওর গুরু।

রাসুমামা গর্জে ওঠে,-থামবি নসু? শিকারের তুই কি জানিস,তোর গুরু ওই নকুল মাহাতো কি জানত? আমার গুরু বন্দুকই ব্যবহার করত না। ভালুক টালুক তো গরু বাঁধা গোঁজ দিয়ে পিটিয়েই মারতেন। গুরু বাঁধার খোঁটা দিয়ে কত ভালুক মেরেছেন তার হিসাব নেই।

নসুমামা বলে,-কি গুরুরে তোর রাসু? বনে বনে কষ্ট করে ঘুরে শিকার করত? আমার গুরুদেব একেবারে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বনে জঙ্গলে যেতেই হত না।

আমরা অবাক হই।

-কি বলছ? বনে না গিয়ে শিকার করবে কি করে?

নসুমামা এবার লাইনে এসেছে। বলে,-তবে আর মহাশিকারী কি! আমার গুরুদেবকে সারা এলাকায় মুণ্ডা হো'রা বলতো-মারাং শিকারি। মানে সবচেয়ে বড় শিকারি।

তখন তো সর্বত্র বন,গভীর বন। কোথাও বাঘের উৎপাত হচ্ছে, কোনো গাঁয়ে পাগলা হাতির উৎপাত শুরু হয়েছে-মানুষ মেরে তছনছ করছে,কোনো অঞ্চলে বাইসন ক্ষেপে গিয়ে ঘরবাড়ি ভাঙছে-বিভিন্ন গাঁয়ের মানুষ আসত গুরুদেবের কাছে খবর দিতে।

গুরুদেবের চ্যালা হিসাবে আমার কাজ ছিল একটা খাতায় কোন্ গ্রামে বাঘ মানুষ মারছে,কোন্ বসতিতে হাতি মানুষ মারছে, কোথায় বাইসন মানুষের সর্বনাশ করছে-এই সব লিখে রাখা। খাতাতে এক নম্বর, দু'নম্বর করে নাম্বার দিয়ে ওই সব লিখতাম।

-তারপর সেই সব বনে যেত শিকার করতে?

গোবরার কথায় নসুমামা বলে,-ধ্যাৎ,মহাপুরুষ মারাং শিকারি। ওদের ব্যাপারই আলাদা। সন্ধ্যার পর গুরুদেব পূজা অর্চনা সেরে কপালে প্রসাদী তিলক পরে বাইরে এসে হাঁক দিত,-বন্দুক লাও,গুলি লাও।

আমরা এনে দিতাম বন্দুক। আর খাতা হাতে রেডি। গুরুদেব বলতেন,-পড়ো। এক নম্বর-

আমি পড়ে যেতাম,-কুদলিবাদে একটা বুনো হাতি...

গুড়ুম! গুরুদেব একটা গুলি করলেন,-দুসরা?

আমি পড়ে গেলাম,-এদেলবাও-এ একটা বাঘ...

গুড়ুম! আবার গুলি। এমনি পর পর পড়ে গেলাম বসতির নাম আর জানোয়ারের নাম, আর এক একটা গুলি ছুটল।

-তারপর।

নসুমামা বলে,-ওই এক একটা বসতির এক এক জানোয়ারের নামে ছোঁড়া গুলি ঠিক গিয়ে তাদেরই কানে কপালে মোক্ষম জায়গাতেই লাগবে। আর খবর আসত ত্যানারা সব নিকেশ হয়ে গেছেন। ঘরে বসেই শিকার।

আমরা হতবাক।

রাসুমামা বলে,-গুলিবাজ নয়তো গুলবাজ।

নসুমামা বলে,-ওই বিদ্যাটা শিখতে পারলাম না। গুরু অকালে সাপের ছোবলে মারা গেছল।

গল্প ভালোই জমেছে। এমন সময় খাবার ডাক আসাতে আড্ডা থামিয়ে উঠতে হল। তবে মহান ওই শিকারিদের চ্যালাদের এলেম দেখার বাসনাটা প্রবল হয়ে উঠল।

ক'দিন এখানে থাকতে হবে, কারণ সারান্দার বনের ভিতর বনবাংলোয় থাকতে গেলে বনবিভাগের বিশেষ অনুমতিপত্র চাই। সেটা আনতে হবে চাইবাসার বন অফিসের থেকে।

বড়মামা খুবই কর্মব্যস্ত লোক। ব্যবসাপত্রের কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, জেলার কর্তাদের কাছেও যেতে হয়। বড়মামার ম্যানেজার, অন্য কর্মচারীরা অবশ্য আছে। আর তার এই দুই ভাই আমাদের নসুমামা আর রাসুমামা কাজের থেকে অকাজই করে বেশি। রাসুমামা তো জিপ নিয়ে ওই শিকারির বেশেই বনপাহাড়ে ঘোরে। আর নসুমামা ঘরে বসেই তস্য গুরুদেবের মত কামান দেগে অমুক বসতির হাতি, তমুকবনের বাঘ মারেন।

সেদিন সকালে আমাদের বনে যাবার কথা শুনে রাসুমামা বলে,-নো ফিয়ার, চল আজই বনে যাবি। বাংলো-ফাংলো সব ব্যবস্থা

করে দেব।

বড়মামা বলেন,-থাম রাসু। অনেক করেছিস, বিনা পারমিটে বনে ঢুকে এদের বিপদে ফেলিস না।

তবে কি বনে থাকা যাবে না?-পটলা বলে।

বড়মামা বলেন,-এই সপ্তাহেই চাইবাসা যাব ব্যবসার কাজে। ডি.এফ. ও সাহেব আমার চেনা জানা। তোমাদের পারমিট, বাংলোর ব্যবস্থাও করে আনব।

রাসুমামার গুরত্ব যেন কমছে। সে বলে,-করো তাহলে। বনে যাবে তার আবার অনুমতি! রামচন্দ্র বনে গেছল কার কাছে পারমিট নে?

বড়মামা বলেন,-তখন রামরাজত্ব,ওসব লাগত না। এখন মানুষের রাজত্বে মানুষের এসব লাগে। তোর মত মর্কটদের অবশ্য এখনও এসবের দরকার নেই।

রাসুমামা চুপ করে যায়।

এর মধ্যে আমরা বড়বিল শহরটাকে দেখে ফেলেছি। ছোট শহর, চারদিকে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়। পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে সারান্দার দিকে।

ওদিকের নদীটার নাম কারো। দুদিকে শাকসবজির খেত। ধানও কিছু হয়েছে। মাটি খুবই উর্বর। কিন্তু বন থেকে হরিণের পাল নামে। আসে বন শুয়োরের দল। বুনো হাতির দেখা তো পথেই মেলে। বনপাহাড় ছেড়ে তারাও মাঝে মাঝে শহরের আশেপাশে এসে কলাবাগান, আখখেত তছনছ করে যায়। আর আসে ভালুকও। তাই বড়মামা বলেন,-বেশি দূরে যেও না। এসব জায়গা সেফ নয়।

সেদিন সকালে নসুমামার সঙ্গে বের হয়েছি ওদের খামারের দিকে। ওদিকের পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ ঢালু জমিতে আখ,আলু,ধান,আনাজপত্রের চাষ হয়। তার ওদিকে নদীর ধার ঘেঁষে মুরগির খামার।

এককালে এসবই বনে ঢাকা ছিল। মানুষ বন কেটে এসব জবর দখল করে চাষ আবাদ করছে বনের পশুদের তাড়িয়ে।

তবু তারা মাঝে মাঝে এসে হানা দেয় খেতে। মাঠে সবুজ সতেজ আলু,আখ হয়েছে। সেই আলুর ভেলি বেশ কয়েকটা কারা যেন কোদাল দিয়ে খুঁড়ে নীচেকার নধর আলু সব খেয়ে গেছে। কিছু পড়ে আছে, দাঁতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়।

আমি বলি,-এত আলু তোলা হয়েছে?

মজুরার বলে,-না, বাবু।

রাসুমামা নিরীক্ষণ করে বলে,-দেখছিস না, বন শুয়োরের পাল নেমেছিল। তারাই দাঁত দিয়ে ভেলি উলটে সব আলু শেষ করেছে।

স্থানীয় মুণ্ডা মজুররা বলে,-সুলুক সন্ধান পেয়েছে, এবার রোজই নামবে। ওদিকে হরিণের পালও আসছে। সব শেষ হয়ে যাবে।

রাসুমামা বলে,-আজ রাতেই আসছি রেডি হয়ে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ওই বনশুয়োর হরিণ যা পাব তাই মারব।

রাসুমামাকে বলি,-আমরাও তোমার সঙ্গে আসব মামা। তোমার শিকার করা দেখব।

দেখবি! -রাসুমামা বেশ গৌরবান্বিত বোধ করে। তবু বলে, তবে কাউকেই বলবি না। একদম সায়লেন্ট থাকবি। বড়দা, বিশেষ করে ওই গুলবাজ নসুকে একদম বলবি না। হান্টিং কাকে বলে তোদের দেখাব। তোরাও বল্লম, লাঠি, টাঙ্গি হাতে রাখবি। অবশ্য দরকার হবে না আমি আছি। তবু হাতে একটা হাতিয়ার থাকলে মনের জোর বাড়ে।

সত্যিই শিকার দেখা যাবে। পটলা বলে,-বনে এসে এসব না দেখলে চলে?

হোঁৎকা বলে,-তা যা কইছিস।

বাড়ি ফিরে চুপচাপ রইলাম। নসুমামা শুধোয়,-কোথায় গেছলি?

ফটিক ওইসব এড়াবার জন্য বলে,-শহরের এদিক ওদিক ঘুরছিলাম।

নসুমামা বলে,-বাইরে যাবি না। এখন বুনোশুয়োর,ভালুক, একটা দুটো চিতে বাঘও নাকি আসছে নদীতে জল খেতে। একা দূরে যাবি না। কাল তোদের মুর্গা মহাদেও দেখাতে নিয়ে যাব। পাহাড়ের মধ্যে ঝর্না-সেখানে মন্দির ঘন বনের মধ্যে। লাকে থাকল বুনো হাতিও দেখতে পাবি।

গোবরা বলে,-তাড়া ফাড়া করবে না তো মামা?

নসুমামা বলে,-এ শর্মাকে বনের হাতিরাও চেনে। নকুল মাহাতোর সাগরেদকে বনের সবাই সমীহ করে। কোনো ভয় নাই। রেডি থাকবি কাল সকালে।

দুইমামার দয়াতে অনেক কিছুই দেখা যাবে। আজই তো যাচ্ছি বরাহ শিকারে। দিনটা চুপচাপ কেটে গেল। বড়মামাও চলে গেলেন চাইবাসা। পরশু ফিরবেন জঙ্গলে যাবার পাশ নিয়ে।

তিথিটা বোধহয় পূর্ণিমা, শীতের শুরু। আকাশ বেশ ঝকঝকে। চাঁদের আলোয় বনপাহাড় স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। আমরা পাঁচ মূর্তি আর রাসুমামা বের হলাম চুপিসাড়ে। রাসুমামার পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে মোজা-হান্টিং সু, গায়ে শার্টের উপর একটা কালো রং-এর গোবদা সোয়েটার, মাথায় টুপি। হাতে বন্দুক, গলায় টোটার মালা।

আমাদের বলে,-নসুকে কিছু বলিসনি তো?

পটলা বলে,-না,না।

গোবরা বলে,-ও কাল আমাদের মুর্গা মহাদেব দেখাতে নিয়ে যাবে। বুনো হাতিও দেখাবে বলেছে।

রাসুমামা বলে,-এখন তোদের শুঁড়কাটা হাতির বাচ্চার পালই দেখাব চল।

শুয়োরগুলো বেশ নাকি নধর। হাতির বাচ্চার মতই দুদিকে দুটো ধারলো দাঁত বের হয়ে থাকে। ওই দিয়েই তারা মাটি খুঁড়ে কন্দ মূল বের করে। আলুর ভেলি সাফ করেছে ওই দাঁত দিয়েই।

হোঁৎকা বলে,-শুয়োর তো খাই না মামা, একখানা হরিণ যদি মারতি পারো।

রাসুমামা তখন বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। আমরা চলেছি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। রাসুমামা বলে,-চান্স পেলে হরিণই খাওয়াব তোদের।

খামারের ওখানে একটা লম্বা শেড মত আছে। তখন রাত বেশ গভীর। চারিদিক নিস্তব্ধ। মুণ্ডা মজুরদের সর্দার কালু মুণ্ডাও জেগেই ছিল। তবে ঠিক সজ্ঞানে নেই। মহুয়া ওদের চাই-ই। মহুয়া পান করে তখন তার দাঁড়াবার মত অবস্থা নেই, টলছে। তবে ওতে ওরা অভ্যস্ত। টলতে টলতেই ওরা সব কাজ করে।

এর মধ্যে এখান ওখান থেকে খান দুয়েক বল্লম,লোহার রড, লাঠিও জোগাড় হয়ে যায় আমাদের জন্যে।

রাসুমামা বলে,-মুণ্ডা তুই-ও চল খেতে।

মুণ্ডা চোখ বুজেই বলে,-তোরাই যা। আমি এখন নিদাবো, নিদ আইছে।

ওইখানেই একটা বস্তার গাদার উপর ধপাস করে শুয়ে পড়ে। নেশায় না ঘুমে বুঁদ হয়ে যায় তা বুঝতে পারি না। তবে আর ওর সাড়াশব্দ মেলে না।

আমি বলি,-কি হবে মামা। গাইড তো আউট।

রাসুমামা বলে,-কোনো ভয় নাই। আমি তো আছি। চল।

বেশ কিছুটা মাঠ দিয়ে এসে আলুর খেত। আলের এদিক ওদিকে কালো পাথর মাথা তুলে আছে। পাশেই নদী। কিছু জায়গা আবার নিচু। সেই নিচুটায়, নদীর জল ঢুকে কাদা-কাদা হয়ে আছে। জলও আছে সামান্য।

নদীর ধারে বেশ কিছু শাল মহুয়ার জঙ্গল। আদিম অরণ্যের কিছু ঘাস এখানে রয়ে গেছে। রাসুমামা বলে,-শুয়োরগুলো পাহাড় বনের দিক থেকে নামে দল বেঁধে। আমি ওই পাশে ওদের পথের ধারে থাকছি, তোরা এদিক ওদিকে গুঁড়ি মেরে পাথরের আড়ালে বসে থাকবি। কোনো শব্দ করবি না।

আমরা এক এক জন পাথরের আড়ালে বসেছি। আমার হাতে নড়বড়ে একটা বর্শা-তার ফলাটা লাঠিতে ঠিকমত বসেও নি। ওই মোক্ষম অস্ত্র দিয়ে কি হবে জানি না। হোঁৎকার হাতে একটা লাঠি।

গভীর রাত্রি ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যায়। বন পাহাড়গুলো যেন রাতে ঘুমোচ্ছে। ঠান্ডাও বাড়ছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। তখনও কোনো কিছুর দেখা নেই। জায়গাটা ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমেছে। স্তব্ধতার মাঝে নদীর কলকল শব্দ শোনা যায়। রাসুমামাও বন্দুক রেডি করে ঢালুর মাথায় বসে আছে পাথরের আড়ালে।

কতক্ষণ ঠান্ডায় বসে আছি জানি না, হঠাৎ রাসুমামার সিগন্যাল পেয়েই আমরা চেয়ে দেখি বনের দিক থেকে গোটা কয়েক বেশ নধর সাইজের শুয়োর এসে আলুর খেতে নেমে, এদিক ওদিক দেখে, এবার দাঁত দিয়ে আলুর ভেলি ফালাফালা করছে। যেন লাঙল চষছে। গাছগুলো উলটে পড়ছ, আর নরম নিটোল আলু খেয়ে চলেছে।

এত কাণ্ড ঘটছে কিন্তু বন্দুক হাতে রাসুমামা নির্বিকার। কাছেই ওই ভাবে আলু খাচ্ছে, কিন্তু গুলি ছোটাচ্ছে না। স্তব্ধ রাসুমামা।

ওদিকে হোঁৎকা বসেছিল লাঠি হাতে, আমার হাতে বল্লাম-তাও নড়বড় করছে। এসব হাতিয়ার দিয়ে ওই ভয়াল শুয়োর মারার চেষ্টা করা মানেই, নিজেদের শিকারে পরিণত করা।

পটলা কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে সন্তর্পণে চলেছে রাসুমামার দিকে। ওকে গুলি করার জন্য বলতে হবে।

পটলা দেখে, রাসুমামা বন্দুক তাক করে বসেই আছে। গুলি করার নাম নেই। পটলা রাসুমামাকে ঠেলা দিয়ে সংকেত করতে চেষ্টা করে, তাতেও সাড়া নেই। জোরে ঠেলতে রাসুমামা কাত হয়ে পড়ে, আর বেশ ভারী দেহ ঢালুর মুখে গড়াতে শুরু করে।

বন্দুক পড়ে রইল ওখানে, রাসুমামা কুমড়োর বস্তার মত গড়াচ্ছে ঢালু বেয়ে। ক্রমশ গতিবেগ বাড়ছে।

রাসুমামা ওই শুয়োরের দলকে দেখেই জ্ঞান হারিয়েছে। ওই ভাবেই পাথরের খাঁজে স্ট্যাচুর মত আটকে ছিল। পটলার ধাক্কায় মামার জ্ঞানহীন দেহটা গড়াতে গড়াতে এসে সশব্দে ওই নীচের জলকাদায় পড়ে। ছপাং করে শব্দটাও বেশ জোরেই হয়।

আমরা তো হতবাক। এদিকে ওই শব্দটা রাতের স্তব্ধতার মাঝে বেশ জোরেই শোনা যায়। সেই শব্দ শুনে বুনো শুয়োরের দলও সাবধানী হয়ে ওঠে। মাথা তুলে এদিকে চাইতে, বোধহয় আমাদের অস্তিত্বের খবর পেয়েই একেবারে মাথা নিচু করে আমাদের দিকে তেড়ে আসে।

রাসুমামা তো তখন জলাশয়ে। বন্দুক ওই পাথরের মাথায়। আমরা তখন অনাথ। হাতের ওই ডান্ডা-ফাণ্ডা ফেলে তখন দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়েছি।

গোবরা দৌড়ে গিয়ে নদীর ধারে একটা গাছ পেয়ে তাতেই তরতর করে উঠে পড়ে। আমি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে সেঁধিয়েছি। হোঁৎকা, পটলা, ফটিকদের সন্ধান জানি না। তখন অবস্থা-চাচা আপন পরাণ বাঁচা।

গোবরার চেহারাটা বেশ ওজনদার। কুমড়োর মত নিটোল দেহ নিয়ে প্রাণভয়ে গাছে উঠেছে। একটা ডাল ধরে আরও উপরে উঠে যাবার চষ্টা করে। আর সেই ডালে ছিল একটা মৌচাক।

ওদিকে বুনো মৌমাছিরা অনেক গাছেই ছোট বড় সাইজের মৌচাক করে। ভালুকদের খুবই প্রিয় খাদ্য মৌচাক। মৌচাক দেখলে ভালুকও তার পিছনে থাকে। মৌমাছির কামড়ের ভয়ও আছে, তাই ভালুকগুলো কোনো জলার কাদায় আচ্ছাসে গড়াগড়ি দিয়ে, সর্বাঙ্গে পুরু করে কাদা মাখে। তাদের শক্ত বড়বড় লোমের সঙ্গে সেই পুরু কাদা পুলটিশের মত জমে যায়। মাথা গা সব জমে তখন কালো পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়, চোখ দুটো পিট পিট করে। সর্বাঙ্গে কাদার আবরণ থাকার জন্য মৌমাছির কামড় আর গায়ে বেঁধে না। সেই দেহ নিয়ে ভালুক গাছে উঠে, না হয় ডাল নাড়িয়ে, মৌচাক ভেঙে ফেলে মধু খায়।

ওই গাছে মৌচাকের সন্ধান পেয়ে একটা ব্যাটা গোদা ভালুক এর আগেই সর্বাঙ্গে কাদার মেক-আপ নিয়ে ওই গাছতলায় বসে মৌচাক ভাঙার প্ল্যান করছিল।

ঠিক সেই সময়েই শুয়োরের তাড়া খেয়ে গোবরা ওই গাছেই উঠেছে। আর অন্ধকারে প্রাণের দায়ে ওই মৌচাকের ডালটাই ধরেছে। মড়াক্ করে ডাল ভেঙে মৌচাক আর গোবরা দুজনেই এসে পড়ে নীচে অপেক্ষামান সেই ভালুক বাবাজির উপর।

আচমকা দেড়মণি কোনো মানুষের লাশ এর আগে কখনও ওই ভালুকের উপর পড়েনি। ভালুক আর্ত চিৎকার করে পিঠ থেকে ওই মাল ঝেড়ে ফেলে মধুর আশা ত্যাগ করে দৌড়তে থাকে।

হোঁৎকা ব্যাপারটা বোঝেনি। ধাবমান মুর্তিকে দেখে ভেবেছিল, পাথরের আড়াল থেকে কালো সোয়েটার পরা মামাই বের হয়েছে। তার মানে রাসুমামা খালি হাতেই বন্যবরাহের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে। বিপদ হবেই। তাই হোঁৎকা ওই ধাবমান মূর্তিকে ধরে চিৎকার করে,-রাসুমামা, যাইবা না। তোমারে বুনোশুয়রের সাথে ফাইট করতি দিমু না। ওগোরে যাতি দাও।

পিছন থেকে হোঁৎকা মামার ওই গোদা হাতটাই খাবলে ধরেছে। বাধা পেয়ে ভালুক বাবাজি এবার আরও ঘাবড়ে গেছে। একটু আগেই এক দুপেয়ে জীব তার ঘাড়ে চেপেছিল, কোনোরকমে তার কবলমুক্ত হয়ে দৌড়চ্ছে। আবার একজনকে ওইভাবে আটকে ধরতে দেখে ফিরে চাইল ভালুক বাবাজি।

হোঁৎকাও চাঁদের আলোয় এবার ভালুকের লম্বা মুখ, কুতকুতে জ্বলন্ত চোখ দেখে ঘাবড়ে গেছে।

-তুমি মামা নও, আয় বাপ্ রে। ভালুক-

কে কাকে ভয় পেয়েছে জানা যায় না। হোঁৎকা মামার হাত ছেড়ে সিধে দৌড়, ভালুকও লদপদ করে দৌড়াচ্ছে বনের দিকে।

বন্যবরাহ, বন্যভালুক দুপক্ষই উধাও। কিন্তু এবার ওই চাঁদনি রাতে আমাদের কথক, কথাকলি নৃত্য শুরু হয়। বৃন্তচ্যুত মৌচাক থেকে পালে পালে ক্রুদ্ধ মৌমাছিল দল এবার পাঁচ মূর্তিকে আক্রমন করেছে।

আমাদের চিৎকারে খামার বাড়ির দিক থেকে মুণ্ডা সর্দার, অন্যদের নিয়ে লাঠি সড়কি হাতে, হ্যারিকেন মশাল নিয়ে দৌড়ে আসে।

মশালের আগুন ও ধোঁয়ায় মৌমাছিরাও পালায়।

এমন সময় দেখি সেই কাদামাখা ভালুকটা আবার এই দিকেই আসছে। বোধহয় এবার ওটা আমাদেরই আক্রমণ করবে।

পটলা চিৎকার করে,-ভালুকটা এবার ফিরে এসেছে,অ্যাটাক করবে-

মুণ্ডারা এসব পরিস্হিতির মোকাবিলা করতে জানে। ওরা টাঙি বল্লম নিয়ে তৈরি।

হঠাৎ সেই মূর্তি আর্তকণ্ঠে বলে,-ভালুক নই। আমি রাসুমামা-তোদের রাসুমামা রে।

রাসুমামা অজ্ঞান অবস্থাতেই জলায় গড়িয়ে পড়েছিল, এবার ওই কর্দমাক্ত দেহ নিয়ে উঠে এসেছে। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আমাদেরও মৌমাছির কামড়ে আর টেনশনে তখন কাঁপ ছটকানো অবস্থা। রাসুমামাকে দেখে হোঁৎকা গর্জে ওঠে,-এই কাণ্ড তোমার! শিকার করবা কি, বুনোশুয়োর দেখ্যাই 'ফিট'।

খেয়াল হয়নি এতক্ষণ। এবার দেখি এইসব কাণ্ড ঘটতে ঘটতে আকাশ সামান্য ফরসা হয়ে গেছে।

রাসুমামা বন্দুক ঘাড়ে চুপ করেই ফেরে। আমরাও কমবেশি চোট পেয়েছি।

নসুমামার ভোরে মর্নিংওয়াক করা অভ্যাস। এই ক'দিন সে আমাদের ডেকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে যেত। আজ ক্যাম্প খালি, রাসুও নেই দেখে সে চিন্তিত।

এমন সময় শোভাযাত্রা করে ওই ছত্রভঙ্গ অবস্থায় আমাদের ফিরতে দেখে, আর রাসুকে ওই কর্দমাক্ত ভালুকের মত দেখে বলে,-ই কি রে! কোথায় গেছলি? কাদা মেখে ভুত হয়ে ফিরছিস! গোবরা তোকে চিনাও যায় না, চোখ ঢেকে গেছে। হোঁৎকা তোর জামাটা ফর্দাফাই-

সব শুনে নসুমামা বলে,-রেসো, তোর গুরু এই শিকার শিখিয়েছিল? অ্যাঁ-গুরু মারেনি টিকটিকি-তার শিষ্য গুলন্দাজ!

রাসুমামা বলে,-আজ মিসটেক হয়ে গেছে। পড়ে দেখবি এই রাসু বোসের এলেম।আমি ঘরে বসে বাঘ মারি না তোর গুরুর মত। আমি রীতিমত অ্যাকশন করি।

গোবরা তো ফুলে ঢোল। মুণ্ডা সর্দারই বন থেকে কোনো গাছের শিকড় পাতা এনে বেটে খেতে দেয়, গায়ে মাখায়। তাতে আশ্চর্য ফল হয়।

নসুমামাও বিব্রত। বলে,-এই অকস্মার সঙ্গে রাতদুপুরে বেরিয়েছিলি! যদি বাঘ হাতির পাল্লায় পড়তিস কি সর্বনাশ যে হত! এখন বড়দা ফেরার আগে সেরেসুরে ওঠ। না হলে রেসোকেও ছাড়বে না বড়দা, আমাকেও কথা শোনাবে। আজ কমপ্লিট রেস্ট নে।

আমাদের এক রাতের শিকার দেখিই নাজেহাল অবস্থা। তাই আজকের দিনটা খেয়ে ঘুমিয়েই কাটাই। এরপর আসল অভিযান বাকি। দু'একদিনের মধ্যেই সারান্দার জঙ্গলে যেতে হবে। হোঁৎকা বলে,-পটলা, তর ওই দুইখান মামারেই ক্যানসেল কইরা বনে যামু।

বড়মামা বনবিভাগ থেকে বনে ঢোকার অনুমতি মায় বনবাংলোও বুক করে এসেছে আমাদের জন্যে। অবশ্য আমরা কেউই বড়মামাকে সেই রাতের ওই শিকারের বিচিত্র কাহিনির কিছুই জানাইনি।

কিন্তু বড়মামা বোধহয় ফার্মের কাজের লোকজন, যারা শেষরক্ষা করেছিল আমাদের, তাদের কাছ থেকেই জানতে পারেন ব্যাপারটা তখন অবশ্য গোবরা অনেকটা সেরে গেছে। কিন্তু রাসুমামা ওই গোবদা সোয়েটার সমেত ঠান্ডায় জলকাদায় ঘন্টাখানেক পড়ে থাকার জন্য জ্বরে পড়েছে।

বড়মামা বলেন,-রাসু, একটু জ্ঞান আক্কেল তোর হবে না কোনোদিন! মুরোদ নাই বন্দুক ঘাড়ে ঘুরবি, আর শিয়াল দেখেই মূর্ছা যাবি। কি কাণ্ড করেছিলি বল দেখি!

রাসু বলে,-আর হবে না দাদা। বনে গিয়ে কোনো অঘটন ঘটাবো না, বিশ্বাস করো।

নসুমামা বলে,-না দাদা, ওকে বিশ্বাস নেই।

আমরাও মুখে কিছু না বলে মনে মনে সায় দিই। ওই রাসুমামা যেন না যায়। তবু নসুমামাকে ভরসা করা যায়।

শেষ অবধি রাসুমামা ক্যানসেল হয়ে গেল। নসুমামা বলে,-রেসো শিকার করার আগে বন্দুক ধরতে শেখ, বুকে সাহস আন।

নসুমামাই এখন আমাদের সহায়, ভরসা।

সারান্দার বনের ভিতরে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটারে দূরে গহন বনের মধ্যে থলকোবাদ বাংলো। সভ্যজগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। বনে সেগুন, শাল, রোজউড গাছ আছে। আর আছে বাঘ, হাতি বাইসন, হরিণ, সম্বর নানা প্রাণী।

একটা গাছের দাম লাখ টাকা, বাঘের চামড়ার দাম চোরাবাজারে কয়েক লাখ টাকা। হাতির দাঁতের এক কেজির দামই আমি শুনেছি দশ হাজার টাকা। একটা দাঁতাল হাতির দুটো দাঁতের ওজন নিদেনপক্ষে পনেরো কেজি হবে। অর্থাৎ দাঁতের দামই দেড় লাখ টাকা। এছাড়া হাতি মেরে চোরা শিকারির দল হাতির দাঁত দুটো কেটে বাকি দেহটা বনের গভীরে পুঁতে রাখে। পরে এসে ওই হাড়ের স্তূপ তুলে নিয়ে যায় বাইরে। সেই হাড়ের দামও লাখ খানেক।

এইসব কারণে ইদানীং বনের গভীরে চোরা কাঠ কাটাই-এর দল, চোরা শিকারির দলও সক্রিয়। এরা নানাভাবে ছলে-বলে-কৌশলে বনের দামি কাঠ, বনজ প্রাণীদের অন্যায়ভাবে মেরে পাচার করে লাখ টাকা রোজগার করে।

ইদানীং সারা বনে তাদের খুবই দৌরাত্ম্য চলেছে। একটা দলের কয়েকজনকে ধরার পর পুলিশ, বনবিভাগ সতর্ক হয়ে নজর রাখছে চারদিকে।

বড়মামা বলেন,-নসু, তুই ওদের সঙ্গে যা। আর সাবধানে যাবি, কাল জিপ তোদের গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ওই বাংলোতেই থাকবি। চৌকিদারই রান্নার লোক দেবে। মালপত্র কিছুই মেলে না বনের মধ্যে, সব নিয়ে যাবি। বনের মধ্যে যাবি না, বাংলোর আশেপাশেই ঘুরবি। চারদিন পর জিপ তোদের গিয়ে নিয়ে আসবে। মালপত্র সব দেখে শুনে নিয়ে যাবে। এদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

নসুমামা এহেন দায়িত্ব পেয়ে রাসুর দিকে চাইল। রাসু তখন মাথা নিচু করে ফুঁসছে। দাদার সামনে কিছু বলতে পারে না।

নসুই বলে,-ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না বড়দা। আমি সব জিনিসের লিস্টি বানিয়েছি। এই দ্যাখো-

বড়মামা চোখ বুলিয়ে বলেন,-এসব বড়বিল বাজার থেকে নিয়ে আয় এখনই। আর সঙ্গে কিছু সর্দিজ্বর, পেটের অসুখের ওষুধও নিবি। বনের মধ্যে ওসব মেলে না।

নসুমামা এবার মার্কেটিং শুরু করে। চারদিনের মত চাল, ডাল, নুন, তেল, মশলার প্যাকেট আলু, পিঁয়াজ, আদা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো সস, মাখন, ডিম, মোমবাতি সবই নিতে হয়েছে। মায় হেরিকেনের কেরোসিন তেল, দেশলাই অবধি! এছাড়া চা বিস্কুট পাউরুটিও আছে।

সব মাল তুলে আমাদের শীতের পোশাক নিয়ে জিপে উঠছি, মামাবাবু বলেন,-নসু, বনে যাচ্ছিস, পারমিট গেট পাশ ওসব নিয়েছিস তো?

নসুমামা ওদিকে দাঁড়ানো রাসুকে দেখে নিয়ে বলে,-তুমি কি আমাকে রেসো পেয়েছ, আাই দেখো।

প্যান্টের পকেট থেকে বনবিভাগের অনুমতিপত্র, বাংলোর অনুমতিপত্র সবই দেখায়।

আমরা নিশ্চিন্ত হই। পটলা বলে,-নসুমামার নজর স-সব দিকেই। হুশিঁয়ার লোক।

গোবরা মালপত্র দেখে বলে,-খান দুই কুমড়ো নিলে হত। কুমড়ো তিন চারদিন ফ্রেশ থাকে। খেতেও ভালো।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,-থাম গোবরা, কুমড়ো অযাত্রা, ওর নাম করলি তরে মার্ডার করুম। কুমড়োর ব্যবসা নিজেই তো একখান কুমড়ো বনছিস। চুপ মাইরা থাক।

আমি থামাই,-যাত্রার সময় মাথা ঠান্ডা করে চল।

নসুমামা এবার আমাদের দলপতি। পরনে প্যান্ট, শার্টের উপর হাফ সোয়েটার আর তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ওই টিকটিকে দেহের উপর বসানো মস্তকটি ও আবৃত করেছে একটা বারান্দাওয়ালা টুপি দিয়ে।

এখানে পথে ঘাটে লাল ধুলোর পাহাড়। লোহা পাথরের খনি এলাকা। ওদিকের পাহাড়ের মাথা কামিয়ে গাছপালা শেষ করে ব্লাস্টিং করে আয়রন ওর তোলা হচ্ছে। লাল ধুলোর আধিক্য এত বেশি যে একবার বের হলে জামা কাপড় সবই লাল হয়ে যায়। মাথার চুলে সাবান দিলে লাল কাদা ফেনা হয়ে বের হয়।

তাই পথে সাধারণ পোশাক পরেই বের হয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই ধুলোয় জামা দেহ সব গেরুয়া হয়ে যাবেই।

জিপটা চলেছে লোকালয় ছাড়িয়ে মোরামের রাস্তা ধরে। দুদিকে ঘন বন। বেশ খানিকটা এসে এবার বড়রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে বেঁকে ফরেস্ট রোড ধরে এগিয়ে যেতে-বনে ঢোকার গেট।

জিপ থামতে বনের রক্ষীরা এসে জিপ তন্ন তন্ন করে খোঁজে। আপত্তিকর কোনো বস্তু, কোনো অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক আছে কিনা দেখে তারপর সেই অনুমতিপত্রটা দেখে ভালো করে, জিপের নাম্বার-ঢোকার সময় সব খাতায় লিখে, নসুমামাকে দিয়ে সই করায়। এত কিছু করার পর গেটের কাঠটা একজন তুলে ধরতে আমরা বনরাজ্যে ঢুকলাম।

রাস্তা বলতে এখানে পাহাড়ের বুকে মোরাম-লালধুলো ঢাকা একটা পথ। ওদিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ বনভূমি। বনরাজ্য রোদে ঝলমল করছে। ধাপে ধাপে পাহাড়ের গায়ে শাল, সেগুন, আবলুস, গামার-নানা গাছের অরণ্য।

গাছের ডালে জিপের শব্দ শুনে বাঁদরগুলো কিচির মিচির শুরু করে। ডানা মেলে বিশাল ময়ূর এ ডাল থেকে ও ডালে ঝটপট করে উড়ে যায়। বনে ঢুকে আমরা যেন ওদের শান্তি নষ্ট করেছি। যে কোনো মুহূর্তে হাতির পাল বেরুতে পারে। পথে দেখি হাতির লাদ। ড্রাইভার শম্ভু মুণ্ডা বলে,-থোড়া আগেই গেছে।

কোনোমতে গিয়ে পৌঁছলাম বাংলোয়। চৌকিদার তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। এখানে মহুয়ার ছড়াছড়ি। ওদিকে একটা আদিবাসী বস্তি। বনের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে বেশ কয়েকঘর আদিবাসী ঘরবাড়ি। এরা বনেই চাষবাস করে। অন্য কাজও করে। গরুবাছুরও আছে, মাঠে চরছে।

বাংলার চৌকিদারকে এসময় জাগানো ঠিক হবে না। তার সহকারীই আমাদের ঘর খুলে দেয়। এই গহন বনে লোকজন খুব বেশি আসে না। নসুমামাই মুণ্ডারী ভাষাতে বলে লোকটাকে। সে জিপ থেকে মালপত্তর নামিয়ে নেয়, আর দুটো ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে। তারপর সে রান্নার ব্যবস্থা করতে থাকে। বেলা তখন প্রায় একটা।

জিপের ড্রাইভারকে ফিরতে হবে ওই বনের মধ্য দিয়ে। সে-ও বেলাবেলি ফিরতে চায়। এখানে সূর্য অস্ত গেলে বৈকাল হয় না, চারিদিকে উঁচু পাহাড়, তার আড়ালে সূর্য ঢলে পড়লেই বৈকাল নামে। তখন বনের রূপও বদলে যায়। তাই সে বলে,-হম অব চলে নসুবাবু!

নসুমামা ওদিকে তখন কাজের তদারকিতে লেগে গেছে। ওই লোকটাকে দিয়ে মাটির কুঁজোয় খাবার জল ভর্তি করিয়ে আর একজনকে দিয়ে বাঁকে করে নীচের পাহাড়ি নদী থেকে বাথরুমের জল তোলাচ্ছে।

ইতিমধ্যে খিচুড়ি চাপিয়েছে লোকটা। ওতেই ফুলকপি মটরশুঁটি আলু ফেলে দেবে। আর বললে মামলেট ও করতে পারে। আজকের মেনু খিচুড়ি আর মামলেট।

বাংলোটা একটা ছোট পাহাড়ের উপর-সমতলে। সামনে সুন্দর বাগান, ফুলের গাছ। রাস্তাটা পাহাড়ের নীচে থেকে একটা ব্রিজ পার হয়ে উপরে উঠেছে। নীচে ছোট একটা নদী। ওই নদীর জলই তুলে আনা হয় বাংলোয়।

লাল ধুলোত সর্বাঙ্গ ভরে গেছে। নসুমামা বলে,-জল তুলে চান করতে দেরি হবে। তার চেয়ে চলো ওই নদীতে, ওখানেই চান করা যাবে আচ্ছাসে। কাপড়গুলোতেও সাবান দেওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা ভালোই। ঝকঝকে রোদে ওই নদীতে স্নান করতে ভালোই লাগবে। আমরা সাবান, তেল, গামছা নিয়ে নেমে যাই ওই নদীতে।

নদীটা ছোট, তবে হাঁটু ভর জল বইছে। পরিষ্কার জল। মাঝে মাঝে বাঁকের মাথায় একটু গভীর। তবে বড়জোর কোমর না হয় বুক সমান। পাথরও রয়েছে। ওই পাথরে বসে জামা প্যান্ট সাবান দিচ্ছে নসুমামা। আমরাও রোদে পিঠ করে সানবাথিং করছি।

হঠাৎ নসুমামা আর্তনাদ করে ওঠে,-অ্যাই রে!

কি হলো?-চাইলাম আমরা।

নসুমামা তখন প্যান্টে সাবান দিয়ে পাথরে সেই প্যান্টকে ধোবী আছাড় দিচ্ছিল। এবার থেমে গিয়ে বলে,-প্যান্টের পকেটে বনের পারমিট, বাংলোর পাশগুলো ছিল।

বের করি কাগজগুলো। একটা প্লাস্টিকের খোলে ছিল বলে সেগুলো ভিজলেও কিছু রয়েছে। নসুমামা সেই ভিজে কাগজ দুটো বের করে ওদিকে একটা পাথরের ওপর রোদে রেখে ছোট পাথরের নুড়ি চাপা দেয়।

আমরাও নিশ্চিন্ত হই-যাক্, ভিজে গেলেও নষ্ট হয়নি ওগুলো।

স্নান পর্ব চলছে। নসুমামা জামা আছড়াচ্ছে। হঠাৎ চিৎকার করে পটলা ছুটে যায়। নদীর ধারে মাঠে কয়েকটা গরু চরছিল। ওদের দল থেকে একটা নধর এঁড়ে গরু নসুমামার রাখা ওই কাগজগুলো দেখে এগিয়ে এসে জিবের একটা সাপটে সেই কাগজগুলো মুখে পুরেছে। কিছুটা বাইরে দেখা যায়। নসুমামাও কেসটা দেখে এবার জামা ফেলে লাফ দিয়ে এসে এঁড়ে গরুর মুখটাকেই ধরে চিৎকার করে,-অ্যাই, খাসনে! খাসনে!

এঁড়ে গরু চোখ বুজে চিবুচ্ছিল, হঠাৎ এভাবে বাধা পেতে সে-ও মাথা নিচু করে নসুমামার সরু কোমরটা দুই শিং-এর ফাঁকে ধরে শুন্যে তুলেছে। আমরা হতবাক। নিমেষের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে যায়। ষাঁড়ের দুই শিং-এর মধ্যে শূন্য পথে দুলছে নসুমামার পটকা শরীর। আর আর্তনাদ করছে,-অ্যাই! অ্যাই!

ষাঁড়টা পুরো কাগজগুলো মুখগহ্বরে পুরে নিজেই যেন জঞ্জালমুক্ত হবার জন্য শিংটা জোরে নাড়ে। নসুমামার আর্তনাদ আর শোনা যায় না। নদীর জলে সশব্দে কি একটা পড়ে। তারপর সব স্তব্ধ। এঁড়ে গরুটাও এবার সেদিকে হেলে দুলে ফিরে যায়। নিজের দলে।

-নসুমামা কই?

পটলা বলে,-কো-কোথায় গেল রে মামা?

মামা বিহনে এই বনে আমরা অনাথ। হঠাৎ ওদিক থেকে জলের মধ্যে এবার মামার মুখটা ভেসে ওঠে,-আমি এখানে!

মামা তখন জল থেকে উঠে দুশোমিটার সাঁতরে বিজয়ীর মত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় পাথরে বসে আর্তনাদ করে,-গেছিরে! কোমরটা ভেঙেই গেছে বোধ হয়।

কোনোরকমে ধরে তুলি মামাকে। ভাগ্যি ভালো ওই ষণ্ডমহারাজ ওকে জলে ফেলেছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেছে। না হলে ডাঙায় আছড়ালে কোমরই ভাঙত।

স্নান করার পর এবার খিদেটাও চাগিয়ে ওঠে। খাবার টেবিলে বসেছি। এককালে ইংরেজ আমলে এখানে প্রভুদের আনাগোনা ছিল, তাই এখনও সাহেবিয়ানা কিছু রয়ে গেছে আসবাবপত্র পুরোনো আমলের, বাসনপত্রও আছে।

কিন্তু খেতে বসে দেখি খিচুড়ি তো নয়, যেন জ্বলন্ত আগুন। আর চাল সেদ্ধ হয়েছে তো ডাল চেয়ে আছে। তেমনি লঙ্কা ঠেসেছে। আর ডিমের ওমলেট-এ কাঁচা লঙ্কার চাষ করেছে। তেমনি নুন।

খিদের চোটে হাপুস নয়নে কেঁদে কেঁদে খেতে হচ্ছে।

বংশী মুণ্ডা, সেই অপুর্ব রাঁধুনির নাম। বংশী শুধোয়,-ঝাল লাগিছু?

ব্যাটা উড়িয়াভাষায় কথাও বলে তাহলে। আধখাওয়া করে ওঠে পড়ি। গোবরা বলে-রাতের রান্নার সময় আমিই থাকব। এত লঙ্কা দেবে না।

-ঠিক আছি।

পরে বোঝা গেল লঙ্কা এত দেবার কারণ। দেখি বংশী, আর তার বৌ বোধহয়, দু'তিনটে ছেলেকেও ডেকে এনেছে। সবাই মিলে খাচ্ছে সেই খাবার-বেশ উপভোগ করে।

হোঁৎকা বলে,-খাতি দে। বেচারাদের ভরপেট খাবারও জোটে না রে। খুবই গরিব এরা।

বৈকালে ওদিকে বস্তিতে বের হই। দেখি একটা মাটির ঘরের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা পড়ছে, বোধহয় পাঠশালা। আর ওদিকে কিছু মহিলা শালপাতার থালা বুনছে। ওদের কুটির শিল্প। বাঁশ কিনতে পারলে বেশি কাজ করা যায়।

মাস্টারমশাই কোথায়? -নসুমামা একজন ছাত্রকে শুধোয়। ছেলেটা হাত দিয়ে আকাশের দিকে দেখায়।

তাহলে মরে গেছে নাকি রে? -আমি বলি।

হঠাৎ ওদিকের একটা পেয়ারাগাছের মগডাল থেকে জবাব আসে,-এই যে, হম্ ইধার হ্যায়। পেড়মে।

মাস্টারমশায়কে কোনো গাছের মগডালে কাপড় সেঁটে বিচরণ করতে দেখব-তা ভাবিনি। একটা ঝোলায় গাছের নিটোল পেয়ারা পাড়তে ব্যস্ত।

আমাদের দেখে নেমে এল তরতর করে। মুখে হাসি এনে ভাঙা হিন্দি বাংলায় বলে, -নমস্কার। কাল মনোহরপুরের হাট আছে না, অহি বাস্তে সব আমরুদ পাঠানে হোগা। কুছ রুপেয়া মিলবে। ইস্কুলের বিদ্যার্থীলোগ্‌কা কিতাব খরিদ নে হোগা।

ক্রমশ আলাপ হল যুবকটির সঙ্গে। ওর বাড়ি বাঁচি জেলার কোন্ গ্রামে। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে এই দূর বনের মধ্যে এসেছে।

এখানেই রয়ে গেছে এদের মধ্যে লেখাপড়ার শেখানোর কাজ নিয়ে। সামান্য সাহায্য পায়, তাতে ছেলে মেয়েদের বই শ্লেট ও

জোটে না। তবু সে চেষ্টা করে এই কাজ চালাতে। আর এখানকার মহিলাদের নিয়ে বনের পাতা, বাঁশ এসব দিয়ে কিছু জিনিস তৈরি করে বিক্রি করে ওদেরই দেয়।

কিন্তু টাকার অভাবে কোনো কাজ তেমন হচ্ছে না। এই গরিব অসহায় বনবাসীদের জন্য কেউ ভাবে না, কিছু করে না। সামান্য টাকা পেলে এরা অনেক কিছু করতে পারে।

হঠাৎ কথাটা শুনে পটলা বলে,-নসুমামা, সেই গার্ড সাহেবের দু'নম্বরী রোজগারে টাকাটা তো সঙ্গেই রয়েছে।

নসুমামার ও মনে পড়ে। বলে,-এনেছি।

হোঁৎকা বলে ওঠে,-হেই পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই লাগাই দে। মাস্টার ছোকরা কাজের পোলা।

পটলা তাকে বলে কথাটা,-আপনাদের কাজে কিছু সাহায্য করতে চাই। কিছু টাকা দেব-নেবেন?

এর মধ্যে বস্তির বেশ কিছু লোকও জুটে গেছে। তারাও শুনছে আমাদের টাকা দেবার কথা। মাস্টার বলে,-দেবেন? তাহলে তো খুবই কাজে লাগে স্যার। বহুৎ কামমে আয়েগা।

নসুমামা বলে,-প্রায় হাজার তিনেক হবে।

বহুৎ মেহেরবানি স্যার।-মাস্টার, অন্যরাও খুশি।

দু'একজন লোক ওদিকে শুনছে আমাদের কথা। ওরা খুশি হয়নি তা বুঝেছি। ওদের একজন বলে,-ওহি রুপেয়া পঞ্চায়েতকো দিজিয়ে সার।

লোকটার চোখ দুটো পিটপিট করছে। শয়তানের মত চাহনি।

বলি,-পঞ্চায়েত তো অনেক সরকারি টাকা পায়। তাদেরই এই ভালো কাজে টাকা দেওয়া দরকার। তা তো দেয় না, তাহলে এদের যা দেব, তাতে আপনারা কেন ভাগ বসাবেন?

লোকটা জবাব দিল না। অন্যজন বলে,-মুখিয়াজির বাত শুনলে ভালোই হত। ঠিক আছে, আপনাদের যা মর্জি করুন। চলো মুখিয়াজি।

লোকদুটো চলে গেল। পটলা বলে,-মাস্টারজি, আপনি বাংলোয় আসুন, টাকাটা নিয়ে যাবেন।

মাস্টারমশাই বোধহয় জীবনে এতটাকা একসঙ্গে হাতে কোনোদিন পায়নি। নসুমামার ব্যাগেই ছিল টাকাগুলো। আমরাও সঠিক গুনিনি। ও পাপের টাকা ছুঁই-ও নি। এখন গুনে দেখা গেল প্রায় চারহাজার টাকা আছে।

টাকা পেয়ে মাস্টারজি বলে,-বড় উপকার করলেন সার। এবার বেশ কিছু মাল তৈরি করে তার লাভ থেকেই বাচ্চাদের বই শ্লেট সব দিতে পারব। বহুৎ-বহুৎ ধন্যবাদ স্যার।

নসুমামাও খুশি। বলে,-সত্যি একটা ভালো কাজই হয়েছে। ব্যাটাকে জব্দ করার জন্য রাগে ওর মাল সাফ করেছিলাম, আজ বোঝা নামিয়ে খুশি হলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে বস্তিতে রটে গেছে কথাটা। মুখিয়া, তার চ্যালা ভেবেছিল দমকা কিছু রোজগার হবে তাদের। ওদের সামান্য কিছু দিয়ে বাকিটা নিজেরাই পকেটস্থ করবে। কিন্তু তা না হতেই এবার তারাই খেল শুরু করে।

বিট অফিসার, ফরেস্ট গার্ডরা মুখিয়াকে চেনে জানে। কারণ বনের দামি কাঠ, মায় বেআইনি ভাবে বাঘ মেরে চামড়া, হাতির

দাঁত এসব তারাই গোপনে পাচার করে। লাখ টাকার ভাগও তাদের মধ্যে ভাগ হয়।

মুখিয়ার দল পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে কাজ করে। বনের কর্তারা, পুলিশ এখন সজাগ। তাই মুখিয়াও যেন ওদের সহযোগিতাই করতে চায়-এই ভাব দেখিয়ে ওই বিট অফিসার মায় টহলদার পুলিশ পার্টিকেও বলে,-বাংলোয় কারা এসে গাঁ বস্তিতে যেচে টাকা দিচ্ছে স্যার।

বিট অফিসার বলে,-বনবাংলোয় কারা এসেছে?

মুখিয়া বলে,-সে তো আপলোগ জানতা সার। ওদের হাব-ভাব আচ্ছা ঠেকল না।

পুলিশও বলে,-আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে। না হলে যেচে কেউ বস্তির লোকদের টাকা দেয়। ঠিক কোনো বুরা কামধান্দা করে ওরা। সেদিন ভি একটা বাঘ মেরেছে কারা। চামড়াটাও পাওয়া যায়নি। গত মাসে বনে হাতি মেরে বড় বড় দুটো দাঁত কেটে লিয়ে গেছে। ই লোক কৌন হ্যায় পাতা কিজিয়ে বিটবাবু। নেহি তো কোই গড়বড় হলে আপনি ভি চক্করমে ফাঁসিয়ে যাবেন।

সন্ধ্যা নামার পর বনভূমির রূপ বদলে যায়।

চারিদিকে নামে নিথর স্তব্ধতা। তার মাঝে নদীর শব্দের সঙ্গে মেশে ঝিঁঝির একটানা ডাক। আকাশের বুকে তারাগুলো ঝকমক করে। চা খাবার পর এবার নসুমামা জমিয়ে বসে তার গুরুর বিচিত্র শিকার কাহিনি শুরু করেছে।

সেবার একটা পাগলা হাতিকে কি করে জব্দ করেছিল স্রেফ মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে, তারই কাহিনি শুনছি। হোঁৎকা নিবিষ্ট মনে চিনেবাদাম পেয়ারা চিবুচ্ছে। হঠাৎ সদলবলে কাদের আসতে দেখে মুখ তুলে চাইলাম।

জিপ থেকে নামছে কয়েকজন। জোরালো টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। বাংলোয় জ্বলছে হ্যারিকেন। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন পুলিশও রয়েছে। চৌকিদারও ছুটে সেলাম করে।

হঠাৎ বিটবাবু, পুলিশদের দেখে একটু বিব্রতই বোধ করে। ফরেস্টের বিটবাবুই এখানের অফিস, বাংলোর চার্জে। সে এবার আমাদের আপাদমস্তক দেখে, নসুমামাকে শুধোয়,-কোথা থেকে আসছেন-

নসুমামা জানতে বিট অফিসার শুধোয়,-বাংলোর পারমিট দেখান।

এবার চমকে উঠি। নসুমামা বলে,-আছে। চাইবাসা থেকে এনেছি।

সেটা দেখান! -ধমকে ওঠে বিট অফিসার।

নসুমামা বলে,-এই স্যার! না-ছিল-এখন নাই।

-মানে।

-এখানের একটা গরু সেটাকে খেয়ে ফেলেছে স্যার। বিশ্বাস করুন।

নসুমামার কথায় বিট অফিসার এবার ধমকে ওঠে,-ইয়ার্কি হচ্ছে? গরুতে বাংলোর পারমিট, ফরেস্টের পাশ খেয়ে ফেলেছে?

পটলা বলার চেষ্টা করে,-স-সত্যি স্যার।

চোপ! মোটকা এক পুলিশ অফিসার গর্জে ওঠে, দিল্লাগি হোতা হ্যায়। নিকালো পাশ।

কোথায় পাশ। ব্যাটা এঁড়ে গরুটা এভাবে পাশ গিলে খেয়ে আমাদের আছোলা বাঁশ দেবে তা কোনোদিনই ভাবিনি। বলি,-বিশ্বাস

করুন স্যার, সব ছিল।

অ্যাই থাম।-বিট অফিসার আমাকেও থামিয়ে দেয়।

এবার পুলিশের সেই মোটা লোকটা বলে,-সার্চ করো এদের মালপত্র।

মানে! আমরা কি করেছি যে এসব করবেন! -গোবর বলে ওঠে।

দারোগা বলে,-কি করো, তা আমরা বুঝেছি। এবার সেটা তোমাদেরও বুঝিয়ে দোব। এই বনে বিনা পাশে ঠাটেবাটে ঘোরা হয়, আদিবাসীদের হাতে করে যা ইচ্ছে তা করো, বনে বনে যত বেআইনি কাজের মূলে তোমাদের মত গ্যাং-ই.

-কি বলছেন স্যার? কিছুই বুঝতে পারছি না।

পটলার কথায় ধমকে ওঠে পুলিশের মোটকা লোকটা,-এবার বুঝিয়ে দোব।

বিট অফিসার বলে,-বাংলোর পারমিট নাই, মিথ্যা কোথা বলে এখানে ঢুকেছে। এই মুহূর্তেই বের হয়ে যাও, বাংলোয় থাকা যাবে না। চৌকিদার-

যে চৌকিদার এতক্ষণ আমাদের সেবা করতে ব্যস্ত ছিল, বস্তি থেকে মুরগি কিনে এনেছে আমাদের জন্য, সেই চৌকিদার বলে,-বাহার যাইয়ে বাবু। সামান বাহার লে যাইয়ে। রুম লক্ করনে হোগা।

এবার আমাদের অবস্থা করুণ। এই গহন বন, বাঘ হাতির রাজ্যে রাতে কোথায় থাকব জানি না। ওদিকে কিচেনে তখন চারপাঁচটা মুরগির কারির খোসবু উঠেছে। পেটেও খিদে। বলি, -এই শীতে বনের মধ্যে কোথায় থাকব স্যার। সব কাগজপত্র ছিল। আপনাদের কপিও এসেছে।

বনের মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা তেমন নাই। সুতরাং ওসব ওরা পায়নি। পেলেও চেপে গেছে।

বিট অফিসার বলে,-বেআইনি ভাবে বনে ঢুকেছে, বিনা পাশে বিনা পারমিশনে বাংলো দখল করেছে।

দারোগা গর্জে ওঠে,-বেআইনি কাঠ পাচার, বন্যপ্রাণী শকার করে দাঁত চামড়া পাচার চক্রের লোক তোমরা।

কি বলছেন এসব?-পটলা গর্জে ওঠে। তার তোত্‌লামি বেড়ে যায়, ক-কলকাতার নামি ফ্যামিলি আমরা, এরা সবাই ভালো ছেলে। ইনি নসুমামা, বড়জামদার মিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পার্টনার।

পুলিশের কাছে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার। তাই বলে,-ছোড়িয়ে ফালতু বাত। চলো থানায়-ফাটকমে ঘুসা দেগা। চলো।

বনের মধ্যে এরাই রাজা। কেবল মাত্র পাশটার জন্যই এই হাল।

এবার বিট অফিসার আর দারোগাবাবুদের মধ্যে কি কোথা হবে, দারোগাবাবু ঘোষণা করে,-আপনাদের থানায় যেতে হবে।

-সেটা গিয়েই বুঝবে ছোকরা। বহুৎ তড়পাতা হ্যায়। অ্যাই-উঠাও গাড়িমে সবকোইকো।

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে নাকি বত্রিশ ঘা। টাকা খরচ করে বনভ্রমণে এসে এভাবে শীতের রাতে পুলিশের হাতে পড়ে থানায় যেতে হবে বিনা দোষে-তা ভাবিনি।

পড়ে রইল রুটি, মুরগির মাংস। ওসব বিট বাবুর চৌকিদারের সেবায় লাগবে হয়তো। আমরা খালি পেটে চলেছি থানাতে।

এর মধ্যে বস্তির লোকজনও জুটেছে। রটে গেছে পুলিশ নাকি ডাকাতের দলকে ধরেছে। ভিড়ের মধ্যে সেই মাস্টারজিকেও দেখি। সে কী বলতে এসেছিল। তার কথা কেউ শোনেনি। মুখিয়াও এসেছে। সে হাসছে। প্রতিশোধের হাসি।

তবু নসুমামা বলে,-গুয়া থানায় গেলে কোনো ভয় নেই। বাড়িতে খবর দোব।

কিন্তু শুনি-গুয়া থানায় নয়, এটা বনের অন্যদিকে মনোহরপুর থানার এলাকা। আমাদের সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছে এরা।

মাঝরাতে থানায় এনে ঘুমন্ত কনস্টেবলকে ডেকে তুলে দারোগাবাবু হুকুম দেয়,-ইন্ লোককো লক্আপ্মে ঘুসা দেও।

বলার চেষ্টা করি,-স্যার, পালাব না। বাইরেই থাকতে দিন।

-চোপ? লে যাও লক্আপ্মে।

টেনে নিয়ে গিয়ে গরাদ-এর গেট খুলে একটা প্রায়ান্ধকার হলঘরে আমাদের সবাইকে পুরে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে তালা দিয়ে চলে গেল।

লক্আপেও থাকতে হল! এর জন্য দায়ী নসুমামাই।

এতক্ষণ দেখিনি ঘরের ভিতরটা। কটা প্রাণী এদিক ওদিক শুয়েছিল। তারা এইবার জেগে ওঠে। নসুমামার পরনে দামি সোয়েটার টুপি। হোঁৎকায় গায়ে একটা উইন্ড চিটার। পটলার গায়ে গলাবন্ধ দামি সোয়েটার।

এবার ওই গজিয়ে ওঠা মূর্তিগুলো সজীব হয়ে ওঠে। মনে হয় সবকটা সিঁট্কে চোর, পকেটমার। একজন লম্বা বলিষ্ঠ লোক ধরেছে নসুমামাকে,-দে বে সোয়েটারটা দে। -আমারটা নে।

একটা ছেঁড়া মলিন জামা এগিয়ে দেয়। নসুমামা বাধা দিতে লোকটা বলে,-শেষ করে দেব।

কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে। নসুমামার গেল সোয়েটার, টুপি; হোঁৎকার উইন্ড-চিটার। পটলার জামাও গেছে অন্য একজনের গায়ে। আমার পুলওভারটা বিনা বাধাতেই দিয়ে দিলাম। লোকটা শীতে আমাকে কাঁপতে দেখে তার ময়লা দুর্গন্ধময় চাররখানা দিয়ে বলে,-লে বে।

প্রথম দফাতেই জামাগুলো বেহাত। টাকা পয়সাও কেড়ে নিল তারা। বাধা দিতে বাইরের ঘুমন্ত পাহারাদার গর্জন করে,-হল্লা করনেসে পিটেগা সব কোই কো। নিদ্ যাও শান্তিসে।

আমাদের অবস্থা এখন পথের ভিখারিদের মতই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙে বাইরের তর্জন গর্জন শুনে। সেই মোটকা দারোগা ফিরে এসেছে।

এবার ওই ঘর থেকে বের করে সকলকে ভাঁড়ে চা আর খানদুয়েক লেড়ে বিস্কুট দিয়ে বলে,-বসে বসে সরকারি অন্ন ধ্বংস করা চলবে না। অ্যাই এদের বাগানে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগা।

বরাতে আবার কি দুঃখ আছে কে জানে!

শীতের পোশাক নেই। সব বেহাত হয়ে গেছে। নসুমামার গায়ে ছেঁড়া চটের মত একটা জামা, হোঁৎকার গায়ে দু'সাইজ বড় একটা কাঁধ ফাটা ময়লা কোট, পটলার জুটেছে একটা জিনস্-এর জামা-বোতামও নেই। গায়ে ঢলঢল করছে বেগুন খেতের কাকতাড়ুয়ার মত। আমার গায়ে সেই বোঁটকা গন্ধওয়ালা ছেঁড়া চাদর।

কনস্টেবল ক'জনে আমাদের দারোগাবাবুর জমিতে এনে কোদাল, ঝুড়ি দিয়ে বলে,-মাটি কেটে জমিন সমান কর।

অর্থাৎ দারোগাবাবু হাজতের লোকদের দিয়ে তার জমি তৈরি করাচ্ছে বিনাপয়সায়। শক্ত পাথুরে মাটি, তাই প্রায় তিন ফুট কেটে জমি হচ্ছে দারোগাবাবুর।

ভাবতে পারি না এই যন্ত্রণা থেকে কিভাবে মুক্তি পাব? এরপর আদালতে পেশ করা হবে। আমাদের নাকি জেলই হবে।

মনে পড়ে কলকাতার কথা। পটলা বলে,-খবরও পাঠানো যাবে না। সর্বনাশ হবে।

বনের অ্যাডভেঞ্চার মাথায় উঠেছে।

দিনরাত সব একাকার হয়ে গেছে। কি তারিখ, কি বার জানি না। জামা প্যান্ট আর পরা যায় না। ঘামে ধুলোয় বিবর্ণ। মুখ চোখ বসে গেছে। ক'টা দিন কেটেছে জানি না।

দারোগা শাসায়,-জেলে গেলে বুঝবে ক্যামন মজা। এখন থেকেই শয়তানি শিখেছ। সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু তোমরা।

হোঁৎকা বলে,-আপনিই কি কম! যাদের ধরছেন তাদের দিই ওই জমি কাটান, ঠিকমত খাইতেও দ্যান না-

-চোপ! হম্‌কো আইন মৎ শিখাও। আজ তুমহারা খানা বন্ধ।

খাবার বলতে লাল চালের ভাত, জলের মত ডাল আর একটা লাবড়া জাতীয় তরকারি। খাওয়াও যায় না। তাও বন্ধ।

এবার আমরাও বলি,-খাবার বন্ধ করতে হবে না, আমরাই খাব না। না খেয়েই থাকব। এই অন্যায় জুলুম সইব না। কি করেছি আমরা? বিনা বিচারে আটকে রেখে মজুর খাটাবেন?

দারোগা গর্জে ওঠে,-পিটিয়ে ঠান্ডা করে দেবো।

তাই মারুন। -আমরাও মরিয়া হয়ে উঠেছি।

নসুমামা বলে,-কিছুই করিনি। তবু আনলেন-

এমন সময় জিপটা এসে হাজির হয়। আমরাও দেখি বড়মামা নামছেন, সঙ্গে সেই বনের ইস্কুলের মাস্টারজি, একজন উকিলবাবু এবং একজন ভদ্রলোক।

দারোগা আমাদের বেয়াদপির জন্য এবার রুল তুলেছে, পিটিয়ে ঠান্ডা করবে। এমন সময় উকিলবাবু বলে,-ওটা নামান দারোগাসাহেব।

তারপর আমাদের জামা কাপড়, আর আমাদের হাল দেখে উকিল বলেন,-এদের দিয়ে ওই খেতের মাটি কাটাচ্ছেন?

-না তো?

হোঁৎকা বলে,-মিথ্যাবাদী! দ্যাখেন স্যার-কোদাল চালাই হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে।

নসুমামাকে দেখে বড়মামা বলেন,-বাঃ। তুই এখানেই থাক নসু। মাটির ঝুড়ি বয়ে কাজ করার অভ্যাসটা কর। তা জামা, সোয়েটার কোথায় গেল তোদের।

আমি বলি,-লুট হয়ে গেছে সব।

দারোগাবাবু একটু ঘাবড়ে গেছে। শহরের পুরসভার চেয়ারম্যান বড়মামার বন্ধু। ওই মাস্টারজি আমাদের ওই ভাবে থানায় চালান করতে দেখে, পরদিন নিজে ওই বনপাহাড় টপকে বড়বিলে এসে বড়মামাকে খবরটা দেয় সন্ধ্যার মুখে। জানায় ফরেস্টের পাশ, বাংলোর পাশ সঙ্গে ছিল না-সেই সুযোগ নিয়েই ওই বদমাইস মুখিয়া ওদের মিথ্যা অভিযোগ করে পুলিশে দিয়েছে। মনোহরপুর থানায় নিয়ে গেছে ওদের।

পরদিন রবিবার। চাইবাসার ফরেস্ট অফিস বন্ধ। কিছু করা যায়নি। সোমবারই বড়মামা সেখানে এসে ওদের নামলেখা পারমিট, বাংলোর পারমিট সব কিছুর ডুপ্লিকেট কপি নিয়ে উকিলের গাড়িতে তুলে বেশ দূর পথ ভেঙে এই শহরে এসেছেন।

এবার চেয়ারম্যান বলেন,-দারোগাবাবু, এদের বিনা দোষে ধরেছেন।

দারোগা বলে,-বিনা অনুমতিতে বনে ঢুকেছে, বনবাংলোয় থেকেছে।

বড়মামা এবার কাগজপত্রগুলো দেখিয়ে বলে,-অরিজিন্যাল কাগজ ওদের হারিয়ে গেছে, এগুলো দেখুন। এতে ওদের বনে অনুমতি আছে। বাংলোর বৈধ পাশও রয়েছে।

উকিলবাবু বলেন,-এদের বিনা দোষে আটকে রেখেছেন, এই ভাবে অত্যাচার করেছেন কেন?

দারোগাবাবু এবার ঘাবড়ে গিয়ে বলে,-বিট অফিসার বললে।

আর তুলে আনলেন? -উকিলও জেরা শুরু করে।

শেষ অবধি দারোগাবাবু আমাদের ছেড়ে দিয়ে বলে,-ওদের ছেড়েই দিচ্ছি স্যার। এ নিয়ে আর ঝামেলা করবেন না।

এবার ফিরে আসি বড়জামদায়। তখন আমাদের দেখে বড়মামিমার চোখে জল আসে।

-একি হাল করেছে তোদের। এখন কলকাতার ওরা কেউ এলে কী জবাব দেব?

বড়মামা বলে,-এসব ঘটেছে ওই নসুর জন্যেই। কাগজপত্র কিনা গরুকে খাইয়ে দিল।

রাসুমামা এইবার তাক্ মত বলে,-ও নিজেই একটা বলদ। দ্যাখ না সব হারিয়ে কার চামচিটকে একটা জামা পরে ভূতের মত ফিরেছে।

বড়মামা আমাদের বলেন,-ক'দিন বাড়িতে রেস্ট নে। খাওয়া দাওয়া করে সুস্থ হ। তারপর কলকাতায় ফিরবি। তবে যে ক'দিন থাকবি ওই নসুরাসু দুটোর থেকেই দূরে থাকবি।

ক'দিন মামার বাড়িতে থেকে বেশ যুৎ করে খেয়ে দেয়ে আবার নতুন তাগদ্ নিয়ে ফেরার সময় নসুমামা বলে,-ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

বড়মামা বলেন,-না। তোকে বিশ্বাস নেই। কলকাতা যাবার গাড়িতে তুলতে গিয়ে নাগপুর যাবার গাড়িতেই হয়তো তুলে দিবি।

তোর এলেম জানা আছে। আমিই টাটানগর গিয়ে ওদের তুলে দেব।

সেবার নিরাপদেই ফিরেছিয়াম।

পটলার পক্ষীপ্রেম

পটলা ইদানীং খুবই ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে।

অবশ্য আমাদের পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের পটলচন্দ্র মাঝে মাঝে নানা কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনও কবিতার চাষ করে, দিনরাত এন্তার কবিতা, উপন্যাস, নাটক লিখতে থাকে দিস্তা দিস্তা কাগজে। কবিতা লেখার জন্যে তো সেবার গঙ্গাতেই ডুবে মরত।

সেবার সাধু হবার জন্য গৃহত্যাগ করে সে এক কাণ্ড বাধাল। কয়েকেমাস আগে ফুটবলার হবার সাধনা করতে গিয়ে এইসা ঠ্যাং ভাঙল যে এখনও ঈষৎ নেচে নেচে চলে।

সেবার দেশভ্রমণ করতে গিয়ে কোথায়, থানায় জমা পড়ে গেল।

পটলার কাজ কারবারই বিচিত্র।

কিন্তু পটলা না হলে আমাদের পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের অবস্থা মা মরা বাছুরের মত অসহায় গোছেরই। আলুকাবলি, ফুচকা, চানাচুর, মালাই বরফ সাফ্ নকুলের দোকানের চা ওমলেটের বিল ওই পটলাই যোগায়।

সুতরাং ওকে দরকার।

সামনে ক্লাবের ফিস্ট। ঘটাপত্র আছে। কিন্তু পটলা গায়েব।

পরপর চার পাঁচদিন ওর দেখা নেই। ওদিকে কুলেপাড়া ক্লাব এখানের শিল্ডে রানার্স আপ হয়েই বেশ জোর ভোজ দিয়েছে।

হোঁৎকা বলে-ক্লাবের প্রেস্টিজ পাংচার হুই গেছে গিয়া, ওগোর রানার্স আপ হই যা ফিস্ট দিছে আর আমরা 'উইনার্স' হই কিছুই করলাম না? উঃ-কি দুঃখু তা বুঝবি না তরা?

হেই পটলা কি কয়? তগোর ক্যাশিয়ার?

ফটিক বলে-কদিন আসেনি।

হোঁৎকা বলে ওঠে-ওরে ধইরা আন! আমিও রেজিক্নেশন দিমু।

হোঁৎকা অবশ্য ঘনঘনই রেক্নিেশন দেয় অমন।

আমি বলি-ওসব করে কি হবে? চল পটলাকেই খুঁজে দেখি না।

অগত্যা চারজনে বিরস বদনে বের হলাম পটলচন্দ্রের বাড়ির দিকে।

পটলারা এই এলাকার বেশ ধনী। ওর বাবা-কাকাদের কি সব ইন্জিনিয়ারিং কারখানা, করাতকল, বড়বাজারে লোহা লক্কড়ের দোকানপত্র আছে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে শহরের মধ্যে বাগান, একটা পুকুর, এদিকে বাড়ি। গাড়ি-ট্রাকও আছে। বাগানের একদিকে মন্দির। পটলার ঠাকুমার জন্যে ওই দেবসেবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পটলার খোঁজ করতে চাকরটা বলে-ছোটবাবু বাগানের ওদিকের বাড়িতে আছে। ওখানেই থাকেন পেরায়।

কাজে এসে দেখি আলাদা একটা বাড়ি একদিকে। নীচের তলায় বাড়ির সরকার, দু'একজন কর্মচারী সপরিবারে থাকে। পুরনো একতলা বাড়িটা মূল বসতবাড়ি থেকে দূরে।

ওই বাড়ির ছাদে টালির ঘর নতুন করা হয়েছে, পটলা ওখানেই বিরাজ করছে।

আমি বলি বাড়ি ছেড়ে এখানে কি করছে রে পটলা?

সঙ্গীত সাধনা করে, আর সেসব বেদম কালোয়াতী গান। ধরলে আর থামে না, ফটিক বলে।

-সাধন ভজন করে নাকি রে?

হোঁৎকা গর্জে ওঠে-কচু করে, দেহি চল।

উপরে উঠে অবাক হই 'ক্যাচ-কিচ'-বিচিত্র শব্দ উঠছে। টালির চালের নীচে জাল ঘিরে বেশ খানিকটায় ডজন দুয়েক নধর লাল, সাদা মুরগি নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে। আর পাত্র ভর্তি কিসব খাবার খাচ্ছে।

কোনটা মাথার লাল ঝুঁটি নেড়ে আবার আওয়াজও করে-কক্-ক্রো-

পটলা আমাদের দেখে বলে।

-ত তোরা?

পটলার জিভটা মাঝে মাঝে আলটাকরায় আটকে যায়। তা বলে বলার উপায় নেই, পটলা রেগে ওঠে। তাই বলি পটলার ব্রেক ফেল করেছে।

হোঁৎকা নিবিষ্ট মনে দেখছে ওই মুরগিগুলোকে। বলে সে-এডা করছস কি রে?

পটলা বলে হ্যাঁ। এবার দেখবি পোলট্রির রমরমা ব্যবসা করব। আমাদের দেশ প-প্যাব কাপিটা প্-প্-প্রোটিন খায় খুব কম। মুরগি ফুল অব প্-প্-

কথাটা শেষ করি-প্রোটিন।

পটলা বলে,-হ্যাঁ। আর দামেও সস্তা। মাংস-ডিম সব মেলে মুরগি থেকে।

হোঁৎকা বসে বাংলা পরীক্ষায় নারকেল সম্বন্ধে রচনা লিখেছে। তাই হোঁৎকাও জুড়ে দেয় সেই রচনা লেখার ভঙ্গিতে।

মুরগি দেখতে অতীব সুন্দর, দুইখানা পা। মাথায় লাল ফুল তার। মুরগির ঠ্যাং খাইতে অতীব সুস্বাদু। মাংসও-

পটলা চোখের সামনে তার পালিত প্রিয়জনদের ঠ্যাং, মাংস কেউ খাবার কথা ভাববে তা সইতে পারে না। পটলা বলে-ওসব কথা কইবি না হোঁৎকা! ধমকে ওঠে-দে থো ফ্যালাইয়া তগোর বুদ্ধুটুদ্ধুর কথা।

এদিকে প্রেস্টিজ পাংচার হই গেছে গিয়া। আমি রেজিকনেশন দিমু। তুই থাক মুরগি লইয়া।

পটলা বলে-সব টাকা তো বি-বিজিনেসে ঢালছি রে? পোলট্রি বানাবো তার ট-ট্রয়াল দিচ্ছি।

আমি শুধোই কি হবে এতে?

পটলা আকাশ থেকে পড়ে। ওদিকের টেবিলে কয়েকটা মুরগির বিষ্ঠা মাখা খাতা বই বের করে বলে।

-দ-দ্যাখ। দ-দারুণ বড় ব্যবসা হয় মু-মুরগি নিয়ে মহারাষ্ট্রে। ফিলমের অশোককুমার-এর নাম শুনিছিস? মস্ত মুরগির ফার্ম ওর।

চ-চল্লিশ হাজার মুরগি আছে। ওই শ-শক্তি সামন্ত, ওঁরও বিরাট মুরগির ফার্ম।

হোঁৎকা বলে-কস্ কি? তয় তুই অশোককুমার হইবি দেহি?

পটলা বলে-তবু দেখিয়ে দেব বাংলাতেও মুরগি ফার্ম করা যায় বিগস্কেলে। বাইশটা মুরগি ডিম দেবে রোজ নিদেন বিশটা করে।

মুরগির ডিমের ওমলেট ও খাইনি কদিন।

তাই শুধোই-দিচ্ছে? তাহলে আমাদের ডবল ডিমের ওমলেট হয়ে যাক।

হোঁৎকা তর্ক থামিয়ে ওমলেটের গন্ধ পেয়ে বলে-তা মন্দ না। দেহি তোর ডিম টেস্ কইরা।

পটলা বলে-এখানে তো বাচ্চা, মোটে সাত সপ্তাহের। ওরা ডিম দেবে আরও পনেরো সপ্তাহ পর।

হতাশ হয় হোঁৎকা-কস্ কি? এখনও চাইর মাস পর? তার চেয়ে ডিম না খাই ওগোর খাই ফ্যালা। সব কিলিয়ার হইব।

পটলা আবার চটে ওঠে-থামবি? এত বিউটিফুল মুরগি ময়ূরের মত। তাদের খেতে পারবি? এত হৃদয়হীন তোরা? ছিঃ, তোদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা হয়। মুখ দেখাতেও ভালো লাগে না।

পটলা কথাগুলো বলে একটা সাদা নধর মুরগিকে বুকে নিয়ে আদর করতে থাকে। যেন সিদ্ধার্থ আহত তীরবিদ্ধ হাঁস বুকে নিয়েছে গোছের ভাবটা।

হোঁৎকা চটে ওঠে! বলে সে,

-সমীর আমার রেজিকনেশন লই যা। আমি তগোর ক্লাব ছাড়ুম। কয় মুখ দেখতি লজ্জা হয়! দেখস না-

আজ পটলার কাছে এতদিনের বন্ধুরা কেউ নয়। আপন হল কিনা ওই মুরগিগুলো।

পটলা ওদিকে মুরগিদের তোয়াজ করছে। নেমে আসি ব্যথিক মনে আমরা। এতদিনের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া ক্লাব পটলা ভেঙে দিল। ফিস্টও হবে না।

বাগানের পথ দিয়ে আসছি। হোঁৎকা কাথাও বলে না। মন্দির থেকে হঠাৎ পটলার ঠাক্মাকে বের হতে দেখে প্রণাম করি। হোঁৎকা অবশ্য খুবই ভক্তিমান। প্রণামটা ওই আগে করে ও উদাস কণ্ঠে বলে-চলি ঠাক্মা। আর এ জীবনে দেখা হইব না।

ঠাক্মাও ভালোবাসেন আমাদের। পটলার রকমারি বিপদে আমরাই বুক দিয়ে পড়ি। তাই হোঁৎকার ওই কথার সুরে বলেন-কেন রে?

হোঁৎকা বলে-পটলা আমাগর মুখদর্শন করবে না কইছে। তয় আর আসুম ক্যান? কন?

ঠাকমার মনের চাপা রাগটা এবার ফেটে পড়ে। তিনি নিষ্ঠাবতী ধার্মিকা মহিলা। বাড়ির ত্রিসীমানায় মুরগি আনতে দেখে পটলার উপর চটে ছিলেন। চাকরবাকরদের বলেও পবিত্র পরিবেশ থেকে মুরগি দূর করা যায়নি।

আজ আবার এসব শুনে ঠাকমা বলেন,

-ওই ছোঁড়াটার মাথা বিগড়েছে, বামুনের বাড়ি-দেবতাবিগ্রহ রয়েছেন-ও কিনা মুরগির চাষ করছে? মহাপাপ আনছে। পড়াশোনাও গোল্লায় গেছে পটলার।

হোঁৎকা বলে গম্ভীরভাবে-তাই দেহি। স্কুলেও কম যাইতিছে। ওর গায়ে মুরগির গন্ধলাগে।

ঠাকমা এবার বলেন-ওই পাপগু লোকে দূর করতে পারবি তোরা?

হোঁৎকা যেন বুকে বল পায় ঠাকমার কথায়। মুরগির নেশা ছাড়াতেই হবে এবার। কারণ না হলে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবই উঠে যাবে। হোঁৎকা বিনীতভাবে বলে-

-কি কইছেন ঠাকমা? সখ কইরা পুষছে ওগোর!

ঠাক্মা বলে-ঝাঁটা মারি এমন সখের মুখে। পারবি কিনা বল?

হোঁৎকা বলে-আপনে কইছেন, গুরুজন। দেহি কি করা যায়। তর কিছু হইলে আপনি কিন্তু কিছু কইবেন না। ব্যাপারটা গোপন রাখাই ভালো।

ঠাক্মা গরদের থানের খুঁট থেকে একটা কুড়িটাকার নোট বের করে হোঁৎকাকে দিয়ে বলেন-যা হয় কর বাপু। ওতে মিষ্টি কিনে খাবি তোরা।

হোঁৎকা ব্যবসায়ে পটু। নোটটা হাতিয়ে বলে-মাত্তর কুড়ি ট্যাকা?

অর্থাৎ ওটার যেন এই সংসারে কোনো দামই নেই।

ঠাকমা বলেন-কাজ উদ্ধার কর তখন আরও কিছু দেবো।

হোঁৎকা আপাতত এই নিয়েই খুশি। বলে সে-ঠিক আছে ঠাক্মা। দেহি কি করা যায়।

যা বাজার তাতে কুড়ি টাকায় বেশিদিন চলবে না। ঝালমুড়ি-ফুচকা-আলুকাবলির দামও বেড়ে গেছে। ক'দিনের মধ্যে পটলার পোলট্রির ব্যবস্থা কিছু না করতে পারলে মুশকিল হবে।

বৈকালে ক্লাবের মাঠে বসে সংগৃহীত চিনেবাদাম ঝালনুন দিয়ে ঈগলের মত একটা একটা দানা গুনে খেতে খেতে বলি-কি ভাবলি হোঁৎকা?

হোঁৎকা তখনও ভাবছে। গোবরা বলে-দিই একদিন লুটপাট করে রাতের বেলায়।

আমি বলি-দারোয়ান আছে ওদের দুটো জানিস তো।

তা জানি। সুতরাং লুটপাট করা চলবে না! এমন সময় ফটিককে ধ্যাড়ধেড়ে ব্রেক বেলহীন সাইকেল হাঁকিয়ে আসতে দেখে চাইলাম। ফটিক বলে-সাংঘাতিক খবর রে? পটলা একেবারে বোবা মেরে গেছে শোকের ঠ্যালায়।

শুধোই-পটলার কি হল রে?

গোবরা শুধোয়-তাহলে ওর ঠাকমা টেঁসেছে নাকি রে? বল জব্বর ভোজই হবে।

হোঁৎকা ধমকে ওঠে-থাম দেহি। হাঁইচা কাইসা বল কি হয়েছে? ফটিক বলে-পটলার জব্বর একখান মুরগি আজ দুপুরে মারা গেছে রে। খায়নি পটলা! একেবারে শোকে পাথর হয়ে গেছে।

চুপ করে ভাবছি বন্ধুর এতবড় শোকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো। হঠাৎ হোঁৎকা খুশিতে চিৎকার করে ওঠে।

-ব্যাস! জয় মা তারা, পথখান বাতলে দিস মা। জয় বাবা শিব শম্ভু।

অবাক হই ওর উৎসাহে। বলি,-পটলার এতবড় দুঃখে তুই খুশি হয়েছিস?

হোঁৎকা বলে-মোটেই না। ওর দুঃখ ঘুচাইবার পথ পাইছি।

চল গিয়া একবার দেইকা আসি।

যাওয়াই উচিত।
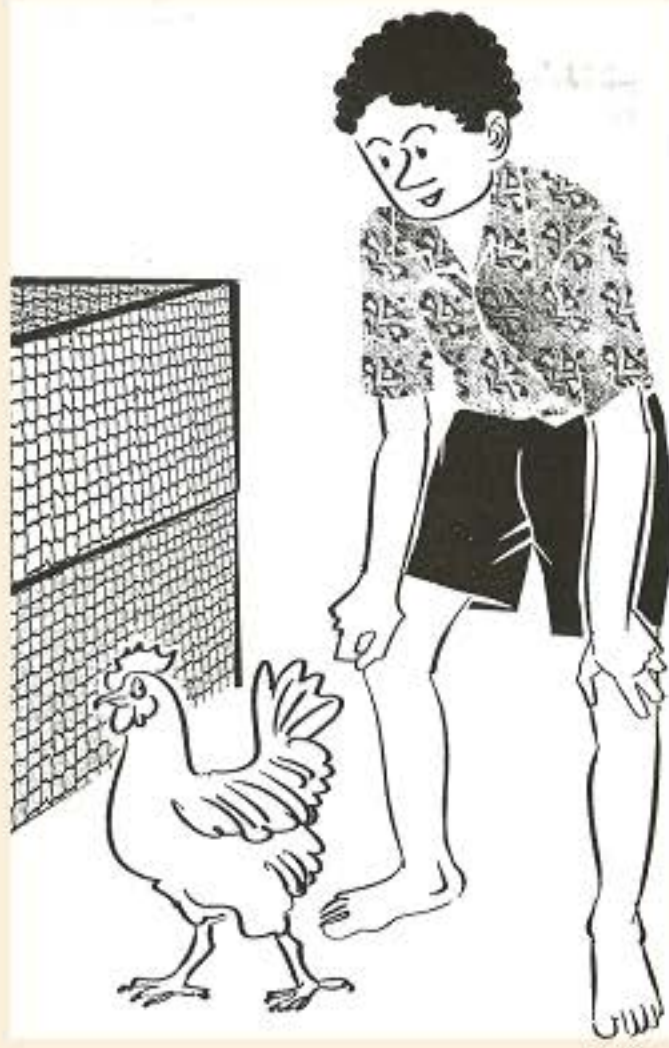
পটলার পোলট্রির সবচেয়ে সরেশ মুরগিটা মারা গেছে হঠাৎ। পটলা দুপুর থেকে খায়নি, ঠাকমা ছুৎমনি বাঁচিয়ে দুর থেকে ডাকাডাকি করেও পটলাকে সরাতে পারেনি। চাকরবাকররাও হিমশিম খেয়ে গেছে।

এমন সময় আমাদের দেখে ঠাকমা চাইলেন, বলেন-দ্যাখ আবার কি করেছে পটলা ? আপদগুলো সব সরলে বাঁচি !

-পটলা।

আমাদের ডাক শুনে শোকসন্তপ্ত পটলা চাইল। বলে, তোরা এলি, কিন্তু আমার সর্দার চলে গেল রে।

মনে হয় মুরগির নাম 'সর্দার' রেখেছিল। আমি দার্শনিকের মত ভঙ্গিতে বলি-দুঃখ করে কি করবি বল? সর্দার তো আর ফিরবে না।

হোঁৎকা হঠাৎ এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বলে ওঠে। পটলা, এ যে রানীক্ষেত 'ডিজিজ' রে। মুরগির মৃত্যুরোগ। খুব ছোঁয়াচে-বাকি মুরগিগুলোর এ রোগ না হলি হয়। হলি অনলি টোয়েনটি ফোর আওয়ারস। ব্যস-সাফ।

চমকে ওঠে পটলা, তার সাধের মোরগকুল যে এতবড় বিপদে পড়েছে তা ভাবেনি। পটলা বলে,

-তাহলে?

হঠাৎ পটলা হোঁৎকার দুহাত ধরে কাতরস্বরে বলে,-কিছু ব্যবস্থা কর হোঁৎকা। যা লাগে খরচা দেব।

হোঁৎকা বলে-ঠিক আছে গিয়া। 'সালফার'। আমার নগু মামায় বিখ্যাত ভেটারানারি ডাক্তার। ওর প্রেসক্রিপশন, ঠাঁইশা গন্ধকের ধোঁয়া দিতি হবে কুইক।

পটলা বলে-তাই কর ভাই। বাঁচা আমাকে। তৎক্ষণাৎ গোটা পঁচিশ টাকাও দিয়ে দেয় পটলা। হোঁৎকা আমাদের ডিউটিতে রেখে ছুটল 'সালফার' আনতে। ধুনুচি-ছোবড়া এসবও আনতে হবে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হোঁৎকা রেডি হয়ে এসেছে। ঠাকমাও রয়েছেন দূরে। এ বাড়ির মুরগিদের বাঁচা ভাই।

হোঁৎকা একগাল হেসে বলে-আইয়া যহন পড়ছি তখন আর 'ভয়' নাই পটলা। মার ধুনো-

চার পাঁচটা ইয়া সাইজের ধুনুচিতে ছোবড়া দিয়ে এন্তার ধোঁয়া করে একেবারে ঘন অন্ধকার করে দেওয়া হল। কাসছি, কিন্তু হোঁৎকার কথামত কাজ করতে হচ্ছে।

আবছা অন্ধকারে দশ পনেরো মিনিট সব ঢেকে গেল, তারপরেই গন্ধকের ছিটে। কোনদিকে দরমার বেড়ায় লেগে আগুন ধরে যায় পটলার নবনির্মিত মিনি পোলট্রিতে।

হইহই ব্যাপার। চিৎকার করছে পটলা।

-মুরগি বাঁচা, না হলে আমি নিজেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে প্রাণ দেব।

দু-তিনজন ধরে আছি পটলাকে। অবশ্য আগুন এমন কিছু নয় কিন্তু আগুন নেভানোর লোক জুটে গেছে তার তুলনায় অনেক বেশি। বাগানের মালি আবার হোস পাইপও লাগিয়েছে।

লাঠি-বাঁশের ঘায়ে পোলট্রির ঘর ধূলিসাৎ, জলের তোড়ে মুরগিও কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেছে, দু'একটা আহত আধা ঝলসানো অবস্থায় দেখা গেল মাত্র।

বাকি ডজন দুয়েক সরেস মুরগি একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে, পোলট্রি ঘরও ধূলিসাৎ। কাঠ-টালি বাঁশও ছেতরে পড়েছে।

পটলা তখন শোকে মুহ্যমান। আমরাও ছাই-জলে ভিজে গেছি, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি ওর মুরগিকুলকে।

পরের দিনেই পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাৎসরিক ফিস্ট আর শিল্ড ফাইনালের উৎসব বেশ ঘটা করেই হল। আমাদের আইটেম বেশি ছিল না। তবে যা ছিল সরেস।

চিকেন চাউমিন, চিলি চিকেন আর চিকেন তন্দুরি উইথ স্যালাড। আর রান্না করেছিল নকুল-কাফের নকুলদা নিজে।

মুরগির অভাব হয়নি। ওই ধোঁয়ায় অন্ধকারে হোঁৎকা-গোবরা দুজনে গোটা ষোল আঠারো জব্বর মুরগিকে কপ্ কপ্ করে বস্তায় পুরে চালান করেছিল। আমরা শুধু ধোঁয়া দিয়ে জমাট অন্ধকারকে ঘনতর করে রেখেছিলাম। পটলাও এসেছিল ক্লাবের কর্মকর্তা সে। কিন্তু মুরগির শোক তখনও ভুলতে পারেনি বলে মুরগি আর খায়নি। ও দই সন্দেশ খেয়েছিল, তার টাকা অবশ্য এসেছিল ওর ঠাকমার কাছ থেকেই।

আমাদের এমন নিখুত অপারেশনে ওর ঠাকমা খুব খুশি হয়েছিল। পটলার মাথা থেকে পোলট্রি ব্যবসা এখন উবে গেছে।

কেষ্টমামার কীর্তি

সারা কলকাতায় হৈচৈ পড়ে গেছে! পড়ারই কথা। মহাকাশে কোনো দেশের পাঠানো এক কৃত্রিম উপগ্রহ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে। কোথায় কখন কি ভাবে সেই বিরাট বস্তুগুলো টুকরো টুকরো হয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় ছিটকে পড়বে আর কি প্রলয় কাণ্ড বাধাবে তা কে জানে।

গোপীবল্লভ তর্কতীর্থ সেদিন হরিসভায় ধর্মালোচনার সময় বেশ জমিয়ে একটিপ নস্যি নাকের ফোকরে সেঁদিয়ে মেজাজ এনে বলে-হবে না ? ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষ গেছেন ক্যারদানি দেখাতে। এখন বোঝো ঠ্যালা ! নিজেদের পাঠানো উপগ্রহ এখন অগ্নিগর্ভ হয়ে এগিয়ে আসছে দ্বাদশ সূর্যের তেজ নিয়ে সৃষ্টি আর মানুষ জাতকে ধবংস করতে। নিশ্চিত ধবংস অনিবার্য। হরিসভায় উপস্থিত বুড়োবুড়ি। মানুষজনের মুখে নেমেছে আতঙ্কের ছোঁয়া।

পতিত ডাক্তার এই আড্ডায় একজন নিয়মিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এককালে ডাক্তারীতে নামও করেছিলেন এই এলাকায়। এখন অনেক ছোকরা ডাক্তার এসে পড়ায় পতিতবাবুর বাজার একটু মন্দা।

আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য হোঁৎকার চিন্তাশীল অভিমত-পতিত ডাক্তার ইদানীং কানে কম শোনত্যাছে, জ্বর হইলে দিছে প্যাটের অসুখের ওষুধ। প্যাটের অসুখে দেয় জ্বরের ওষুধ ! রোগী হালায় যাইব ক্যান!

এহেন পতিতবাবু হরিসভায় ঘোষণা করেন,-পণ্ডিতমশাই এই উপগ্রহের বিস্ফোরণে যারা বিলীন হবে তারা তো মরে বেঁচে যাবে। কিন্তু বাকি যারা থাকবে তাদের প্রাণ যাবে বেঘোরে। শরীরের অন্ত্র যন্ত্র ক্ষয়ে যাবে। আর ক্যানসার-বিলকুল ক্যানসারে কাতরে-কেতরে মরবে, দেখবেন।

ভক্তজনে কাতর কণ্ঠে শুধোয়, তাহলে কিসের রক্ষা পাবো পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিত গোপীবল্লভ অর্ধনিমীলিতে নেত্রে বলেন,-নাম গান করো ইশ্বরকে ডাকো।

কে জানে কি হবে!

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সভ্যবৃন্দের মুখেও ভীতির ছায়া। আমরা তো কোনো ছার, সারা কলকাতা, মায় বাংলাদেশের মানুষেই সেই সমাগত ধ্বংসের ভয়ে শিউরে উঠছে।

কাগজখানা পড়ে আছে। আমরা গড়াগড়ি দিচ্ছি ঘাসে। একেবারে সামনের পাতায় মহাকাশে ছিটকে আসা আগুনের পুঞ্জ! তারা পৃথিবীর উপর এসে পড়বে দু'একদিনের মধ্যে।

গোবরা ম্লানমুখে বলে,-ভেবেছিলাম এবার গদাধর শিল্ডটা জিতবোই।

হোঁৎকার আলুকাবলিতেও অরুচি এসে গেছে। বলে,-না। পটলা খানদুই কুলপি ছাড় গিয়া। দু'দিন তো আর বাঁইচা আছি মাত্তর। গোবরা ওই শিল্ডের স্বপ্ন ছাইড়া দে।

ফটিকের খেয়াল-এর সুর থেমে গেছে। বলে সে-আর গান গেয়ে কি হবে রে? ডেথ্ কামিং।

সারা কলকাতা ক্রমশ ক্ষেপে উঠেছে। গোপীবল্লভ পণ্ডিতের ওই নাম-গানের কথাটা যেন সারা কলকাতার মানুষের কানে পৌঁছে গেছে।

শুরু হয়েছে নাম সংকীর্তন। গঙ্গার ধারে কোথাও বিরাট প্যাণ্ডেল করে মারোয়াড়ীর দল মণকে মণ ঘি পুড়িয়ে যজ্ঞ করছে। পার্ক, তেরাস্তার মোড় নাট মন্দিরের চত্বরে হাজার হাজার মানুষ বসে পড়েছে খোল করতাল নিয়ে।

আমাদের পাড়ার গিরিধারী লালাকে আসতে দেখে তাকালাম। সদ্য স্নান পুজো সেরেছে, কপালে সাদা লাল চন্দনের দাগ, লম্বা ছোলা বাঁশের মত লকলকে চেহারা, টিকিতে জবা ফুল।

লোকটার চাল-ডাল আটার বিরাট ব্যবসা, টাকার কুমির। কিন্তু ক্লাবের চাঁদার বেলায় তেমনি হাড়কঞ্জুস। পাঁচ টাকা বের করতে কালঘাম ছুটিয়ে দেয়। পারতপক্ষে আমাদের ছায়া মাড়ায় না। এহেন লালাজি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!

লালাজি মধুমাখানো স্বরে বলে,-বাবালোগ্, দুনিয়া পাপে ভরে গেল, তাই রামজি ধ্বংস করবেন ইবার। পাপীলোগ কো খতম করে পুণ্যবান লোগকেই বাঁচাবেন। শোচলো বেটা, হারাম গুদামসে চাউল আটা সব কোইকে দিবে। তুমলোগ বন্দোবস্ত করো। আউর নাম গানা ভি হোগা।

এ যেন ভূতের মুখে রামনাম! লোকটা কী ভুল বকছে?

ফটিক বলে,-কাল থেকে কেত্তন পার্টি আর নেই। সব বুকড। ডবল-তেডবল রেট নিচ্ছে। হরিদাস মড়া কেত্তুনে। সেও তিন শিফ্‌টে পাক্কা একশ টাকা রেটে নামগান করছে।

লালাজি অভয় দেয়,-যা লাগে দিব।

ক্লাবের মাঠেই বাজারের কয়েকজন কুচো সবজিওয়ালা, পাড়ার ঘুঁটে ওয়ালীকে ধরে এনে ফটিক লাগিয়েছে নাম-গান করতে।

টবের তুলসী গাছ এনে মালা পরিয়ে বসানো হয়েছে।

ওদিকে হোঁৎকা, গোবরা লাইনবন্দী লোকদের চাল আটা দান করাচ্ছে লালাজিকে দিয়ে।

লালাজির গুদামে এত চাল! সরষের তেল আর হোয়াইট মিশিয়ে যে এত ব্যারেল তেল!

স্বচক্ষে দেখলাম, গরুর চর্বির ব্যারেলগুলো থেকে চর্বির সঙ্গে দালদা আর ঘিয়ের সেন্ট মিশিয়ে কিভাবে আসল ভাদুয়া ঘৃত হত।

অবাক গলায় বলি,-এই ঘি আর তেল তৈরি করতেন লালাজি!

লালাজি বলে-রাম কহো বেটা। উ সব সিধা ফেক দিবে গঙ্গাজিমে।

লালাজি আজ যেন দেবতা হয়ে গেছে। দরাজ হাতে গুদাম খালি করে দান করছে আর মাঝে মাঝে কীর্তন পার্টির ওখানে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে-বলো হরে কিষ্ট-হরে কিষ্ট। কিষ্ট কিষ্ট হরে হরে।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মাঠেই ওই দানযজ্ঞ চলেছে, নামযজ্ঞ চলেছে।

ওদিকে হরিবাবুও এসে বলে,-মহৎ পুণ্য কাজ করছ হে তোমরা। পুরোনো কথা মনে রেখো না বাবা। আর কতক্ষণই বা বাঁচব?

হরিহর বাবুর সঙ্গে মাসাধিককাল আমাদের বাক্যালাপ বন্ধ।

আমাদের ক্লাবের একটু ওদিকে হরিহরবাবুর বাড়ি। রিটায়ার করে ভদ্রলোক ছাদের বেশ কিছুটা এলাকা দরমাজাল দিয়ে ঘিরে টালির ছাউনি চাপিয়ে পোলট্রি করেছেন। লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড মুরগি পুষে বেশ ব্যবসা করেছেন। ওঁর সঙ্গে তুচ্ছ কারণে একটা গোলমাল হওয়ার জন্য তিনিও শাসিয়েছেন, আমরাও কথা বলিনি।

আজ হরিহর বাবু নিজে এসে বলেন,-ওসব মনে রাখিস না বাবারা, এই অপবিত্র মুরগির ব্যবসা তুলে দিচ্ছি। তোদের জন্য গোটা পাঁচেক মুরগি রেখেছি। নিয়ে আসবি। জয় গুরু।

পাড়ার তাবড় অনেকেই এসে উদাত্তকণ্ঠে হরিনামে যোগ দিয়েছে।

গোপীবল্লভ পণ্ডিত বলে,-নাম গান করো বাবারা। কলৌ নাস্তেকলৌ নাস্তে। কলৌ নাস্তেব গতিরণ্যথাঃ।

লোডশেডিংওয়ালারাও বোধহয় পাপের ভয়ে কদিন আর আলো নেভায়নি। সব আলো জ্বলছে, মাইকে মাইকে সারা কলকাতা ছেয়ে গেছে। আজই এই কলকাতার নাকি শেষ রাত্রি।

হঠাৎ দেখি কুলপিওয়ালা রামভরোসও এসে জুটেছে। রোদে নামগান করে ভক্তদের তেষ্টা পাচ্ছে। সেও ভক্তদের কুলপি খাওয়াচ্ছে, দাম মাত্র আট আনা।

রামভরোস বলে-বাবুজি, এতনা জাদা নাফা করে আর পাপ নেহি করব।

আমাদের হাতে শালপাতা ভর্তি দু-তিনটে করে কুলপি দিয়ে দেয়।

দামটা দে পটলা-বলি পটলাকে।

রামভরোস দুই কানে হাত দেয়, ছিঃ ছিঃ! -আর কিতনা টাইম বাঁচব বাবুজি!

ওদিকে আদি সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক গদাই বাবু খালি গায়ে বসে আলটাকরা বের করে চিৎকার করছে,-জপো হরে কৃষ্ণ, হরে রাম।

বিশাল উদর। থলথলে দেহ। মিষ্টির দোকানে ওই ঘি-এর গন্ধে আর দুধ ছানা খেয়ে ফুলে ওঠা তেলালো দেহ নিয়ে এতদিন দোকানের থরে থরে সাজানো সন্দেহ আগলে বসে থাকত।

আজ গদাই-এর আদি সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মিষ্টির অনেকটাই এসেছে ক্লাবের ওই তুলসীতলায়। পুণ্য, পুণ্য চাই।

সারা দেশটা বুঝি রাতারাতি বদলে গেছে। পাড়ার ওদিকের রেললাইনের ধারে পাতাল রেলের মালপত্র চুরি যেত, মাঝে মাঝে বোমাবৃষ্টি হত তেলিয়া মস্তান আর ন্যাপলা ঘোষের দলের মধ্যে। ছুরি বোম-মারামারি চলত।

আজ সেই তেলিয়া-ন্যাপলার দল দু'ঝুড়ি বোমা এনে ওদিকে পচা পুকুরের পাঁকে ফেলে দিয়েছে। ছুরিও ফেলেছে তারা। ওদিকের নাটমণ্ডপে দু'জনে চন্দনের ছাপ কপালে দিয়ে তারস্বরে নামগান করছে।

আর একটা দিন কেটে গেল! শেষ সময়ে নিকটবর্তী, রেডিওতে বাজছে করুণ সুর-সর্বত্র মাইকে মাইকে নামগানের মহড়া।

আমরা যথারীতি পৌঁছে গেছি তুলসীতলায়, মাঠে। আর একটু পরেই শুরু হবে দানযজ্ঞ, নামগান।

কেষ্টমামার কি হইছে জানস?-হঠাৎ হোঁৎকার মুখে ওই নামটি শুনে চমকে উঠি।

বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে ওই কেষ্টমামাকে ঘিরে। ওই নিয়ে অভিন্ন হৃদয় হোঁৎকার সঙ্গেও চলেছিল একটা ঠান্ডা লড়াই কয়েক মাস ধরে। সেই 'কেষ্টমামা'! আবার!

তখন এশিয়াড-এর প্রস্তুতি চলেছে। কোন কোন অ্যাথলেট, কোনো প্লেয়ার সেখানে যাবে প্রতিযোগিতায় তার তোড়জোড় চলছে, এহেন সময় হোঁৎকার সেই কেষ্টমামা এসে হাজির।

বন পাহাড়ের ওদিকে কোনো নামি ইস্পাত কোম্পানির লোহার খনিতে কাজ করে হোঁৎকার কেষ্টমামা। গোল পেটা নিটোল কালো কুচকুচে চেহারা। মাথায় চকচকে একখান টাক। পরনে হাফপ্যান্ট কেডস-আর বুকে লেবেল সাঁটা টাইট গেঞ্জি।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবে ওকে এনে হোঁৎকা পরিচয় করিয়ে দেয়-আমার কিষ্ট মামা, বিরাট স্পোর্টসম্যান! ডিসকাস থ্রো কইরা স্টিল কোম্পানিতে চাকরি পাইছে। সারা বিহার চ্যাম্পিয়ন। এবার দিল্লীর এশিয়াড গেমসে ইন্দিরাজি ওরে কল করেছেন।

হোঁৎকা আবার বলে,-জানস, বুটা সিং মামার 'বুজম্ ফ্রেন্ড'!

মামা তেলানে হাসে,-হেঁ-হেঁ ও আর এমনকী। দিল্লীতে এবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হই লই তয় অলিম্পিক যাবার লাগবো।

হোঁৎকাও অবশ্যই যাইব, মেনেজার হইব।

হোঁৎকা একদিনেই মামাকে নিয়ে আমূল বদলে গেছে। ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল। বলে গেল, চিফ্ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। ওখান থেকে কেষ্টমামার প্র্যাকটিসে যাবে।

পটলা বলে-স-সব গুল। লোহার বল ছুঁড়ে দিগ্বিজয় করবে, হুঁ!

ফটিক বলে-না রে, তাই হয় আজকাল। দেখিসনি সামান্য তলবা বায়াঁ নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরছে লোকে। ওই পূর্ণদাস বাউল তো একতারা খমক বাজিয়ে গান গেয়ে পৃথিবী পাক দিচ্ছে।

হোঁৎকার এখন একদম সময় নেই। প্যান্ট কোট টাই পড়তে শুরু করেছে। ক্লাবে এসে বলে, ভারতগৌরব কিষ্ট মামারে একখান রিসেপশন দে-চাঁদার জন্য ভাবস না। মামারে ধইরা তিনশো ট্যাকা দিমু, অর্গানাইজ কইরা ফ্যাল।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব কর্তৃক ভারত গৌরব ডিসকাস নিক্ষেপকারীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে অনেকেই আসে। খেলাধুলার উৎসাহী ক্লাব হিসাবেও নাম ছড়ায়। আর পণ্ডিত ডাক্তারও ম্যানেজ করে এসেছে সভার অন্যতম প্রধান বক্তা হিসেবে।

পাড়ার সব অনুষ্ঠানের পতিতবাবু ঠিক লাইন করে সেট হয়ে যায়। ধর্মসভা, স্কুলের বিতরণী উৎসব, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ফুটবল প্রদর্শনী কোথাও বাদ নেই।

শোনা কথা, একবার গোহত্যা নিবারণী সভায় লেকচার দিয়ে নাকি ষাঁড়দের নিয়ে কী বলেছিল, ষাঁড়েরা গুঁতিয়ে একটা ঠ্যাংই ভেঙে দিয়েছে। সেই থেকে এখনও লেংচে লেংচে চলে।

আমাদের সভাতেও পতিতবাবু এসে বক্তার চেয়ার দখল করে বসেছেন। মাঠে বহু কৌতূহলী মানুষও জমেছে। সবার চোখে বিস্ময়!

পতিতবাবু গলা কাঁপিয়ে নেচে নেচে বক্তৃতা শুরু করলেন:

কিষ্টবাবু দেশের গৌরব, দেশের শক্তি। ওই গোলক ছুঁড়েই দেশের আক্রমণকারীদের আমরা বিনাশ করব। দেশছাড়া করব।

ভাইসব, ওই লৌহ গোলক নিক্ষেপকারী জাতীয় বীরকে আমরা বলব-তুমি দিনরাত লোহার গোলা ছুঁড়ে দেশের মধ্যে চোরাকারবারী, মুনাফাবাজ, মজুতদারদের দুর্গ গুঁড়িয়ে দাও।

দেশকে বহিঃশত্রু, ভিতরের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাও। হে বীর-

পতিতবাবু আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল, হাততালি আর সিটির আওয়াজে শোনা গেল না। তাড়াতাড়ি বসানো হল তাকে।

মাইকে ঘোষণা করা হল: এরপর লৌহগোলকের কৌশল দেখাবেন কেষ্টবাবু।

একটা ঘড়ির চক্র করা জায়গাতে কেষ্টবাবু সর্বাঙ্গে রেড়ির তেল মেখে কুচকুচে কালো দেহ নিয়ে লোহার গোলা হাতে দণ্ডায়মান। হোঁৎকা খুদু ইলেকট্রিসিয়ানকে বলে ওখানে একটা আলোর ফোকাস ফেলেছে।

তারপর বিশাল দেহটাকে লাট্টুর মত আড়াই পাক খাইয়ে একটা চাপা গর্জন করে ছুড়ে দিল সেই লৌহগোলক।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ওঠে খাগড়াই কাঁসাপেটার গলায়,-কোন ড্যাকরা-মুখপোড়ারে।

সেই সঙ্গে হরিহরবাবুর গর্জন, বেশ কিছু মোরগের ঝটাপটি।

কেষ্টমামার উৎক্ষিপ্ত গোলক গিয়ে পড়েছে ওদিকে হরিবরবাবুর টালির তৈরি মুরগির ঘরের উপর। কয়েকটা টালি ভেঙে পড়েছে। গোটা তিনেক মুরগি চাপা পড়ে মরেছে, দুটোর ঠ্যাং ভেঙে তারস্বরে চিৎকার করছে!

হরিহরবাবু ওই লৌহগোলকের গুঁতোয় ধরাশায়ী-মোরগকুলকে হাতে ঝুলিয়ে ভাঙা টালি তুলে গর্জাতে গর্জাতে এগিয়ে আসে,-ইয়ার্কি পেয়েছ! লৌহগোলক ছোঁড়া ঘুচিয়ে দেব! থানায় যাচ্ছি।

জনতাও মজা পেয়ে যায়। শেষ অবধি তিনটে মুরগির দাম তিন আটটে চব্বিশ টাকা দিয়ে আর টালির দাম বাবদ ষোল টাকা কুল্যে চল্লিশ টাকা দিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচলাম আমরা।

হোঁৎকা ততক্ষণে মামাকে নিয়ে হাওয়া।

তার দুদিন পরই শুনলাম হোঁৎকা দিল্লী গেছে মামার সঙ্গে। সেখান থেকে নাকি অলিম্পিকে যাবে।

গোবরা বলে-একনম্বর বেইমান ব্যাটা হোঁৎকা।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব যেন মিইয়ে পড়েছে। হোঁৎকা নেই।এদিকে ফাইন্যাল খেলায় তিন গোলে হারলাম।

হঠাৎ একদিন ভুস্ করে উদয় হল হোঁৎকার। বিষণ্ণ চেহারা। ঝোড়োকাকের মত কোৎরাতে কোৎরাতে ক্লাবে এসে ঢোকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,-আমার বরাত খুবই মন্দ রে! হক্কল প্ল্যান ভেইস্তা গেল গিয়া!

হোঁৎকা তাহলে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান! মনে মনে খুশিই হই।

পটলা মুখে সান্ত্বনা দেয়-আলুকাবলি খা।

হোঁৎকা আবার ফুল-ফর্মে শালপাতা চাটতে চাটতে বলে,-একটুর জন্য মিস কইরা গেল রে, মামায় ডিসকাস খান্ ছুঁড়েছে, ব্যস-ধাঁ কইরা উপরে উইঠা কোথায় ওদিকের ঝোপ জঙ্গল না খানায় পড়েছে তার আর পাত্তাই হইল না গিয়া।

আহা! হোঁৎকার দুঃখে আমরা দুঃখিত হই। ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ হয় এইভাবেই।

তারপর কিছুদিন পরই এই ধ্বংসলীলার পূর্বাভাস শুরু হয়েছে।

এমন সময় হোঁৎকার ওই মামার কথা শুনে শুধোই,-পুলিশ তাকে খুঁজছে কেন?

হোঁৎকা বলে,-কারোরে কস না কিন্তু। খুউব গোপনীয়।

-আরে বল না, কারণটা কি?

হোঁৎকা বলে,-সারা ভারতের এতবড় ডেঞ্জার ক্যান আইছে আজ তারই এনকোয়ারি কইরা সব, খবর পাইছে ওরা। রাশিয়াও কনফার্ম করছে। মামার লাক খানা ভেরি ব্যাড্ রে। হেই যে দিল্লীতে কম্‌পিটিশনে যে লৌহ গোলক খান ছুঁড়ছিল-

-সেটাতো খুঁজেই পাওয়া যায় নি।

হোঁৎকা বলে-না। তার পাত্তা মিলছে। আর হেই লৌহগোলকখানই এইসব ডেঞ্জার করছে! মামার ছোঁড়া হেই লৌহগোলকখান সিধা হাত তনে ছুইটা আকাশে উইঠা আরও উপরের দিকে যাইয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াইয়া সোজা মহাকাশে হাজির হইছে।

-এ্যাঁ! বলিস কিরে?

হোঁৎকা বলে,-হঃ! সেই মহাকাশে গিয়া না একখান জবরদস্ত উপগ্রহের ঠক্কর লাগছে, ব্যস-সেখানে চুরমার হইয়া এখন নামতেছে। বাংলার দিকে।

সমস্বরে গর্জে উঠি,-ধরে নিয়ে যাক তোর ওই কেষ্টমামাকে। উঃ সারা বাংলাদেশ ধ্বংস হচ্ছে ওর জন্য!

হোঁৎকা মিনতির সুরে বলে-মামারে বাঁচা সমী। মুখ বন্ধ কইরা থাক।

সকাল হয়। নাহ্‌ কিছুই হয়নি।

আরে! আমরা সবাই বেঁচে গেছি। কাগজে বের হয়েছে সেই উপগ্রহ চূর্ণ কোথায় মহাকাশে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। দু'একটা টুকরো কোনো সমুদ্রে পড়েছে।

সকালেই কীর্তন ভেঙে গেছে।

লালাজি কপাল চাপড়াচ্ছে,-মেরা সব্বনাস হো গিয়া। ফকির হয়ে গেল বিলকুল। গুদাম সাফ হয়ে গেল। হায় রামজি।

সারা পাড়া কেঁপে ওঠে বোমার শব্দে। তেলিয়া মস্তান আর ন্যাপলা ঘোষের দলের মধ্যে বোমাবাজি শুরু হয়েছে আবার। লোকজন পালাচ্ছে প্রাণভয়ে।

ক্লাবের মাঠে রামভরোস কুলপি এনেছে। এইটুকু কুলপি। বলে-দেড় রুপেয়া লাগবো।

রাতারাতি সব বদলে গেছে আবার। পটলা বলে-হোঁৎকা তোর কেষ্টমামাকে বল, যদি সত্যি পারে তো গোটা কয়েক লৌহগোলক ছুঁড়ে মহাকাশ থেকে যে কটা কৃত্রিম উপগ্রহ আছে পৃথিবীর বুকে পেড়ে ফেলুক, তবু জিনিসের দাম কমবে।

হোঁৎকা ওর কথায় এবার গর্জে ওঠে,-কি কইলি পটলা? আমি গুল দিছি তগো?

মারমুখী হোঁৎকাকে থামাই,-শোন হোঁৎকা, পটলা তো তা বলেনি। কেষ্ট ঠাকুর বহুবার দেশকে বাঁচিয়েছে পাপীতাপীদের শাস্তি দিয়েছে সুদর্শন চক্র ঘুরিয়ে। তাই তোর মামা যদি আর গোটাকয়েক লৌহগোলক ছুঁড়ে আবার পৃথিবীর বুকে দু চারটে উপগ্রহকে চুরমার করে নামাতে পারে, সব বিলকুল বদলে যাবে। গেছল কিনা বল?

হোঁৎকা সায় দেয়-তা গেছল। হক্কলেই সাধু হইয়া গেছল।

তাই বলছি একবার তোর কেষ্ট মামারে রিকোয়েস্ট করে দ্যাখ না, যদি কিছু করা যায়।-আমি হোঁৎকাকে ঠাণ্ডা করি।

হোঁৎকা চিন্তিতভাবে বলে,-দেহি কথাটা কমু ওরে।

হোঁৎকা এবার কথাটা সিরিয়াসলি ভাবছে বোধহয়।

মুখোশ

সেদিন কুলেপাড়া ক্লাব-এর সঙ্গে চন্দ্রভানু শিল্ড ফাইনালের খেলায় আমরা গোহারান হেরে গেলাম। এমনভাবে হারতে হবে তা আমরা কোনদিনই ভাবিনি।

ক্লাবের জামতলার ঘাসে চুপচাপ পড়ে আছে পটলা। সে ক্লাবের গোলকিপার, তিন তিন খানা গোল খেয়ে লটকে পড়েছে।

হোঁৎকা গজরাচ্ছে। ও ব্যাকে খেলে। দারুণ স্টেডি প্লেয়ার। প্রথম দিকেই তাই ওকে যুৎসই মেরে বাইরে পাঠিয়েছিল কুলেপাড়া ক্লাবের এক ভাড়াটে মারকুটে প্লেয়ার।

পটলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে,-খেলার বিভাগই তুলে দেব। এত ব-বড় অপমান সইতে হবে ওই নিতু মিত্তিরের কাছে? এর চেয়ে ডে-ডেথই ভালো।

পটলার 'ডেথ' মানে আমাদের পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবেরই 'ডেথ'। সুতরাং ওটা মেনে নিতে পারি না।

হোঁৎকা চোট খেয়ে গজরাতে গজরাতে বলে,-এর শোধ লমুই। তুই চুপ কইরা দ্যাখ পটলা, ওই নিতু মিত্তিরের খুব ফাঁট্ হইছে, দুইডা পইসা কামাইয়া-

ফটিক বলে,-নিতু মিত্তিরই এবার এখানের সবাইকে হটাতে চায় টাকার জোরে। ইস্কুলের ভোটেও নাকি দাঁড়াচ্ছে।

-ইস্কুলের ভোটের কথা পরে। এখন নিতু মিত্তির তার ছেলে চিতুকে দিয়ে আমাদের ক্লাব লাটে তুলতে চায়।

পটলার অবস্থা তখন শক্তিশেল খাওয়া লক্ষ্মণের মত। আমরা কোনরকমে ওকে ধরে নিয়ে চলেছি।

ওদিকে তখন ব্যান্ডপার্টি, তাসাপার্টি নিয়ে পেল্লায় শিল্ডটাকে মালা পরিয়ে ঠ্যালাগাড়িতে তুলে নিতু মিত্তির পাড়া প্রদক্ষিণ করছে। সঙ্গে তস্য পুত্র চিতু।

আমাদের দেখে ওদের নাচের বহর বেড়ে গেছে। সিটি বাজিয়ে তুমুল নাচছে ক্যাবলা, মদন, নটবর ও আরও অনেকে। আর নিতু মিত্তির গাড়িতে বসে দেখছে তার অনুচরদের এই বিজয় বিভিন্ন মোকামে সাপ্লাই দেয়।

আগেকার খোলার চালের বাড়ির বদলে এখন নিতু মিত্তিরের তিনমহলা প্রাসাদ। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল।

ইদানীং পাড়ার বেশ কিছু ছেলেদেরও সে কাজে লাগায়। বলে,-বেকার সমস্যা দূর করতেই হবে। খাটো, রোজগার করো আর আনন্দ করো।

তারই পক্ষছায়ায় গজিয়ে উঠছে ওই কুলেপাড়া ক্লাব। দুহাতে সেখানে টাকা খরচা করে চিতু। ফলে সেখানেই ভিড় বাড়ছে ছেলেদের। এতে নিতু মিত্তিরের প্রভাবই শুধু বাড়ছে না ব্যাবসাও চলছে রমরম করে।

পরদিন ক্লাবে আলোচনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে নাইট স্কুল চালাবার ব্যাপার নিয়ে। এমন সময় হটাৎ একটা গাড়ির চড়া হর্ন শুনে চেয়ে দেখি, স্বয়ং নিতু মিত্তির গাড়ি থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে একগাল হাসি। সঙ্গে মদনা আর ক্যাবলা। ক্যাবলার এ পাড়ায় অনেক বদনাম। ক্যাবলা দেখছে আমাদের। কারণ ওকে আমরাই সেবায় এক ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার করার জন্য চাঁদা করে মেরেছিলাম।

নিতু মিত্তির অমায়িক ভদ্রলোকের মত বলে,-সব ভালো আছো তো?উৎসব।

কয়েক বছরের মধ্যেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে এই নিতু মিত্তিরের। কলকাতার লাগোয়া অঞ্চল। নিতু মিত্তির বসিরহাট

অঞ্চলের লোক। এখানে এসে প্রথম প্রথম আবাদ অঞ্চলের কাঠ, গোলপাতা এসব নিয়ে ব্যবসা করত। দেখতে দেখতে এখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বিরাট শেড তুলে, সেখানে নানা মালপত্র রেখে, ট্রাকযোগে আবাদের

পটলা বলে,-ভালোই।

নিতু মিত্তির বলে,-সমাজের মঙ্গল করতে চাই। দেশ সেবা। তাই তোমাদেরও সাহায্য আমার দরকার। তোমরা ইয়ং ম্যান। আমি চাই, ভেদাভেদ ভুলে দুনিয়ার ইয়ংম্যান এক হও। আর আমি তোমাদের সেবা করে ধন্য হই।

ওর চামচেদের দল হাততালি দেয়।

আমারা হতবাক। যেন ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি। নিতু মিত্তির বলে,-তাহলে একদিন আমার বাড়িতে এসো তোমরা। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে কাজে নেমে পড়তে হবে।

নিতু মিত্তির সদলে বিদায় নেবার পর বলি,-কিছু বুঝলি মতলবটা!

হোঁৎকা বলে,-বুঝছি। ওরেও বুঝাইমু।

সকালের দিকে বহু ছেলেরাই আসে নিতু মিত্তিরের দরবারে। কাজকর্মের সন্ধানে। হোঁৎকা পাড়ার মাতব্বর গোছের। একদিন সকালে তাই প্রতিপক্ষ দলের হোঁৎকাকে নিতু মিত্তির তার কাছে আসতে দেখে, মনে মনে খুশিই হয়। হোঁৎকাকে হাতে আনতে পারলে তার সুবিধাই হবে।

হোঁৎকা বলে,-আপনার কাছেই আইলাম ছার। কাজকাম কিছু নাই। হক্কলেই কয় আপনি দয়ালু সজ্জন।

বিনয়ের সঙ্গে নিতু মিত্তির বলে,-সাধ্যমত সকলেরই উপকার করতে চাই।

চিতুও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। হোঁৎকার কুলেপাড়ার তাবড় ছেলেদের অস্বীকৃত নেতা। তাকে হাতে পেলে পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবকে ডকে তুলে দেওয়া যাবে। তাই চিতুও বলে,-বিপদে পড়ে এসেছে হোঁৎকা, ওকে একটু হেল্প করা উচিত বাবা।

হোঁৎকা তার কাতরতার মাত্রা আর এক ডিগ্রি বাড়িয়ে বলে,-একটু দ্যাখেন ছার, তালি পড়াশুনাটা করতি পারি।

নিতু মিত্তির এবার বরাভয় দেবার ভঙ্গিতে বলে,-ঠিক আছে, দেখি যদি কিছু রোজগারের পথ করে দিতে পারে।

গালকাটা ক্যাবলা আশেপাশেই ছিল। প্রভুর ডাকে পোষা বুলডগের মত এসে দাঁড়ায়। ইয়া জুলপি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে রঙ-ওঠা নীলচে টাইট জিনিস্।

নিতু মিত্তির বলে,-বিকাশ বাবাজি এসেছে। ওর খুব বিপদ। ওকে একটু কাজপত্তর দিতে হবে। শিখিয়ে নিবি। খুব ভালো ছেলে বিকাশ বাবাজি।

বিকাশ হোঁৎকার ভালো নাম।

নিতু মিত্তির তারপরই ব্যবসার কাজে ডুবে যায়।

ম্যানেজার বলে,-কাল আমাদের গাড়ি আটকেছিল পথে।

চমকে ওঠে নিতু মিত্তির। তার ট্রাকে নানা ধরনের মাল দেওয়া নেওয়া হয়। হঠাৎ ক্যাবলাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে। নিতু মিত্তির জানে ক্যাবলাই তার বিশ্বস্ত অধিনায়ক। ওর গুণের শেষ নেই। আগে ওয়াগান ভেঙে মাল পাচারকারী দলের নেতা ছিল সে।

ক্যাবলা বলে,-আজও কিছু মাল আসবে।

খুশি হয় নিতু ওর কথায়। বলে,-সাবধানে আনবি। আমিও লাইন কিলিয়ার করে রাখব। আর-ক্যাবলা আরও কিছু বলতে চায়। ওই হোঁৎকাকে নিলেন?

নিতু মিত্তিরও কথাটা ভেবেছে। বলে,-একটু নজরে রাখবি। ওকে আসল ব্যাপার না জানিয়ে মাঝে মাঝে ট্রাকের মালের সঙ্গে পাহারা দিতে পাঠাবি।

যদি কিছু জানতে পারে?-ক্যাবলা শুধোয়।

নিতু মিত্তির গভীর জলের মাছ। হোঁৎকাকে দলে আনতে চায়। বলে,-একবার এখানে পা দিলে সহজে বেরুতে পারবে নারে। আর বেগড়বাই করলে, ফাঁদে ফেলে দিবি। যাক পুলিশের খপ্পরে।

হোঁৎকাও নজর রেখেছিল চারিদিকে। ক্যাবলা ও ঘরে ঢুকতে, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। ওদের কোথাগুলো শুনেছে হোঁৎকা।

-এ্যা! নিতুদা বলেছে কাল একবার বসিরহাটে গিয়ে এক ট্রাক পাট আসবে, নে আসবি। ধর পঞ্চাশ টাকা খোরাকি।

হোঁৎকা জানে তাকে দু-একটা কাজে পাঠানো হবে। সে-ও তাই চায়। টাকাটা পকেটে পুরে ক্যাবলাকে শুধোয়,-কখন যাওন লাগবে ক্যাবলাদা?

ক্যাবালার প্রথম থেকেই হোঁৎকাকে ভালো লাগেনি। তবু নিতুদার কথার উপর কা চলে না। তাই ক্যাবলা বলে,-কাল সকালেই ট্রাক যাবে। ওতে গিয়ে রাতে মাল নে গুদামে ফিরবি।

এর আগে বসিরহাটে দু-একবার এসেছে হোঁৎকা। এইদিকে পটলাদের আদি বাড়ি। কিন্তু এখন ওদের ওখানে যাওয়া যাবে না। হোঁৎকাকে অবশ্য একা পাঠায়নি ক্যাবলা। সঙ্গে দলের মদনাকেও পাঠিয়েছে।

ওরা ট্রাক নিয়ে এসেছে।

নদীর ধারে একটা পোড়ো বাড়ি। পাশে আমবাগান আর বাঁশবনের জটলা।

মদনা বলে,-খেয়ে দেয়ে দুপুরে শুয়ে পড় হোঁৎকা, রাতে মাল বোঝাই হলে বেরুবে। গুদামের চেহারা দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে হোঁৎকা।

কয়েকখানা ঘরকে কোনরকমে মেরামত করে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে ছাদটা ভেঙ্গে ঘাড়ে না পড়ে।

হোঁৎকা মনে মনে জায়গাটায় একটি ছবি এঁকে নেয়।

একসময় পায়ে পায়ে আগাছার বন পার হয়ে বাড়ির বাইরে আসে। দেখা যায় একজন লোককে। সে এগিয়ে আসে বলে,-বাইরে যাবে না।

অর্থাৎ তার বাইরে যাওয়ারও হুকুমে নেই।

রাত্রি নামতে দেরি হয় না। হোঁৎকা বেশ বুঝতে পারে এদের কর্মব্যস্ততা হঠাৎ বেড়ে ওঠে। অন্ধকারে তারাজ্বলা আলোয় আবছা দেখা যায়। নদীতে দু-একটা নৌকা এসে থেমেছে। ছায়ামূর্তির দল অন্ধকারে কি সব মালপত্র নামাচ্ছে আর ট্রাকে তুলছে।

মদনা সারাদিন কোথায় ছিল কে জানে, এবার তার গলাও শোনা যায়।

হোঁৎকা ব্যাপারটা দেখেছে দোতলার জানলা থেকে। শুনেছে ইছামতী নদীর ওপারেই বাংলাদেশ। এই জায়গাটা সীমান্তের কাছেই। রাতের অন্ধকারে আসা নৌকাগুলোয় নিশ্চয়ই ওদেশ থেকে আনা বেআইনি মালপত্র থাকে।

ট্রাকটা ফিরছে কলকাতার দিকে। ট্রাকে চাপানো আছে পাটের গাঁট। নিশ্চয়ই এই গাঁটের মধ্যে কৌশল কোরে মূল্যবান বিদেশি জিনিস পাচার করা হচ্ছে।

নিতু মিত্তিরের আসল ব্যবসার খবর পেয়েছে এবার হোঁৎকা। লুকিয়ে সস্তায় বিদেশি জিনিস এনে নিতু মিত্তির তার লাভের পুঁজি বাড়াচ্ছে আর মুখে দেশপ্রেমের বুকনি দিচ্ছে।

নিরাপদে এত মালপত্র এসে পৌঁছতে দেখে খুশি হয়ে নিতু মিত্তির বলে,-তুই তো বেশ পয়মন্ত রে। কাজের ছেলে। নে পঞ্চাশ টাকা রাখ। মিষ্টি খাবি। আর শোন, মন দিয়ে কাজকম্মো কর। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমি চাই দেশের ইয়ংম্যানরা সবাই কর্মবীর হোক। তবেই তো দেশের, সমাজের উন্নতি হবে।

ক্যাবলাও দেখেছে নিতু মিত্তির হোঁৎকাকে খাতির করছে। আড়ালে ক্যাবলা বলে,-কত্তা কত দিল রে?

হোঁৎকা টাকাটা বের করে তা থেকে ক্যাবলাকে দশ টাকা দিতে ক্যাবলাও খুশি হয়। বলে,-আবার পাঠাব তোকে। আর শোন, ব্যাটা মদনার দিকেও নজর রাখবি। ও মাল সরায়-টরায় কি না দেখবি।

হোঁৎকা এবার তার মত বলে-মদনা তো তোমাকেই আউট করতে চায় ক্যাবলাদা।

ক্যাবলা অবশ্য সেটা অনুমান করেছে। এরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যেন একপাল হিংস্র কুকুরের দল, এক টুকরো মাংসের জন্য যখন তখন যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। নিতু মিত্তিরের মত লোক দেশের যুবশক্তিকে এমনি করে অন্ধকার পথে নামিয়েছে নিজের রোজগারের স্বার্থে। হোঁৎকা সমাজের এই অন্ধকার রূপটাকে দেখে শিউরে উঠেছে। এই নিতু মিত্তিরের মত কসাইদের মুখোশ খুলে দেবে হোঁৎকা। তার জন্যই সে সাবধানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

ক্লাবের মাঠে আমরা চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি। কেউ কেউ ঘাস চিবুচ্ছে।

পটলা হতাশভাবে বলে,-কা-ক্লাব তুলে দেব! গোবরা বাধা দিয়ে বলে,-হোঁৎকা গেছে যাক। তাই বলে হেরে যাব? নেভার। নতুন কত মেম্বার আসবে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ক্লাব ঝিমিয়ে পড়েছে। যে কোনদিন ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হবে। সব ছেলেরা এখন নিতুদার নামে অজ্ঞান।
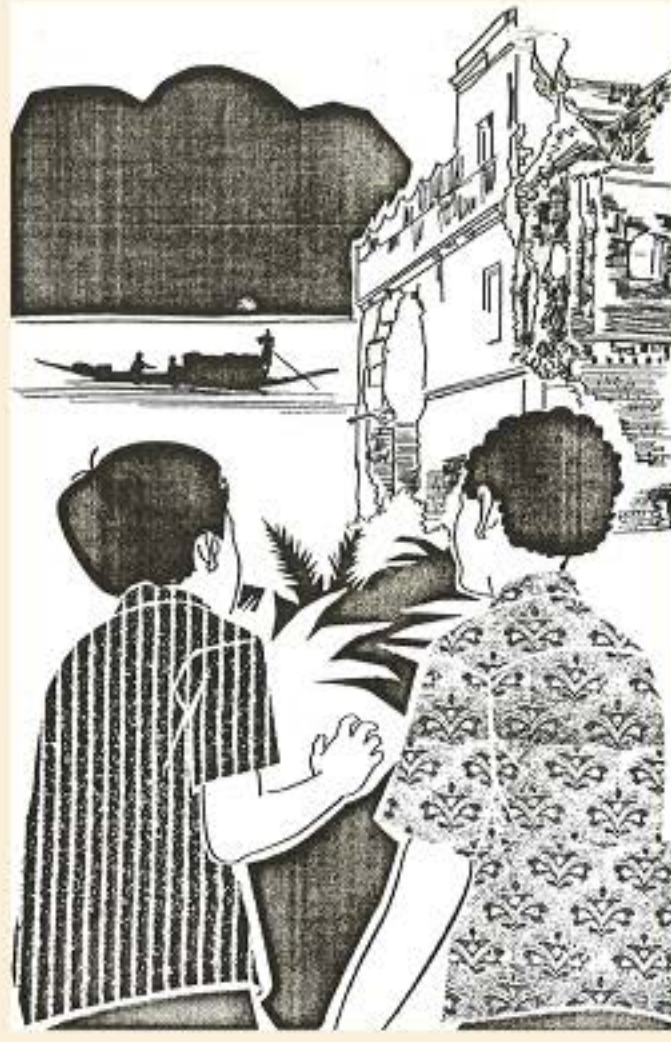
হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কাকে আসতে দেখে সবাই মিলে একসঙ্গে তাকালাম। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারি না। হোঁৎকা এসেছে।

অবাক হই,-তুই।

পটলা বলে,-আর কেন এলি? ক্যাবলা, নিতু মিত্তির আমাদের ক্লাব তুলে দেবে।

হোঁৎকা বলে,-ছাড়, ছাড়। পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাব তুলবে নিতু মিত্তির?

হোঁৎকার কথা শুনে অবাক হই। হোঁৎকা তাহলে আমাদের ছেড়ে যায়নি।

সব শুনে-টুনে গোবরা বলে,-এত বড় শয়তান ঐ নিতু মিত্তির? এ আমারা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পটলা মন্তব্য করে,-ওর প-পরিচয়টা প্রকাশ ক-করতেই হবে।

হোঁৎকা শোনায়,-ক্যাবলা আর মদনাকে লড়ায়ে দিছি। ওরা দুজনে ফাইটে লাইগা গেছে। ওদের দিই কাজ হাসিল করুম। তগোর একটু হেল্প করন লাগবে। আর আমি তো আছিই।

আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ জল্পনা-টল্পনা করে হোঁৎকা আরো বলে,-তরা ঐ প্ল্যান মত কাজ কর গিয়া, আমারে দেখলেও চিনবি না। আমিও ওগোর কারো সামনে তগোর সাথে কথাই কইমু না। শুধু সিগন্যাল দিমু দু-আঙুল নাড়াইয়া।

কদিন ছুটি বাকি আছে সামারের, আমরা চারজন চলেছি বসিরহাটে পটলাদের দেশের বাড়িতে। হোঁৎকা সঙ্গে নেই। মনে মনে তার অভাব অনুভব করছি। ও থাকলে খাবার খরচা কিছু হয় সত্যি, কিন্তু সাহস বাড়ে।

পটলাদের বাড়িতে এসে কিছুটা নিশ্চিন্তবোধ করি। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বাড়িটা, সাবেককালের দোতলা বাড়ি। পিছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাজানো আম, লিচু, কাঁঠাল, নারকেল বাগান।

পটলার খুড়তুতো ভাই ভজুও খুশি হয় আমাদের দেখে। এর আগেও দু-একবার আমের সময়ে এসেছি। তাই ভজু বলে,-কই হোঁৎকাকে দেখছি না? পঞ্চ পাণ্ডবের চারজন এলি, সেটি কই?

সব কথা শুনে ভজুদা বলে,-তাই নাকি, এতসব!

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে নদীপথে আমরা চলেছি দূরের বাগান ঘেরা ওই বাড়িটার দিকে। ভজুদা নিজেদের নৌকা নিয়ে চলেছে, ওতে নদীটাও দেখা যাবে।

ভজুদা বলে, ওপারে একটু গেলেই বাংলাদেশ। এ গাং-এ কোনটা আসল জেলেদের নৌকা আর কোনটা নয়, তা বোঝার উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে এখানে বিদেশি মালপত্রের লেনদেন হয় প্রচুর।

একটু পরে বাগানের মধ্যে একটা পুরানো বাড়ি দেখিয়ে ভজুদা বলে,-খুব সম্ভবত এই বাড়িটা। নদীর ভাঙনে কিছুটা এলাকা ভেসে যেতে, এ বাড়ি ছেড়ে পালায় সকলে।

বুঝতে পারি এই বাড়িটার কথাই বলছিল হোঁৎকা।

ডিঙি থেকে কিছুদূরে নেমে, আমরা এগিয়ে আসি বাড়িটার দিকে। দেখা যায়, একটা ট্রাক আসছে ধুলো উড়িয়ে। আর ঐ ট্রাকে গালকাটা ক্যাবলা, ও আরও একজনের সঙ্গে বসে আছে হোঁৎকা। ওরা তিনজনে বসে গল্প করছে।

আমাদের মধ্যে চোখাচোখি হয়ে যায়। অর্থাৎ অঙ্ক ঠিকই মিলছে। সব প্ল্যানও ঠিকমত চলছে। হোঁৎকা সেটা জানাবার জন্য একনজর আমাদের দেখে, বাইরে হাত বার করে সংকেত দেয়।

এবার আমাদেরও প্ল্যান মত এগোতে হবে।

ভজুদা বলে,-কিছু ভাবিস না। ঠিক মত ব্যবস্থাই করছি। একবার প্রদীপদার কাছে চল।

প্রদীপ বোস এখানে নতুন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ভজুদার চেনা। ওঁর কাছেই সবাই চললাম আমরা।

এদিকে হোঁৎকা এখন নিতু মিত্তিরের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে উঠেছে। আবার নিতু মিত্তিরের ক্যাবলাকেও দরকার। ও দুঃসাহসী। বোমা, ছুরি, পিস্তল চালাতে পারে। রাতের অন্ধকারের লাখ লাখ টাকা বিদেশি মালের আমদানির কাজে এসব লোকেরও দরকার। তার ওপর এ সপ্তাহে প্রচুর মাল আসছে। তাই ক্যাবলাকেও মদনের সঙ্গে দিয়েছে, হোঁৎকা তো আছেই।

এই ব্যবস্থাতেই মদনের সন্দেহটা ঘনীভূত হয়। নিতু মিত্তিরকে বোধহয় ক্যাবলাই ওর সম্বন্ধে কিছু খবর দিয়েছে। আর ক্যাবলাও হোঁৎকার কাছে শুনেছে মদনার মনোভাবের কথা। তাকে টপকাতে চায়। নিজেই নাকি এই ব্যবসাতে নামবে।

হোঁৎকা নীরবে দেখছে দুজনকে। দুটো যেন রাগে ফুলে ওঠা হুলোবিড়াল, কখন যে কে কার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে।

ইতিমধ্যে গুদামবাড়িটায় এসে উঠেছে ওরা।আজ রাতেই সেই বড় চালানটা আসবে।

সবাই ব্যস্ত, গুদামে রাশ রাশ পাটের বাণ্ডিল খোলা হচ্ছে, মাল এলে প্যাক করা হবে পাটের বাণ্ডিলে মধ্যে।

হোঁৎকা এর মধ্যে নীচে নেমে এসেছে। নাহ্, এদিকে বিশেষ কেউ নেই। এই ফাঁকে সে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে।

পটলাদের বাড়ির বাইরের মহলে তখন পুকুরের মাছ ভাজা দিয়ে চা পর্ব চলছে। হোঁৎকাকে ঢুকতে দেখে খুশি হয়ে বলি,-আয়, আয়! বোস!

খানকয়েক মাছ ভাজা দ্রুত মুখে পুরে দিয়ে হোঁৎকা বলে,-বসার সময় নাই রে। তরা রেডি থাক অ্যাকসন শুরু করন লাগবে। আজই ফাইনাল গেম। জেতা চাই-ই।

রাত্রি নেমেছে। ক্যাবলা, মদনা, হোঁৎকা এসেছে নৌকায়।

রাতের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দল নৌকা থেকে সাইকেলের টায়ারের বাণ্ডিল, বিড়ির পাতার বস্তা, কাপড়ের গাঁটরি নামচ্ছে নদীর ওপারে। আর নৌকায় তুলছে বিদেশি দামি যন্ত্রপাতি এবং আরো অনেক কিছু।

নিরাপদে মাল বোঝাই হবার পর এরা অপেক্ষা করে এদিকের অন্ধকারে। একটা টর্চের জ্বলা-নেভা সংকেতের জন্য। সেই সংকেত পেলেই এদিকের তীর নিরাপদ মনে করে এরা পাড়ি দেবে।

ব্যাপারটা আগে থেকেই জানা ছিল আমাদের। হোঁৎকাই ওদের সব প্ল্যানের ছকটা দিয়েছিল। সেইমত আমরাও বের হয়েছি। গোবরা, পটলা, আমি, ফটিক ছাড়া রয়েছে ভজুদা। পিছনে দূরে রয়েছেন প্রদীপবাবু। দরকার মত তিনি এসে পড়বেন।

আমরা চুপিসারে এসে হাজির হয়েছি পোড়ো সেই ভূতুড়ে বাড়ির এদিকে, নদীর ধারে।

দূরে ওপারে দেখা যায় কালো বিন্দুর মত নৌকাগুলোকে। ওই যে দূরে বাংলাদেশের সীমান্ত। সেখান থেকে দু-একটা কথার টুকরো ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

আলোর সংকেত পেয়ে ওপার থেকেও আলো জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়। তারপরই শোনা যায় নদীর জলে দাঁড়ের শব্দ। ছপ ছপ করে দাঁড় বেয়ে বিচিত্র মাল বোঝাই নৌকো এপারের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ গোবর্ধনের হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ে একটা লোক আর তার হাতের টর্চটা। বুঝতে পারি, এ-ই আলোর সংকেত দিচ্ছিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তার ছিটকে পড়া দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরই গামছা দিয়ে ওর হাত পা বেঁধে ফেলি।

লোকটা ভাবতেও পারেনি, এমনিভাবে কেউ তাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

এমন সময় ওদিকের মাটির সড়কে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। পথটা এসেছে গুদাম বাড় অবধি।

ওই পথের মুখে আমাদের পাহারা রয়েছে। আজ রাতে নিতু মিত্তির স্বয়ং আসছে। কারণ চালানটা খুবই বড়, তাই নিজেও আশপাশে থাকবে।

পটলা চাপা স্বরে বলে,-নি-নিতু মিত্তিরও এসে গ্যাছে!

আমি জানাই,-ওটাকেও জালে জড়াতে হবে।

নদীটা বেশ চওড়া এখানে। ভাঁটার টান, তাই স্রোতও বেশি। নৌকা দুটো ভেসে ভেসে নীচের দিকেই গেছে একটু। সেখান থেকে বেয়ে এই ঘাটে এসে লাগবে।

ওদিকে মদনা, ক্যাবলারা চেয়ে আছে তীরের দিকে। তারা আশা করছে আর একটা আলোর সংকেতের। কিন্তু সেই সংকেত আসে না। কানে আসে, নিতু মিত্তিরের গাড়ির শব্দটা। ওই শব্দ ক্যাবলার চেনা।

ক্যাবলা বলে,-নিতুদাও এসে গেছে, তাহলে লাইন কিলিয়ার। নৌকা ধারে লাগা।

প্রতিবাদ করে মদনা,-না। ইশারা না পেলে নৌকা নিয়ে যাব না ওদিকে।

ক্যাবলা বলে,-চুপ কর তুই। মাঝি, ধারে নে চল!

মদনা তবুও বলে,-ক্যাবলাদা।

ক্যাবলা গর্জে ওঠে,-তুই চুপ থাক। যেভাবে হোক তাড়াতাড়ি মাল নামাতে হবে। তোর মতলব বুঝেছি।

সঙ্গে সঙ্গে চটে ওঠে মদনা,-আনসান বলবে না।

হোঁৎকা দেখছে ওদের দুজনকে। ওরা এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তবু ক্যাবলাই দলনেতা, তার কথামত নৌকা দুটো ধারে এসে ভিড়েছে।

আমরা একটু দূরে বাঁশবন আর ঘেঁটু ঝোপের মধ্যে বসে আছি গা ঢাকা দিয়ে।

ওদিকে তখন নৌকা থেকে মাল খালাসের কাজ শুরু হয়েছে, নিতু মিত্তিরও এসে হাজির।

ক্যাবলা বলে,-ওই মদনার মতলব সুবিধার নয় কত্তা, ও মাল নে কেটে পড়ার তালেই ছিল।

নিতু মিত্তির গর্জে ওঠে,-ওটাকেই কেটে গাং-এর জলে ভাসিয়ে দেব আজ।

মদনও গর্জে ওঠে বিপদের গুরুত্ব বুঝে,-যা তা বলবি না ক্যাবলা, তোর লাশই গিরিয়ে দেব।

নেহাৎ দুজন ধরে ফেলে নাহলে মদনা বোধহয় তখনই ক্যাবলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এবার খেয়াল হয় ওদের। এপারের সংকেতকারী সেই লোকটা নেই।

নিতু গর্জে ওঠে,-এইসব কাঁচা কাজ করিস?

ক্যাবলা বলে,-ছিল তো। ওই মদনার দলের লোক সেটা। তাই সরে গেছে।

মদনা। -নিতু মিত্তিরের গর্জন শুনতে পাই।

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে কাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠেছি। আমাদের খবর পেয়ে ওরা বোধহয় এবার আমাদেরই আক্রমণ করতে চায়।

চাপা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। ওদের লড়াই জমার ফাঁকতালে হোঁৎকা এসে সেঁদিয়েছে আমাদের দলে।

হোঁৎকা চাপা স্বরে বলে,-চুপ কইরা থাক। ওগোর মধ্যি, দ্যাখ হালায় একখান লাশ পড়বো। তর ভজুদার অ্যাকসন কখন শুরু হইব? চারে সব মাছ আইনা দিছি, এহন জাল ফ্যালবি আর তোলবি।

হঠাৎ অন্ধকারে নদীর বুকে কয়েকটা সার্চ লাইটের তীব্র আলো ঝলসে ওঠে। দু তিনটে জিপ। হেড লাইটের আলোয় অন্ধকার মুছে গেছে। দেখা যায়, মালপত্র ফেলে লোকজন দৌড়চ্ছে। কিন্তু ভজুদার ক্লাবের ছেলেরাও অন্ধকারে বাঁশবন, আমবাগানে ছড়িয়ে ছিল। লাফ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে ওদের।

ক্যাবলাও এই গোলমালে তার বোমার থলিটা বের করে। আলোয় দেখা যায় ক্যাবলা বোম ছুঁড়তে যাচ্ছে। চমকে উঠি-বোম মেরে শেষ করবে আমাদের?

হোঁৎকা বলে,-ওটারে লেঙ্গি মাইরা ফ্যাল গোবরা, ওতে বোম আর নাই, আমি আসল বোম ফেইল্যা ওতে পাটের গোল্লা পুইরা রাখছি। কচু হইব ওতে।

নিতু মিত্তির বেগতিক দেখে পালাবার চেষ্টা করে। আর ঠিক সেই সময়েই প্রদীপদার টর্চের আলো পড়ে মুখের ওপর। থমকে দাঁড়ায় নিতু মিত্তির। মরিয়া হয়ে রিভলবার বার করে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপদার নিরেট পুলিশি ঘুসিতে একেবারে ধরাশায়ী নিতু মিত্তির।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সারা শহরের লোকজন জুটে যায়। কয়েকটা হ্যাজাকের আলোয় ওই বিরাট বিদেশি মালের চোরা চালান গ্যাং

সমেত ধরা পড়ে।

কুলেপাড়া অঞ্চলে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। হঠাৎ জেগে ওঠা ক্যাবলা মদনাদের মত যুব কর্মী, নিতু মিত্তিরের মত দেশসেবক এখন সরকারের জেলে। উঠে গেছে ওদের ক্লাবও।

সুন্দরবনের শয়তান

আমাদের গোবর্ধনের মামা নকুলবাবু এখন কুমড়ো হোলসেল বিজনেসে অনেক টাকা কামিয়ে এবার কুলেপাড়ার খালধারে ওর কুমড়োর গুদামের পাশের মাঠটায় বিরাট করাত কল গড়েছে। দিনরাত কাঠ, বড় গুঁড়ি, চেরাই হয়। ট্রাকে করে আসে নানা মুলুক থেকে কাঠের গুঁড়ি, তাই চিরে নানা কড়ি-বড়গা, তক্তা বনায়।

ইদানীং নকুলমামা কোনো কোম্পানির চায়ের পেটি বানাবার অর্ডারও পেয়েছে। লাখ লাখ টাকার কাজ।

অবশ্য শুনি এত টাকার ব্যবস্থা করেছে আমাদের পটলার কাকাই। তিনিই এই ব্যবসার পার্টনার, অর্থাৎ আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের পটলা এবং গোবরা দুজনের আত্মীয়রাই এই কারবারের পত্তন করেছে।

আমাদের ক্লাবের মাঠের পাশে তাদের কারখানার বতিল তক্তা ছাটল, খুঁটি ইত্যাদি দিয়ে আমরা ক্লাবঘরও বানিয়েছি একেবারে ছবিতে দেখা লগ কেবিনের স্টাইলে। রং-চং করে একেবারে ফরেস্ট বাংলোর মত ক্লাবঘর হয়েছে।

শীতের মুখ। স্কুলের সেকেন্ড টার্মিনালও হয়ে গেছে। ফুটবলের যুদ্ধ তেমন নেই আর, ইদানীং সৌরভ গাঙ্গুলীর দেখাদেখি পাড়ায় পাড়ায় বহু সৌরভ শচীন গড়ে তোলার সাধনা শুরু হয়েছে।

তাই আমাদের ক্লাবের মাঠেও ন্যাপাদা এখন টুপি মাথায় দিয়ে সাদা প্যান্ট পরে বাচ্চাদের নিয়ে ক্রিকেট কোচিং-এ ব্যস্ত।

সেদিন গোবরাই বলে-চল সুন্দরবন ঘুরে আসা যাক। দারুণ জায়গা।

ছোটকার মন মেজাজ ভালো নেই। এবার পরীক্ষায় সে নির্ঘাৎ ফেলই করবে, বিশেষ করে অঙ্কে আর ইংরাজিতে। -ছোটকা বলে।

-দ্যাশের লোক ইংরেজি পড়ানোর জন্য ক্যান পাগল হইতে কইতি পারস? বিদেশির ভাষা, ক্যান মাতৃভাষা কি দোষ করছে? কটমট ভাষা-পোলাপান-গোর ফ্যাল কইরাইবার মতলব, আর অঙ্ক? তুইক'বান্দর, বাঁশে উতি নামতি ক্যান যাইব? গাছ নাই, চৌবাচ্চার অঙ্ক? চৌবাচ্চার জল কত থাকব তার জন্য এত হিসাব? আর ওই এলজেবরা? বাচ্চাদের উপর টর্চার'-

ছোটকার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলেই বিপদই বাড়বে। তাই বলি-মন দিয়ে পড় ওসব দেখবি ঠিক পাস করবি।

ছোটকা বলে-পইড়া পাস করবি তরা, আমি বিজিনেস করুম। কাঠের বিজনেস!

গোবরাও ইদানীং মামার কুমড়োর বিজিনেসের সঙ্গে কাঠের বিজনেসও দেকছে। গোবরা বলে-সুন্দরবনের গেঁও কাঠ - এর দারুণ ডিমান্ড। মামা তো বন ইজারা নিয়ে কাঠ আনাচ্ছে সুন্দরবন থেকে। চল বেড়িয়ে আসবি আর কেমন করে কাঠের বিজনেস করে সবাই দেখবি।

পটলা অবশ্য এর মধ্যে বিজনেস অনেক কিছুই করেছে অবশ্য কোনটাই তার টেকেনি। সেবার গ্যাস বেলুনের ব্যবসা করে তো নিজেই গ্যাস বিমানে চেপে আকাশেই উঠে গেছল। পরে বহুৎ ঝামেলার পর ধরাধামে ফিরে আসে। আইসক্রিমের ব্যবসা করতে গিয়ে নিজেই আইসক্রিম হতে হতে রয়ে গেছল।

তবু পটলা বলে-বি-বিজনেসেই সব। ব্ বাণিজ্যে বসতি লল-পটলার জিবটা মাঝে মাঝে আলটাকরায় সেট হয়ে যায়। তোতলা বললে রেগে যায় তাই ওই ভাবেই জানাই ওকে। আমিই পাদস্ফুরণ করি-লক্ষী। পটলা ততক্ষণে জিবটাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে বলে-হ্যাঁ। তাই বলছি চল সুন্দরবন ঘুরে আসবি।

ফটিক গানের রেওয়াজ করছিল। সে আবার আজকালকার সঙ্গীত গায় না। বলে-ওসব শব্দদূষণ। গান হবে একেবারে প্রকৃতির মত, সহজ-সুন্দর বর্ণময়। তাই কালোয়াতিই গায় সে। আর এক একখান গান যখন ধরে সেটাকে নিয়ে বছর খানেক ধরে বমিই করবে বিকট স্বরে। বলে,

-এ সমুদ্র রে, মেরে সইয়া, স্নেহ এই দুটো কথা নে আমার। ওস্তাদজিরা ঘরানার মারফাটিয়াজি দু'ঘণ্টা সুরের জাল বুনতে পারেন। কি সুর? শুনলে পাগল হয়ে যাবি।

ছোটকা বলে-তা বুঝেছি। তর গান শুইনাই পাগল হই, মনে হয় তবে গলা টিইপা ধরি তবেই মার্ডার করুম, তর ওস্তাদ মারফাটিয়াজির গান শুনলে মাইরা মাথা ফাটাই দিমু!

ফটিক গর্জে ওঠে-সাট্ আপ্। গুরু নিন্দা করবি না।

কোনমতে ওদের থামাতে হয়। এহেন ফটিকও বলে-চল, সুন্দরবনই ঘুরে আসি। তয় টাইগার-ওই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখাতে পারবি?

ছোটকা গর্জে ওঠে-বাঘ দেইখা প্যান্টুল বাসন্তী কালার হইব ফট্কে! যা বীর তুই!

-কি বললি? আমি ভীতু? জানিস আমার কাকা কত বড় শিকারি? আমিও কাকার সঙ্গে বাঘ মারতে গেছি তরাই-এর জঙ্গলে। নর্থ বেঙ্গলের ছেলে আমি। আমাকে বাঘ-এর ভয় দেখাবি না। তুই তো বাঙ্গাল, শিয়ালও দেখিসনি।

ছোটকাকে থামাতে অবশ্য পটলার নগদ কিছু খসল। নেপাল দোকানের টোস্ট, ওমলেট পেতে ছোটকা বলে-ঠিক আছে। চল সুন্দরবনই যামু।

গোবর্ধন বলে-পটলা, তাহলে ক্যাশকড়ি ম্যানেজ কর। খরচা তো আছে।

পটলা এখন আমাদের কামধেনু। তাদের পরিবারের একমাত্র বংশধর। কাকার ওই সব ব্যবসার ভাবী মালিক সে। সুতরাং সে যাবে, আর কুমড়ো মামা অর্থা' নকুলমামার ওনলি ভাগ্নে গোবরাও যাবে তাই কোম্পানি থেকেই ক্যাশকড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে, শুধু আমাদের কষ্ট করে বডি ফেলতে হবে ওদের লঞ্চে।

পটলা বলে-কাকাকে বলে সব ম্যানেজ করে নেব। তো-তোরা শুধু যাবি। ব্যস!

পটলাকে নিয়েই গোল বাধে। ওই রায়বাড়ির একমাত্র বংশধর। বিরাট ব্যবসা ওর বাবা কাকাদের। কুলেপাড়া কেন কলকাতার এখানে ওখানে ছড়ানো অনেক বাড়ি, এদিকের বড় দুটো বাজার, চিংড়ি-মাছের ভেড়ি কি নেই? পটলার ঠাকুমাই গোল বাধায়-তুই সোঁদরবনে যাবি কি রে? সেখানে জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, না না। তোর যাওয়া হবে না। আবার কোথা কি বাধাবি? তোকে বিশ্বাস নাই।

পটলার ওই দোষ। যেখানেই যাবে একটা না একটা ঝামেলা বাধাবেই। পটলার ব্যাপার নিয়ে অনেক কাহিনিই লেখা হয়েছে। বিপদ, ঝামেলাও যেন পটলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। নিজের দোষেই বিপদের জালে জড়াবে, তারপর অবশ্য এই পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের হোঁৎকা, গোবরা ফটিক আর এই অধমের ডাক পড়বে সেসব সমাধান করার জন্য।

তাই ঠাকুমা পটলাকে ছাড়তে চায় না।

এদিকে পটলাও জেদ ধরে-ক-কেন যাব না? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঠাকুমা রেখেছ বাঙালি করে, ম্ মানুষ করোনি।

পটলার কাকাই বলে-তা সত্যি মা, এত বড় ব্যবসা করছি সুন্দরবনের কাঠ নিয়ে ও দেখেই আসুক ব্যাপারটা। হোঁৎকারাও যাবে না হয়।

হোঁৎকাসহ আমাদের ক'জনের ডাক পড়ে ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা আমাদের ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ফুটবল ফাইনাল, কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গাইয়েদের খরচা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে ঠাকুমাই টাকা যোগায়। তাই ঠাকুমাকে মেনে চলতে হয় আমাদের।

ঠাকুমা বলে-পটলা সোঁদরবনে যাচ্ছে, তোরাও নাকি যাবি।

হোঁৎকা বলে-ঠাকুমা, এহেন অনেকেই লঞ্চ লই বাচ্চা-টাচ্চাদের লই সুন্দরবন ভ্রমণে যায়, মেলা খরচা কইরাও টুরিস্ট স্পট হইছে।

ঠাকুমা বলে-ওই ভুইফোঁড় ফুটানিওয়ালা বাবু, বাবুনীদের কথা ছাড়। বিপদের জায়গা, তোরা পটলাকে ওখানে যেতে না কর। তার চেয়ে কাশী বৃন্দাবন যা, দেবদেবীর ঠাঁই তীর্থ।

পটলা বলে-ক্ কাশীবৃন্দাবন তুমি যাচ্ছ-যাও। বৃন্দাবন নয় সু-সুন্দরবনই যাব।

হোঁৎকাই বলে-ভয় নাই ঠাকুমা। আমার বাড়িতে পড়ার খুব চাপ দিত্যাছে, পড়িছিও। তবু আপনি কইছেন যামু ওর সাথে। ওই গোবরদের লই যামু। দিন পনেরো ভয় নাই, নিরাপদেই ঘুইরা আসুম।

ঠাকুমা কিছুটা আশ্বস্ত হয়-তাহলে যা। তবে খুব সাবধানে যাবি। শুনলাম নকুলও যাচ্ছে?

পটলার ছোটকা বলেন-হ্যাঁ মা, নকুলবাবু ওদিকের সব জানেন। হুঁশিয়ার লোক। ও সঙ্গে থাকবে। কোনো ভয় নাই। যাক পটল কদিন ঘুরেই আসুক।

সুন্দরবন এককালে কলকাতা অবধিই বিস্তৃত ছিল। লর্ড হেস্টিংস নাকি বর্তমানে যেখানে পার্কস্ট্রিট সেখানেই হরিণ শিকার করতেন। কালীঘাট তো ছিল গভীর বনের মধ্যেই। দিনের আলোয় মানুষ-জন গিয়ে পুজো দিয়ে বেলাবেলিই ফিরে আসত। পথে বাঘ, ডাকাত সবকিছুর ভয়ই ছিল।

মূলত সুন্দরবন গড়ে উঠেছে গঙ্গার অসংখ্য ব-দ্বীপকে ঘিরে। এদিকে গঙ্গা-ওদিকে ইচ্ছামতী গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। যশোর জেলাতেও পশর, শিবসা প্রভৃতি নদী মিশেছে। এই মোহানায় বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে অসংখ্য দ্বীপে গজিয়ে ওঠে বনভূমি। সুন্দরবন তাই বিশালই। বর্তমানে বাংলাকে কেটে দুভাগ করা হয়েছে। তাই সুন্দরবনও পড়েছে দুই বাংলার দক্ষিণ সীমান্তে দুই দেশের ভাগে।

কিন্তু এই বাংলায় এর বিস্তার দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনাতেই। ওদিকে বাংলাদেশের ভাগে পড়েছে বেশিরভাগ সুন্দরবনটাই।

এখানে নদী-খালের জল নোনা। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা খেলে, তাই সব জলই নোনা। আর বনও গভীর।

আগে কলকাতার উপকণ্ঠ অবধি যে ভয়াল বন ছিল, ক্রমশ মানুষের বসতি বাড়ার জন্যই মানুষরা ওই বনভূমিকে কেটে নির্মূল করে দিল। গড়ে উঠল গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম। বিদ্যানদী-মাতলা-আর অনেক নদী খালকে ক্রমশ বাঁধ দিয়ে দিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য করল। আর গড়ে তুলল বসত, চাষের জমি।

অরন্যভূমিও পিছু হঠতে লাগল। এখন দূরেই সরে গেছে আদিম রহস্যময়ী সুন্দরবন। গড়ে উঠেছে আবাদ, বসতি, গঞ্জও।

আমাদের সেই বনভূমিতে যেতে হবে লোকালয়ের সীমা ছাড়িয়ে। এখনও যেটুকু বনভূমি আছে তাও বেশ ভয়ালই আর দুর্গম। মানুষ সেই অরণ্যে বাস করে না, করতে পারে না। দু দশ দিনের জন্য যায় কাঠ ব্যবসায়ীদের লোকজন, বড় বড় নৌকা, ছোট নৌকা-সঙ্গে লোকজন। তাদের খাবার দাবার মায় খাবার জল অবধি নিয়ে যেতে হয়। ওই বড় বড় নৌকাতে দল-বেধেঁ ছোট গাং-এ নোঙর করে থাকে। আর দিনের বেলায় কাঠ কাটে, ফের নৌকায়। ওখানেই থাকা খাওয়া।

কাঠ বোঝাই হয়ে গেলে চলে আসে, আবার সেই আদিম অরণ্য নিজের নির্জনতাকে ফিরে পায়। কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের পেটে কুমিরের পেটে, না হয় সাপের ছোবলে দু'একজনকে রেখে আসে মাঝে মাঝে। না হয় গাং-এর তুফানে নৌকাডুবিতেও মরে। এসব সাধারণ ব্যাপার ওই অরণ্য জগতে।

তাই সুন্দরবনকে ভয় করে সবাই। তবু মানুষ যায় সেখানে।

নকুলমামা অর্থাৎ গোবর্ধনের কুমড়ো মামা এতকাল কুমড়োর ব্যবসা করে চেহারাটাকেও বেশ নধর সাইজের একটি কুমড়োই বানিয়েছে। ভুঁড়িটি ও বেশ কুমড়োর মত গোলগাল, চোখদুটো পিটপিট করছে, দর্শনীয় বস্তু তার চোখের জোড়া ভুরু। যেন সতেজ পালং শাকের একটি আঁটি ধনুকাকারের মত। তার সঙ্গে ইয়া পাতটাঙ্গির সাইজে এক জোড়া পুরুষ্টু কাবলী বেড়ালের লেজের মত গোঁফ! গোল মুখে ওই ভুরু যুগল আর গোঁফ জোড়ার অবদান কম নয়।

চোখে নিকেলের চশমা। দেখলে মনে হবে চলন্ত পিপের উপর যেন একটা ফুল সাইজ পাকা তাল কেউ রেখেছে। আর গলার আওয়াজ। হ্যাঁ আওয়াজ বটে। যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে কেউ কথা বলছে। ওই গোলগাল ভুঁড়িটি নানা অভিজ্ঞতায় ঠাসা। মাথাটা ছোট কিন্তু ওই মাথায় রকমারি বুদ্ধিও খেলে যায় অনায়াসেই।

নকুলমামা এসেছে পটলাদের বাড়িতে। সুন্দরবন তিনিও যাচ্ছেন। একটা নিশান জিপে করে যাব আমরা সন্দেশখালির এপারে ধামাখালি পর্যন্ত। সেখানে নকুলমামারা একটা কাঠগোলা বানিয়েছে। ঘর টরও আছে। নৌকার ডিপো। ওখানে বন থেকে মাল এনে খালাস করা হয় তারপর ট্রাকে করে কলকাতার করাতকলে কাঠ আসে।

আগে কলকাতা অবধিই নৌকা আসত সুন্দরবন থেকে, এমনকী অধুনা বাংলাদেশে যশোর খুলনা থেকে। এখনও সল্ট লেকের এদিকে কেষ্টপুর খাল তার চিহ্ন হিসাবে বয়ে চলেছে। আজকের মেট্রোপলিটান বাইপাস গড়ে উঠেছে সেই খাল বুজিয়ে।

নকুলমামা জিপে আমাদের পাঁচমূর্তিকে দেখে একটু অবাক হয়। আমাদের মালপত্রও উঠছে জিপে। আমরাও হাজির। নকুলমামা বলে-তোমারাও যাবে নাকি সুন্দরবনে? এ্যাঁ-ওখানে কি করবে?

ঠাকুমা বলে-তাই বলো নকুল? বললাম কাশী বৃন্দাবন যা-তা নয় বাদাবনে যাব।

পটলার কাকা বলেন-যাক, একটু দেখেই আসুক। নকুল কাকাবাবুকে চটাতে পারে না। সেও তৎক্ষণাৎ সুর পাল্টে বলে-তাই চলুক। ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজেদের কেউ যাওয়াই উচিত। চল দেখে আসবি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্টে দুটো পয়সা রোজগার করছি।

নকুলমামা যে খুশি হয় নি তা বেশ বুঝেছি।

ইদানীং গোবরাও নকুলমামার উপর খুশি নয়। অবশ্য গোবর্ধনের নিজের মামা নয়, গ্রাম সম্পর্কে মামা। গোবর্ধনের নিজের মামার বন্ধু। অবশ্য গোবরা বলে-নকুলমামা এখন ফরেনেও কুমড়ো চালান দিয়ে ভালো রোজগার করছে।

নকুলমামা জিপের সামনের সিটে আলো করে বসেছে। অবশ্য নকুলমামা ঠিক ফর্সা নয়। অর্থাৎ পাকা কুমড়োর মত নয় তবে চালকুমড়োর মত কালো অঙ্গে ধুলোর প্রলেপ পড়েছে। গোঁফগুলোর রং বদলেছে, ধুলোয় রঞ্জিত। আমরা পিছনের সিটে বসে চলেছি।

হোঁৎকা বলে-ফরেনে কুমড়ো কেউ খায়? গুল মারবি না গোবরা? ফরেনে কুমড়ো এক্সপোর্ট করছে?

গোবরা বলে-হ্যাঁ। বাংলাদেশ ফরেন নয়? মামা এখন ট্রাক ট্রাক কুমড়ো এখানে এনে নৌকায় করে নদীপথে বাংলাদশ পাঠাচ্ছে। সেখানে কত দাম জানিস?

হোঁৎকা বলে-হঃ, এবার বুঝছি ওই নকুলমামা সুন্দরবনে কাঠই নয়-কুমড়োর চালানও দিত্যাছে, তাই আসছে।

এককালে যে সেসব অঞ্চলে বন ছিল তা বোঝা যায়। এখনও নোনা গাং-এর আভাস মেলে, ক্রমশঃ লোকালয়ও আসে দূরে দূরে। ধূ ধূ মাঠ, মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তাটা গেছে। বর্ষায় সারা মাঠ ডুবে যায়।

ক্রমশ এসে পড়লাম বড়নদীর ধারে। বিস্তীর্ণ গাং, গাং নয় যেন সমুদ্রের খাড়িই, তার থেকে একটা বড় খাল বের হয়ে গেছে। এই দুই নদীর সঙ্গমে নকুলমামাদের কাঠের আড়ত, ওদিকে টিনের চালের ছাউনি দেওয়া গুদাম মত, তার পাশে কাঠের খুঁটির উপর উঁচু ঘর কয়েকটা। সিঁড়ি দিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

সাপ আর বন্যার প্রতিরোধ এমনি উঁচু টং-এর উপর ঘর। ওদিকে ওই খালের ধারে বেশ কিছু ছোট বড় নৌকা বাঁধা, কিছু নৌকা ডাঙায় তুলে মেরামত, রং-টং করা হচ্ছে। খালের মধ্যে একটা লঞ্চও রয়েছে।

পটলা বলে-ওটা কোম্পানির লঞ্চ। ছোট কাকাই ওটা কিনে দিয়েছে।

নকুলমামাকে দেখেছি আসার সময় দু'একটা গ্রামের মধ্যে জিপ থামিয়ে নেমে গেছে। স্থানীয় কিছু লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। একটা লোককে তো জিপেই তুলে নিল।

কালো লোকটা-ওর গালে একটা কাটার দাগ। লোকটা আমাদের দিকে চেয়ে কি যেন বলে মামাকে। ওর চাহনিটা কেমন যেন ধূর্ত শিয়ালের মত। চোখ দুটো ট্যারা।

হোঁৎকা বলে-ট্যারা লোক সুবিধার হয় না। হালা কুনদিকে চাইছে, কারে দেখছে তাও বোঝানের উপায় নাই। সঙ্গী, ওর উপর

নজর রাখতি হইব। কেস্ সুবিধার বুঝছি না।

পটলা বলে-বে-বেড়াতে চলেছিস 'এনজয়' কর, তা না তর সব তাতেই বারুদের গন্ধ পাওয়া চাই।

গোবরা বলে-কে জানে, নকুল মামা কি যে করে। কুমড়ো কাঠ বেচতে গেলে পাইকের, মহাজন সামলাতে হয় রে। তাই ওকে নিয়েছে। বাদাবনে যেতে গেলে সাবধান হতে হয়, ওরা এখানকার লোক-তাই নিয়েছে সঙ্গে।

স্থল পথ এবার শেষ হল, এই ধামাখালি ডিপোয় এসে আমরা জিপ খালি করলাম। ওদিকে নকুলামামা তখন খুবই ব্যাস্ত। লোকজন নিয়ে কাঠ-এর চালান দেখছে। সুন্দরবনে গাছ মাত্র কয়েক রকমেরই হয়। ওই দ্বীপগুলো জোয়ারের সময়, প্রায় সবই ডুবে যায় জোয়ারের জলে। নোনা জলে শাল ইত্যাদি সাধারণ গাছ হয় না।

এখানে জম্মে নাসিক্যমূল আছে এমনি সব গাছ। শিকড়গুলোর মাটি ভেদ করা তীক্ষ্ণ শূল এক, দেড়ফিট দুফিট উঠে থাকে মাটির উপর। মানুষ জন পড়ে গেলে তাদের অবস্থা হবে ভীষ্মের শরশয্যার মতই। গেঁথে যেতেও পারে। ওই নাসিক্যমূল থেকে বাতাস টেনে নেয় এখানের গাছ, খাদ্য আহরণ করে।

এই বনে তাই সুন্দরী, গরান, কেওড়া, বাইন, ধুন্দুল, গর্জন প্রভৃতি গাছই হয়। আর হয় হলুদ কালো হিতালের বন, কিছু গোলরাতার গাছও হয়। নারকেল গাছের মত ছোট ছোট ফলও হয়, ভিতরে জল থাকে। এই গোলপাতা দিয়ে ঘরও ছাওয়া হয় আবাদ অঞ্চলে।

বাইন কাঠের ছোট ফালি তক্তা দিয়ে চায়ের পেটি তৈরি হয়। ওই কাঠের চাহিদাও বেশি। গরান কাঠ ও মজবুত, এর ছাল এর 'কাথ' চামড়া ট্যান করতে লাগে। আর গরান কাঠে ব্রাশ এর হাতল আরও নানা কাজে লাগে। ধুন্দুল কাঠ লাগে উডপেন্সিল তৈরির কাজে। কাঠের চাহিদাও প্রচুর।

নকুলমামা এদিক ওদিক ঘোরে নিজের কাজেই ব্যাস্ত সে। আমরা নতুন এসেছি, কোথায় থাকব বনে যাবার কি হবে, খাওয়াদাওয়ার কি হবে এসবের কথা ভাবার সময় তার নাই।

পটলাকে বলি-এসব কি রে?

পটলাও চটে উঠেছে। ওদিকে কাঠের ঘরে তক্তপোশে বসে একজন লোক খাতাপত্র লিখছিল, আমাদের মা মরা বাছুরের মত অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে দেখে সেই বের হয়ে আসে।

পটলাদের বাড়িতে সে কয়েকবারই এসেছে। তাই দেখই চিনতে পারে। সেই-ই এগিয়ে আসে-আসুন, আসুন ছোটবাবু, শুনছিলাম বটে আপনি বেড়াতে আসবেন। তা নকুলবাবু তো কিছু বলেননি। আমিও ঘরে কাজ করছিলাম। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আসুন ঘরে আসুন চা-টা খান, তারপর থাকার ব্যবস্থা করছি।

তখন বৈকাল নামছে।দুপুরে খেয়েদেয়েই বের হয়েছি। অবশ্য দীর্ঘ পথের ঝাঁকনিতে সে সব উধাও হয়ে গেছে। লোকটি নিজেই নিজের পরিচয় দেয়-আমার নাম মদন নস্কর।

এখানের কাজকম্মো দেখি। হামিদ, পাকানিকে বলে আয় পাঁচখানা ডবল মামলেট আর পবার দোকানে টাটকা পাউরুটি থাকলে পাঁচখান আন, না হলে মুড়িই আনবি, সঙ্গে মণ্ডা-ফণ্ডা যা পাস। দৌড়ে যা।

ছেলেটার বয়স বেশি নয়। আমাদের বয়সিই। কালো বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। হামিদ দৌড়াল। মদনবাবুর ইঙ্গিতে এর মধ্যে জল এনেছে একজন। তেষ্টাও পেয়েছিল। মদনবাবু বলে-জল খান। খাবার আনছে। বাদাবন তবু তো এখন যাত্রীটাত্রী আসে বাসে কিছু মেলে, তাও সব সময়ে নয়।

এর মধ্যে হামিদই দৌড় ঝাঁপ করে ওমলেট পাউরুটি চা এসব এনেছে। চা-টা খাচ্ছি এর মধ্যে মদনবাবু উঠে গিয়ে লোকজন

নিয়ে আমাদের মালপত্র ওদিকের একটা ঘরে তুলে এবার আমাদের ডেকে নিয়ে যায়।

উঁচু পাটাতনের উপর ঘরটা। কাঠের দেওয়াল, মেজেও কাঠের, জানালা খুললেই দেখা যায় গাং-এর বিস্তার। বিকালের সূর্যের রং এখন বেগুনি রং-এর ধারায় পরিণত হয়েছে।

হামিদই আমাদের দেখাশোনার কাজে লেগেছে। ছেলেটা বেশ চটপটে। এর মধ্যে বিছানা করে খাবার জলও এনেছে কুঁজোয়। এখানের অনেক খবরই দেয় সে বাদাবনের নৌকাতেও গেছে, নিজেও নৌকা বাইতে পারে।

ঘরে থিতু এবার বের হই আশপাশে ঘুরতে। ওদিকে বেশ লম্বা একটা গুদাম, ওখানে এদের মালপত্র থাকে, ওদিকে গিয়ে দেখি কুমড়োর টাল।

গোবরা কুমড়ো বিশারদ, সেই-ই বলে-নকুলমামা দেখি এখানেও এত কুমড়ো স্টক করেছে। কাঠ আর কুমড়ো-ডবল লাভ।

হামিদ বলে-ইখানে নৌকা বোঝাই হয়ে কুমড়ো আসে বাংলাদেশ থেকে।

আমরা অবাক হই। এদেশে এত কুমড়ো তবু এত কুমড়ো আসে বিদেশ থেকেও। দেখি নকুলমামা ওদিকে নদীর ঘাটে ব্যস্ত একটা বড় নৌকা থেকে কুমড়ো নামছে।

হঠাৎ আমাদের ওখানে দেখে একটু অবাক হয়।

-তোমরা? এখানে?

আমিই বলি-বেড়াতে বের হয়েছি।

-তা ভালো। ঘুরে টুরে দ্যাখো। তবে কি দেখবে? দেখার কি কিছু আছে। এই গাং আর কাদা। হ্যাঁ-গাং-এ নেমো না। জল পর্যন্ত ছোঁবে না নদীতে, যা কামটের রাজ্যি।

কামট এর নামই শুনেছি।

হামিদ বলে-না-না। পানিতে নামতে দিব না বাবুদের।

নকুলমামা বলে-আর সন্ধ্যার মুখেই ফিরবে বুঝলে পটল বাবজি। এখানে মা মনসার রাজ্যি। সব একেবারে জাত কুলীন। গোখরো-চন্দ্রবোরা-খুব সাবধান।

সরে আসি। ও চায় না আমরা বেশি ঘোরাঘুরি করি। আর প্রথম থেকেই দেখছি নকুলমামা আমাদের আসার বিপক্ষেই কথা বলছে।

আমরা চলে আসতে দেখি নকুলের সেই সহচরও একটা নৌকা থেকে নেমে ওর কাছে আসে আর আমাদের দেখিয়ে কি যেন বলছে।

শুধোই, ওই ট্যারা লোকটা কে রে হামিদ?

হামিদ বলে-ওই তো নোটন শিকারি, বাদাবনে, গাং-এর মুলুকের গুনীন। ও অনেক মন্তর তন্তর জানে। দেহবন্ধন, বনবন্ধন, বাঘের মুখবন্ধন সব। নকুলবাবুর ওই কুমড়োর নৌকা যা আসে ওইই আনে ওপার বাংলা থেকে। যা বন্দুক চালায় ও-আশমানের পাখিকে পেড়ে ফেলে। অর্থাৎ লোকটার গুণ অশেষ, আর নকুলবাবুর ও যে খুবই বিশ্বস্ত তা মনে হয়।

হোঁৎকা বলে-কেস জনডিস্ মনে লয়।

হামিদ বলে-কিছু কইলেন বাবু? ও কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি। হোঁৎকা বলে-না, কিছু কই নি, চল!

ওদিকে নৌকা মেরামত, রং করা হচ্ছে। খালের মাঝখানে লঞ্চটা নোঙর করা। ওতে নৌকায় করে মালপত্র নিয়ে গিয়ে তোলা হচ্ছে।

সন্ধেবেলাতে মদনবাবু ঘরে এসে বলে-আজকের রাত কালকের দিনটা এখানে থেকে, কাল রাতের ভাঁটিতে বের হবেন জঙ্গলে। আমাদেরও রসদপত্র যাবে, খাবার জল যাবে। মালপত্র রেডি করে নেবে কালই।

এবার নকুলবাবুর দেখা মেলে। অর্থাৎ তার ব্যবসাপত্র সামলে এতক্ষণে লোকটার ফুরসত মিলেছে। ওর ঘরটা ওদিকে। এবার নকুলবাবু পোশাক বদলে আসে টর্চ হাতে আমাদের ঘরে। বলে-ও এখানেই থাকার ব্যাবস্থা করেছে ম্যানেজার? কিন্তু এটা তো বসন্তবাবুর ঘর! এখানে তুললে? অর্থাৎ এই ঘরে তোলাটাও ওর পছন্দ হয়নি। কিন্তু ম্যানেজার মদনবাবু বলে-বসন্ত বাবুর ভাইপো ওদের তাই এখানেই রেখেছি। কাল রাতের ভাটিতেই লঞ্চ ছাড়ব ভাবছি বনে যাবার জন্য।

নকুল বলে-কাল রাতে? আমার যে এক চালান মাল আসার কথা। দুশো মণ কুমড়ো আসবে।

মদনবাবু বলে-মাল এলে লোকদের বলে যাব, তারা গুদামে রাখবে।-না-না। আমাকেই থাকতে হবে। অবশ্য আজ রাতে যদি এসে যায় মাল তাহলে গোলমাল হবে না। ট্রাকও আসবে আজ রাতেই তাহলে মাল কলকাতায় পাঠাতে হবে।

মদনবাবু বলে-কাল রাতে লঞ্চ না ছাড়লে বনে কাঠের কাজে যারা রয়েছে তাদের খাবার, জল-এর টান পড়বে। কাল যেতেই হবে।

ম্যানেজার চলে যায়।

নকুলবাবু এবার বলে-কেন যে বনে যাচ্ছ। এখানেই দু-চার দিন থেকে নদীর মাছ-টাছ খেয়ে কলকাতা ফিরে যাও। বনে বিপদ, কষ্ট।

হোঁৎকা বলে-তার জন্য ভাবতি হইব না। এতদূর আইছি বন দেইখাই যামু।

নকুল বলে-অ! যাবেই? ঠিক আছে। শোন-এখানে বাঘ কুমির ছাড়াও ডাকাতের ভয়ও খুব। রাত বিরেতে হুট হাট বাইরে যাবে না। ঘরের মধ্যেই থাকবে।

উপদেশ দিয়ে চলে যায় মামা।

গোবরা বলে-তখন থেকে আমাদের পিছু লেগেছে কেন রে?

ফটিক বলে-আমাদের জন্য বেশি ভাবেন ভাই। হোঁৎকা কিছু বলে না।

রাতে ম্যানেজারবাবু আমাদের জন্য টাটকা পারশে মাছের ঝোল, ভেটকির কালিয়া করিয়েছে। নকুলমামা বলে-চিংড়ি পাওনি হে মদন?

মদনবাবু বলে-সকালে রামপুরে হাটে পাঠাব। আমাদের পুকুরে দেখব।

নকুল বলে-কলকাতার বাবুদের খাওয়াও আদর করে। হবু মালিক।

পটলার উদ্দেশেই কথাটা যেন রসিকতা করেই বলেছে। আমরা চুপ করেই থাকি।

রাত নেমেছে। বাতাসে ওঠে ঢেউ-গর্জন।

ঝড়ো হাওয়া বয়। চারিদিক অন্ধকার। ওর মধ্যে দেখি ওদিকে নদীর ঘাটে ছায়ামূর্তির দল কি কাজে ব্যস্ত। বড় নৌকা থেকে মালপত্র নামছে। অন্ধকারেই ওরা মাল তুলছে গুদামে।

হোঁৎকার ডাকে এগিয়ে আসি, জানলার বাইরে গাং-এ ওদের কাজকর্ম চলছে দ্রুতগতিতে। নকুলবাবুর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

-তাড়াতাড়ি মাল খালাস করে নৌকা ছেড়ে দে!

হোঁৎকা বলে-অন্ধকারে কি হয় রে এখানে?

আমিও সঠিক জানি না, তাই বলি-কে জানে।

কিচ্ছুক্ষণের মধ্যে ঘাটের ব্যস্ততা কমে যায়। লোকদেরও আর দেখা যায় না। সব যেন ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের ঘুম নাই।

হোঁৎকা বলে-চুপ মাইরা চল। কেসখান দেইখা আসি।

গোবরা বলে-নকুলমামা বলেছিল ডাকাতের ভয়!

হোঁৎকা বলে ওঠে-থো ফালাইয়া তর নকুলমামার কথা। চল তো।

অন্ধকারে আমরা বের হয়েছি পাঁচমূর্তির দল। ক্যাম্প-এর সবাই শুয়ে পড়েছে। নৌকাগুলো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। হোঁৎকা এগিয়ে যায় গুদামের দিকে। দরজাটা ভেজানো।

ভিতরে কুমড়োর স্তূপ। তার ওদিকে মোমবাতি জ্বেলে নকুলবাবু উবু হয়ে বসে কুমড়ো নিয়েই নাড়াচাড়া করছে। হোঁৎকা বলে,

-ওখানে কি করতিছে?

হঠাৎ পিছনে দু তিনজন আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। ওদের অতর্কিত আক্রমণে আমি ফটিক ছিটকে পরেছি। লোক দুটো আমাদেরই ধরতে চায়। কিন্তু হোঁৎকা গোবরা আর পটলারা বের হয়েই কয়েকটা গরান-এর কাঠ হাতে তুলে নিয়েছিল। আমাদের লাঠি ও ছিটকে পড়েছে। কিন্তু ওদের লাঠির আঘাতেই আক্রমণকারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ওরা বেদম পিটছে লোকদুটোকে। তারাও বিপদ বুঝে সরে পড়ে। এবার ছাড়া পেয়ে আমরা সরে আসি নৌকার পিছনে। দেখি নকুলবাবুও ওই শব্দে বের হয়ে আসে। কাকে যেন বলে-কি ব্যাপার? গোলমাল শুনছিলাম?

সেই নোটনই বলে-কারা যেন এদিকেই এসেছিল? গুদামের দরজায় দেখলাম।

-সেকি! কারা? ধরতে পারলি না তাদের? নকুলবাবু গর্জে ওঠে। -সব পালালো!

নকুলবাবু বলে-চারিদিক নজর রাখ! তখনই বলেছিলাম, হুঁশিয়ার থাকবি। কি যে করিস?

আমরাও ততক্ষণে ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করে নৌকার আড়াল দিয়ে হামাগুড়ি মেরে এদিক ওদিক ঘুরে এসে নিজেদের ঘরে ঢুকেছি।

গোবরা বলে-কিছু একটা ব্যাপার আছে।

হোঁৎকা বলে-গন্ধ আমিও পাইছি। তয় ঠিক বুঝতে পারছি না। নজর রাখতি হইব ওই মামার উপর। গোবরা ও তর শকুনি মামারে। শোন, লাঠিগুলান সাথেই রাখ, কাজে দিব।

শুয়ে পড়ি। রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘরের মেঝেতে ঢালা ফরাস পাতা। তাতেই পাঁচজন শুয়েছি। দিন ভোর ধকল গেছে, রাতেও, শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি।

হঠাৎ মনে হয় ঘরের মধ্যে ছায়ামূর্তির পদধ্বনি। চোখ মেলে দেখি অন্ধকার ঘরের দরজাটা খোলা। হাওয়া ঢুকছে আর এদিকে কাঠের মেঝের উপর কাদের পায়ের শব্দও শোনা যায়। মনে হয়, আমাদেরই কেউ উঠেছে বোধ হয়। তারপরই দেখি ধস্তাধস্তি চলেছে। পটলাকেই ধরেছে ওরা।

একজন বলে এটাকেই তুলে নে চল কর্তার হুকুম।

পটলার মুখ চেপে ধরেছে ওরা। হোঁৎকা-গোবরা ওদিকে ঘুমুচ্ছে। আমিও ব্যাপার দেখে চুপচাপ বের হয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধকরে শিকল তুলে দিয়ে চিৎকার করতে থাকি।

-চোর-চোর-ডাকাত-ডাকাত!

ক্যাম্পের লোকজন জেগে উঠেছে। ওদিকে ঘরের মধ্যে বন্দী লোকদুটোও এবার ব্যাপার বেগতিক বুঝে শিকার ফেলে পালাতে চেষ্টাই করে, কিন্তু ততক্ষণে ভিতরে হোঁৎকা, গোবরাও জেগে উঠেছে। হাতে তাদের লাঠি-ছায়ামূর্তি দুটোকে তারাও দুচার ঘা কসেছে।

বাইরেও লোকজনের গলা পাওয়া যায়। বন্দী লোকদুটো এভাবে জালে পড়বে ভাবতে পারেনি। তারা মরিয়া হয়ে জানলার দিকে ছুটে যায়। পলকা জানলার শিক-ওদিকে পিঠে তখন লাঠিও পড়ছে, বাইরেও মাঝি বাওয়ালিরা ছুটে আসছে। তারা জানলার শিক কোনরকমে বেঁকিয়ে ওরই ফাঁকে গলে নীচে লাফ দিয়ে পড়ে গাং-এর দিকে দৌড়াল।

পিছনে কে তাড়া করে-ধর, ধর!

দরজা খুলে এবার আমি ওদের বাইরে আনি।চোরদের ধরা যায় না। অন্ধকারে প্রাণের দায়ে দৌড়ে তারা তখন পগারপার।

ম্যানেজার এসে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর নকুল মামা গোলগাল শরীর নিয়ে এসে হাজির হয়-কি ব্যাপার?

ম্যানেজার গর্জাচ্ছে-ধরতে পারলি না ওদের?

হামিদ বলে-দৌড়ালাম পিছু পিছু কোথায় সটকে গেল।

নকুলমামা এবার মুখ খোলে। ধরতে পারলি না? অকম্মার দল। আমাদের বলে-বলিনি, এসব ডাকাতের রাজ্য। ঘরে এসে হানা দেয়। সাবধানে থাকবে।

নকুলবাবু আবার উপদেশ দিয়ে চলে যা-

বাকি রাতটা ঘুমোতে পারি না। হোঁৎকা বলে-পটলকে তুলে নিতে আইছিল ওরা? আমি জানাই-তাই মনে হল।

হোঁৎকা বলে-নাটক জমছে। তয় শেষ দেইখা ছাড়ুম। দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

ফটিক বলে-ভেবেছিলাম শান্তিতে একটু আলাপ করব রাগ রাগিণীর, যা শুরু হল প্রথম থেকে গান মাথায় উঠবে মনে হচ্ছে।

হোঁৎকা বলে-তুই গান গাঁ। তর ওই 'মেরি সইয়া' ওই গান পইচা গেছে। অন্যগান গাইবি কয়ে দিলাম।

দিনটা ভালোই কাটল।

মদন বাবু আমাদের দিকে এবার বিশেষ নজর রেখেছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া ভালোই হল। সামনেই নোনা জলের পুকুর হামিদই জাল ফেলে তাজা পারশে, ভেটকি, বাগদা চিংড়ি ধরে।

নকুলমামা বলে-হ্যাঁ। চিংড়িটা ভালোই রেঁধেছ পাকানি। দাও, বাবুদের দাও। কলকাতায় এ জিনিস মেলে না। খাও-ওর কথার স্বরেও বিদ্রূপের ছোঁয়া।

বৈকালে বের হয়েছি। ওদিকে ডিঙি গুলো রাখা, দেখি ওই নোটনও সেখানে রয়েছে। আমাদের দেখে বলে-আজ রাতেই বের হবেন তো!

-হ্যাঁ।

নোটন বলে-তারই ব্যবস্থা করছি। অ্যাই ডিঙি মজুত রাখবি। বাবুদের লঞ্চ তুলে দিতে হবে।

ওদিকে নৌকা ঘাটায় বড় বড় জালায় টিউবওয়েলের জল তোলা হচ্ছে। বনের মধ্যে যারা কাজ করছে তাদের জন্য চালের বস্তা, ডাল, সরষের তেলের টিন, মায় পেঁয়াজ লঙ্কা, কুমড়ো-মুলো এসব উঠছে। তামাক-বিড়ির পেটি, নানাকিছু নিয়ে যেতে হয়। সেখানে কিছুই মেলে না। সেইসব মাল তোলা হচ্ছে নৌকায়।

হঠাৎ ওদিকে একটা লোককে দেখে চাইলাম। কপালে তাজা ক্ষত, তাতে চুন লাগানো, লোকটা লেংড়ে হাঁটছে। হঠাৎ আমাদের দেখে সে নৌকার আড়ালে বসে পড়ল আমাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই।

আমিই এগিয়ে যাই, লোকটাকে যেন কাল রাতে দেখেছি, কিন্তু নৌকার ওখানে গিয়ে আর দেখা পাই না। হোঁৎকা বলে-ওখানে কি করস অ্যাই সমী?

এসে বলি-ওই লোকটা কাল ঘরে ঢুকেছিল। মাথায় লাঠির ঘা পায়েও চোট আছে।

-তাই নাকি!

-কিন্তু কোথায় পালালো নৌকার আড়ালে।

গোবর্ধন বলে-বুঝলি ভূত এই সরষের মধ্যেই রয়েছে।

হোঁৎকা বলে-ধরতে পারলে ভূতের বাবার পাত্তাও বাইর করুম। কিন্তু ধরাই গেল না তাকে।

সন্ধ্যার পরই বের হবার তোড়জোড় শুরু হয়। লঞ্চটা খাল-এর ভিতরে গভীর জলে রয়েছে। ওখানে আমাদের জন্য তোষক, কম্বল, বালিশ সব পাঠানো হয়েছে। খাবার-দাবারও তোলা হয়েছে। সাত দশদিন থাকতে হবে লঞ্চে। তার জন্য সবই নিতে হয়েছে।

এবার আমরা গিয়ে ওই লঞ্চে উঠে শুয়ে পড়ব। ভাঁটা আসবে মাঝরাতে। তখন যাত্রা শুরু হবে।

নকুলমামা তখন ব্যস্ত। বলে-তোমরা লঞ্চে উঠে আরাম করে শুয়ে পড়ো। আমি এদিকের সব ঝঞ্ঝাট সামলে লঞ্চে উঠব। ছাড়ার মুখে কত কাজ আমার। এর মধ্যে ট্রাকও এসে গেছে মামার। নিজে ওই নোটন আরও কিছু লোকজন নিয়ে ট্রাকে কুমড়ো তুলছে। মাঝে মাঝে হাক পাড়ে-সাবধানে লোড করবি কুমড়ো। বরগুলো নীচে দে। নিজে ট্রাকে উঠে কুমড়ো বোঝাই করা দেখছে। মধ্যে ম্যানেজার মদনবাবুও নিজে থেকে কিছু কুমড়ো তুলে দেয়। নকুলমামা বলে-সাবধানে নে যাবি। আর কলকাতার আড়তের সরকার বাবুকে বলবি এই লটের কোনো মাল আমি না ফেরা অবধি যেন না হয়।

মদন অর্থাৎ ম্যানেজার বলে-আপনি নিশ্চেন্তে বলে যান। এই চালানের সঙ্গে আমিই যাব কলকাতায়। সরকারকে সব বলে কয়ে আসব। ভাববেন না।

লোকটা খুবই কাজের। এত বড় কাঠের কারবার, এত নৌকা, তার মাঝি, কাঠুরিয়াদের সে একাই সামলায়। আমাদের জন্যও সব ব্যবস্থা নিখুঁত করে রেখেছে।

ভাটার টান। গাং-এর জল অনেক নীচে নেমে গেছে। এখন এক হাঁটু কাদা ভেঙে ডিঙিতে উঠতে হবে। সেই ডিঙি নিয়ে যাবে আমাদের লঞ্চে। শীতের রাত। কাদাও ঠান্ডা বরফ, জলও।

পটল বলে-কাদা ভেঙে যেতে হবে?

নকুলমামা বলে-কি হে ম্যানেজার, কলকাতার বাবুদের নে ফ্যাসাদ হল যে। কাদা ভাঙবে না সুন্দরবন দেখতে যাবে?

ওদিকে কয়েকটা ডিঙি তোলা আছে, মদনবাবু বলে কি ভেবে-ওই ডিঙিতে উঠে বসুন আপনারা।

নকুলের সঙ্গী নোটনই বলে-তাই ভালো। আসেন বাবুরা। অ্যাই হামিদ তুই বৈঠা নে বোস। ওই ডিঙি ঢালু কাদায় ঠেলে দিই, গাং-এ পড়লে তুই বাবুদের নিয়ে যাবি লঞ্চে।

নীচে ঘাটে হ্যাজাক জ্বেলে অন্য নৌকায় রসদপত্র উঠছে। আমরা শুকনো ডাঙায়, ডিঙিতে চেপে বসলাম। সামনে খুবই ঢালু গভীর নদীর বুক, কাদায় থিকথিক করছে।

ওরা ঠেলে নৌকাটাকে উপরে কাদার মুখে এনে জোরে ঠেলতেই নৌকাটা মহা কাদায় পড়ে গভীর ঢালু পথে তীব্র গতিবেগ নিয়ে এসে জলে পড়ে। জায়গাটা বড়নদী আর ওই খালের মোহানা। ভাটার সময়েও জল বেশ গভীর আর দুই নদীর মোহানায় তাই চোরা স্রোতও আছে। নৌকাটা তীর বেগে এসে নদীতে পড়েছে। হামিদ তখনও হাল ঠিকমত লাগাতে পারে নি, নদীর সঙ্গমে চোরা স্রোতের আবর্তে নৌকাটা ঘুরছে, দূরে লঞ্চটা দেখা যায়, এদিকে ঘাট থেকেও বেশ দূরে এসে গেছে নৌকাটা।

হঠাৎ আবিষ্কার করি জুতো ভিজে গেছে। নীচের দিকে চেয়ে দেখি নৌকার তলাটার কয়েকটা তক্তার জোড় খুলে আছে আর সেই পথ দিয়ে ফোয়ারার মত গাং-এর জল চারিদিক থেকে ঠেলে উঠছে নৌকায়।

চিৎকার করি-নৌকার ফুটোয় চারিদিকে জল উঠছে। হামিদও বিভ্রান্ত। পটলা হোঁৎকা চিৎকার করে-নৌকা ডুবছে।

গোবরা হাঁক পাড়ে-নকুলমামা। আমরা ডুবে যাচ্ছি। নৌকা ডুবছে। গহনগাং, কুমির কামটের আস্তানা। মাঝে মাঝে কুমির এখানে ডাঙার কাছে এসে গরু বাছুরকে ল্যাজের ঝাপটায় গাং-এ ফেলে নিয়ে চলে যায় নদীর অতলে।

কামটের ঝাঁক হাড় থেকে ধারালো দাঁত দিয়ে মাংস কুরে কুরে নেয়। এখানে জলে পড়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। সামনে সেই মৃত্যুর বিভীষিকা, নৌকার খোল প্রায় সিকিভাগ জলে ভোরে গেছে। আর মিনিট কয়েকের মধ্যে হিমরাতে আমরাও জলের অতলে তলিয়ে যাব নৌকা সমেত।

আমাদের ডাকাডাকি চিৎকারে ডাঙার মাঝিদের খেয়াল হয়। ওরা দুদিক থেকে দুখানা নৌকা নিয়ে আসছে আমাদের ডুবন্ত নৌকার দিকে। জল তখন হাঁটুর কাছাকাছি এসে গেছে। হিমশীতল স্পর্শ, এদিকে নদীর অতল গহ্বর, ওপাশে অন্ধকার নদীর বিস্তার।

যা হোক কোনমতে ওরা দুখানা ডিঙি দুদিক থেকে এনে আমাদের হাত ধরে টেনে তোলে দুদিকের নৌকায়। আমাদের ফুটো নৌকাটা তখুনিই জলভর্তি অবস্থায় অতলে তলিয়ে গেল চোখের সামনে।

ওই ডিঙি দুটোই আমাদের এনে লঞ্চে তুলে দেয়। তারপর থিতু হয়ে বসে এবার ওই চরম বিপদের কথাটা ভাবছি।

পটলা বলে-জো-জোর বেঁচে গেছি।

হোঁৎকা বলে-তা তো বাঁচছি, কিন্তু জাইনা শুইনা আমাগোর ওই ফুটা নৌকায় উঠতি দিল ক্যান?

প্রশ্নটা আমারও। কিন্তু এর কোনো উত্তর পাই না।

গোবরা বলে-ওরা হয়তো জানে না, ফুটো ডিঙি ওগুলো, মেরামতের জন্য তোলা ছিল। তাতেই উঠেছিলাম।

কিন্তু আমারও কেমন সন্দেহ হয়। এসে অবধি দেখছি কেউ বা কারা বারবার আমাদের বিপদে ফেলতে চাইছে। বারবার তারা আক্রমণ করেছে আমাদের। যদিও কিছু করতে পারে নি। তাই বোধহয় জেনে শুনেই প্ল্যান করেই আমাদের শেষ করতে চেয়েছিল এই ভাবে। আমি বলি-আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছে হোঁৎকা। পটলা, তোদের এখানে অনেক কিছুই হয় যেটা আর কেউ দেখুক এরা চায় না। আমরা যদি কিছু দেখে ফেলি তাই পদে পদে ওরা বাধা দিচ্ছে।

পটলা বলে-ক-করেকট। কিন্তু এর শেষ দেখতেই হবে সমী, হোঁৎকা।

হোঁৎকা বলে-ক্ষুধা পাইছে। এর একসাইটেড হলি আমার ক্ষুধা পায়। কিছু খাই লই। তারপর ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করনে লাগবো। হোঁৎকা সামনে একটা পাঁউরুটি আর জেলির কৌটা দেখে সেটার সৎকারে লেগে যায়।

আমি বলি-হোঁৎকা এখন জলপথে চলেছি। সুন্দরবন বলে কথা, খাবার জল অবধি রেশন করা-বেশি খাস না।

হোঁৎকা আমার কথায় কান দেয় না। পাঁউরুটি চিবিয়ে চলে। গোবরা ওদিকের ডেকে আমাদের বিছানার ব্যবস্থা করছে। বলি-ওরা তো গাং-এর অতলে চিরবিশ্রামের সুযোগই করে দিয়েছিল। এখানে তুই-ই কর।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙে লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দে আর লঞ্চের দোলানিতে। চেয়ে দেখি লোকালয়ের চিহ্ন আর নেই। বিশাল গাং-এর বুক চিরে লঞ্চটা চলেছে। ফিকে কুয়াশার জাল বিছানো নদী।

লঞ্চের শব্দে জলচর পাখি ঝাঁক উড়ে যায়। পুব আকাশ লালে লাল। দূরে ঘনবনের মাথায় সূর্য উঠছে। শান্ত গাং-সভ্যজগৎ থেকে আমরা দূরে সুন্দরবনের সীমানায় এসে গেছি।

লঞ্চের পিছনে বাঁধা দু তিনটে বড় নৌকা। জল, রসদপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে বনের গভীরে পড়ে থাকা কাঠুরিয়াদের উদ্দেশে।

পটলার ঘুম ভেঙে গেছে ছাদের উপর থেকে লঞ্চের ইঞ্জিনের ধকধক শব্দ ছাপিয়ে ভেসে ওঠে ফটিকের সেই গান-মেরে সইয়া। তিন বছর ধরে ওই এক লাইনই গাইছে। গান তো নয় যেন সুরকে ধারাল চপার দিয়ে কিমা বানিয়ে চলেছে।

পটলা লঞ্চের বাইরে চেয়ে বলে-বি-বিউটিফুল! সুন্দর।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে-মার্ডার করুম। এক্কেবারে শ্যাষ কইরা দিমু।

-কাকে? শুধোই আমি।

হোঁৎকা বলে-তগোর ওই তানসেনের বাচ্চা ফটিক সেনেরে।

এমন সময় শোনা যায় জোরালো স্বরে খোল কর্তালের বাদ্যি-তারপরই শুরু হয় একদল লোকের সুরে বেসুরে উদ্দাম চিৎকার-হরি বোল-হরিবোল-হরিবোল বল ভাই।

এই দূর সমুদ্রঘেষা সুন্দরবনের নির্জন ফাঁড়িতে হঠাৎ উন্মত্ত কেত্তন শুনে চাইলাম। এবার দেখি লঞ্চের সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামছে গোল পিপের মত দেহখান নিয়ে নকুল মামা। ইয়া গোঁফ জোড়া আর পালংশাক হেন দুই ভুরু নাচিয়ে বলে-বুঝলে গুরুদেব বলেন শত কাজের মধ্যেও সকাল সন্ধ্যা নামকীর্তন শুনলে দিন ভালো যায়। আহা-সুধামাখা হরিনাম হে, শোন।

একজন বিকট হেঁড়ে গলায় নাম করছে-হরিবোল-আর তারপরই একপাল লোক কলকণ্ঠে নাম গর্জন করে চলেছে। টেপ রেকর্ডারে বাজছে ওই নামব্রহ্ম নদীর বুক কাঁপিয়ে। নকুল মামারও ভক্তির জোয়ার এসেছে। নেহাৎ শব্দদূষণের কানুন, এখানে নেই। তাই রক্ষে। কিন্তু ওই নামসুধা আমাদের কাছে বিষবৎ হয়ে উঠেছে। নকুলমামা বলে-শোন, হরিনাম কানে গেলে পুণ্য হয়।

হামিদ এর মধ্যে চা করে এনেছে, স্টকে বিস্কুট ছিল। ওই দিয়েই চা পর্ব সারি।

এবার লোকালয়ের সীমা পার হয়ে লঞ্চ ঢুকছে আদিম অরণ্য জগতে। ধু-ধু গাং, সীমা নাই।

সারেং কাশেম মিঞা বলে-ওই দেখেছেন নদীর ওদিকেই বাংলাদেশ। অর্থাৎ সীমান্ত দিয়েই চলেছি আমরা।

নকুলমামা তখন চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে নামসুধা পান করে চলেছেন।

বড় গাং-এর বুক চিরে চলেছি। দুদিকে ঘনবন। হলুদ কালো হিজল, কেওড়া গাছ, সবুজ বাইন, গোলপাতার জঙ্গল, মাঝে মাঝে একটু ফাঁকা চরের মত দেখা যায় নদীর বাঁকে। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ হরিণের পাল চরছে, কাছেই বনের শুরু। গাছে গাছে বাঁদরের জটলা। কেওড়াগাছের পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য, আর বানরগুলো ওই গাছে বসে ফল, পাতা খায়, ডালপাতা ভেঙে নীচে ফেলে হরিণগুলো তারই লোভে বানরের পালের সঙ্গেই থাকে। ওই দুই শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে একটা মিতালীর বন্ধন গড়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে গাছের ডাল থেকে দু'একটা বাঁদর হরিণের ঘাড়ে পড়ে আর ঘোড়ার পিঠে চাপার মত ভঙ্গিতে বসে পড়ে, হরিণটাও ওকে পিঠে নিয়ে দৌড়তে থাকে। একচক্কর দৌড়ে যেন সার্কাসের খেলা দেখিয়ে হরিণের পিঠ থেকে আবার গাছের ডালে এসে বিরাজমান হয় বাঁদরটা।

লঞ্চ চলেছে। দুদিকে বনভূমি, বড় নদী থেকে একটা বড় খাল বের হয়ে গেছে। জোয়ারের জলে ফুলে ওঠে আবার ভাটার টানে তাদের বুকে জেগে ওঠে পলিকাদা, গাছগুলো নুইয়ে পড়েছে খালের উপর। সবুজ হলুদ বন, কে যেন বাগানের মত করে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। তাই মনে হয় সুন্দরবন যেন সত্যই সুন্দর বনই।

একটা পত্রহীন গাছ দেখা যায়। মরা ডাল থেকে লম্বা লম্বা কি ঝুলছে বড় ডাঁটার মত। পাতা নেই-শুধু ওই ঝুলন্ত ডাঁটার সমাবেশ। শুধোই সারঙ্গকে-ওটা কি গাছ। এত ডাঁটা ঝুলছে মোটা মোটা?

সারেং কাশেম মিঞার সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়ে গেছে। বয়স্ক বেশ ভদ্র মানুষ কাশেম মিঞা। ও বলে-ওটা? দাঁড়াও দেখাচ্ছি, কাশেমকে বনে বাদাড়ে ঘুরতে হয়, ওরা সঙ্গে দু দশটা চকোলেট বোমার মত পটকা রাখে।

বাদাবনের বাঘকে ভয় দেখাবার জন্যও ওটার দরকার। সেই পটকায় আগুন দিয়ে লঞ্চ থেকেই কাছাকাছি বনের দিকে ওটা ছুড়ে দেয়, আকাশে পটকাটা সশব্দে ফেটে যায়, অবাক দৃশ্য? ডাঁটাগুলো ওই আওয়াজ শুনে সজীব হয়ে ওঠে আর নিমেষের মধ্যে তারা ডাল ছেড়ে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ডাল আবার শূন্যপ্রায় হয়ে যায়।

কাশেম মিঞা বলে-ওসব বুনো সাপ, জলে বন ডুবে যায় তখন ওই ভাবেই গাছে আশ্রয় নেয়। আওয়াজ পেতেই সব সরে গেছে।

নকুলমামা ততক্ষণে হরিবোল-এর ক্যাসেট থামিয়ে কি সব হিসাবনিকাশ লিখতে ব্যস্ত। আমার কথায় বলে-বলিনি, এখানে পদে পদে বিপদ। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, বনে সাপ আর-

-আর কি?

আমার কথায় নকুলমামা বলে-থাক! ত্যানাদের মুখোমুখি যেন না হতে হয়।

হোঁৎকা পটলারা নীচের থেকে তখন ক্লাবের ফুটবল টিম নিয়ে জোর তর্ক শুরু করেছে। লঞ্চের পিছনে রান্নার জায়গা। হামিদ আর একটা ছেলে দুজনে রান্নার যোগাড় করছে। বন আর বন, বড় নদী ছেড়ে একটা বড়খালে ঢুকেছি। বনকে দেখতে পাই আরও কাছ থেকে। খুব ঘন আর দুর্ভেদ্য, মাটিতে তীরের ফলার মত মূলগুলো উঠে রয়েছে। পা পড়লে গেঁথে যাবে।

ঘন হেঁতাল বন। হলুদ কালো ছায়া ঘন ঝোপ।

হামিদ বলে-এখানেই বড় শিয়ালরা থাকে। বাঘকে এরা বড়শিয়ালই বলে।

লঞ্চের পিছনে দুখানা বড় নৌকা তাতে রসদপত্র খাবার জল চলেছে। হঠাৎ বাঁকের মাথা থেকে একটা ছোট লম্বামত নৌকা খান কয়েক দাঁড় ফেলে ঝপ্‌ঝাপ করে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে।

এতক্ষণ কাছাকাছি কোনো নৌকা দেখিনি। মানুষের দেখাও পাইনি। এবার মানুষ দেখছি বনের গভীরে। রোদে জলে ওদের দেহের বর্ণ তামাটে, কিন্তু বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ। মাথায় গামছা বাঁধা, খালি গা, দু'একজনের গায়ে ফতুয়া, গেঞ্জি, তবে সেগুলো কোনকালে সাদা ছিল তা বলা মুশকিল।

নকুলমামাই বলে-সারেঙ্গভাই।
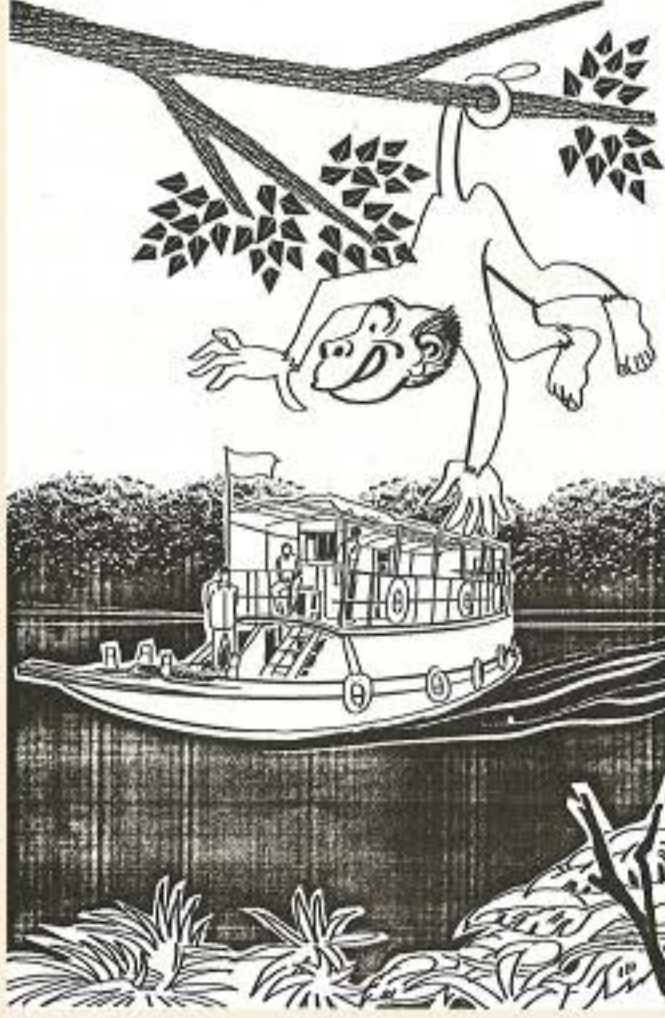
কাশেম লঞ্চের স্টিয়ারিং হাতে চাইল ওর দিকে। ওই নৌকা থেকেই লোকগুলো দেখছে আমাদের সারেঙ্গ লঞ্চের গতিবেগ বাড়িয়ে হর্ণটা বাজাতে থাকে।-সেই শব্দ বনে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। বেগে লঞ্চটা বের হয়ে গেল-ওরা নৌকাটা নিয়ে ওদিকে বনের মধ্যে একটা ছোট খালে ঢুকে গেল।

নকুলমামা নেমে এসে কখন পিছনের বাথরুমে অর্থাৎ কাঠের বেড়া দেওয়া ঝুলন্ত একটা খুপরি, শৌচকার্য সেখানেই সারতে হয় কোনমতে। মামাকে ওখান থেকে বের হতে দেখি। নকুলমামা কখন ওখানে সেদিয়েছিল জানি না। ওখান থেকে বের হয়ে নকুলবাবু এদিক ওদিক চাইছে সতর্কিত চাহনিতে।

-গেছে ব্যাটারা?

কে বলে-হ্যাঁ!

কাশেম মিঞা অবশ্য চারিদিকে নজর রেখে জোরেই লঞ্চ চালাচ্ছে। নৌকার মাঝিরাও সাবধানী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। নকুলমামাকে শুধোই-ওরা কারা?

নকুল বলে-কে জানে! মধু বাওলিয়ার নৌকা হতে পারে, তবে বিশ্বাস নাই। হতে পারে কপিল সর্দারের লোক, বললাম না, বাঘ ছাড়াও এই সুন্দরবনে বাঘের বাবাও আছে! গুরুদেব! জয় গুরু!

নকুলবাবুর মত সাহসী লোককেও বাথরুমে লুকোতে হয় কাদের ভয়ে তা ঠিক বুঝতে পারি না।

পটলা বলে-কি ব্যাপার রে হামিদ?

হামিদই বলে-কপিল সর্দার এই অঞ্চলের নামি ডাকাত। জল ডাকাত। ওর মস্ত দল। ওরা গাং-এ ডাকাতি করে বেড়ায়। কাঠমহাজন, মাছ মহাজনদের নৌকা লুট করে। লোককে আটকে রেখে মোটা টাকা আদায় করে। পুলিশ ওদের খুঁজছে-কিন্তু কোথায় কোনো গাং-এ কুন বনে কখন থাকে তার হিসাব কেউ জানে না।

নকুলমামা বলে-অ কাশেম মিঞা খেরিয়ে কখন পৌছবা? কাশেম বলে-আর এসে গেছি। এই তো এখানে যুধিষ্ঠির পড়েছিল আর দু বাঁকের পথ!

-যুধিষ্ঠির পড়েছিল মানে? পটলাই বলে মহাভারতের যুধিষ্ঠির এই বাদাবনে আসবে কেন?

হাসে নকুলবাবু, বলে-আরে সে যুধিষ্ঠির নয়, মাঝি বাওমিয়া যুধিষ্ঠির। সেবার এখানে নৌকা গেরাপি করে রেখেছিল রাতে। ঘুমুচ্ছিল, বাঘ এসে নোঙরের রসি থাবায় ধরি টেনে টেনে নৌকা কাছে এনেছিল। ওরা টেরও পায়নি। নৌকা কাছে আসতে এক লাফে নৌকায় উঠে যুধিষ্ঠিরকে মুখে করে নিয়ে চলে যায়।

-সেকি! চমকে উঠি ওর কথায়।

নকুলবাবু বলে-এখানে সবই হয়। যুধিষ্ঠিরকে বাঘে মেরেছিল এখানে। তাই ওই যে ডালে ঝুলছে এখন ওর ছেড়া লুঙি, মাদুর। ওইটাই নিশানা। ওতেই লোকে সাবধান হয়, যে বাঘ রে মুলুক এটা।

পটলাকে বলি-এ কোথায় এলাম রে! বাঘ-কামট, কুমির-জলদস্যু কি নাই?

পটলা বলে-তুই ক-কাওয়ার্ড। ভীতু, এই না হলে অ্যাডভেঞ্চার হয়। হোঁৎকা তখন একরাশ মুড়ি আর স্রেফ কাঁচা লঙ্কা, পিঁয়াজ সঙ্গে খেজুরগুড়ের পাটালি দিয়েই সেকেন্ডে রাউন্ড জলযোগ সারছে আর গোবর্ধন ওদিকে পাকানির কাছে বসে কুমড়ো কেটে চলেছে। কুমড়োর তরকারিই এখানে অন্যতম প্রধান আইটেম।

পটলা বলে-হোঁৎকা, সমী সুন্দরবনে এসে ভয় পেয়েছে রে। হোঁৎকা তখন মুখে মুড়ি উইথ খেজুর পাটালি চিবুতে ব্যস্ত। সেটাকে ম্যানেজ করে বলে-ভয়, আমিও পাইছিরে। খাইতে না পাওয়ার ভয়। কিছুই তো মেলে না এহানে, খামু কি?

নকুলমামা বলে-তাই তো বলছিলাম এসো না। এখন বোঝো মজা। পটল বলে-এসেই যখন পড়েছি তখন শেষ দেখেই যাব।

শেষ অবধি মনের মধ্যে যেখানে গাছ কাটাই হচ্ছে সেখানে এসে পৌঁছালো আমাদের লঞ্চ। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল নামছে। রোদের রং হলুদ হয়ে আসছে। বড় নদীর থেকে একটা মাঝারি সাইজের খাল বের হয়ে ঢুকেছে বনের মধ্যে।

লঞ্চটা এগিয়ে আসে। খালের বুকে অনেক ছোট বড় নানা সাইজের নৌকা রয়েছে। রয়েছে বনবিভাগের পানসী অফিসবোট, ওদিকে খালের ধারে একটু ফাঁকা মত চরভূমি, সেখানে বন থেকে কেটে আনা নানা কাঠের স্তূপ, পাশেই খাল। সেখানে দুহাজার আড়াই হাজার মণ কাঠ ধরে এমনি সব বড় বড় নৌকায় কাঠ সাজানো হচ্ছে। বেশ কিছু লোকজন মাঝি বাওয়ালি, মায় কাঠ মহাজনদের নৌকাও রয়েছে।

এই এলাকাতেই কাঠ কাটাই হচ্ছে এখন। বনবিভাগের থেকে গাছে গাছে চিহ্ন দিয়ে আসবে, সেইসব গাছই কাটাই হবে। এক একটা এরিয়া করে গাছ কাটাই হবার পর কুড়ি বছর আর সেই এলাকায় কাঠ কাটাই হবে না।

তবে নকুলমামা বলে-ওসব আগের নিয়ম ছিল। এখন টাইগার প্রজেক্ট হয়েছে। বাঘেদের শান্তি নষ্ট করা চলবে না। বন কাটাইও এবার খুব কম হবে।

বনের ব্যবসা এবার ডকে উঠবে। আর ক'দিন বাঘ বাঁচুক, তবে মানুষ বাঁচবে। বোঝো নিয়ম!

বনবিভাগের বিট অফিসার ভূষণবাবুও এসেছেন আমাদের লঞ্চে। আমাদের দেখে বলেন-ইয়ং ম্যান, সব অ্যাডভেঞ্চারে এসেছ। বাঃ! একটু সাবধানে থাকবে।

অবশ্য হেঁটে বেড়াবার জায়গা এখানে খুবই কম। আমরা এসেছি শেষ দ্বীপে। এই খালটা গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে।

সেদিন বৈকালে ডিঙিতে কয়েকজনকে নিয়ে আমরা খাল বেয়ে সমুদ্রের ধারেই গেছি। এখানে দেখি বিস্তীর্ণ বালুচর। তবে জনমানবহীন। একটু দূরেই বনের শুরু।

পলিমাটিতে কিছু সরগাছও রয়েছে। ঝোপঝাড়। সেখানে একটা ছোট ডোবার মত। হাঁটু ভোরও নয় তার চেয়ে কম জল। ওই জলটা ছেঁচে দিতে ক্রমশ আবার জল ওঠে। সেই জল নোনা নয়। মিঠে জলই। চারিদিকে নোনা জলের মধ্যে এই একটু মিঠে জলের উৎস, তাই ডোবার ধারে হরিণ, বন শুয়োর মায় বাঘের পায়ের ছাপও দেখা যায়।

আমাদের মাঝিরা সেই জলই সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে। কালচরে দেখা যায় বড় বড় সারস জাতীয় পাখিদের। মানুষ নামক জীব তারা দেখেনি। তাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে-কাছে যেতেও ভয় পায় না, কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

এমন সময় হামিদের ডাক শুনে চাইলাম।

হামিদ বলে-দ্যাখেন পায়ের ছাপ। বড় কাছিমের ছাপ। কোথায় ডিম পাড়ছে, দেখতে এসেছিল।

ছাপটা লক্ষ করে এগিয়ে যাই। পটলা বলে-বালির নীচে ক-কাছিম থাকবে?

হামিদ একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বালির ছোট ঢিপির মত দেখে নিজেই বালি সরাতে থাকে। পটলা বলে-ওখানে কাছিম?

কাছিম নয়, দেখা যায় বালির নীচে ঢাকা দেওয়া হয়েছে এক তাল গোল গোল পিংপং বলের সাইজের কাছিমের ডিম। সাদা সঙ্গে লালচে আভা। তুলতুল করছে। অথচ খোলটা ভাঙে না।

একটা ঝুড়িতে তোলা হল। নকুলবাবু বলে-খাসা ওমলেট হবে।

হোঁৎকা খাবারের গন্ধ পেয়ে আবার আগ্রহী হয়ে সেই ঝুড়িতে তোলে প্রায় আশি নব্বইটা ডিম। কাছিম সমুদ্র থেকে উঠে এসে বালি খুঁড়ে সেই গর্তে ডিম পাড়ে তারপর বালি চাপা দিয়ে চলে যায়। বালির তলে ডিমগুলো ওরই বেশ কিছুদিন পর পূর্ণতা লাভ করে ফেটে যায়-তার থেকে কাছিমের বাচ্চাগুলো সমুদ্রের ডাক শুনে কোনোমতে গিয়ে জলে নামে, জলেই বসবাস শুরু করে। সমুদ্রই যেন তাদের ডাকে জলে যেতে।

ডিমের সমস্যা সমাধান তো হল। সকালে চায়ের জল চাপিয়ে হামিদ বড় নৌকার সংলগ্ন জালি কেটে নেমে যায়। জাল দিয়ে খাপ্‌লা মারতে তারতাজা পারশে-ভেটকি-ভাওন, সিলেট, পমফ্রেট প্রভৃতি নোনা জলের মাছ ওঠে।

সেই মাছ ভাজা না হয় কাছিমের ডিমের ওমলেট আর মুড়ি এই জলযোগ। দু'দিনেই বিরক্তি ধরে যায়। শোওয়া বসা এই লঞ্চে, মাঝে মাঝে ওই চরটুকুতে সাবধানে পায়চারি করা-এই কাজ।

একদিন জোর করেই বনে গেছি। সকালে কাঠ কাটার লোকজন স্নান করে সকালে ফ্যানাভাত খেয়ে নৌকায় খাবার জল তামাক, বিড়ি নিয়ে বনের সরু খালে ঢুকে পড়ে। বনের গভীরে এসেছি আমরা। খাল ও সরু দুদিকের বনসীমা খালের বুক অন্ধকার করে রেখেছে।

কাঠুরিয়ারা বনের মধ্যে জমাট ঘন গাছগাছালি কেটে পথ করে তার মধ্য দিয়ে বনে বনে ঢোকে, মাটিতে পা ফেলে সাবধানে অসতর্ক হলে গরানের শূলোয় পা ফুঁড়ে যাবে, সাপে ছোবল দেবে, বাঘ-এর ভয় তো আছেই।

বনের মধ্যে কাঠ গুলো কাটে আর ওই গুঁড়ি পথে সে সব বের করে এনে ডিঙিতে করে নৌকা বলতে বড় নৌকার কাছে আনে।

ওরা গাছ কাটছে বনের মধ্যে, হঠাৎ বনভূমি কাঁপিয়ে ওঠে চাপা গর্জন। চমকে উঠি আমরা। কে চিৎকার করে ওঠে-হুঁশিয়ার। কেউ বনবিবি, বাবা দক্ষিণরায়ের নাম জপছে। চিৎকারটার পরই শোনা যায় একটা আর্তনাদ।

পটলা, হোঁৎকা আমরা কি করব জানি না। কলরব ওঠে-গুপীকে বাঘ নেছে-হুঁশিয়ার।

হামিদ আমাদের কোনোমতে টেনে এনে বনের ভিতর থেকে ডিঙিতে তোলে।

হোঁৎকা বলে-কি হয়েছে দ্যাখ?

হামিদ বলে-ওরা দেখবে। আপনারা চলেন। সে নৌকা বাইতে থাকে। আর্তনাদটা আর শোনা যায় না। শোনা যায় গহন অরণ্যের বুকে বাঘের গর্জন।গাঁ-এর জলে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় শব্দটা।

আমাদের নিয়ে নৌকাটা ফিরে আসতে নকুলবাবু বলে-বলেছিলাম বনে যেও না ! কি য়ে হত? বাঘের চিৎকার এখান থেকেই শোনা যায়।নৌকা বসতের শান্ত জীবনে চাঞ্চল্য আসে। ফরেস্টের বাবুরাও বন্দুক রাইফেল নিয়ে বের হয়। দু চারটে কাঠুরিয়াদের নৌকা আসছে।

ক্রমশ ফেরে সকলেই। আর সুখের খবর গুপীকে বাঘাটা ধরতে পারেনি। গুপীই অর্তনাদ করে কাছের একটা বড় কেওড়া গাছে উঠে পড়তে বাঘটার চেষ্টা নিস্ফল হয়। তাই ব্যর্থ আক্রোশে সেটা তখনও বনে বনে গর্জন করে ফিরছে।

গুপী ফিরে এসে ঘটিখানেক জল খেয়ে তখন বাঘটার বর্ণনা দিচ্ছে সবিস্তারে।

পটলা বলে-রয়েল বেঙ্গল টাইগারই দেখেছ তাহলে?

গুপী বলে-বাবা দক্ষিণরায়ই বাঁচিয়েছেন।

কয়েকজন কাঠমহাজনের নৌকায় রয়েছে এখানে। তার মধ্যে গগনবাবুর নৌকায় এসেছে গগনবাবুর এক বন্ধু। হাফপ্যান্ট পরে থাকে-মুখে সব সময় বাঁকানো পাইপ, ফুক্ ফুক্ ধোঁয়া বের হয়। রোজ ওই জঙ্গলেই দাড়ি কামিয়ে ফিট ফাট থাকে ওই গোপালবাবু।

গোপালবাবু বলে-ফুঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার! তরাই-এর জঙ্গলে কত হাতি-বাঘ মেরেছি। এ তো তুচ্ছ। বলুন এটাকে আমিই ফিনিস করে দিই।

বনবাবু বলে-না-না। বাঘ মারা বেআইনি। এই এলাকা থেকে বাঘটাকে হটাতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি, পারেন তো আপনারাও করুন। না হলে কাজ করার অসুবিধা হবে। ওই বাঘটার সাহস বেড়ে যাবে, সে একদিকেও আসতে পারে।

পটলা বলে-বাঘটা দেখতে পেলাম না।

হোঁৎকা এর মধ্যে ওই গগনবাবুর শিকারি বন্ধু গোপালবাবুকেই আমাদের লঞ্চে এনে হামিদকে দিয়ে চা আলুসেদ্ধ সার্ভ করিয়ে খোস গল্প জুড়েছে।

গোপাল কারফর্মা নাকি মস্ত শিকারি। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা মায় তরাই-এর অরণ্যের তামাম বাঘ হাতি তাকে চেনে। ওদের কতজনকে যে সে মেরেছে তার ঠিক ঠিকানা নাই।

আমি বলি-বাঘ হাতি মারা তো এখন নিষেধ।

পটলাও ওই গল্পবাজ শিকারিকে দেখে তার বোলচাল শুনে খুশি নয়। সেও বলে-কারেক্ট। এখন তো হান্টিং বেআইনি কাজ।

গোপাল কারফর্মার দেহটা টিক্‌টিকে লগার মত। মুখখানাও আমসি মার্কা, তোবড়ানো। তবে নকুলবাবুর মত একজোড়া পুরুষ্ট গোঁফ তার মুখখানাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে।

নকুলবাবু বলে ওঠে-আরে চোরাগোপ্তা সব শিকারই হয়।

গোপাল কারফর্মা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলে-তা অবশ্যই হয়। করিও। তবে আমার লিস্টে এই বিয়ের আগেই আমি শ' খানেক বাঘ মেরেছি মশাই। ওয়ান হানড্রেড। তখন তো এসব আইন কোথায়?

নকুলবাবু বলে-তাহলে বাদাবনের এই বাঘটাকেই কিল করে দ্যান গোপালবাবু। না হলে নিরাপদে কাঠ কাটতে দেবে না ব্যাটা!

গোপাল বলে-দেখি। তবে সামনে বনবাবুরা রয়েছে যে। তবে বলছেন ভেবে দেখি। নকুলবাবু বলে-গগনবাবুকেও বলছি। বাঘটাকে নিকেশ করে দ্যান মশায়। ফরেস্টর লোকদের আমরা সামলে নেব।

নকুলবাবু চলে যেতে পটলা বলে-বে-আইনি কাজ করবেন না। পুলিশ কেস হয়ে যাবে। গোপাল কারফর্মা বলে-ভাবছি একবার চেষ্টা তো করা দরকার। ওরা বলছেন।

এবার হোঁৎকাই প্ল্যানটা দেয়। সে বলে-একটা কথা কমু স্যার?

কারফর্মা স্যার বলাতে খুব খুশি। বলে সে-বলো, বলো।

হোঁৎকা বলে-ওই বাঘ মাইরা শ্যাষে বিপদে পড়বেন। বাঘও আপনারে মারতি পারে।

কারফর্মা গোঁফে তা দিয়ে বলে-এ্যাঁ। কত বাঘকে আমি কিল করেছি। ওসব আমার কাছে জলভাত।

হোঁৎকা বলে-হউক জলভাত, তয় কি জানেন। বাঘে ছুইলি আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুইলি সর্বাঙ্গে ঘা হইবে। বাঘের চেয়েও ডেঞ্জার।

কথাটা কারফর্মাও মানে। আমরাও হোঁৎকাকেই সাপোর্ট করি সকলে।

হোঁৎকা বলে-ওরা কইছে ওদের কথামত বনের মধ্যে মাচানে বসেন, তয় ভোরের দিকি অনেক হরিণ জল খাইতে আসে, সেইসময় একখান হরিণই ফিনিস কইরা দেন। বলে-সঙ্গে সঙ্গে কাইটা মাংস বানাই দিমু, কেউ জানতি পারব না। জমাইয়া মাংস খামু ক'দিন।

পটলা বলে-হরিণের চামড়াটা ঠাকুমাকে দিতে হবে পুজার আসন হবে।

হোঁৎকা বলে-তাই হইব। তর ঠাকুমারে ওটা দিতি পারলে ভালো আমদানি হইব।

হোঁৎকা বলে-তাহলে কালই গাছাল দিন স্যার।

মিঃ কারফর্মা কি ভাবছে। গোবরা বলে-কি হল স্যার। ভয় পেয়ে গেলেন ? কারফর্মা গোঁফ মুচরিয়ে বলে-বুঝলে ছোকরা গোপাল কারফর্মা ভয় ডর কাকে বলে জানে না।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে একটা ছোট ডিঙিতে করে নকুলবাবু একটু কাঠ কাটার হিসাব দেখতে বেরুবেন। এই বনবাসেও নকুলবাবু কেমন ব্যাস্ত। মাঝে মাঝে একাই দু'একজনকে নিয়ে বের হয়ে যায় বনে। কি করে কে জানে। তবু সকাল সন্ধ্যা ওই টেপরেকার্ডারে গুরুদেবের অমৃতময় সেই হেড়ে বেসুরো গলায় নামগর্জন শুনবেই। নীরব বন ঝাঁপিয়ে সেই হুঙ্কার জাগে-বলো নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরে রাম। সেই সঙ্গে শোনা যায় উদ্দাম খোলের শব্দ। বনতল কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যার মুখে আমরা আমাদের নৌকা থেকে দেখছি একটু দূরে বনের মধ্যে খালে নৌকা রেখে নকুলবাবু কাছে স্তূপগুলো দেখছে। সূর্য অস্ত গেছে, অন্ধকার নামছে খালের বুকে।

নৌকায় টেপরেকর্ডারটা পাটাতনে রাখা ওদিকে বনে আঁধার ফিকে থেকে ঘনতর হচ্ছে। নকুলবাবু চশমাটা খুলে রেখে মুখে চোখে জল দিচ্ছে। এরপর নামগান শুরু হবে টেপে-তার সঙ্গে নকুলবাবুও গলা মিলিয়ে গুরুদেবের দোহারকি শুরু করবে বিকট স্বরে।

হঠাৎ নকুলবাবু চিৎকার করে ওঠে। সামনের কেওড়াগাছ থেকে একটা বাঁদর অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিল, এবার ফাঁক পেতেই একলাফে নেমে এসে নৌকার পাটাতনে রাখা নকুলবাবুর চশমাটাই নিজের চোখে পরে নেয় বানরনন্দন। নকুলবাবু তেড়ে যেতেই ওই পাওয়ার দেওয়া চশমায় বাঁদরটা নকুলবাবুর গালটা নিরীক্ষণ করে সপাটে সেখানে একটা চড় কসিয়ে গাছের ডালে উঠে এদিক ওদিকে লাফিয়ে বনে সেঁদিয়ে যায় চশমা পরেই।

নকুলবাবুও চশমার শোকে বিহ্বল হয়ে বনেই ঢুকতে যাবে, হঠাৎ এমনি সময় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাঘের গর্জন ওঠে। নৌকা বসতের মানুষজন চমকে ওঠে।

বাঘটা যে এখানেই হানা দেবে তা ভাবেনি কেউ। আমরা হতচকিত। দূরে বিশাল বাঘটা এবার সামনের নৌকায় পাটাতনেই লাফ দেয়। একজন বাওয়ালি বসেছিল হালের ওদিকে। নকুলবাবু নীচে। ওই বাঘ দেখে নকুলবাবু কাঠগাদার আড়ালে কাদাতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে গুরুদেবকে স্মরণ করে।

এদিকে ওজনদার বাঘটা নৌকার পলকা পাটাতনে লাফ দিতেই ওর ওজনে বাখারির এক পিস পাটাতন উল্টে যায়, বাঘবাবাজির ল্যাজ সেই ভাঙ্গা বাখারির চার ফিট বাই তিন ফিট পিসে ঢুকে গেছে। নকুলবাবুর গুরুদেবের অমৃতকণ্ঠবাহী টেপ রেকর্ডারের বেল্টটা বাঘের গলাতে জম্পেশ করে আটকে গেছে। আর নড়াচড়ার ফলেই বোধহয় 'প্লে অন' সুইচটাতে চাপ পড়তেই গুরুদেবের বজ্র নির্ঘোষ শোনা যায়।

-বলো নিতা-ই গৌওর রাধে এ শ্যাম্।

হ্যরে কৃষ্ণ-হর্্যে রামা-ম।। ব্যালো-ও

সুন্দরবনের বাঘও ওই বজ্রনির্ঘোষে আতঙ্কিত হয়ে এবার শিকারের মায়া ছেড়ে বনে ফেরার জন্য লম্ফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামে। ল্যাজে সেই বাখারির পাটাতনের পিস আটকে রয়েছে। আর গলদেশে বেল্টের মালা পরা টেপরেকর্ডারেও সুধাকণ্ঠের নামগান, চলেছে। জীবনে এমন বিপদে কখনও পড়েনি বাঘবাবাজি।

তখনও বজ্রকণ্ঠে নামগান চলেছে, আর সেই নামগানের গুঁতোয় বাঘবাবাজি ওই পাটাতন শুদ্ধ ল্যাজ আর কণ্ঠদেশে দোদুল্যমান নামগান এর কলরব নিয়ে সোজা বনের গভীরে ঢুকে কোনো দিকে দৌড়াল বাঁচার পরান নিয়ে কে জানে। এতক্ষণ ভীত চকিত দৃষ্টিতে ওই নাটক দেখছিলাম। এবার পটলা বলে বুঝলি ফটিক, বাঘটা গ-গানের খুব ভক্ত। তো-তোর সাকরেদ করে নে।

হোঁৎকা বলে-ও ওই নকুলমামার গুরুদেবেরই চ্যালা হইব। যা নামগান শোনাচ্ছে এখন ব্যাটা।

নকুলবাবুকে আর চেনা যায় না। চশমা গেছে মায় শেষ পারানির কড়ি গুরুদেবের নামসুধাও ওই জানোয়ারটা চুরি করে নিয়েছে। আর তাকে সর্বাঙ্গে পলিকাদা মাখিয়ে ভূত বানিয়ে গেছে। নকুলমামা শীতে কাঁপছে। তবু কোনমতে ছোট নৌকায় দাঁড়িয়ে চান করে কাপড় চোপড় বদলে এসে লঞ্চে বসে।

হোঁৎকাই বলে-হামিদ চা দে। খাবার দে মামাবাবুকে।

পটলা বলে-বাঘটা এক নম্বর শয়তান। আপনার গুরুদেবের নামও নিয়ে গেল।

নকুলবাবু গর্জে ওঠে-ওর বিহিত করবোই। হামিদ, নৌকা নে যা। গগনবাবুর বোট থেকে সেই শিকারি সাহেবকে ডেকে আন।

নকুলবাবু বাঘের উপর খুবই কুপিত। প্রতিশোধ নিতেই হবে। কে জানে বাঘটা এখনও গান শুনছে কিনা। গগনবাবুও এসেছে গোপালবাবুর সঙ্গে। নকুলবাবু বলে-ওই ব্যাটা বাঘকে এক গুলিতে খতম করতে হবে গোপালবাবু।

গোপাল কারফর্মা বলে-সিওর। বিটু ইন টু আইজ। ব্যস-একটি বুলেট, খতম।

-তাই করুন। ব্যাটা গুরুদেবকে নিয়ে ছেলেখেলা করবে?

গগনবাবু বলে-কিন্তু ফরেস্টের বাবুরা-

নকুল বলে-ও আমি দেখে নেবো।

পরিকল্পনা হয় কাল ভোরেই মিঃ কারফর্মা ওই বনের মধ্যে বড় একটা গাছে উঠে পড়বে, আর নকুলমামার প্রিয় সেই নোটনও নাকি খুব সাহসী। বাদাবনের ঘোঁতঘাত সবই জানে সে।

নোটনই তাকে নিয়ে যাবে বাঘের ঠিকানায়। কথাটা গোপনই থাকে। বাঘ মারা হলে তাকে ছাল চামড়া ছাড়িয়ে পুঁতে দেবে মাটিতে। বাঘের চামড়ার দামই হবে কয়েক লাখ টাকা। নখ-দাঁতও বেশ চড়াদরে বিক্রি হয়।

পটলা আমরা ওদের পরিকল্পনা শুনে অবাক।

পটলা বলে-ওই নকুলবাবুর এটাও ব্যবসা। কায়দা করে বাঘ মেরে চামড়া বেচে বিদেশে।

গোবরা বলে-নকুলমামার তাই এত আমদানি।

হোঁৎকা বলে-লোকটা দশ নম্বরী। ওর অনেক রকম কালা ধান্দাই আছে। ওর মতলব ভালো না। কিন্তু আমাদের করার কিছুই নাই। এসব অন্যায়কে সহ্য করতে হবে?

পটলাই বলে-এটা ঠিক করছেন না আপনি। আমাদের কোম্পানির কাজে এসে লুকিয়ে সুন্দরবনের বাঘ মেরে লাখ টাকায় সেই চামড়া বিদেশে পাচার করবেন। এটা ঠিক নয়।

নকুলবাবু গুম হয়ে যায়। পটলা বলে-এর আগেও আপনি লুকিয়ে বাঘ হরিণের চামড়া বিক্রি করেছেন।

নকুলবাবু বলে-যা জানো না তা নিয়ে কথা বলবে না। আর এই বাদাবনে আমার ওপর কথা বললে ভালো হবে না। এখানে মুখ বুজে থাকতে হবে তোমাদের। বাইরে গিয়েও কোনো কথা বলবে না, সাবধান করে দিচ্ছি পটল, আর তোমাদেরও।

পটলা বলে-হুমকি দিচ্ছেন?

নকুল গর্জে ওঠে-সাবধান! কোনো কথা যেন না বেরোয়। ফল ভালো হবে না।

নকুলবাবু শাসানি দিয়ে উপরের কেবিনে ঢুকল। সেই দাড়ি গোঁফ ভর্তি মুখ নিয়ে নোটনও কুতকুতে চোখের নীরব চাহনিতে আমাদের নীরব শাসানিই দিয়ে যায়।

এবার বুঝেছি নকুলবাবুর বাদাবনে বেশ কিছু দু-নম্বরী ধান্দা আছে। এসবের থেকেই তার এত রোজগার। তাই কুমড়োর ব্যবসা ছেড়ে এখন বাদাবনে যাতায়াত শুরু করেছে।

পটলার কাকা এত সব খবর রাখেন না। তার অনেক ব্যবসা। এই ব্যবসার ভার তিনি নকুলবাবুর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছেন। আর নকুলবাবুই আড়ালে নানা বেআইনি পথে নিজের রোজগার বাড়িয়ে চলেছে।

পটলা বলে-এর বি-বিহিত করতেই হবে। কাকামণিকে গে সব কথাই বলব। একটা শয়তানের চক্র গড়ে উঠেছে এখানে।

হোঁৎকা বলে-এহন চুপ মাইরা থাক। বাদাবনে ওরাই দেহি যা খুশি তাই করছে। হালায় কুমড়ো মামা এহানেও দেহি কুমড়া ইমপোর্ট করতিছে, ওদিক থেকেও নানা মাল আনছে।

পটলা বলে-ব্যাটা শয়তান?

হোঁৎকা বলে-চুপ মাইরা থাক। দেহি কাল সকালে তো কারফর্মারে কইছি, যদি হরিণের মাংস জোটে, খাই দাই লঞ্চ লই ফিরুম। নৌকায় লঞ্চে বইসা পায়ে বাত ধইরা যাইব। ঘোরনের জায়গাই নাই ওই বীচ ছাড়া।

সাকালের আলো সবে ফুটছে। পুব আকাশের বুকে রূপালী আভাস জাগে। নৌকাবসত তখনও জাগেনি। আজ শুক্রবার, বন কাটাই-এর লোকদের ছুটি।

দেখি গগনবাবুদের নৌকা থেকে একটা ছোট নোকায় কারর্ফমা সাহেব উঠে এল। পরনে খাঁকি হাফপ্যান্ট, শার্ট, মাথায় টুপি, গলায় একটা কার্টুজের মালা, হাতে রাইফেল। নৌকায় রয়েছে নোটন সর্দার। দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ, গাঁয়ে একটা ধুমসো চাদর জড়ানো, মাথায় গামছা বাধতে নোটন সর্দার। ডিঙিখানা আমাদের লঞ্চের পাশ দিয়ে বেয়ে চলে গেল বনের দিকে। আমরা বীর শিকারিকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাই। হাত নাড়ে গোপালবাবুও। নকুলবাবুও দেখছে। তার চোখে বাঘ মারা স্বপ্ন। আর বেশ কয়েক লাখ টাকা এসে যাবে যদি ওই দশ এগারো ফিট রয়েল বেঙ্গলের চামড়াটা পায়। নকুলবাবু এখন সেই গুরুদেবের নাম গানের ক্যাসেট নেই। তাই নিজেই বাঁশ ফাটা গলায় নাম করে গুরুদেবের স্টাইলে।-ব্যালো-নিতাই গৌর-কোত্থেকে একটা ছোট কত্তালও বের করে এবার কয়েক লাখ টাকা আমদানির স্বপ্নে নামগান শুরু করেছে।

আমরাও লঞ্চে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। দূর বনের কোনো গাছের উপর ভোরের আলোতেই কারফর্মার মত নিপুণ শিকারি বসে আছে তাক করে। বনের মধ্যে ভোরের বেলাতে হরিণের পাল বের হয় খাবারের সন্ধানে। পাল পাল হরিণ আছে এখানে। তার একটা নিশ্চয়ই পড়বে ওর গুলিতে।

হোঁৎকা বলে-হামিদ বেশি কইরা আদা পিঁয়াজ লঙ্কা রেডি রাখবি, মাংস আমিই বানাইমু।

নকুলবাবু নামকীর্তন করছে বনের দিকে কান পেতে। কখন গুলির শব্দ শোনা যাবে তারই জন্য কান পেতে আছে। ঘণ্টা দু-তিন পার হয়ে গেল। বেলা বেড়ে ওঠে। সোনা রোদ ছড়িয়ে পড়ে কেওড়া বাইন গাছের বুকে। আজ নৌকাবসতের লোকদের কর্মব্যস্ততা নেই। খালের বুকে নৌকার যাতায়াতও কম।

দেখা যায় বনের দিক থেকে সেই ডিঙিটা আসছে। ওদিকে কারফর্মার বসে আছে, মাথায় টুপিটা নাই, এদিকে নোটন সর্দার গুম হয়ে হাল মেরে ডিঙিটা আনছে।

আমরা ব্যগ্র হয়ে নজর করি। হোঁৎকা বলে-দ্যাখ নৌকার খোলে হরিণ ফরিণ কিছু আছে কি না? ওদিকে নকুলবাবু নৌকা দেখে নামকেত্তন সিকেয় তুলে রেখে লাফ দিয়ে লঞ্চের ছাদ থেকে দেখছে নৌকাটার দিকে।

কে জানে বাঘ মেরে বনেই রেখে এসেছে বোধহয়। তাহলে নকুল লোকজন নিয়ে ছাল ছাড়াবার জন্য রওনা দেবে। হুঙ্কার ছাড়ে সে-জয় গুরু! অ্যাই নোটন।

নৌকাটা কিন্তু আমাদের লঞ্চের দিকেও আসে না। নোটন সর্দারও সাড়া দেয় না। কারফর্মা সাহেবকে নিয়ে ওদিকে রাখা গগন মহাজনের বড় নৌকায় তুলে দিয়ে এবার নোটন ডিঙি নিয়ে ফিরছে আমাদের লঞ্চের কাছে।

নকুলবাবু গর্জে ওঠে-কি রে নোটন কথার জবাব দিচ্ছিস না যে? নোটনের জবাব দেবার সময় নেই। ডিঙিটা নৌকার কাছির সঙ্গে বেঁধে এবার সে নৌকায় রাখা ছোট বালতিটা দিয়ে গাং-এর জল তুলছে আর হড় হড় করে মাথায় গায়ে ঢেলেই চলেছে। আর মাঝে মাঝে আওয়াজ করে-রাম, রাম! আবার জল ঢালে সর্বাঙ্গে। আমরাও অবাক নোটনের কাণ্ড দেখে। তারপর নেয়ে ধুয়ে জামা কাপড় চাদর কেচে লুঙি ফতুয়া পরে এবার লঞ্চে উঠে আসে নোটন।

হোঁৎকার একরাশ পিঁয়াজ আদা ছাড়ানো পড়ে আছে, নকুলবাবু গর্জে ওঠে-কি হল? কিছু বলছিস না কেন বাঘটাকে মারতে পারলে ওই ব্যাটা শিকারি! ব্যাটা গোলন্দাজ!

এবার নোটন ফেটে পড়ে। বলে সে-শিকারি! গোলন্দাজ! বাপ্ মারেনি টিকটিকি তার ব্যাটা গোলন্দাজ! তাহলে বলি সব খোলসা করে! রাম-রাম!

ভোরের আবছা আলোয় তারা ডিঙি থেকে নেমে সাবধানে গিয়ে একটা কেওড়া গাছের উঁচু ডালে উঠে বসেছে। বাঘটার পায়ের ছাপও দেখেছে তারা নরম মাটিতে।

আশেপাশেই ঘুরছে বাঘটা। গাছের, উপরের ডালে বসেছে কারফর্মা সাহেব বন্দুক বাগিয়ে, আর তার ঠিক নীচের ডালেই বসেছে নোটন সর্দার।

ভোরের কুয়াশা মাখা গাছগাছালি, 'স্তব্ধ বন' বাতাসে ওঠে সমুদ্রের গর্জন আর বনে বনে হাওয়ার শব্দ। চোখ মেলে বসে আছে। হঠাৎ একটা শব্দ। ওদিকের বনে একটা সাবধানী শব্দ।

কারফর্মাকে নোটন ইশারা করে-বাঘ!

কারফর্মার চোখ দুটো যেন লাল হয়ে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে সে আওয়াজ করে-বা-আ-ঘ!

তারপরই মুখ তোলে নোটন, দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ তরল পদার্থ পড়ে তারপরই দুর্গন্ধময় পদার্থ উপর থেকে পড়ছে, নোটনের মুখ দাড়ি ছাপিয়ে সেই পূতি গন্ধময় আধাতরল বস্তু সর্বাঙ্গে পড়তে থাকে।

কারফর্মার হাতের বন্দুক সশব্দে নীচে পড়েছে আর কারফর্মা দুহাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলছে আর মুখে অস্ফুট আর্তনাদ বা-ঘ-বাঘ-বাঁচাও!

সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক কর্মও ঘটে চলেছে নীচে নোটনের দেহের উপর নিঃসাড়ে, বাঘের নাম শুনে।

হাসতে থাকি ওই অপূর্ব দৃশ্যের কল্পনা করে।

হোঁৎকা শুধোয়-বাঘ দেখছিলা?

নোটন বলে-বাঘ! কোথায় বাঘ! দেখি পাশের গাছে একটা বড় বাঁদর ওই দৃশ্য দেখে দাঁত বের করে দেওয়লা করছে।

নকুলবাবু গর্জে ওঠে-এই শিকারি! ফুটানিবাজ! বাঘের নাম শুনেই বাহ্যি পেচ্ছাব করে, সে গেছে বাঘ মারতে!

নোটন বলে-ভাবলাম ওরে গাছের ডালেই রেখে ফিরে যাই, তা গগনবাবুর সমুন্ধী, তাই নামিয়ে বন্দুক কুড়িয়ে নে এলাম। টুপিখান কোথায় গেল কে জানে? কুন বান্দর পরে ডালে ডালে ঘুরবে।

নকুলবাবুর হাতে এত টাকা ফসকে গেল। হোঁৎকা বলে-সুন্দরবনের বান্দর, বাঘ বেশ রসিক! বান্দরে চশমা চোখে দেয়, টুপিও পইরা ঘোরে আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও গুরুদেবের নামগান শুইনা বেষ্ণব হই গেছে গিয়া।

নকুলমামা বলে-থামতো! সুন্দরবন তোমাদের কুলেপাড়া রাসমণির বাজার নয় এখানে সবকিছুই হতে পারে। খুব ডেঞ্জার জায়গা।

তখন ঠিক বুঝিনি ব্যাপারটা। বুঝলাম সেই রাতেই। লঞ্চের ভিতর শুয়ে আছি। এখানে দিনের চেহারা রাতের চেহারা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। সন্ধ্যার পর নামে আদিম আরণ্যক অন্ধকার। বনের মাঝে হরিণের টলটলে চোখ দেখা যায়। বাতাসে ওঠে সমুদ্রের গর্জন। সবাই তখন নৌকায় উঠে আসে।

এক এক নৌকায় এক একদল কাঠের পিদিম জ্বলে, একজন 'সোনাভানের কাহিনি' না হয় মা বনবিবির পাঁচালি পড়ে অন্যরা শোনে। কেউ বা কাহিনি শোনায়, রাজা-রাজপুত্র, জিন পরীর কাহিনি সকলেই শোনে মুগ্ধ হয়ে।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট আটটার মধ্যে চুকিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। অন্ধকার রাতে এখানে কেউ কারো নাম ধরেও ডাকে না।কাউকে ডাকার দরকার হলে 'কু' করে শব্দ করে অন্যজন ওই ডাকেই সাড়া দেয়।

সেদিন সকালে পটলা হামিদ হোঁদৎকাদের নিয়ে ডিঙিতে বীচে গেছি কাছিমের ডিমের সন্ধানে। বালুচর বেশ প্রশস্ত। এখানে ফঁকার বেড়ানো যায় বনের দিকে নজর রেখে। বালিতে ডিমের সন্ধান করছি।

হঠাৎ দেখা যায় বনের দিক থেকে ক'জন লোক সরু একটা খাল থেকে নৌকা নিয়ে বের হয়ে আসছে। কাঠ মহাজনদের লোকই হবে-মিঠে জলের সন্ধানে এসেছে তাই ভেবে আমরা ডিমের সন্ধান করছি ওদিকে। হঠাৎ পটলার চিৎকার শুনে চাইলাম। লোকগুলো পটলাকে ধরে ওর মুখ বন্ধ করে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের ডিঙিতে তোলে।

আমরা দৌড়ে যাবার আগেই ডিঙিতে পটলাকে তুলে তীব্র বেগে ডিঙি বেয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমাদের ডিঙিটারও দূরে ওদিকের খালে রয়েছে। আসতে গেলে সমুদ্রে নেমে ডিঙি বেয়ে এই খালের মুখে ঢুকতে হবে। আর এই খালটা বনের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে গেছে। কোথায় গেছে আমাদের পক্ষে খোঁজাও সম্ভব নয়।

তাই আমরা ওদের পিছনে যাবার চেষ্টা না করে ডিঙি নিয়ে ফিরে এলাম নৌকা-বসতে।

তখন বেলা প্রায় এগারোটা। নৌকা বসতের বেশিরভাগ কাঠুরিয়া, মাঝি সবাই বনে গাছ কাটতে গেছে। নকুলবাবুও নাই। বনবিভাগের নৌকাতে গিয়েও বিট অফিসার, গার্ডদের দেখা পাই না। ওরা বনের মধ্যে কাজে গেছে। একজন মাত্র রান্নার লোক রয়েছে ওদের বোটে। সে আর কি বলবে। কেউ না, অথচ পটলাকে কারা তুলে নিয়ে গেল। হোঁৎকা বলে-বেশ গড়বড় হয়ে গেল। এহন কি করা যায়?

গোবর্ধন বলে-নকুলমামাও নাই। ওদিকে রয়েছে মিঃ কারফর্মা। সেদিনের বাঘ মারার ওই নাটকের পর তিনি আর এমুখো হননি।

ছটফট করছি আমরা। কাশেম মিঞা সারেং লঞ্চেই ছিল। সে বলে-চলেন দেখি, ব্যাটাদের নৌকা যদি দেখতে পাই। খবর পেয়ে কারফর্মা সাহেবও এসেছে বন্দুক নিয়ে। সেও বলে-সে কি বাদাবনে কিডন্যাপিং?

আমি জানাই-ঠিক বুঝছি না, ওরা পটলাকে কেন তুলে নিয়ে যাবে?

হোঁৎকা বলে-চল, দেখি!

কাশেম মিঞা লঞ্চ নিয়ে বের হল। সঙ্গে কারফর্মাও রয়েছে। এখাল ওখাল ঘুরে সমুদ্রের একদিকে ঘুরে এলাম, কিন্তু তেমন কোনো নৌকার সন্ধান মেলে না। গাং-এ কয়েকজন মাছ ধরছিল নৌকায় করে।

কাশেম মিঞা তাদেরও জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তারা বলে-দু' একখান নৌকা যাতায়াত করতে দেখছি, কিন্তু তেমন কিছু তো দেখি নাই বাবুরা।

ঘণ্টা দুয়েক এদিক ওদিক নিস্ফল ঘোরাঘুরি করে নৌকাবসতে ফিরি হতাশ মনে, ততক্ষণে নকুলবাবুও ফিরেছে। পটলার কোনো খবরই নাই।

সব শুনে নকুলবাবু বলে-তখনই বলেছিলাম সুন্দরবনে এসো না। এখানে মানুষ বাঘও আছে। এ তাদেরই কাজ। লাখ দুলাখ টাকা চাইবে কম করে, দিলে ফেরৎ পাবে। না হলে ব্যস!

হোঁৎকা বলে-এহন কি করা যায় কন?

বন বিভাগের বিট অফিসারও এসেছে। তার বনের ফেরির নৌকা থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেছে কারা, তাদেরও দায়িত্ব এসে গেছে। তরুণ বিট অফিসার নরেনবাবু বলে-তারা আশপাশেই ছিল।

নকুলবাবু বলে-কেনে গেছলে বীচে? এ্যা-না বলে, না কয়ে যেখানে সেখানে ঘুরবে? খাও এবার ডিম, ঘোড়ার ডিমই খাও। আর এখন পটলের কাকাবাবুদের কি জবাব দেব আমি?

আমিই বলি-পুলিশে খবর দিতে হবে। আর দেখছিলাম নদীতে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লঞ্চ। বনের এদিক ওদিকের জল পথে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই ফোর্সের লোকেদেরও খবর দেওয়া দরকার।

নকুলমামা বলে-সব খবর রাখো দেখছি। এ্যা-ওই বি-এস এফ এর লোকদের তো চেন না, দেবে তোমাদেরই ফটিকে পুরে।

ফটিক বলে-দেয় দিক। তবু পটলাকে বের করার চেষ্টা ওরা করবেই।

হোঁৎকা বলে-বনে বইসা থাকুম না, পুলিশেই যামু।

নকুলবাবু বলে-ভেবে দেখতে দাও। হয় তো এর মধ্যেও কোনো খবর এসে পড়তে পারে।

তারপর আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে-আমিও বসে নাই। দায়িত্ব আমারও আছে পটলের জন্যে। দেখা যাক কি হয়। যাও এখন চান খাওয়া করে নাও।

আমাদের মন মেজাজ ভালো নাই। এই দুর্গম বনে হঠাৎ এইভাবে পটলাকে কারা তুলে নিয়ে গেল জানি না। কোথায় গেল তাও জানি না। কলকাতায় গিয়ে পটলার বাব মা তার ঠাক্‌মাকে কি জবাব দেব তাও ভাবতেই পারছি না।

পটলাও ভাবেনি যে এইভাবে অতর্কিতে ওরা এসে তার উপরই লাফিয়ে পড়ে এইভাবে মুখ টিপে ধরে এনে নৌকায় তুলে বনের গভীরে পালাবে। সেও দল থেকে একটু ওদিকে বালুচরে দাঁড়িয়ে নীল আকাশ, সমুদ্র দেখছিল! মাঝে মাঝে তার মনে কবিত্ব জেগে ওঠে, কবিতাও লিখে ফেলে তখন ডজন খানেক। কিন্তু ওই কবিত্বের জন্য এইভাবে তাকে তুলে নিয়ে যাবে কেউ তা ভাবেনি, নৌকাটার গড়নও আলাদা ধরনের। কিছুটা সরু, আট-দশজন লোক একতালে দাঁড় ফেলছে আর ছিপখানা তীর বেগে জলকেটে ছুটে চলেছে। লোকগুলোর চেহারাও বেশ বলিষ্ঠ, পেশীবহুল। নৌকার খোলে দেখে তরোয়াল, লাঠি-বল্লম, রামদা এসব তো আছেই আর ওদিকে একজন বসে আছে, লম্বা চুল, ধরা গালপাট্টা, কোমরে লাল শালুর বেষ্টনী, মাথায় একটা গামছা। ওর গায়ে একটা ফতুয়া আর হাতে বন্ধুক। ওই এদের নেতা।

লোকটা বলে-এ্যাই বাঁটুল, তুই ওই জেলে ডিঙিটার লোকটাকে বল-এই চিঠিখানা যেন সে ওই কাঠকাটাই এর বনবাবুর নৌকাতে দেয়। বলবি ভূপতি সর্দারের হুকুম।

নদীতে দুতিন খানা বাছাড়ি নৌকায় কয়েকজন লোক গাং-এর ধারে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। মাছ ধরে ওরা জালের পিছনে বাখারির তৈরি ডুবন্ত খাঁচার মত আছে, তাতেই মাছগুলো রাখে, মাছগুলো পালাতে পারে না, ওই হাপরের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে। সেই তাজামাছ ওরা আড়তে নিয়ে যায় কোনো গঞ্জে।

জেলে ডিঙির লোকগুলো হঠাৎ ওই ছিপটাকে তাদের দিকে আসতে দেখে জাল ফাল ফেলে হাত জোড় করে কান্নাকাটি করতে থাকে-মেরো না গো। গরিব মানুষ, পরান হাতে নে প্যাটের দায়ে গাং-এ এসেছি। দোহাই তোমাদের, সঙ্গে ত্যামন কিছু নাই দুদিনের খোরাকি আছে তা নে যাও, পরানে মেরো না।

পটলাও বুঝেছে এই নৌকার লোকেরা কুখ্যাত জল ডাকাত। এই এলাকার আতঙ্ক। সে এদের কবলেই পড়েছে। ছিপের নেতা মত লোকটা গর্জে ওঠে-এ্যাই চোপ! মারব না তোদের। শোন, এই চিঠিখানা ওই যে ওই ছোট মনসার বাদায়, কাঠ কাটাই এর ঘেরি হয়েছে জানিস।

একজন জেলে বলে-হ্যাঁ বাবু, ফরেস্টের পিটেল বোট ও আছে, মেলা নৌকা বাওয়ালিও আছে দেখলাম।

ডাকাতটা বলে-ওই বনবাবুদের বোটে এই চিঠি পৌঁছে দিবি আজই। ঠিক তো!

লোকটা এত সহজে রেহাই পাবে ভাবেনি। বলে-তাই দেব বাবু।

-হ্যাঁ। আর না দিলে এ গাং আর আসতে হবে না। কপিল সর্দারের লোক তোদের শেষ করে দেবে।

জেলেরা সবাই বলে-না, না। আজই বৈকালে পৌঁছে দেব।

পটলাকে নিয়ে ছিপটা এবার বড় নদী ছেড়ে আবার বড় একটা খালে ঢোকে। চলেছে তারা। একসঙ্গে জলে দশটা দাঁড়ের শব্দ ওঠে। পটলা দেখছে বন এখানে গভীর। দুপুরবেলা পার হয়ে গেছে।

ওদের একজন মাটির হাঁড়ি থেকে পান্তাভাত আর মাছের চচ্চড়ি সঙ্গে পিঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা এগিয়ে দেয় ওর দিকে একটা ময়লা সানকিতে। লাল কাদাকাদা ফাটা চালের ভাত। মাছটার বিশ্রী গন্ধ উঠছে।

-খাও।

পটলা বলে-খিদে নাই।

ওরা খেতে থাকে। একজন বলে-খিদে পেলেই খাবে। অন্যজনও খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে বলে-সর্দার ওর জন্য হালুয়া, পোলাও রেঁধে রাখবে। অনেক টাকার মাল শুনছি। দাম দিলে নাকি ওর বাবা কাকারা দু পাঁচ লাখটাকাই দেবে।

পটলা শুনছে কথাটা। ঠিক ভাবতে পারে না এরা নকুলবাবুর খবর পেল কোথা থেকে। তাহলে নকুলবাবু কি এদের চেনে? কথাটা এদের শুধোতে পারে না। চুপ করেই থাকে।

পড়ন্ত বেলায় বনের গভীরে এসে থামল এদের নৌকা। গাছের ডাল থেকে একটা পাখি তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে ওঠে।

এদের ছিপ থেকেও একজন দুহাতে মুখ ঢেকে অমনি একটা আওয়াজ করতে এবার বনের ভিতর থেকে একজন লোক বাঁশের মাথায় একটা নীল কাপড় পতাকার মত নাড়তে ছিপটা এবার'-বাঁকের মাথা দিয়ে খালের ভিতর এগিয়ে যায়। দেখে পটলা খালের মধ্যে বেশ কয়েকখানা ছোট বড় ছিপ নৌকা, আর একটা বড় নৌকা-বেশ ছই এর ঘর করা, দু চারটে ছইওয়ালা নৌকাও আছে।

এখানে বনের মধ্যে বেশ খানিকটা উঁচু ডাঙামত, সেখানে বন কেটে কাঠের ঘরও রয়েছে দু একটা।

বনের গভীরে এটা সেই কোনো ভূপতি সর্দারের অস্থায়ী রাজধানী বলেই মনে হল।

ছিপ থেকে সেই নেতা মত লোকটা উঠে গেল ওই বড় নৌকার পাটাতনে। দেখা যায় একজন লোক একটা কাঠের বেঞ্চে বসে তামাক খাচ্ছে।

পটলা ছিপ থেকে দেখছে লোকটাকে। সেই ছিপের সর্দার যেতেই লোকটা তামাক খাওয়া ছেড়ে চাইল। গোলমত মুখ, চোখ দুটো বুনোমোষের মত লাল টকটকে। আর গলার আওয়াজ বিশ্রী ফাটা-তবে সতেজ। শুধোয় এ-এনেছিস ছেলেটাকে?

-ওই তো!

পটলাকে নিয়ে যায় ওরা ওই সর্দারের কাছে। কপিল সর্দার পটলাকে আপাদমস্তক দেখে বলে-ওদের খপর দিইছিস?

-হ্যাঁ।

সর্দার বলে-এটাকে নে গিয়ে ওই নৌকায় রাখ। নজর রাখবি। আর শোন-এর খাবার দাবারের যেন ভালো ব্যবস্থা করা হয়।

পটলাকে বলে-যাও। ওখানেই থাকবে। পালাবার পথ এখানে নাই, চারিদিকে বন আর নদী। বাঘ না হয়, কুমিরেই শেষ করে দেবে।

পটলাকে এনে ওরা একটা ছইওয়ালা নৌকায় তোলে। দুজনকে বলে সেই লোকটা-নজর রাখবি। আর খাবার দাবারের সব ব্যবস্থাই কর এর। কত্তার হুকুম, কোনো অসুবিধা যেন না হয়। অনেক টাকার মাল।

পটলা বুঝেছে সে এই জলদস্যুদের গল্পই শুনেছিল। আজ সত্যিই এদের পাল্লাতেই পড়েছে।

বনের গভীরে থাকলেও সভ্যজগতের সঙ্গে যে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তা বুঝতে পারে পটলা। নৌকায় তোষক বালিশ কম্বল সবই আছে। সকাল থেকে কিছুই খায় নি, দু'এক গ্লাস জল ছাড়া।

এখানে ওর জন্য বৈকালে চা আর গরম রুটি আলু চচ্চড়ি গুর আসে। কাচের প্লেট গ্লাস নাবে, ভাঁড়ারে খাবারের অভাব নাই। বনের গহনে রেডিও বাজে সর্দারের নৌকায়।

বনের হরিণের মাংস এই নৌকাবসতে পায়নি, রাতে হরিণের মাংস রুটি সবই জোটে। আরামেই আছে, কিন্তু বন্ধুরা নেই। একা একপাল ডাকাতের মধ্যে বাস করতে হবে কতদিন তাও জানে না, আর কখনও কুলেপাড়ার বাড়িতে মা বাবা ঠাক্মার কাছে ফিরতে পারবে কি না তা জানে না পটলা।

ভাবতেও কষ্ট হয়।

রাতে ঘুম আসে না। ছই এর ফাঁক দিয়ে দেখে রাতের বেলাতে তো এখানে লঞ্চ আসে। আবছা আলোয় কি সব কথাবার্তা হয় আবার ওরা অনেকে চলে যায়। রাতের অন্ধকারে এদের নানা কাজকারবার চলে এই সুরক্ষিত অঞ্চল থেকেই।

পটলার খবর আসে আমাদের কাছে বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার মুখে। সেই জেলেদের একটা ডিঙি এসে চিঠিখানা বিট অফিসারের নৌকায় দিয়ে গেছে।

লোকগুলোও বলে-একটা সোন্দর ছেলেকেও দেখলাম ওদের ছিপে, ওরে নিয়ে চলে গেল বিহারীখাসের ওদিকে।

বিট অফিসারই খবরটা আনে আমাদের লঞ্চে। বিট অফিসার নরেনবাবু বলে এ কপিল সর্দারের দলের কাজ। ব্যাটারা এদিকে

রাজত্বি চালাচ্ছে। রাতে বর্ডার পার হয়ে দুনম্বরী মাল আনে আর এদিকে ডাকাতি গুম সবই করছে।

নকুলবাবু বলে-এদের তখন থেকে মানা করেছি কলকাতার ছেলে বনে বাদায় এসো না। এখন বুঝুক, বলে দুলাখ টাকা না পেলে ছাড়বে না পটলাকে। সাতদিনের মধ্যে টাকা না পেলে খতম করে দেবে।

আমরা ত চমকে উঠি।

-সেকি!

নকুলবাবু বলে-তাই লিখেছে। এই বুধবার টাকা এনে দিতে হবে পুইজালির মোড়ে গাং এর ধারে ওদের লোকের হাতে, তবেই পটলাকে ছাড়বে।

এমন বিপদে পড়তে হবে ভাবিনি আমরা।

নরেনবাবু বলেন-সন্দেশখালি থানায় গে খবত দিতে হবে।

নকুলবাবু বলে-পুলিশ! পুলিশ কি করবে এখানে? ছেলেটাকে পেতে গেলে সুড়সুড় করে টাকা দেওয়া ভালো। ওদের চটালে বিপদ হবে।

কি করা যাবে ভাবতে পারি না। হোঁৎকা বলে-

তাই ভালো। কালই আমরা গিয়া ওর বাবা কাকারে কই টাকা লই আসতি।

নকুলবাবু বলে-তাই করো, কিন্তু এদিকে এত হাজার টাকার কাঠ পড়ে আছে। সময়ে মাল চালান না গেলে বহুৎ লোকসান। তোমরা সকালে লঞ্চ নিয়ে চলে যাও। ধামাখালি থেকে বাস পাবে কলকাতার, কাল সন্ধ্যা তক কলকাতায় পৌঁছে পরশু ই টাকা নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরবে ক্যামন। তারপর দিন বুধবারও আমি কুমিরমারির হাটতলায় প্রমথ নস্করের কাপড়ের দোকানে থাকবো, তোমরা কাকাবাবুকে নে টাকা সমেত এসে পড়লে ছেলেটাকে বাঁচানো যেতে পারে।

-উঃ কি হল বলো তো? বাবুদের সাথে মুখ দেখাবার পথও রইল না। এখন টাকা দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টাই করতে হবে পটলাকে। তোমরা গিয়ে ব্যবস্থা করো।

নরেনবাবু বলেন-এভাবে লোকের সর্বনাশ করবে, গাং নৌকা চলাচল করতে দেবে না, আমরাতো চেষ্টা করছি ওই ডাকাতদের ধরার।

নকুল বলে-আগে ছেলেটাকে ঘরে ফিরতে দেন, তারপর যা করার করবেন।

পটলা বৈকালে এসেই তার নৌকায় উঠে বসেছে।

কি ভাবে মুক্ত হবে জানে না। নৌকায় একটা ছেলেও আছে। তার খাবারদাবার আনে। সেই বলে-কাল ভোরের জোয়ারে হাটে যাবে তারা, কুমিরমারির হাট থেকেই তারা আনাজপত্র, খাবারদাবার আনে মহাজনের গদি থেকে।

পটলার পকেটে একটা খাম, কাগজও ছিল। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধিটা গজিয়ে ওঠে। বলে সে-হাটতলায় ডাকঘর আছে?

-ডাকঘর? ছেলেটা বলে-একটা লালবাক্স সেখানে চিঠি ফেলে টেলে?

-হ্যাঁ! এই জায়গাটার নাম কি?

ছেলেটা বলে-চামটার খাল, কেনে গো?

পটলা মনে মনে একটা নকশা করে রেখেছিল। বড় নদীর নাম হরিণগাড়া, তার থেকে ডাইনে একটা খাল বেরিয়েছে, ওটার নাম বলেছিল ওরা বিহারী খাল, ওই খালের বুক দিয়ে বাংলাদেশ যাবার স্টিমার যেত। তাই পথে সংকেতের একটা লোহার উপর সাতরং করা বোর্ড ও আছে।

সেই বোর্ডের পাশ দিয়েই এই খাল ঢুকে এসেছে বনের গহনে।

পটলা ডটপেন দিয়ে কাগজে সেই ম্যাপটা আন্দাজমত এঁকে ফেলে, তাঁদের বনের মধ্যে বসতের খালটাও আঁকে। আর চিঠিখানায় কাকাকে ওসব জানায়। খালটার মুখবন্ধ করে ঠিকানা লিখে পটলা বলে ছেলেটাকে-

-তোর নাম কি?

-কেষ্টা। ছেলেটারও ওকে পছন্দ হয়।

পটলা বলে-এখানে থাকতে ভালো লাগে?

কেষ্টা এদিক ওদিক চেয়ে বলে-না বাবু, এরা সাংঘাতিক লোক। আমার বাবাকেও এরাই মেরেছিল সেবার গাং-এ। পেটের দায়ে ইখানে পড়ে আছি। কোথাও কাজ পেলে চলে যাব এ মুলুক ছেড়ে, নালে এরা বাঁচতে দেবে না। বাইরে কোথাও কাউকে চিনি না, কে কাজ দেবে বাবু। ঘরে মা-একটা ভাই আছে।

কেষ্টার চোখ জলে ভরে ওঠে। পটলা বলে-

-আমি যদি ছাড়া পাই তোকে কলকাতা যাব। সেখানেই থাকবি কাজ করবি আমাদের ওখানেই।

কেষ্টা বলে-সত্যি!

-হ্যাঁ, পটলার পকেটে কিছু টাকাও ছিল। লোকগুলো তার পকেট সার্চও করেনি। এমনিই তুলে এনেছিল। পটলা পকেট থেকে শ পাঁচেক টাকা বের করে ওকে দিয়ে বলে-

-এটা বাড়িতে দিবি। আর শোন-এই চিঠিখানা ডাকঘরের সেই চিঠিফেলার লালবাক্সে ফেলে দিবি আজই। খুব হুঁসিয়ার এরা কেউ যেন জানতে না পারে।

কেষ্টা ধুতির পেট কোঁচড়ে টাকা সমেত চিঠিখানা ঠিকমত সেঁদিয়ে নিয়ে বলে-কেউ জানতি পারবে না। আজই ফেলে দেব।

ভোর রাতেই ওরা নৌকা নিয়ে মালপত্র আনতে বের হয়ে যায়। আটদাঁড়ের নৌকা-এক জোয়ারেই ওরা বেলা দশটার মধ্যে কুমীরমারিতে পৌঁছে যাবে।

ওই কপিল সর্দারের দলের লোকদের হাটে অনেকেই চেনে। তাদের কোনো অসুবিধাই হয় না। হাটে পৌঁছে লোকগুলো খাবারের দোকানে বসে এবার বিনাপয়সায় কচুরি জিলাপি খেতে থাকে।

কেষ্টার বাড়ি একটু ওদিকে, নদীর ধারে একটা ছোট বাড়িতে ওর মা-ভাই থাকে, বাবা নাই। কেষ্টা বাড়ির দিকেই রওনা হয়। টাকাগুলো মাকে দিয়ে ফেরার পথে গোপনে লালবাক্সে চিঠিখানা ফেলে দেবে।

আমাদের লঞ্চটা এসে থামে কুমিরমারির ঘাটে। ওদিকেই ফরেস্টের বিট অফিস নরেনবাবুর সঙ্গে নেমে গেছি বসতির শেষ প্রান্তে। ঝিলা, রায়মঙ্গল নদীর মোহানার মুখে ছায়াঘেরা বনবাংলো-ফরেস্ট অফিস। সামনে রায়মঙ্গল চলে গেছে বাংলাদেশের দিকে।

দূরে একটা বি-এস-এফ-এর লঞ্চকে দেখা যায়।

নরেনবাবু এর মধ্যে অফিসে গিয়ে রেডিওতে যোগাযোগ শুরু করেছেন। চারদিকে ডাকাতদের এই নতুন শিকারের খবর ছড়িয়ে পড়ে।

আমি বলি-কলকাতা পুলিশকেও যদি মেসেজ দেন পটলার বাড়ির ঠিকানা-ফোন নাম্বার দিচ্ছি। ওর বাবাকেও যদি খবর দেন ভালো হয়।

নরেনবাবু কলকাতা পুলিশকেও ওখান থেকেই রেডিও মেসেজ দিয়ে দেন।

খিদে পেয়েছে।

দোকান বলতে ওই হাট তলায়, আজ হাট বার এখানে আজ বহু মানুষজন, নৌকার ভিড়। এইটাই মানুষের শেষ বসতি। দ্বীপটাও বেশ বড়ই। সব লোকজনই হাটে আসে। আর নৌকায় করে আসে অন্যদ্বীপের লোকজনও। দোকানীরাও আসে নৌকায়, মালপত্র নামিয়ে বেসাতি করে দিনশেষে দোকান গুটিয়ে নৌকায় তুলে আবার চলে যায় অন্য হাটে। দিনভোর ভিড় থাকে।

পথ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা ছেলে আমাদের দেখে শুধোয়

-বাবু, একখান চিঠি ফেলব, ডাকঘরের লালবাক্সে ফেললে চলে যাবে তো?

ওর কথায় চাইলাম। আমি শুধোই-কোথায় যাবে চিঠি?

হোঁৎকাই বলে-দেখি চিঠিখানা।

ছেলেটি চিঠিখানা হোঁৎকার হাতে দিতে ঠিকানাটা পড়ে চমকে উঠি-এ যে পটলাদের বাড়ির ঠিকানা রে! মনে হচ্ছে পটলার হাতের লেখা।

শুধাই-এ চিঠি তুই কোথায় পেলি! কে দিয়েছে ফেলতে? ছেলেটা এবার ঘাবড়ে যায়, বলে না-হায়। আমি কিছু জানি না গো।

পালাবার চেষ্টা করতে গোবরা খপ্ করে ওর হাতটা ধরে বলে-একদম চেল্লাবি না, পালাবার চেষ্টা করলে তোকে গাং-এ ডুবিয়ে দেব। কি নাম তোর?

-কেষ্টা।

আমিই বলি-কোন ভয় নাই তোর। ওই বাবু আমাদের বন্ধু। আমরা তাকেই খুঁজছি। চল আমাদের সঙ্গে।

খাওয়া মাথায় উঠল, কেষ্টাকে নিয়ে এসে হাজির করি নরেনবাবুর কাছে সেই চিঠি সমেত।

নরেনবাবু এর মধ্যে কলকাতায়, বারাসাত হেড কোয়ার্টারে মেসেজ দিয়েছেন, বসিরহাট পুলিশ দপ্তরে বনদপ্তরে খবর গেছে। যেখান থেকে ওরা বি-এস-এফ-এর দপ্তরে খবর দিয়েছে। যেভাবে হোক ওই জলদস্যুদের ধরতেই হবে।

পুলিশ বিভাগ, বনদপ্তর ওই ভূপতি সর্দারের দলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লোকটা অনেকদিন ধরেই এই এলাকায় নানা জায়গায় ডাকাতি, খুন জখম করে চলেছে।

গাং-এর জেলে, কাঠুরিয়া-কাঠমহাজনদের নৌকা লুট করে, অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করছে। এছাড়া ইদানীং এই সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানও অনেক বেড়ে গেছে।

এসবের মূলে ওই কপিল সর্দারের দলই। স্থানীয় কোনো কোন ব্যবসায়ী ওই দলের সাহায্যেই ওদের দিয়েই লাখ লাখ টাকার বিদেশি মাল, সোনার বিস্কুট এসব আমদানি করে চলেছে।

কলকাতার পথে এমন অনেক মাল ধরাও পড়েছে। কিন্তু আসল অপরাধীদের কেউ ছুঁতেও পারেনি। পুলিশ বি-এস-এফ ওই ডাকাতদের কোনো সন্ধানই পাচ্ছে না।

এবার পটলাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

আর কেষ্টার হাতের চিঠিখানাতে একটা ম্যাপও আঁকা আছে। নরেনবাবু ওইসব অঞ্চলে প্রায় ঘোরাঘুরি করেন, তিনি ম্যাপটা দেখে কিছুটা অনুমান করেন চামটার জঙ্গলে রয়েছে তারা মনে হচ্ছে। কোথায় আছে ওরা? কেষ্টা কাঁদছে, নরেনবাবু বলেন কি রে!

-কিছু জানি না বাবু! ওরা জানতে পারলে আমাকে তো শেষ করবেই, মা ভাইটাকেও খতম করে দেবে।

সেটা খুবই সম্ভব ওই দানবের পক্ষে। কেষ্টাই চেনে সেই গাং, বনের গহন অঞ্চল পুলিশকে সেইই নিয়ে যেতে পারে ওখানে। আর যা করার তাড়াতাড়িই করতে হবে।

হোৎকা বলে একটা কিছু করতি হইব!

আমি বলি-স্যার। ওই কেষ্টা আর ও ওর দলের পাঁচ ছজনের সঙ্গে নৌকায় এসেছেন। ওরা না ফিরলে লোকগুলো মায় সর্দারও জেনে ফেলবে কিছু অঘটন ঘটেছে।

নরেনবাবু কি ভেবে বলেন কেষ্টাকে-ঠিক আছে, যা তুই ফিরে যা। তবে বলিস না এখানে এসেছিলি, তোরা ফিরবি কোনো দিকে?

কেষ্টা বলে-ওরা বলছিল বাঘনার গাং দিয়েই ফিরবে মরিচঝাঁপির ফোড়ন দিয়ে।

নরেনবাবু বলেন-ঠিক আছে, তুই যা।

কেষ্টা ছাড়া পেয়ে দৌড়ালো।

আমরা বলি-ছেড়ে দিলেন ওটাকে!

হোৎকা বলে-এখন কি হইব?

নরেনবাবু বলেন দ্যাখনা এবার কি হয়। এর মধ্যে কয়েকটা মেসেজ দিতে হবে।

আমরা বলি আমরা চলে যাব?

নরেনবাবু বলেন কলকাতায় তোমাদের বন্ধুর বাড়িতে এতক্ষণ পুলিশ থেকে ফোনে সব খবরই চলে গেছে। ওরাও বোধহয় রওনা দেবেন এখনই।

এখানেই থেকে যাও তোমরা। পুলিশ ওদিক থেকে কোনো মেসেজ থাকলে আমাদের এখুনিই জানাবে।

নরেনবাবু আবার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে বি-এস এফের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে থাকেন।

আমরা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে কি করব ভাবতে পারছি না।

অবশ্য কলকাতার মেসেজ এসেছে পটলার কাকা এখানেই আসছেন, তাই আমাদের এখন এখানেই থাকতে হবে।

নরেনবাবুই আমাদের লঞ্চের সারেংকে বলে কাশেম মিঞা, লঞ্চ নিয়ে আপনি ধামাখালির ক্যাম্পে চলে যান। সেখানে কলকাতা থেকে পটলের কাকাবাবু আসছেন তাকে নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবেন এখানে।

লঞ্চ চলে গেল, আমরা রয়ে গেলাম ফরেস্টের রেস্ট হাউসে।

ওখানেই দুপুরের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। হোৎকা বলে-কি গড়বড় হইল সবকিছু।

গোবরা বলে পটলার কাকাবাবু আসছেন।

হোৎকা বলে কিছু বুঝছি না। ওই কিষ্টারে ছাড়ালো ক্যান?

এদিকে দেখি ঘাটে এসে ভিড়েছে একটা লঞ্চ।

বৈকাল হবো হবো, নরেনবাবু বলেন-চলো, দেখা যাব প্রাথমিক কাজটা কতদুর করা যায়।

লঞ্চ নিয়ে আমরা বাঘনা নদী ধরে চলেছি। এর একদিকে বন, আর একপাশে বাঁধের নীচে দু' একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। শেষ জনবসতি, এরপর বসতি আর নাই, নদী আর গহন বন।

আমাদের লঞ্চটা একটা ঝোপের ধারে এসে থামল, ওদিকে বনের ভিতর একটা খাল চলে গেছে। একটা হাট ফেরত দু'একটা নৌকায় লোকজন চলেছে।

দেখা যায় একটা নৌকায় কেষ্টা রয়েছে আর ছ'সাতজন লোক নৌকায় মালপত্র নিয়ে চলেছে। ওরা এবার বনের মধ্যে খালে ঢুকে উধাও হয়ে যাবে।

হঠাৎ বনের ভিতর থেকে একটা লঞ্চ থেকে বিকট জোরে সাইরেন বেজে ওঠে। ওই নৌকার লোকজন সচকিত হয়ে নৌকা খালের ধারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে বনের ভিতর থেকে পুলিশের একটা লঞ্চ এগিয়ে এসে ওদের পথ আটকে দাঁড়ায়।

এপাশ থেকে ফরেস্টের লঞ্চও গিয়ে তাদের রুখেছে। গার্ডদের হাতে বন্ধুক, ওদিকে পুলিশও তৈরি।

কেষ্টাদের নৌকা থেকে একজন জলে ঝাঁপ দিতেই পুলিশের লঞ্চ এসে তাকে ফাঁস দিয়ে ধরে টেনে তোলে। আর নৌকায় সবকটাকেই পুলিশ ঘিরে ফেলে অ্যারেস্ট করে তাদের লঞ্চে তোলে। মাল বোঝাই নৌকাটাকেও টেনে এনে ফরেস্টের জেটিতে লাগায়।

এতদিন পর ভূপতি সর্দারের দলের কয়েকজনকে হাতে-নাতে ধরেছে পুলিশ।

এবার বুঝতে পারি নরেনবাবু কেষ্টাকে কেন ছেড়ে দিয়েছিল। ওকে না ছাড়লে দলের বাকি ক'জনকে ধরতে পারত না। লোকগুলোকে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

আর পুলিশ গর্জায়-কোথায় তোদের আস্তানা-তাই বল।

লোকগুলো মুখ খুলতে চায় না। পুলিশও ছাড়বে না।

বৈকাল নামছে, এর মধ্যে পুলিশের নানা প্রকারের জেরার চোটে কয়েকজন মুখ খুলেছে। ততক্ষণে বি-এস-এফের একটা লঞ্চও এসে পড়েছে সদরের নির্দেশে।

নকুলবাবু আমাদের লঞ্চটাকে বিদায় করে এবার নিশ্চিত হয়। বিট অফিসারও নাই, নকুলবাবু ওই দিনই লোকজন নিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে অনেক দামি কাঠ কেটে ফেলে সাইজ করে নৌকাতে বোঝাই করে ফেলে।

নৌকাগুলো মাল নিয়ে যাত্রা করবে এই জোয়ারে। তার আগেই সে অন্য নৌকায় নোটন আরও কজনকে নিয়ে বের হয়। এই নৌকাটায় একটা ইঞ্জিনও লাগানো।

নকুলবাবু বিশেষ কাজে এইটা নিয়ে যাতায়াত করে। তার জন্য বিশেষ কিছু মাল আসবে বনের মধ্যে একটা জায়গায় বর্ডার পার হয়ে। সেগুলো নিয়ে ফিরবে সে ধামাখালির ক্যাম্পে। তাই বের হয় সে বৈকালেই সেই গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে।

কপিল সর্দারের ব্যবসাপত্র ভালোই চলছে। গহনবনের এক এক ঠাঁই। এসে কিছুদিনের জন্য নৌকা বসত গড়ে তোলে। ওইটাই তার অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার।

তবে এক জায়গায় সে বেশিদিন থাকে না, থাকা নিরাপদ নয়। তাই মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে সর্দার ঠাঁই বদল করে।

সেই ভাবেই এখানে এসে রয়েছে কদিন ভূপতি সর্দার। তার জাল বহুদুর অবধি ছড়ানো। আবাদের অনেক ধনী লোক তাকে খুশি রাখে। তার জন্য মোটা টাকা মাসোহারা দেয়, বড় বড় মাছের আড়তদার কাঠ মহাজনদেরও মাসকাবারি দিতে হয় যথাস্থানে, না হলে এই বাদাবনে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে হবে না।

নকুলবাবুও সেটা জানে। সে আরও বুদ্ধিমান। তাই ওই প্রণামী দেওয়া ছাড়াও ভূপতি সর্দারের সাহায্যে অন্য ব্যবসাপত্র শুরু করেছে।

অবশ্য মূলধন নকুলবাবুর।বর্ডারের ওপার থেকে দুস্তর গাং এই গহন সুন্দরবন পার হয়ে প্রচুর, বিদেশি মালপত্র আনা হয়।

এসব আনে নকুলবাবুর লোকজনই কিন্তু তাদের মদত দেয় এই ভূপতি সর্দারের লোক।

সীমান্তের গাং-এ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এর টহলদারী লঞ্চ ঘুরে বেড়ায়। এরা তাদের ফাঁকি দিয়ে বনের কোনো সুড়ি পথে মাল আনে। মাঝে মাঝে গুলি বিনিময়ও হয়।

এরাও সেই বিদ্যায় কম নয়, এদের কাছে আধুনিক অস্ত্রও আছে। তাই দরকার হলে মোকাবিলা করেও পালিয়ে আসে কোনো গোপন পথে। মাল চলাচল-এর কাজ ঠিকই চলে।

কপিল সর্দার এসবের জন্য মোটা টাকাই বখরা হিসাবে পায়। আর পার্টিরাও তাদের মাল পেয়ে যায়। ভূপতি সর্দার এছাড়াও মাঝে মাঝে তাক্ বুঝে কোনো বিদ্রোহী মহাজনকে সযুত করার জন্যই তার নৌকার জেলে বা কাঠুরিয়াদের ধরে মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করে।

কপিল সর্দার ডিঙিতে তার অস্থায়ী ক্যাম্প পরিদর্শন করে নিজের বোটে উঠে আসে। বেশ ছিমছাম আধুনিক কায়দায় সাজানো বোট। তাতে শক্তিশালী ইঞ্জিন লাগানো। এছাড়া ও বেশ কিছু ভুটভুটিও আছে।

সর্দার এককালে লঞ্চ নিয়ে মাছের ব্যবসা করত। এই সুন্দরবনের নদী খাড়ি তার চেনা। ক্রমশ ভূপতি বুঝেছিল জোর যার মুল্লুক তার।

বাদাবনে ক্রমশ সেই নীতির জোরেই সে বড়লোক হয়ে ওঠে। মাছের নৌকা লুট শুরু করে ক্রমশ সে মানুষের সর্বস্ব লুট করতে শুরু করে আজ এইখানে পৌঁছেছে, ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করতেও তার বাধে না।

কত গরিব জেলে-বাওয়ালি তার কাজের প্রতিবাদ করতে গাং-এ তলিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই।'

কপিল ক্রমশ দলপতি হয়ে ওঠে।

বৈকালে সব দেখে শুনে আসে। গাছের ডালে তার পাহারাদার থাকে। শিকার গাং-এ ঢোকার মুখেই সে খবর পায়।

কপিল পটলাকেও দেখে।

-কি রে!

পটলা চুপ করে থাকে। কপিল বলে-দু লাখ টাকা এলেই তোকে মোল্লাখালির লঞ্চে তুলে দেব। সে কদিন থাক। আর সাতদিনের মধ্যে টাকা না এলে-তখন খতম।

পটলা চুপ করেই থাকে। ভয়ও হয়। কিন্তু বেশ বুঝছে সে এই মানুষটার কাছে দয়া চাওয়া বৃথা।

সর্দার শুধোয়-এ্যাই ভুতো, ন্যাপারা এখনও হাট থেকে ফেরেনি?

ন্যাপা নৌকা মেরামতের কাজ করছিল, ডাঙায় নৌকা তুলে পরীক্ষা করতে হয় তলার কাঠ-বোড্ ঠিকঠাক আছে কিনা। সেগুলো মেরামত রং করতে হয় মিস্ত্রির কাজ করার লোকদের দিয়ে।

ভুতো বলে-এখনও ফেরার টাইম হয়নি। এতটা পথ যাতায়াত করতে হবে। হাটে মাল তুলে তবে তো আসবে। এসে যাবে।

সন্ধ্যা নামে, রাত ঘনায়। তখনও ফেরে না সেই ন্যাপার দল হাট থেকে। এবার ভাবনায় পড়ে কপিল সর্দার।

এমন সময় অন্ধকারে 'কু' শব্দ ওঠে, যেন কোনো পাখিই ডাকছে। ডাকটা এদিক ওদিকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। গাং-এর বুকে নৌকার ইঞ্জিনের শব্দ।

কপিল সচকিত হয়ে ওঠে। ওই ডাকে বুঝতে পারে, সে তাদেরই কোনো নৌকা আসছে, অর্থাৎ সেই নৌকাকে তার খালে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে।

কপিল নিশ্চিত হয় হাট থেকে বোধহয় ন্যাপারাই ফিরছে, সে এসে পাটাতনে দাঁড়ায়। নৌকাটা এসে তার নৌকার গায়ে লাগে। উঠে আসে একজন।

কপিল হতাশ হয়-ন্যাপার নৌকা এ নয়। এসেছে তার এক পার্টনার নকুলবাবু। ছই এর ভিতরে ঢুকে যায় ওকে নিয়ে।

নকুল বলে-ফরেস্টের চালান এসেছে আমার?

কপিল তখনও চিন্তায় রয়েছে, তবু কারবার করতে হবে। তাই বলে,

-হ্যাঁ, মাল নিয়ে য়াও তোমার। ওই যে। পেটি দুটো দেখায়! নকুল জানে এই চালানে তার বেশ মোটা লাভই হবে। তাই সর্দারকে সে একটা থলে এগিয়ে দিয়ে বলে-পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। কপিল টাকাটা নেয়। নকুলবাবু বলে,

-আর দুলাখ আসছে সর্দার, আনার কমিশন যেন ঠিক থাকে। ওই ছেলেটাকে ছাড়াতে ওরা টাকাই দেবে!

ভূপতি বলে-এলে পাবে।

নকুল তার নৌকায় মাল তুলে নিয়ে বের হবে রাতের বেলা এত টাকার মাল নকুল কাউকে বিশ্বাস করে না। কে জানে এ-মাল নিয়ে বের হলে মাঝ গাং-এ এই তার দলকে দিয়ে লুট করিয়ে সব কেড়ে নেবে।

তাই ওর নৌকা বসতেই রাতটা পার করে ভোরেই বের হবে। এই ভেবে সে নৌকাটা এনে ওদের নৌকাগুলোর কাছাকাছি নোঙর করে রয়েছে, ওদের কাছাকাছি থাকাই নিরাপদ।

কপিল এবার চিন্তায় পড়ে। হাট থেকে ওরা ফিরল না। ওদের কোনো বিপদ হলে তাদেরও বিপদ, অথচ কোনো খবরও নাই। ভূপতি রাতের বেলাতেই তার দলের বিশ্বস্ত নেতা ক'জনকে ডেকে আনে নৌকায়।

-ওরা ফিরল না। পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি তো?

এরাও ভাবছে কথাটা কপিল বলে রাতেই তোরা ক'জন চলে যা, হাটের রহিম ওস্তাগর আমাদের চেনা জানা। তার কাছে গেলে খবর পাবি। হোঁশিয়ার! বিপদ দেখলে কোনরকমে এসে খবর দিবি।

সন্ধ্যার পরই বাঘনা ফরেস্ট অফিসের জেটিতে দুতিনটে লঞ্চ, ট্রলার পুলিশের লঞ্চ, বি-এস-এফের দুটো লঞ্চ এসে পড়ে। নরেনবাবু অন্যদের সঙ্গে কি আলোচনা করেছে। তারপরই কেষ্টা আর ওদের দলের একজনকে নিয়ে লঞ্চে তোলে।

আমি হোঁৎকা, ফটিক, গোবর্ধনও রয়েছি ফরেস্টের লঞ্চে। পুলিশ-বি-এস-এফের লোক কেষ্টা আর সেই লোকটাকে তাদের লঞ্চে তুলে এবার যাত্রা করে।

আগে বি এস এফ-এর লঞ্চ দুটো-তারপর পুলিশের লঞ্চ, পিছনে ফরেস্টের লঞ্চ ও আবার গাং-এর দিকে চলেছি। কাকাবাবু এখনও আসতে পারেননি। কাশেমের লঞ্চ ও ফেরেনি। বলা আছে ওর লঞ্চ এলে ওরা যেন এখানেই অপেক্ষা করে।

এর মধ্যে পুলিশ, বি-এস-এফ যুগ্মভাবে তাদের প্ল্যান করে নিয়েছে। ফরেস্টের লঞ্চে ও নরেনবাবু, কয়েকজন গার্ড রাইফেল নিয়ে তৈরি। তবে খুব প্রয়োজন না হলে এরা কিছু করবে না। যা করার পুলিশ, বি-এস-এফই করবে।

বি-এস-এফ পথ চেনে, তবু কেষ্টাই তাদের বড় গাং থেকে ভিতরের খালের হদিশ দেয়, খালটা ভিতরে শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে গেছে। এরা লঞ্চদুটোকে একদিকে ঢোকায় আর একটা লঞ্চকে অন্যপথে এগিয়ে যেতে বলে। আমরা রইছি পিছনে।

পুলিশকে আগেই কৌশল বাতলেছিল লোকটা মারের চোটে। খালে ঢুকবার মুখেই পাখির সেই ডাক-সঙ্গে সঙ্গে আলো বসানো রাইফেল থেকে এক ঝলক আলো আর গুলি নিয়ে নিপুণ লক্ষ্যে লাগে গাছের ডালের লোকটার পায়ে আর্তনাদ করে সে নীচের ঝোপে পড়ে 'কু' ডাকও থেমে যায় কপিলের সেই পাহারাদারের।

লঞ্চগুলো এগিয়ে চলেছে।

কপিল সর্দার তার দলবল চমকে ওঠে ওই শব্দে। রাতের নির্জন বনে শব্দটা উঠছে।

দলবল জেগে ওঠে-একি! মনোকে পাহারায় রেখেছিলি?

-হ্যাঁ। গুলির শব্দ শুনলাম সর্দার।

-সেকি! তৈরি হ সবাই! কোনো ব্যাটাকে ধারে কাছে ভিড়তে দিবি না।

ওরাও সব সজাগ হয়ে ওঠে।

পটলার ঘুম ভেঙে গেছে, দেখছে নৌকা বহর নিমেষের মধ্যে জেগে গেছে। আর বনের অন্ধকার বিদীর্ণ করে জোরাল সার্চলাইটের আলো গাং-এর দুদিক থেকে এসে পড়ে নৌকাগুলোর উপর।

মাইকে ঘোষণা শোনা যায় কপিল সর্দার, পুলিশ, বি-এস-এফ তোমাদের দুদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করা হবে। যে যার হাতিয়ার ফেলে দুহাত মাথার উপরে তুলে দাঁড়াও। না হলে গুলি করে সব নৌকা ফুটো করে তোমাদের শেষ করা হবে।

সর্দারের চ্যালাদেরকে লাফ দিয়ে বনে পালাবার চেষ্টা করতেই গুলিতে সে আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে। চারিদিকের গাং বন আলোয় ভরে গেছে।

কপিল স্বপ্নেও ভাবেনি যে এইভাবে তাদের ডেরা দুদিক থেকে ঘিরে ফেলবে পুলিশ-বি-এস-এফ তাদের জালে ফেলবে। আর লড়াই করা বৃথা। ওদের হাতে অনেক মারাণাস্ত্র, শেষই করে দেবে তাদের।

পুলিশ এবার ওদের সবকটাকেই কাউকে দড়িতে বেঁধে, কাউকে হাতকড়া পরিয়ে লঞ্চে তোলে।

পটলাকেও ফিরে পেয়েছি আমরা। হঠাৎ দেখা যায় পুলিশ আর একটা নৌকা থেকে নকুলবাবু, নোটনকে তুলছে বোটে। নকুল আমাদের দেখে বলে-আমি ডাকাত দলের কেউ নই। আমার পার্টনারের ভাইপোকে এরা ধরে এনেছিল, তাই এসেছিলাম এদের কাছে ওকেই ছাড়াবার জন্য। শুধান ওদের।

আমরাও বুঝতে পারি না নকুলবাবু এখানে কেন আসবে। হয়তো পটলার জন্যই এসেছিল। হোৎকা বলে-থাম তো। ওটা শয়তানের হাড়। অন্য কোন মতলব আঁটছে।

পুলিশ অফিসার ওই পেটিটা লঞ্চে তুলে আনে-দেখা যায় ওর মধ্যে মজবুত করে প্যাক করা-সোনার বিস্কুট। পুলিশ অফিসার বলে নকুলবাবুকে-এসব আপনার নৌকায় পাওয়া গেছে। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোনা স্মাগলিং করেন।

-না স্যার। নকুলবাবু বলে-ওসব কিছুই জানি না স্যার। নরেনবাবু বলে-সব জানা যাবে। চলুন এখন।

কাকাবাবুককে অফিসেই পাওয়া যায় তিনিও আমাদের লঞ্চে উঠে আসেন। পটলাকে উদ্ধার করেই ফিরছি আর একটা মস্ত কাজ করেছিলাম আমরা। ভূপতি সর্দার ওই বাদাবনের আতঙ্ককে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। নকুলবাবু কাকাবাবুকে বলে দেখুন, কি না কি পেয়েছে পুলিশ আমাকে ধরেছে। সোনা স্মাগল করি বলছে। ছাড়ান আমাকে।

পুলিশও এসেছে ধামাখালির গুদামে। কুমড়োর গুদাম। নকুলবাবু বলে-দেখুন স্যার। সোনাদানার ব্যাপারে নাই।

কিন্তু দেখা যায় বেশ কিছু কুমড়োর গা চৌকা করে দাগানো। সেটাতে দাগ দিতে সেই পিসটা উঠে আসে-সেই পথে কুমড়োর মধ্যে সোনার বিস্কুট ঢুকিয়ে সেই কুমড়ো শহরে চালান আনে নকুলবাবু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে।

কয়েকটা কুমড়োর মধ্যেই সোনার বিস্কুট মিলতে নকুলবাবু স্তব্ধ।

কাকাবাবু বলেন-এর জন্যই বাদাবনে ব্যবসা করতেন নকুলবাবু। আপনিই টাকার লোভে পটলাকে ডাকাতদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এটা সর্দারই পুলিশকে বলেছে।

পুলিশ নকুলবাবুকেও কপিল সর্দারের দলের সঙ্গে চালান দিল সদরে।

হোঁৎকা বলে-এবার কুলোপাড়ায় ফিরে চল পটলা। যা বাদাবনে আনছিলি, কুন খাদ্যি নাই। আর আসুম না এহানে।

তবে বিজয়ীর মতই সেবার সুন্দরবন ভ্রমণ সেরে ফিরেছি আমরা।